গল্প-ভারতী

শারদীয়া

১৩৬৭ (২)

গল্প-ভারতী

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম"
তুমি হৃদি তুমি মর্ম

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক

শ্রীবৃন্দাবনকৃষ্ণ মজুমদার

প্রকাশক
ভারতী সাহিত্য ভবন
১১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

15916
৫।৩

মূল্য—তিন টাকা।

15916

৯৬ বিডন
কলিকাতা হইতে
ভারতী সাহিত্য

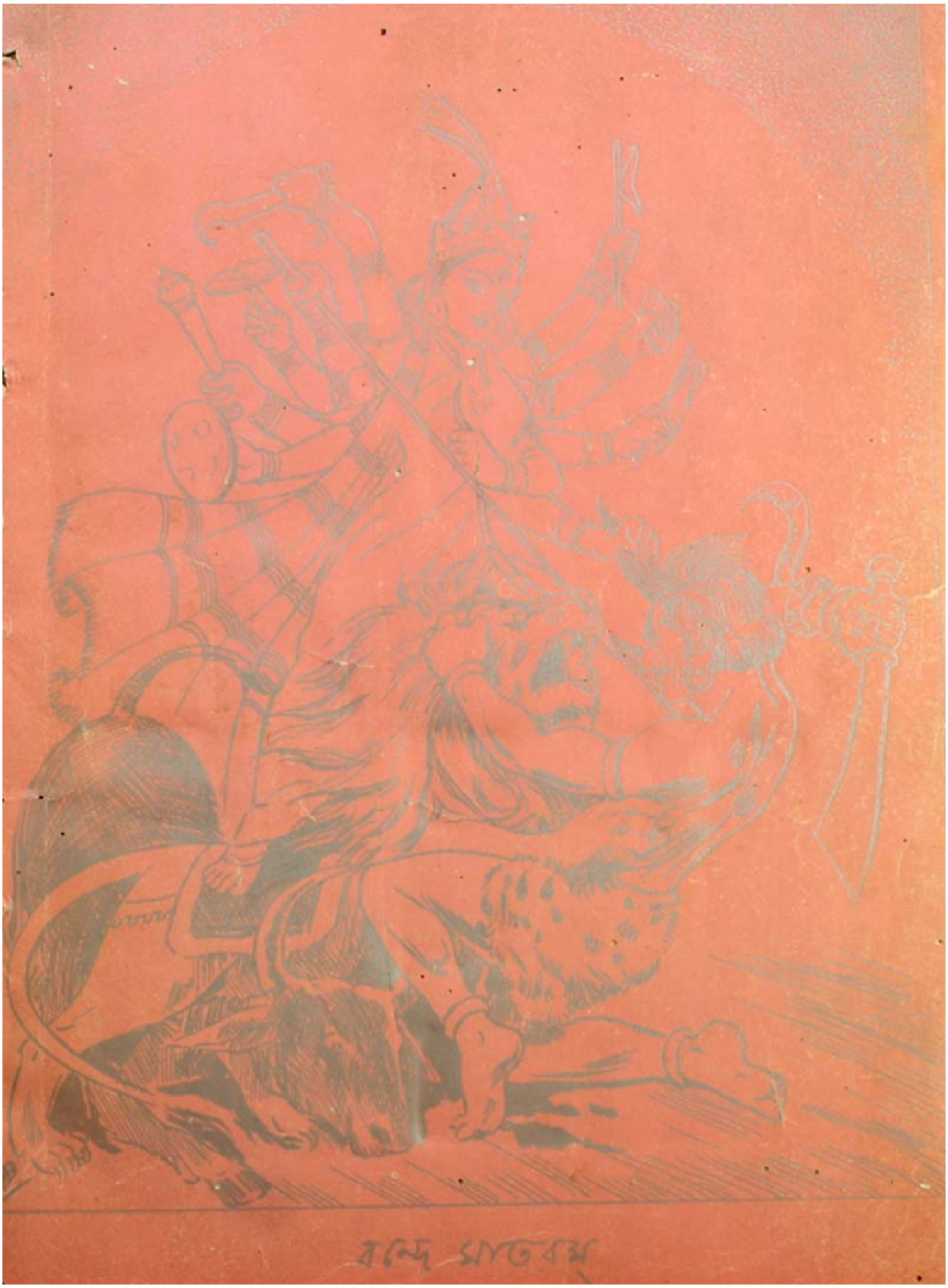
বন্দে মাতরম্

সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত গৌরব

"গীত সুধার তরে চিত পিপাসিত রে"

ঐ একটী কথায় বিশ্বকবি যে নিজের অন্তরের গীত-তৃষ্ণার কথা রূপ দিয়েছিলেন, তা নয়, বিশ্বের প্রত্যেক নর নারীর অন্তর থেকে উঠেছে ঐ অসীম আকুলতা

নদীর কলোচ্ছ্বাসে সুর, পাতার মর্মরে সুর, মানুষের চলা-ফেরা হাসি-কান্নায় সুর···আকাশে গ্রহ নক্ষত্র যে ঘুরছে, তাও অনাদি সুরে বাঁধা

সেই অ-ধরা সুরকে ধরেছে মানুষের তৈরী যন্ত্র···তার মধ্যে ডোরাকিনের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আজ যে জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে, তার মূল কথা হচ্ছে যে, প্রত্যেকটী যন্ত্র সেই সুরকে দিয়েছে নিখুঁত রূপ—

ডোরাকিন এণ্ড সন্স

১২, এস্‌প্ল্যানেড্‌ ইষ্ট, কলিকাতা।

এর জন্য

সমগ্র জাতি চেয়ে আছে ঐ শিশুদের দিকে। কারণ তারাই জাতির ভবিষ্যৎ। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নব-গঠিত দেহ-যন্ত্রের পক্ষে বার্লি একমাত্র সহজ পাচ্য ও সুখাদ্য। তা ছাড়া সান বার্লি বিশেষ যত্ন-সহকারে পরিপূর্ণ সুপক্ক বীজ থেকে তৈরী বলে, রোগী এবং সাধারণ লোকের খাদ্য ও পানীয় হিসাবে এর সমকক্ষ কেউ নেই।

সান বার্লী কেনা উচিত

দি নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বার্লী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১০৫, কটন ষ্ট্রীট কলিকাতা

জেলায় জেলায় এজেন্টের প্রয়োজন। মৈমনসিং এর এজেন্ট, মেসার্স আসাম বেঙ্গল ট্রেডিং সিণ্ডিকেট, রামবাবু রোড, মৈমনসিং; বর্দ্ধমানের এজেন্ট মেসার্স এ্যাড্‌ভার্টাইসিং বুরো, পার্কার রোড, বর্দ্ধমান; চট্টগ্রামের এজেন্ট, ইন্ল্যাণ্ড এজেন্সিস্, চট্টগ্রাম; কলিকাতার এজেন্ট, কক কেমিক্যাল ষ্টোরস, ১, জগমোহন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

সূচী-পত্র

	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	
	পারের খেয়া	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	
	নারদমুনির বঙ্গদর্শন	শ্রীসজনীকান্ত দাস	
৪।	প্রচণ্ড চৌধুরী	শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
৫।	বাঘিনী	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	
৬।	সর্বলা	শ্রীসুবোধ বসু	
৭।	একটি নৈতিক গল্প	শ্রীপরিমল গোস্বামী	
৮।	রোমন্থন	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	
	অন্ধ	"বনফুল"	
১০।	জখ্‌মী দিল্‌	শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়	৯৮

পাখীর সমান সিন্দুর!

সুবাসিত

সোহাগ সিন্দুর

(রেজিস্টার্ড)

বৈজ্ঞানিকমতে পবিত্রতম ও নির্ভরযোগ্য

গুহ এণ্ড ব্রাদার্স :: কলিকাতা

	রাঘব মালাকর	শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৭
	আধুনিকা	শ্রীমনোজ বসু	১১৭
	মাটির দান	শ্রীআশালত সিংহ	১২৩
	আমরা	শ্রীনরেন্দ্র দেব	১৩২
	ভাঁটার টানে	শ্রীপ্রবোধ কুমার মজুমদার	১৪৩
	জীবে দয়া	শ্রীশান্তা দেবী	১৫৮
১৭।	পুনর্ভব	শ্রীসরোজ কুমার রায়চৌধুরী	১৬৭
১৮।	সাবিত্রী	শ্রীঅনুরূপা দেবী	১৭৫
১৯।	মোহমুক্তি	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	১৮০
২০।	দুস্তর	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	২০৫

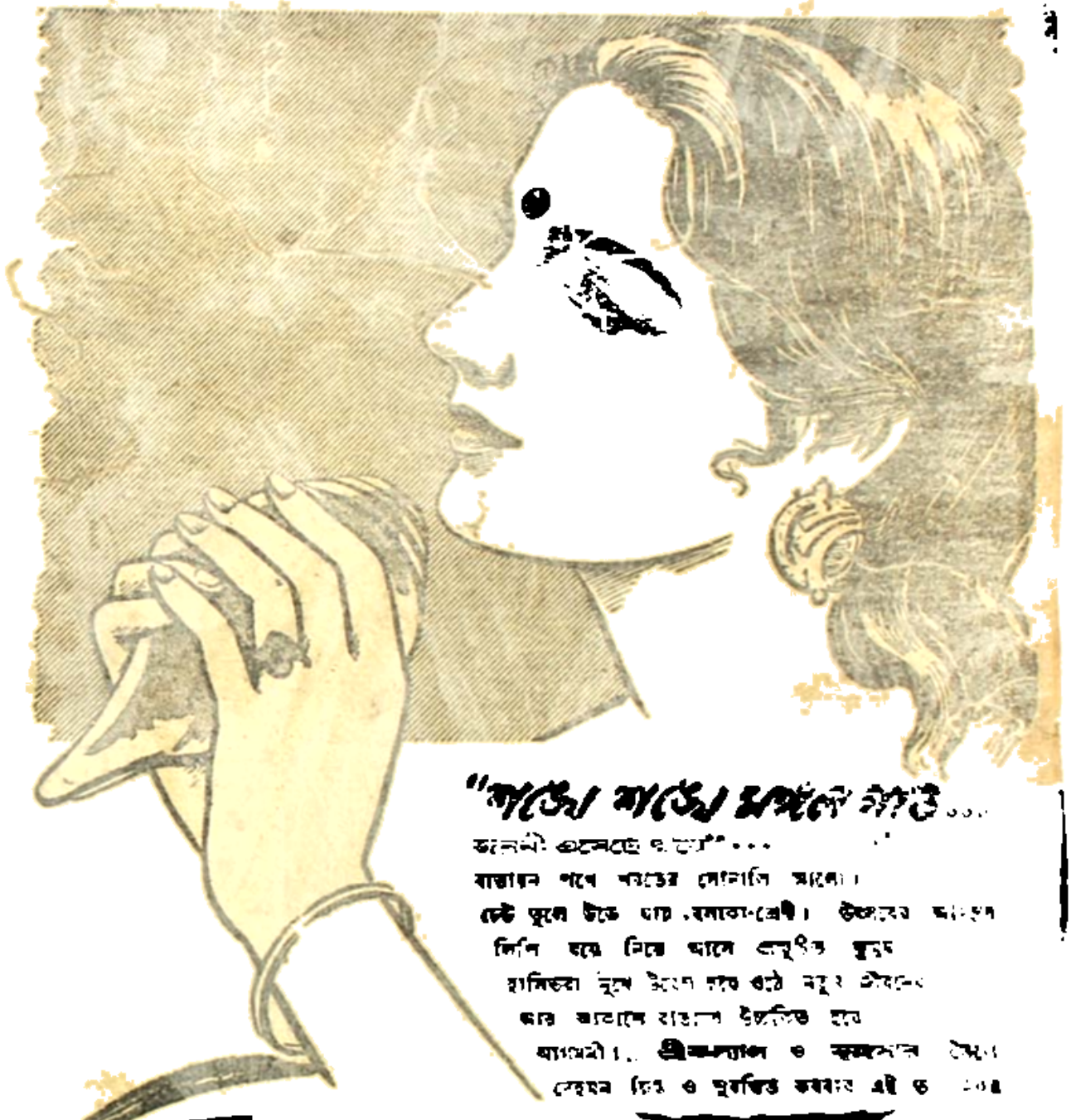

"আজো আজো মঙ্গলে নাও ...
আলেখ্য এসেছে ও ভাই" ...
যাত্রাপথে শতের সোনালি আলো।
ঢেউ তুলে উঠে ঘাট বসাবো-শ্রেণী। উজ্জ্বল আলোর
লিপি বয়ে নিয়ে আসে প্রভাতের দূত
হাসিভরা মুখে উঠে গান বধূ তীরে
আর আকাশে বাতাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে
আগমনী।.. শ্রীকল্যাণ ও কুন্তলীন মেঘ
স্নেহের চিহ্ন ও সুরভিত করবার এই ও ...

শ্রীকল্যাণ কেশ তৈল এবং কুন্তলীন

জে এম কেমিক্যাল ৪৪ কলিকাতা

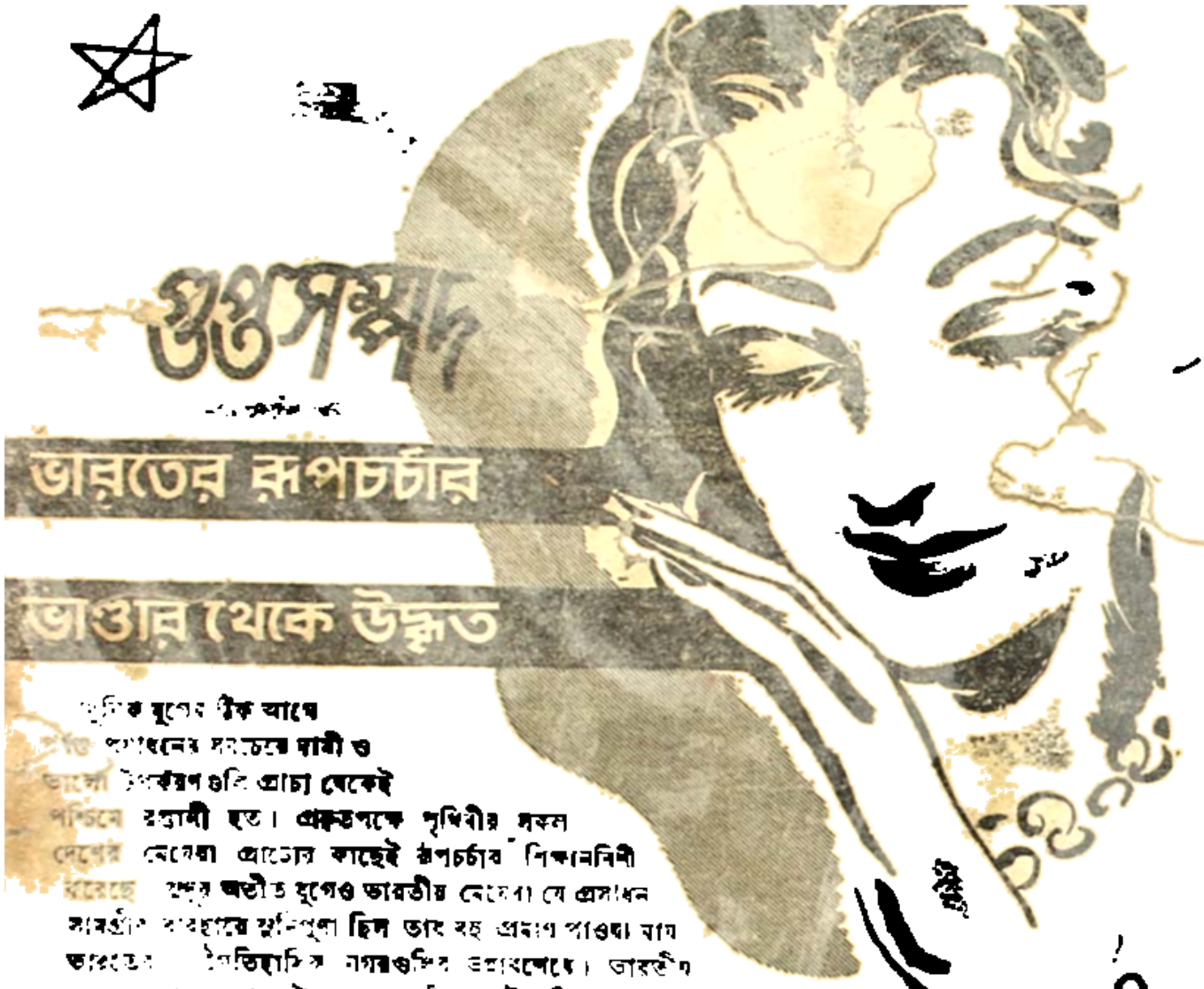

গুপ্তসম্পদ

ভারতের রূপচর্চার

ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত

[illegible] যুগের ঠিক আগে
[illegible] প্রাধনের সবচেয়ে দামী ও
ভালো [illegible]গুলি প্রাচ্য থেকেই
পশ্চিমে রপ্তানী হত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল
দেশের মেয়েরা প্রাচ্যের কাছেই রূপচর্চার শিক্ষানবিশী
করেছে। [illegible] অতীত যুগেও ভারতীয় মেয়েরা যে প্রসাধন
সামগ্রী ব্যবহারে সুনিপুণা ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়
ভারতের [illegible] নগরগুলির ভগ্নাবশেষে। ভারতীয়
রূপচর্চার ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত এক প্রাচীন একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে
দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য উপাদানে তৈরি "বসন্ত-মালতী" আধুনিকাদের
পক্ষে অপরিহার্য একটি প্রসাধনী। এই বসন্ত-মালতী একবারে
ত্বককে পরিষ্কৃত, পরিপুষ্ট ও তাজা করে তোলে; ব্রণ, লোমকূপের
স্ফীতি এবং মেচেতা প্রভৃতি দূর করে। মুখের চামড়ায় লাবণ্য
ফুটিয়ে তোলে। বসন্ত-মালতী ব্যবহারের পর পাউডারের
প্রলেপ মসৃণ ভাবে থাকে।

বসন্তমালতী

রূপচর্চার
পূর্ণাঙ্গ প্রসাধনী

প্রস্তুতকারক:— সি কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

২১।	ভূমিত্রাব কথা	শ্রীমণীন্দ্র লাল বসু	
২২।	পাশের ঘরভূক	শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	
২৩।	কাদড়	শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখো	
২৪।	ধূর্কার ঝিনুক	"ভাস্কর"	২২৬
২৫।	পুরীধাম	শ্রীঈশা দেবী	২৭১
২৬।	নীলমণির স্বর্গলাভ	শ্রীমন্মথনাথ বিশী	২১
২৭।	স্বর্ণ-সীতা	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯৭
২৮।	অনধিকার	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৮৩
২৯।	মুক্তপুরুষ হরিদাস	শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
	লাঙ্গা	শ্রীগিরিন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত	৩২৭

Tele : DALIATALOR

Phone : B. B

শারদীয়ার
মনোরম উপহার
ডালিয়ার
সুন্দরতম
বেনারসী ও সিল্ক শাড়ী
এবং পোষাক পরিচ্ছদ

— দোকান আইনে বন্ধ —
রবিবার ২ টার পর সোমবার সম্পূর্ণ

সকল রকম উপহার সামগ্রী
• হোসিয়ারী
• শয্যাদ্রব্য
সকল রকম তৈরী পোষাক

চেয়ারম্যান : শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়

ডালিয়া
টেলারিং কোং লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

টাকা নিরাপদ

জমি ও বাড়ীতে

আপনার টাকা আমাদের নিকট ফিক্সড্ ডিপজিটে রাখলে তা নিরাপদ থাকবে, আপনি লাভবানও হবেন। রবীন্দ্র নগরে অদূর ভবিষ্যতে সংস্রবিধা জমির উপর গড়ে উঠবে সাতশত পঞ্চাশখানি বাড়ী, তাতেই এই টাকা খাটানো হবে।

রবীন্দ্র নগর

টাকার নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া টাকা খাটাইতে হইলে রবীন্দ্রনগরে বাড়ী ও জমিতে টাকা খাটান। সুদও বোনাস দুই পাইবেন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য

ইনভেষ্টর্স লিঃ

৬৮নং ক্রস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

সব সমস্যার শেষ সমাধান
ইতিহাসের সর্ব-শ্রেষ্ঠ দান...

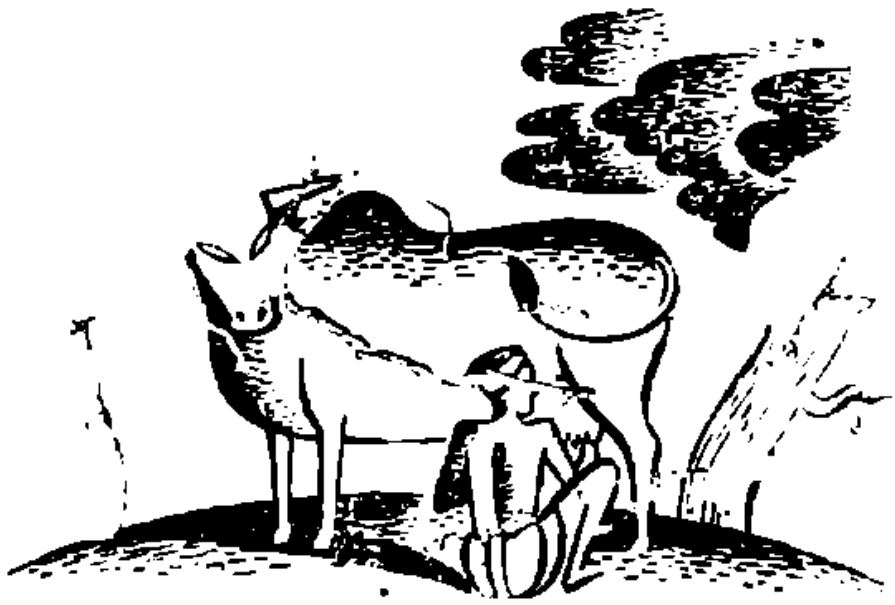

দুধ - শুধু টাটকা হলেই হয় না!

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাদ্য দুধ। এই একটি সম্পূর্ণ খাদ্যটিতে মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় পুষ্টি থাকার জন্যই এ শিশুদের পক্ষে অপরিহার্য। বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় এবং রোগীদের ক্ষেত্রে দুধ যাদের এক প্রধান খাদ্য। সুতরাং খাদ্য হিসাবে দুধের সমাদর সহজেই অনুমেয়।

দুধ কিন্তু, বিশেষজ্ঞরা বলেন, তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাসি হয়ে গেলে এর স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণ বীজাণু জন্মায়। এছাড়া এমনিতে খেলে যাই হোক না কেন খাবার পর দুধ কিছু অবশ্যই প্রতিপাকে যাবার মতন ভাবে দুধিত [illegible]

শুঁড়ো দুধগুলির মধ্যে মিলিন্দিতার সর্বশ্রেষ্ঠ—ভিটামিল। চিকিৎসক ও বড় বাড়ীর সুচিন্তিত অভিমত যে শিশুদের ঐশ্বর্যশালী মতিক যাদুই ভিটামিল।

ভিটা-মিল্ক

শিশুদের ঐশ্বর্যশালী শ্রেষ্ঠ দুধ।

প্রস্তুতকারক :—ন্যাশন্যাল নিউট্রিমেন্টস্ লিমিটেড

finest
Gifts...
...is the gift of exquisite piece of ornament made of genuine guinea gold. It carries the sentiment of love with an endless brilliance. Let us be your consultant as a trusted jeweller in the selection of your gifts of gold.
M.B.SIRKAR and SONS
SON AND GRAN SONS OF LATE B. SIRKAR
Leading Guinea Gold Jewellers and Diamond Merchants
124, 124-1, OWBAZAR STREET, CALCUTTA • PHONE : B. B. 1761

আবহ প্রকৃতির
পূত শুভ্রতার মাঝে
আগে পূজা, মনে আগে
বিশ্বজননীর আনন্দময় রূপ।
কিন্তু
আপনার গৃহে একান্ত
নির্ভরশীল শিশু ও তার
জননীর স্থায়ী
আনন্দ বিধানের কথা ভেবে
দেখছেন কি?
করছেন কি তাদের
ভবিষ্যৎ সংস্থানের
সকল ব্যবস্থা?

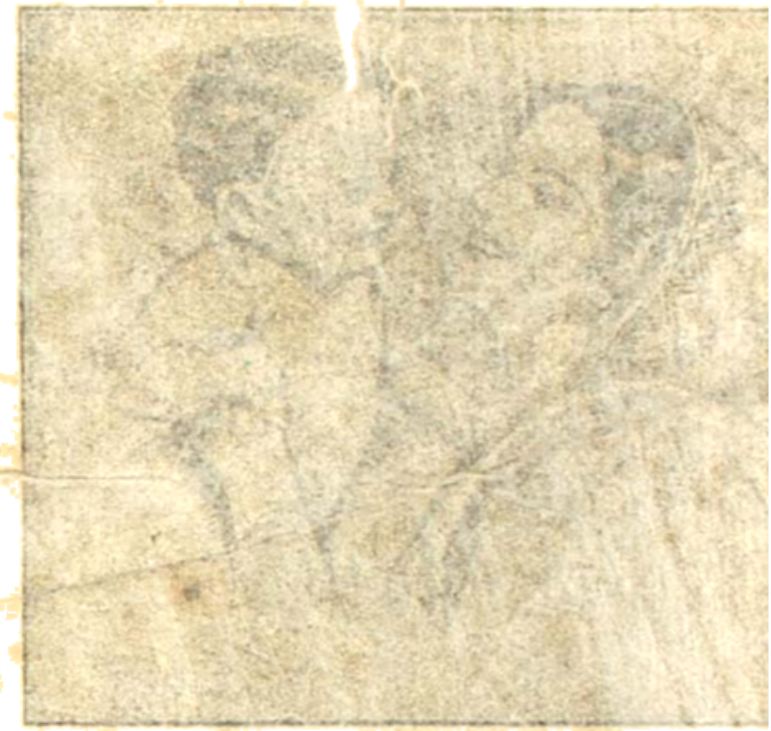

আপনার প্রিয়জনের ভবিষ্যতের ভাবনা—

ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং

উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন।

— প্রতিষ্ঠাতা —

৺ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি কে,সি,আই,ই; কে,সি,বি, ও

প্রস্পেক্টাস অথবা এজেন্সী সর্ত্তাবলীর জন্য লিখুন—

ম্যানেজার,

মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা

— অথবা —

নিম্নের অফিসের ম্যানেজারের নিকট লিখুন—

ঢাকা ব্রাঞ্চ
৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
ঢাকা।

আসানসোল ব্রাঞ্চ
শিখর বোড,
আসানসোল।

রাজসাহী ব্রাঞ্চ
বাঘাবাজার,
পোঃ নিমতিতা, জেলা রাজসাহী।

বিহার ব্রাঞ্চ
পোঃ

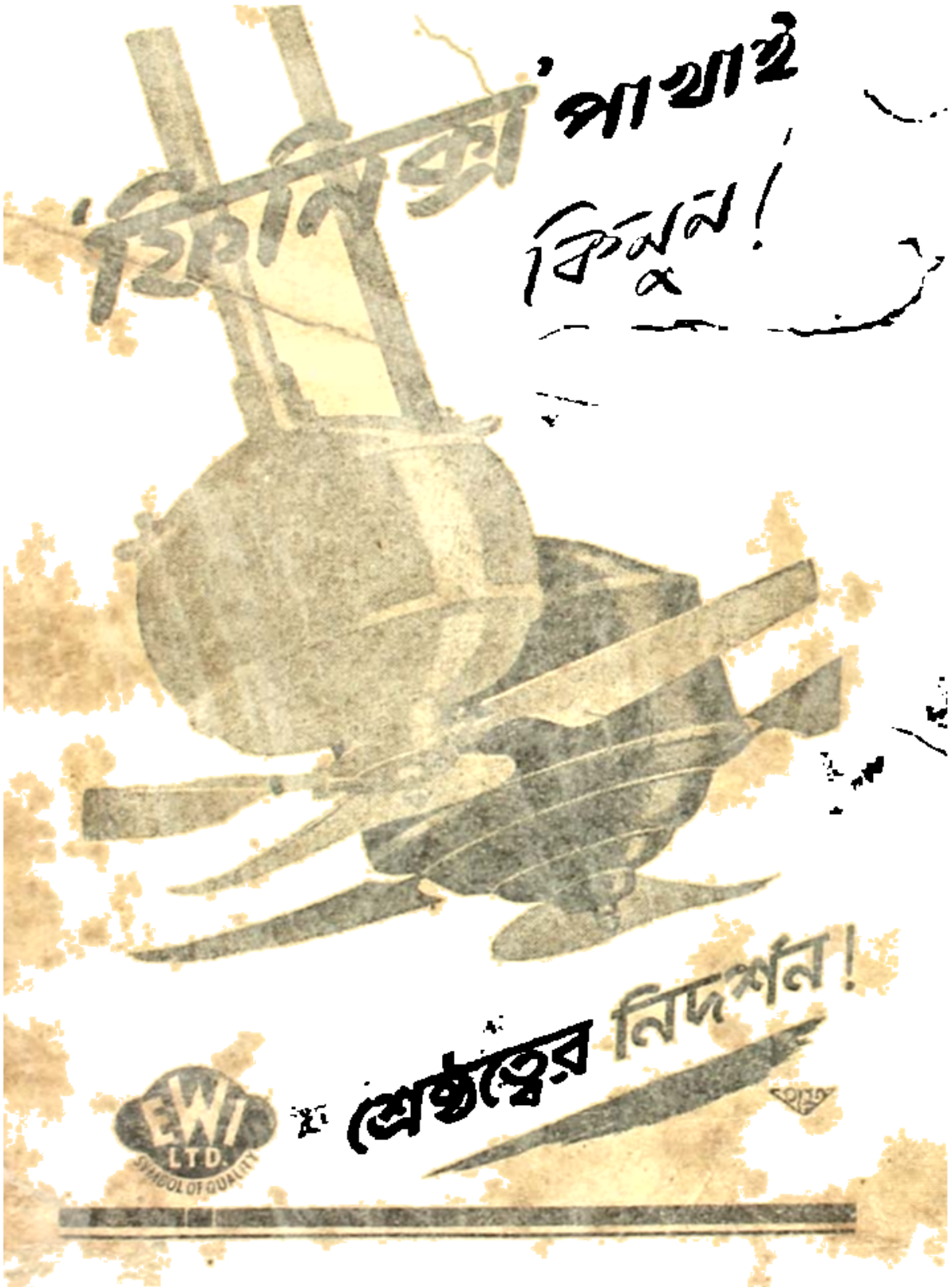
'ফিনিক্স' পাখাই
কিনুন!
শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন!
EWI
LTD.
SYMBOL OF QUALITY

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃ-পূজার এই মহালগ্নে, তোমার লীলা-পীঠ এই বঙ্গভূমিও, আজ বাল্য তোমাকেই স্মরণ করি, হে চিরশিশু, এই পূজার প্রাণ-হীন আড়ম্বরের মধ্যে, কার আয়োজন-হীন প্রাণের পরম-তৃষ্ণাকে···স্মরণ করি, এই অন্তরহীন বাহির-সর্বস্বতার যুগে অমলিন আত্মিক তপস্যাকে···

তোমার একটী জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে তুমি এই ভারতের সহস্র যুগের জীবনের সহস্র মুক্তির ধারা উপলব্ধি করিয়া গিয়াছ··সহস্র যুগের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সমুদ্র-তল হইতে, ক্ষীরোদসিন্ধু মন্থনের দিনে সমুত্থিত অমৃত-ভাণ্ডের মত, তোমার জীবন-অমৃত, নিজেই মন্থন করিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছ···দিয়া গিয়াছ, সন্দেহবাদী বিশ্বের সম্মুখে শাশ্বত ভারতের মূর্ত্তিকে সমুদ্ভাসিত করিয়া

ক্ষত-বিক্ষত আর্ত্ত বিশ্ব আজ তমসাচ্ছন্ন, মৃত, নিজের অন্ধ-ক্ষত সযত্ন-রচিত স্বার্থবুদ্ধির আবরণে ঢাকিয়া, অন্তরের রিক্ততা বাহিরের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যে পরিপূরণ করিবে বলিয়া যে আত্মঘাতী পথে তীব্র বেগে চলিয়াছে, তাহারই পথ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া, হে মহা-ঐশ্বর্য্যশালী প্রাণ-ভিক্ষু, স্মরণ করি, প্রাণের মন্ত্রে নিঃস্ব তোমার আহ্বানে···স্মরণ করি হে একক যাত্রি, আত্মার আলোক-পথে তোমার সুমহান সেই মহাপ্রত্যাবর্ত্তন...

যে জন যাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই বলিয়া মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল,

তোমার জীবনে জীবনের সেই চরমতম সত্যকে তুমি [illegible] প্রত্যক্ষ প্রমাণে সত্য-রূপ দিয়া গিয়াছ···ধর্মকে জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া [illegible] সঞ্জীবনী দিয়াছ···আঁধার নিভৃত লোকে যা ছিল বাষ্প, যা ছিল কাহিনী, কল্প-কল্পনা, মানস চেতনার [illegible] অনুভূতির মধ্যে তুমি তাহাদের লইয়া আসিয়াছ···একটী স্পর্শ, একটী দৃষ্টি···তাহাতে গড়িয়াছ বিশ্ব··· ভাঙিয়াছ বিশ্ব···

তাই আজ সব-পাওয়ার মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে, হে সর্ব-বিত্ত মহৈশ্বর্যবান্ তোমার দিকেই বারে বার চাহিতেছি···তোমার দিকেই বারে বারে চাহিব···তোমার মন্দিরে আসিতে পথ ভুলিয়া যে-অরণ্যে পথ-হারা ঘুরিতেছি, তোমারই কৃপায় যেন দিনান্তে খুঁজিয়া পাই সে-পথ···

২

রামানন্দ রায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশের এক নগণ্য জমিদার···আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কুদিরাম চট্টোপাধ্যায়···তাঁরই একজন দরিদ্র প্রজা···ধর্মভীরু সত্যনিষ্ঠ···

[illegible] প্রয়োজনে···তিনি কুদিরামকে ডেকে পাঠিয়েছেন···

আদালতে একজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন, যার মুখের কথা আদালত সত্য বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। সে-অঞ্চলে কুদিরামের সে খ্যাতি আছে তাই তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, জমিদারের পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্যে।

এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কুদিরাম আনন্দে স্বীকার করলেন, তিনি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কার বিরুদ্ধে? আর কি-ই বা সাক্ষ্য দিতে হবে?

—মামলা তাঁরই এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, জমিদার চান তাঁকে এক্ষুণি জব্দ করতে। তাই কুদিরামকে জমিদারের পক্ষে দু'একটী মিথ্যা বলতে হবে।

ব্রাহ্মণ শিউরে উঠলেন। এ তাঁর দ্বারা কখনো সম্ভব হতে পারে না। জমিদারের অনুনয়, আবেদন, কোন কিছুর জন্যেই নয়।

জমিদারকে দুঃখ করে কুদিরাম চলে আসছেন, এমন সময় নায়েব কানে কানে বলিয়ে দিল, তাঁর কথাটা···আর একবার ভেবে দেখুন···জানেন তো হুজুরকে।

—আমার দিক থেকে এ বিষয়ে ভাববার আর কিছু নেই।

বাড়ী ফিরে এসে রঘুবীরের বিরুদ্ধের সামনে করজোড়ে ব্রাহ্মণ বলেন, রঘুবীর, সত্যরক্ষার জন্যে তুমি না থাকো, আমি তোমায় চাই···রক্ষা কোরো আমায়।

রঘুবীর মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু জমিদার রামানন্দ রায় তাঁর জমি-জমা, ঐশ্বর্য সমস্ত কৌশলে নিলেন হরণ করে।

রঘুবীরকে মাথায় করে নিয়ে ব্রাহ্মণ স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে একেবারে পথে এসে দাঁড়ালেন।

সাধ্বী স্ত্রী চন্দ্রাদেবী বল্লেন, এ গাঁয়ে আর থাকবো না। জমিদার যদি এতেও শান্ত না হয়?

গাঁ ছেড়ে, পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে, ব্রাহ্মণ হাঁটতে আরম্ভ করলেন···সঙ্গে চল্লো রঘুবীর···

—

২

ক্রোশ খানেক দূরে, কামারপুকুর গ্রাম···সেই গাঁয়ের সুখলাল গোস্বামীর সঙ্গে ছিল ক্ষুদিরামের বন্ধুত্ব··· বন্ধুর বিপদের কথা শুনে গোস্বামী তাঁকে তাঁর বাড়ীর একধারে আশ্রয় দিলেন।

বাড়ীর সঙ্গে কয়েকখানা চালা ঘর। সেই ঘরগুলি তিনি বন্ধুকে দান করলেন।

ক্ষুদিরামের মনে বড় ভাবনা ছিল, বুঝি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রঘুবীরকেও নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের অনাহার সওয়া যায় কিন্তু রঘুবীর···বন্ধ হবে তাঁর নিত্য সেবা?

দশ বছরের ছেলে রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়নীকে নিয়ে বন্ধুক ক্ষুদিরাম নবদ্বীপে সেখানেই নতুন করে রঘুবীরকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

সুখলাল গোস্বামী তাঁকে সেই সঙ্গে এক বিঘা দশ ছটাক ব্রহ্মোত্তর জমি দান করলেন···মাত্র এক বিঘা দশ ছটাক···কিন্তু যখন সেই সামান্য জমিতে ফসল হলো, দেখা গেল, এত ধান হয়েছে যে, তাতে তাঁদের দাতা বছর চলে গিয়েও, উদ্বৃত্ত থাকবে···

ক্ষুদিরাম তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে দেব-দ্বিজ আর অতিথি-সেবায় ভুলে গেলেন, কে কবে করেছিল অত্যাচার!

৩

বাড়ীর গা ঘেঁসে চলে গিয়েছে পথ, তীর্থে যাবার পথ···তীর্থ যাবার পথে, সেইখান দিয়ে কত সন্ন্যাসী, কত পুণ্যলোভাতুর যাত্রী নিত্য যাতায়াত করে···কখন কখন অতিথিরূপে তাঁরা সেই ব্রাহ্মণ-বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করে পথশ্রম লাঘব করেন···ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রাদেবী পরম আদরে তাঁদের সেবা করেন···

বিশ্রামান্তে তাঁরা চলে যান···তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় ক্ষুদিরামের মন···পথের শেষে যেখানে আছে তীর্থ-দেবতা। কিন্তু রঘুবীর আর সংসার তাঁকে রাখে আটক করে···

বর্ষা যায়···যৌবন যায়···প্রৌঢ়ত্ব ও শেষ হয়ে আসে···ক্ষুদিরামের বয়স ক্রমশঃ হলো ষাট···

তিনি স্থির করলেন, আর বিলম্ব নয়···বহুদিন থেকে তাঁর অন্তরে সাধ, রঘুবীরে গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্মে

রামকুমার আর রামেশ্বর, দুই পুত্রের ওপর সংসার আর জমিজমার ভার দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন···পায়ে হেঁটে গয়াতীর্থে···

সেখানে গদাধরের পাদ-পদ্মে যথাশাস্ত্র পিতৃ-পুরুষদের তর্পণ করে পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত হলেন···আনন্দে তাঁর চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠলো···

রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, গদাধরের সামনে তিনি পুনরায় তর্পণ কার্য্য করছেন···সহসা সমস্ত মন্দির আলোয় আলো হয়ে উঠলো···দেখেন, সারি সারি সব জ্যোতির্ময় পুরুষ···দিব্য দেহধারী···পিতৃ পুরুষগণ···দুই কর প্রসারিত করে তাঁরা তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন···অর্ঘ্য-অন্তে পিতৃ-পুরুষগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে আরম্ভ যেন স্তব করতে আরম্ভ করলেন···বিস্মিত, পুলকিত ক্ষুদিরাম অগ্রসর হয়ে দেখেন, মণ্ডল-মধ্যস্থ জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁরি ইষ্টদেবতা···নবজলধর-শ্যাম মূর্ত্তি···কি যেন বলবার জন্যে সমগ্র চেতনা চঞ্চল হয়ে উঠলো···কিন্তু তার আগেই দেখেন, সেই মণ্ডল-মধ্যস্থ বিগ্রহের তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অগ্রসর হচ্ছেন···যেন তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন, আমি তোমার সঙ্গে তোমার গৃহেই যাব!

নিদ্রা ভেঙে যায়···জ্যোতি-আহত স্বপ্নাতুর চোখে তিনি কেঁদে ওঠেন···বলেন, অসীম করুণা তোমার··· কিন্তু এ দরিদ্রের ঘরে কোথায় হবে তোমার স্থান? সে-ধূলোয় কি করে রাখবে তোমার চরণ-কমল?

৬

কামারপুকুরে সেই সময় গহন রাত্রিতে স্বামীপুত্র একা-ঘরে চন্দ্রাদেবী সহসা [redacted] ছেড়ে উঠে পড়লেন··· তাঁর মনে হলো, নিদ্রাকালে তাঁর পাশেই জ্যোতির্ময় যেন পুরুষ কে যেন [redacted] স্বামী মনে করে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে দেখেন, সাধারণ মানুষের অঙ্গ তো সে নয়! আতঙ্কে তাঁর ঘুম ভেঙে [redacted] তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে উঠতে গিয়ে তাঁর মনে হলো, সেই দিব্যরূপ তেমনি তো শয্যায় শুয়ে রয়েছে, তবে এতো স্বপ্ন নয়? ভয়-ব্যাকুলচিত্তে তিনি ঘরের অর্গলের কাছে গিয়ে দেখেন, অর্গল তেমনি বন্ধ রয়েছে···তাড়াতাড়ি অর্গল খুলে সেই অন্ধকারে তিনি প্রতিবেশিনী ধনী কামরাণীকে ডেকে তুলেন···ধনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে প্রদীপ জেলে দেখেন, শয্যা শূন্য···

ক্ষুদিরাম তীর্থ থেকে ফিরে এসে যখন সেই ব্যাপার শুনলেন, তাঁর সর্ব-দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো···

[redacted] বয়সে চন্দ্রাদেবী পুনরায় সন্তান-সম্ভবা হলেন।

রাত্রিতে সহসা চন্দ্রার ঘুম ভেঙে যায়···এই যেন শুনলেন, ঘরে কোন্ শিশু-গোপের পায়ে নূপুর-শিঞ্জন-ধ্বনি ···কারা যেন সুরে সুরে কি কথা বলে যায়···ঘরে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন···জাগরণে আবছা মনে পড়ে···

ক্ষুদিরাম আতঙ্কিত অন্তরে দিন গুনে চলেন।

একপাশে ছোট্ট ডালা চাপা ঝুড়ি, তাঁর এক দিকে ধান কোটবার ঢেঁকি···আর একদিকে ধান সিদ্ধ করবার উনুন···তারি মাঝে একটুখানি জায়গায় ধনী কামারাণী প্রসূতিকে নিয়ে ব্যস্ত···

ওর আকাশে তখন রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হয়ে ষষ্ঠদণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিথি দ্বিতীয়া নীরে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ধরায় দিব্যিযোগের প্রবর্তন করতে চলেছে··· রবি, চন্দ্র আর বুধ একই ঘরে মিলিত হয়েছে···

এমন সময় চেঁচি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধনী আনন্দে বলে উঠলো, ওগো শাঁক বাজাও !

ক্ষুদিরাম বুঝলেন, পুত্র সন্তান···তবে কি গদাধর, স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্যে দরিদ্রের ঘরে-ঘরে তুমি এলে ?

ধনী ঝাঁকুড় ঘরে ঢুকে দেখে, ওমা—ছেলে কোথায় ? প্রসূতির পাশে যে রেখে সে এইমাত্র বাইরে গিয়েছিল ? খুঁজে দেখে, উনুনের মুখে ছাই-গাদার ওপর ছেলে শুয়ে আছে···সর্ব অঙ্গ ছাই-এ সাদা হয়ে গিয়েছে ···শিশু-শিব···

গয়া-তীর্থের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম নবজাতকের নাম রাখলেন, গদাধর···

৬

গদাধর পাঠশালায় যায়···কিন্তু নামতার নাম শুনলেই ভড়কে যায়··কিছুতেই মুখস্থ হয় না। কিন্তু যাহাদের বাড়ীতে কথকঠাকুর কবে রাম-সীতার কাহিনী গেয়েছিলেন···বালক একবার শুনেছিল মাত্র···কিন্তু তেমনি অনর্গলভাবে [redacted] বলে যেতে পারে··যাত্রায় কবে রাধা সেজেছিল শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছিলেন বলে, বালক অধিকল [redacted] করে কাঁদে, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলতে তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে···রামায়ণ, [redacted]ত, পুরাণ বালক যা শুনে, তা অবিকল মুখস্থ রাখে···

কুমোর পাড়ার পাশ-পাড়া। কুমোর খুড়ো কত দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে, বালক তন্ময় হয়ে দেখে···বাড়ীতে এসে কাদার তাল নিয়ে নিজের মনে ছোট ছোট সেই সব মূর্তি অবিকল গড়ে তোলে যেখানে যেটা দরকার, কার পায়ে পদ্ম, কার হাতে শাঁখ, কার মাথায় চূড়ো···নিখুঁত···যেখানে যেটা দরকার···

আম বাগানে বিকাল বেলা গদাধর সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করে···যাত্রার যেমন দেখেছে, তেমনি কেউ হয় রাধা, কেউ হয় সখী, কেউ হয় কৃষ্ণ···গদাধর একাই সকলের কথা বলে চলে···আড়াল থেকে গ্রাম নারীরা শুনে বিস্ময় হয়ে যায়···

সবাই আদর করে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়···বালক আবৃত্তি করে শোনায়···

একদিন খালের ধারে বালক আপনার মনে একা খেলা করছে···এমন সময় সহসা আকাশে সমারোহ করে এলো মেঘ···যেমন মেঘ শুধু বর্ষার বাংলার আকাশে দেয় দেখা···কালো কাজল মেঘ···গদাধর এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই কাজল-কালো মেঘের দিকে···এমন সময় তার বুক চিরে উঠে চলে গেল শঙ্খ-ধবল বকের পাঁতি··· কালোর বুকে অথির আলো···বালকের কি মনে হলো, বালকই জানে···দেখতে দেখতে তার বাহ্য জ্ঞান গেল হারিয়ে···সেইখানে সেই মাঠের [redacted] বালক জ্ঞানশূন্য মূর্ছিত হয়ে পড়লো···

সেই পথ দিয়ে যেতে গ্রামবাসীরা দেখে বালক মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে··বহু চেষ্টায় বালকের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তারা বালকটিকে বাড়ী নিয়ে এলো···

চন্দ্রাদেবী যত ঠাকুর ছিল সকলের কাছে মানত করেন, এ রোগ বাছার কেন দিলে তোমরা ?

৭

রোগ যত বড় দেখা দিতে লাগলো··ঠাকুর দেবতার কথা বলতে বলতে, কখন মেঘের দিকে চেয়ে, কখনো ডুমুর গাছের দিকে চেয়ে, কখন বা আরতির শঙ্খ শুনে, বালকের কি হয় কে জানে, জ্ঞানহারা হয়ে বালক লুটিয়ে পড়ে, কখনও বা নীরবে দুচোখ দিয়ে তার জল ঝরে···যেন চোখের পাতার আড়ালেই আছে জলের ঝারি···

কেউ বলে মূর্ছা রোগ !

কেউ বলে, ক্ষুদিরাম, তুমি ভাগ্যবান্, এ যে সব অবতারের লক্ষণ···দেবতা যখন মানুষ হয়ে আসে, তখন দেখনি, তার শৈশব-লীলা ?

মা ভাবেন, অপদেবতার কাণ্ড। মনে মনে মানত মানেন তেত্রিশ কোটী দেবতার।

৮

কিন্তু তা বলে বালক খুব শান্ত ছেলে ছিল না। পুকুর ঘাটে পল্লীরমণীরা স্নান সেরে জলেই পূজো-আহ্নিক করছেন, এমন সময় কোথা থেকে গদাধর কলসে নিয়ে সেখানে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার সুরু করে দিল···তাদের ছিটকানো জল পূজারিনীদের মুখে গায়ে লেগে তাঁদের বিরক্ত করে তোলে···

একদিন এক বর্ষীয়সী ছেলেদের ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, হাঁরে, কেমন ছেলে তোরা ! মেয়েরা এই ঘাটে আহ্নিক গায়ে সাঁতার···এ ঘাটে তোরা আসিস্ কেন ?

গদাধর ধমকানির তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে বলে উঠলো, তাতে হয়েছে কি ?

—আহ্নিক গায়ে মেয়েদের দেখতে নেই ! গদাধর কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। কি-বা-ক্ষতি হবে তাতে ?

কাউকে কিছু না বলে, বালক ঠিক করলো, স্নানের সময় গাছের আড়াল থেকে রোজ সে দেখবে—এ কি-ক্ষতি হয় সে নিজে দেখবে !

পাঁচ-ছ দিন ঐভাবে দেখার পর বালক যখন দেখলো, জগতে সেই ব্যাপারের জন্যে কোথাও কিছু ঘটলো না, তখন একদিন পুকুরঘাটে সেই বর্ষীয়সীর মুখের সামনে গিয়ে বল্লো, কইগো, আমি তো রোজ দেখি, কই কি ক্ষতি হলো ?

৯

রমণী বালকের কথা শুনে হেসে তার জননীকে জানালেন। জননী নিরুত্তে বালককে বোঝালেন, ভাতে তোমার কোন ক্ষতি হয় না, সেটা ঠিক বটে কিন্তু মেয়েরা তাতে অপমানিত হয়।

বালক আর কোন প্রতিবাদ-টাদ করে মার কথাই স্বীকার করে নিল। আর কোনদিন পুকুরঘাটে বালককে দেখা গেল না।

৯

যথাকালে বালকের উপনয়ন-সংস্কার হলো। সন্ধ্যা হয়ে যাবার পর নতুন ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের বেশে সকলের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে।

নতুন ব্রহ্মচারীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ধাই-মা ধনী কামারাণী অনেকদিন থেকে তাকে বলে রেখেছিল, তোর পৈতের সময় আমার বড় সাধ প্রথম ভিক্ষে আমি দেব। বালক কথা দিয়েছি... আর কি! বালক তখন জানতো না যে, তা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ধনী তার ধাই-মা হলেও, সে শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর হাত থেকে প্রথম ভিক্ষা নেওয়া, এমন কি তার হাত থেকে ভিক্ষা নেওয়াও, শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

ভিক্ষা নেবার সময় বালকের সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। যে কেউ ভিক্ষা নিয়ে আসে, নতুন ব্রহ্মচারী তা গ্রহণ করেন না। ধনী আগে না দিলে, আমি ভিক্ষাই নেবো না।

পুরোহিত বোঝায়, বাড়ীশুদ্ধ সবাই বোঝায়, কিন্তু নতুন ব্রহ্মচারী বোঝে না। শূদ্রাণী কি মানুষ নয়?

কোন অনুনয়-বিনয়ে যখন কোন ফল হলো না, তখন বাধ্য হয়েই ধনী কামারাণীকে ডাকা হলো। ধনী ভিক্ষার মুঠী বাড়ালো···নতুন ব্রহ্মচারী আনন্দে বলে উঠলো, ভবতি ভিক্ষাম্ দেহি!

১০

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে সংসারের ভার রামকুমারের ওপর এসে পড়লো···সেই সঙ্গে রঘুবীরের নিত্য পুজার ভার পড়লো গদাধরের ওপর···

এতদিন পরে গদাধর যেন একটা কাজ পেলেন। সারাদিন মন পড়ে থাকে ছোট্ট ঠাকুর ঘরটীর আশে-পাশে···পুজো করেন, যেন ঠাকুর জীবন্ত তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন···

এমনি ভাবে একদিন এলো শিব-রাত্রি। সারাদিন উপোস করে গদাধর ঠিক করলেন, সারা রাত জেগে তিনি শিব-নাম জপ করবেন···

দিনের কাজ শেষ করে উপবাসী ব্রাহ্মণ শিব-পুজোর জন্যে বসলেন···এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে তাঁর হাত ধরে বল্লো, এখনি এসো, বড় দরকার।

—কোথায় ?

—পাইন্ মশাইদের বাড়ী···সেখানে সারা রাত শিব-ঠাকুরের যাত্রা হবার কথা কিন্তু যে লোকটী শিব সাজতো, হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হয়েছে···সবাই বল্ল, তোমাকে শিবের পার্ট করতে হবে···একমাত্র তুমিই পারবে···তোমার তো সব মুখস্থ আছে···

অল্প সময় হলে গদাধরের আপত্তি ছিল না···কিন্তু শিব-পুজোর জন্যে মনস্থ হয়ে তিনি বলেছেন, এখন কি করে হয় ?

বহু বুঝিয়ে বলে, শিবের অভিনয়ের মধ্যেই শিব-পুজো হয়ে যাবে।

সেই বিশ্বাসে গদাধর যাত্রায় শিব সাজতে চল্লেন···

সাজঘরে যথারীতি তাঁকে শিব সাজানো হলো···বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ···গলায় রুদ্রাক্ষ মালা···মাথায় বাঁধা জটা···জটায় লম্বমান বিষধর···

ক্রমশ গদাধরের সর্ব-অঙ্গ নিথর হয়ে আসছিল···রণক্ষেত্র পরে যখন আসরে গিয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন আর তাঁর মুখে কথা নেই···দেহে সাড় নেই···নিশ্চল নিথর দেহ···সেইখানেই অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল···

চেতনার কোন চিহ্ন নেই···যেন প্রাণহীন দেহ···প্রাণহীনই সবাই প্রথমে মনে করেছিল···কিন্তু প্রাণের লক্ষণ স্বরূপ দেখা গেল, শুধু দুচোখ দিয়ে নীরবে ধারা বয়ে চলেছে···

পরের দিন ভোর বেলা পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবে রইলেন···

রাত্রি অবসানে সূর্য্য উঠলে, চেতনা ফিরে এলো আবার···

১১

রামকুমার ক্রমশ বৃদ্ধ হয়ে আসছিলেন···একে একে তাঁর উপার্জ্জনও কমে আসতে লাগলো···তার ওপর স্ত্রী-বিয়োগে তিনি একান্ত কাতর হয়ে পড়লেন···সংসারে নিদারুণ অভাব দেখা দিল···

ধার করে সংসার চলে···কিন্তু তাতে কতদিনই বা চলে ?

রামেশ্বরের উপার্জ্জন অতি সামান্য···গদাধর সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহ···

অগত্যা রামকুমার গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন, রামাপুকুরে একটা টোল খুলে বসলেন···

একা, টোলের কাজ···খাওয়া-দাওয়া, বাজার করা···বড়ই অসুবিধা হতে লাগলো···তাই তিনি কামারপুকুর থেকে নির্কর্মা গদাধরকে মানুষ করবার জন্যে নিজের কাছে কলকাতায় নিয়ে এলেন···

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেলো না···রামকুমার লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কত চেষ্টা করেন···কিন্তু লেখাপড়ায় গদাধরের কিছুতেই মন বসে না···

একদিন রেগে গিয়ে রামকুমার বলে উঠলেন, লেখাপড়া না শিখলে খাবি কি ?

তার উত্তরে গদাধর বল্লেন, খাবার জন্যেই যদি লেখাপড়া হয়···সে-লেখাপড়ায় আমার দরকার নেই···আমার মনের জ্বালা জুড়োতে পারে এমন লেখাপড়া আমাকে শেখাতে পারো?

সেই অজ্ঞ গ্রাম্য কিশোরের মুখে সেই কথা শুনে রামকুমার কি উত্তর দেবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, লেখাপড়ায় ফাঁকি দেবার জন্যে পাগলের এই নতুন পাগলামি! নইলে তার আবার মনের জ্বালা কি?

সে-খবর তখন কেই বা জানতো? কেই বা বিশ্বাস করতো যে সেই পাঠশালা-পালানো ছেলেটির মনে, বিশ্বের চরম সমস্যা তখন নীহারিকা-রূপে বাষ্প-জ্বালা উদ্গীরণ করছিল?

বহু চেষ্টা, বহু অনুনয়-বিনয় করে রামকুমার যখন দেখলেন, পাগলকে কোন কাজেই যখন লাগানো গেলো না, তখন হতাশ হয়ে তিনি সে-চেষ্টাই ছেড়ে দিলেন।

পাগল আপনার মনে ঘুরে বেড়ায়···কি যে মনে হাহাকার করে বুঝতে পারে না···কে যেন টানে, কে যেন ডাকে···কিন্তু কে সে? কেনই বা ডাকে তাকে? কেন তার মনে এ জ্বালা? লোকে যা নিয়ে সুখে হেসে খেলে থাকে, কেন তার কিছুই তার লাগে না ভালো?

১২

গঙ্গার বুকে সারি সারি একশো খানা নৌকো···কোন নৌকোতে চাল, কোন নৌকোতে তরী-তরকারী···কোন নৌকোতে কাপড়-চোপড়···কোনটা রান্নাঘর করে সাজানো হয়েছে···কোনটা শোবার ঘর···এই ভাবে একশো খানা নৌকো তৈরী···

এখনি তারা যাত্রা করবে, গঙ্গার জলপথ দিয়ে কাশী-তীর্থে।

তীরে লোকে লোকারণ্য···কি ব্যাপার? রাণী রাসমণি চলেছেন, তীর্থ করতে, কাশীতে···

এমন সময় রাণীর বাড়ী থেকে পেয়াদা এসে খবর দিল, যাত্রা বন্ধ, রাণী মা যাবেন না!

বহুদিন থেকে রাণীর অন্তরে বাসনা ছিল, সংসারের কাজের ভার নামিয়ে কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বমাতার আরাধনা করবেন।

কিন্তু বিরাট জমিদারীর কাজে ছুটি আর তিনি পান না। তাঁর অন্তরের আকুলতা দেখে, তাঁর জামাই মথুরবাবু রাজী হলেন, জমিদারীর ভার নিতে। রাণীর মন থেকে যেন বোঝা নেমে গেল। নৌকো তৈরী করবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন রাত্রিতে সহসা স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী ছোট্ট বালিকার মূর্তিতে এসে তাঁকে যেন আদেশ করছেন, কাশী যেতে হবে না তোকে···গঙ্গার ধারে মন্দির করে সেখানে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর···নিত্য পাবি আমার দেখা।

ভক্তিমতী নারীর অন্তর ভরে গেল সে-স্বপ্ন-বাণীতে। সব কাজ ফেলে তিনি স্থির করলেন যেমন করে হোক্ গঙ্গার তীরে দেবীর মন্দির গড়ে তুলবেন···সেখানে প্রতিষ্ঠা করবেন, মাতৃ-রূপা দেবী কালিকাকে আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি! আবাল্য তাঁর অন্তরের সাধ, অন্ন-ভোগ দিয়ে দেবীকে করবেন তৃপ্ত···তাঁর প্রসাদ থেকে নিত্য প্রতিপালিত হবে দীনদুঃখী আতুরজন!

১৩

বহু অনুসন্ধানের পর গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে একটা পরিত্যক্ত শ্মশান-ভূমির কাছে কিছু জমি পাওয়া গেল। সেইখানে দেখতে দেখতে উঠলো দ্বাদশ মন্দির···সামনে বিরাট চত্বর···চত্বরের মাঝামাঝি আর দুটী বড় মন্দির···একটা রাধাকৃষ্ণের, আর একটি জননী ভবতারিণীর।

পাঁজি-পুঁথি দেখে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হয়ে গেল···১৮৪৭ সালের ৩১ শে মে···স্নানযাত্রার দিন···

রাণী তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিলেন···দেশে-বেশান্তরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে পাঠালেন···আয়োজন সব প্রস্তুত···

এমন সময় সহসা এলো মহাবিপত্তি···কোন্ ব্রাহ্মণ করবেন এই প্রতিষ্ঠার পৌরহিত্য? যে-সে পূজারী ব্রাহ্মণ দিয়ে তো এই কঠিন শাস্ত্রীয় ব্রত উদ্‌যাপিত হতে পারে না! তার জন্যে চাই আসল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ! কিন্তু শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁরা কেউ পৌরহিত্য করতে সম্মত নন্.. তাঁরা একবাক্যে সকলে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সেই সঙ্গে এ-ও জানালেন যে, শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দেবতার অন্নভোগ দেওয়াও অশাস্ত্রীয়!

রাসমণির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! এ-কথা তো উৎসাহের বশে তিনি কল্পনাও করেন নি! তবে কি বিশ্বের জননী তাঁর জননী ন'ন? শূদ্র-নারীর অন্তরের ভক্তি তবে কি বন্ধ্যা-নারীর সন্তান-স্নেহের মত নিরর্থক নিষ্ফল? শাস্ত্র কি এমনি ভাবে তাঁকে দেবে শাস্তি?

কিন্তু সমস্ত নিরুৎসাহতার মধ্যে তাঁর মনে কে যেন বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই এই পথ-হীনতার মধ্যে কোন ছিদ্র-পথ আছে...নইলে শাস্ত্র এতো অমোঘ নিষ্ঠুর কখনো হতে পারে?

অশ্রু-কাতর অন্তরে রাণী পণ্ডিতদের কাছে বিধানের জন্যে লোক পাঠান। লোক ফিরে ফিরে আসে, বিধান আসে না। স্নানযাত্রার দিন ক্রমশ এসে পড়ে।

১৪

কামারপুকুর টোলে রামকুমার যখন এই ব্যাপার শুনলেন, সেই ভক্তিমতী নারীর অন্তরের আকুলতার কথা জেনে, তিনি ব্যথিত হলেন। স্মৃতি-শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় রাণীকে লিখে পাঠালেন, আপনি শোক করবেন না। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আপনি যদি আপনার মন্দির কোন

ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ করে দেন, তাহলে, এই সমস্যার সমাধান শাস্ত্রীয় ভাবেই হয় এবং তখন মন্দিরে দেবতার অন্নভোগও কোন বাধা থাকবে না।

সেই বিধান পেয়ে রাণী যেন নব-জীবন পেলেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করে তিনি রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের জন্যে শিহোরের ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পুরোহিত রূপে পেলেন এবং ভব-তারিণীর মন্দিরের জন্যে রামকুমারকেই কাতর-ভাবে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। যতক্ষণ না অন্য পুরোহিত পাওয়া যায়, এই দায়িত্ব নিতে রামকুমার স্বীকৃত হলেন।

মহাসমারোহের সঙ্গে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হয়ে গেল। ন'লক্ষ টাকা রাণী খরচ করলেন।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময় রামকুমার গদাধরকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। কিন্তু গদাধর মন্দিরের আশে-পাশে গঙ্গার ধারেই ঘুরে বেড়ালেন। মন্দিরে কোনে কিছু আহার গ্রহণ করলেন না। মন্দিরের বাইরে গিয়ে এক পয়সার মুড়ি খেয়ে সেদিনটা কাটিয়ে দিলেন।

১৫

রামকুমার বহুভাবে বোঝালেন। গদাধর কিছুতেই সম্মত হলেন না। পরের কাছে কাজ করতে গেলে, তার হুকুম মেনে চলতে হবে··নিজের বলতে কিছু থাকবে না। স্বাধীনতা তিনি পরতে পারবেন না। তাতেও কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু পাগল আর এক বিপত্তি করে বসলো, সেখানকার অন্নও গ্রহণ করবে না।

অলক্ষ্যে হাসলেন ভব-তারিণী। শেষকালে ব্যবস্থা হলো, গঙ্গার ধারে দিনান্তে তিনি নিজের হাতে ভাতে-ভাত রেঁধে নেবেন।

তাই চলতে লাগলো ব্যবস্থা। সারাদিন গঙ্গার ধারেই দিন কেটে যায় পাগলের। বড় ভালো লাগে গঙ্গা।

১৬

কাজের যখন কোন সাহায্যই গদাধরের কাছ থেকে পাওয়া গেল না, তখন রামকুমার তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন।

গদাধর তবু একজন সঙ্গী পেলেন। নিজেকে আর রাঁধতে হয় না। হৃদয়ই রান্না করে দেয়। সেবা করে। ভালবাসে।

রামকুমার হৃদয়কে দিয়ে গদাধরকে মন্দিরে কাজ নেওয়াবার চেষ্টা করাতে লাগলেন। হৃদয় বলে, গদাধর শোনেন। এই পর্য্যন্ত।

রাণী আসেন, মথুরবাবু আসেন, গদাধর ঘুরে ঘুরে সরে বেড়ান। একদিন হঠাৎ মথুরবাবু দেখেন,

একটী সুন্দর মাটীর শিব ঠাকুর। কি অপরূপ তার গড়ন! খবর নিয়ে জানলেন, ছোট পুরোহিত গড়েছেন। রামকুমারকে ডেকে বলেন, আপনার ভাইকে মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না? এমন সুন্দর যাঁর হাতের কাজ, মা ভব-তারিণীর বেশকার যদি তিনি হন্···

রামকুমার আবার অনুরোধ করেন···মথুরবাবুও অনুরোধ করেন··

হৃদয় এবার জোর করে চেপে ধরে, কেন, এ কাজ করতে আপনার আপত্তি কি, আমাকে বলতে হবে!

গদাধর বলেন, দেখিস্ নি, ভব-তারিণীর কত সোণার গয়না? ও সবের ভার আমি নিতে পারবো না···

হৃদয় বলে, বেশ, তার দায়িত্ব আমি নেবো! তা হলে তো তোমার আপত্তি নেই?

বিশ্ব জননীর বিগ্রহের সামনে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ! *

১৭

চলে আকর্ষণ···ঘটনার নেপথ্য-বিধান···লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাকালের দিব্য-লীলা··সারাদিন আপনার মনে মন্দিরের সেই আধো আলোয়, চলে পাষাণ-বিগ্রহকে নিয়ে খেলা···কাপড় পরানো, ফুল দিয়ে সাজানো, ঘুম থেকে জাগানো, আবার ঘুমের জন্যে শোয়ানো···সারাদিন···সারা বেলা···

ছোট শিশু পুতুল খেলায় যেমন সব যায় ভুলে, রামকৃষ্ণ যেন সব ভুলে যেতে চলেন···মানুষ নয়··· জন নয়···হাসি নয়···কথা নয়···শুধু সেই পুতুল···আর তিনি···

সাজাতে সাজাতে কখনো বা ভুলে যান সাজাতে···একদৃষ্টিতে থাকেন চেয়ে···

দেখেন···রক্তাম্বরা···পদতলে মূর্চ্ছিত শিব···এক হাতে মুণ্ড্য··আর হাতে বরাভয়···কণ্ঠে নর-মুণ্ড-মালা, রক্ত-ঝরার মালার মত···মৃত্যুময়ী বিশ্বের জননী···আলুলায়িত কালো কুন্তলে নিখিলের রাত্রির অন্ধকার···ও কি শুধু পাথরে-গড়া পুতুল?

মুগ্ধ-বিস্ময়ে বেশকার সেই পাষাণ-বিগ্রহের দিকে চেয়ে থাকেন···চেয়ে থাকতে থাকতে চেতনা হয়ে আসে লুপ্ত···মনে হয় যেন ও কালো পাষাণ পাষাণ তো নয়, ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করেন, এই তো তপ্ত···কোমল···কান্ত স্পর্শ পাচ্ছি···ঐ তো বন্ধ ওষ্ঠ যেন উঠলো নড়ে···উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করেন কি সে বাণী···সর্ব-ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে সজাগ···ঐ তো বাতাসে দুলে উঠলো ঘন কৃষ্ণ কেশরাশ···দুলে উঠলো নিখিল অম্বর···সে-অম্বরে ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত হারিয়ে যায় তাঁর দেহ-মন-আত্মা···

---

* গদাধর নামের পরিবর্তে কখন যে তিনি রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজও পর্যন্ত জানা যায় নি। আমরা অতঃপর তাঁকে রামকৃষ্ণ নামেই উল্লেখ করবো। অনেকে অনুমান করেন যে ঐ নামটি মথুরবাবুর দেওয়া।

ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয় দেখে, প্রতিদিন যেন রামকৃষ্ণ আরো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন···আরো উদাস··· যেন একটা পাথরের মূর্তি···মানুষ দেখলেই ভীত হরিণ শিশুর মত পালিয়ে যান, অংগের গহনতায়··· আত্ম-সৃষ্ট নির্জনতায়।

মন্দিরের কাজের পর আর তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না···গঙ্গার ধার ধরে একা চলেছেন হেঁটে··· রাত্রি হয়ে যায় গভীর···তবুও আসেন না ফিরে···শেষ রাত্রিতে কোথা থেকে আসেন ফিরে···মুখ-চোখ ফোলা···রক্ত-জবার মত লাল চোখ·· যেন সারারাত ধরে কেঁদেছেন।

হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোন উত্তর পায় না···পাথরের মানুষ কথা কয় না!

১৮

জন্মাষ্টমীর পরের দিন বিকেল বেলা যথারীতি ক্ষেত্রনাথ রাধাগোবিন্দের বিগ্রহকে পাশের ঘরে বিশ্রামের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন···

এমন সময় পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোবিন্দ-বিগ্রহের একটী পা ভেঙ্গে গেল···

ভগ্ন-বিগ্রহ···সারা মন্দিরের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল·· তৎক্ষণাৎ সংবাদ গেল রাণী এবং মথুর বাবুর কাছে ক্ষেত্রনাথের চাকরী গেল·· কিন্তু ভগ্ন-বিগ্রহ নিয়ে কি হবে? রাণী পণ্ডিতদের মতামত নিলেন... ভগ্ন বিগ্রহের পূজা হতে পারে না·· গঙ্গাজলে তাকে দিতে হবে বিসর্জ্জন···রাণীর অন্তর কেঁদে উঠলো···এত আদরের বিগ্রহ, তাকে ফেলে দিতে হবে গঙ্গাজলে? কিছুতেই মন তাতে সাড়া দেয় না···অবশেষে কি মনে হলো, মথুরবাবু বল্লেন, একবার ছোট পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

রাণী স্বয়ং এসে রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন। সমস্ত শুনে তিনি বল্লেন, আমি মূর্খ লোক···শাস্ত্র জানি না···তন্ত্র জানি না·· তবে একটা সোজা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার কোন জামাই-এর যদি কোন কারণে একটা পা ভেঙ্গে যায়, আপনি কি তাঁকে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দেন?

অন্তরের কথা অন্তরে গিয়ে লাগে। সেই একান্ত সহজ স্বচ্ছ কথা রাণীর অন্তর স্পর্শ করলো··· একথা তো তিনি একবারও ভাবেন নি...সবাই দেখে এসেছে, বিগ্রহকে বিগ্রহরূপে, শাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা।

এই উন্মাদ কি তবে পেয়েছে, পাষাণের অন্তরালে সেই পাষাণীকে দেখতে···? নইলে কোথা থেকে এলো তার এই বিশ্বাস, এই আত্মীয়তা?

রাণী রাসমণি বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন পাগলের দিকে।

১৯

রাধা-গোবিন্দের পূজোর ভার পড়লো রামকৃষ্ণের ওপর। রামকৃষ্ণ আর কোন আপত্তি করলেন না। পূজো করতে বসেন, যথারীতি আসন-শুদ্ধি করেন···সেই সঙ্গে মনে হয় যেন জগৎ-সংসার সব আড়ালে পড়ে

গেল···সমস্ত বিশ্ব ব্যেপে শুধু রইলো, পূজারী আর পূজার ঠাকুর···সময় চলে যায়···লোক চলে যায়···বেলা চলে যায়···পূজারী আসন থেকে ওঠে না···

অতন্দ্র-দৃষ্টি হৃদয় চুপটী করে দাঁড়িয়ে দেখে···আত্মীয় নয়···বন্ধু···আত্মার আত্মীয়···মহাসাধকের সাধনার একমাত্র সাক্ষী···দিব্য-দেহের যেন মর্ত্য ছায়া···

বহুকষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয় হৃদয়কে বহু চেষ্টা করে···

রামকুমার এই পরিবর্তন দেখে যেমন হলেন সন্তুষ্ট, তেমনি আবার রামকৃষ্ণের সেই অসীম উদাসীনতা দেখে ভীত হয়ে উঠলেন। হৃদয়ের মুখে শুনলেন, সারাদিন সারারাত একা একা কোথায় ঘুরে বেড়ান বনে জঙ্গলে কেউ জানে না। রামকুমার স্থির করলেন, তাঁকে আরো দৃঢ় ভাবে বাঁধতে হবে মন্দিরের কাজে···

বল্লেন, আমি বুড়ো হয়েছি, মার পূজোর দীর্ঘ সব প্রক্রিয়া আর পারি না···এবার থেকে তোকে সে ভার নিতে হবে।

রামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করেন না···বড় ভাল লাগে সেই পাষাণ-কালো পাষাণীকে ··শুনেছি, সে কোলে নিয়েছে রামপ্রসাদকে, চোখের জল মুছিয়েছে কমলাকান্তের, কাঁদিয়েছে কত পাগল ক্ষেপাকে···সে কি মিথ্যে কথা? কল্পনা?

কিন্তু মন্দিরে প্রতিদিন তার পূজো···তার যে বহু নিয়ম-কানুন···বহু মন্ত্র বহু-তন্ত্র···অধিকারী না হলে তো কেউ পারে না পূজোর বসতে।

রামকুমার বল্লেন, আমি তোকে শেখাবো নিজের হাতে।

কিন্তু তার আগে চাই দীক্ষা। অধিকার-অর্জন।

রামকুমার তাঁকে নিয়ে গেলেন সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের কাছে, তন্ত্র-গুরু।

যথারীতি ক্রিয়াকাণ্ডের পর রামকৃষ্ণ গুরুর সামনে আসনে বসলেন। হোম-অন্তে কেনারাম তাঁর কর্ণে মাতৃ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন···

সঙ্গে সঙ্গে, জ্যা-চ্যুত তীরের মত, রামকৃষ্ণ হুংকার দিয়ে আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাটীতে পড়ে গিয়ে অচৈতন্য হয়ে গেলেন। সমাধি।

২০

মথুরবাবু এসে ঘরে বসলেন, এবার থেকে মা শুভ-তারিণীর পূজো আপনাকেই করতে হবে!

রামকৃষ্ণ বলেন, কেমন করে পূজো করতে হয়, তা তো আমি জানি না এখনো!

মথুর বলেন, আমরা তা জানি না। আপনার যেমন ভাবে পূজো করতে ইচ্ছে যায়, তেমনি ভাবেই করবেন।

রামকৃষ্ণ রাজী হন···

অশান্ত ছেলেকে মা একটু একটু করে নিজেই টেনে নেন তাঁর কাছে।

সংসারী লোকের সংস্পর্শ ক্রমশ যেন বিষিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের ছায়া দেখলে শিউরে ওঠেন সারাদিন একলা একলা আপনার মনে কি বকেন।

পূজোয় বসেন কিন্তু সামনে কোন বিগ্রহ আর দেখতে পান না…

ভুলে যান পূজোর মন্ত্র…বিধি…বিধান অনুষ্ঠান…লোকে দেখে, আসনে বসে আছে পাথরের মূর্তি, দু' চোখ দিয়ে শুধু বইছে জলের ধারা…জীবনের একমাত্র সম্বল…

সামনে পাষাণ বিগ্রহ…আর তার সামনে পাষাণ-মূর্তি পূজারী…

তারপর যেই সন্ধ্যা হয়ে যায়…আরতি হয়ে যায় শেষ… মন্দিরের ত্রিসীমানায় আর দেখা যায় না পূজারীকে…

হৃদয় ভেবে আকুল…

একদিন ঠিক করলো, লুকিয়ে কিছু নিয়ে দেখবে…

গঙ্গার ধার দিয়ে অন্ধকারে চলেছে উন্মাদ…নিস্তব্ধ অন্ধকারে শোনা যায় গঙ্গার মৃদুমর্মর…সেই সঙ্গে হৃদয়ের কানে আসে চাপা কান্না… কে যেন রুদ্ধ কণ্ঠে কাঁদছে, মা, মা… নিঃশব্দে অনুসরণ করেন…মন্দিরের বাগান ছাড়িয়ে চলে পাগল… সামনেই গভীর বন… শ্মশান বলে ওদিকে কেউ যায় না সেদিকে …ভয়ে হৃদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে…মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ কাল-পেঁচা চীৎকার করে উড়ে চলে গেল…ঝোপের মধ্যে শেয়াল চলাফেরা করছে… শুকনো পাতার ওপর তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে… হৃদয় দেখে পাগল সেই বনের ভেতর ঢুকে পড়লো…একা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হৃদয়ের ভয় করতে লাগলো…ফিরে এলো সেদিনের মত…

ভোর বেলা ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ… দুচোখ রক্তজবার মত লাল…কোন কথা নেই মুখে…

সেদিন রাত্রিতে আবার হৃদয় নিল পিছু… ঠিক সেই বনের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো হৃদয়… পাগলকে ভয় দেখাবার জন্যে সেখান থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো…কিন্তু পাগলের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই…বনের মধ্যে পাগল ঢুকে চলে গেল…সাহসে ভর করে হৃদয়ও ঢুকলো…দেখলো, বনের ভেতরে এক আমলকী গাছের তলায় পাগল গিয়ে বসেছে…দিগম্বর…অঙ্গে কোন আবরণ নেই…এমন কি লৈতাটা পর্যন্ত নেই

ভয় দেখাবার জন্যে হৃদয় ঢিল ছুঁড়তে লাগলো… কিন্তু আমলকী গাছের তলায় যেমন পদ্মাসনে পাগল বসেছিল, তেমনি বসে রইলো…

নিরাশ হয়ে হৃদয় ফিরে এলো। সেদিন ভোর বেলায় হৃদয় চেপে ধরলো, বনের ভেতর আপনি কি করেন?

—যাকে ডাকি…তারি সুন্দর নির্জন জায়গা…

—কিন্তু গায়ে কাপড় নেই…লৈতা পর্যন্ত নেই? সে কি ব্যাপার!

—পৈতা থাকলে মনে হবে আমি বামুন··আমি একটা আলাদা জাত··মার কাছে যেতে হলে ও আজের বালাই ফেলে রেখে যেতে হবে···সব ছেড়ে, শুনেছি তবে তাকে পাওয়া যায়। ওরে, বল্, তাকে পাব না? বল্?

দর দর ধারায় দুচোখ দিয়ে পাগলের জল ঝরে পড়ে।

২১

কবে কৃষ্ণ চলে গিয়েছিলেন মথুরায়, বৃন্দাবনের পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল শ্রীমতী, কেঁদেছিল গোপিনী, গোপ-বালকের দল, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছিল পিতা নন্দ, মাতা যশোদা···কেঁদেছিল নন্দকুলের গোপালী ধরণী, কেঁদেছিল বৃন্দাবনের তরুলতা···শ্যাম-বিরহে উন্মাদ···

সে কান্না···সে বিরহ··হারায় নি...হারায় না তা··আবার আর একদিন পুঞ্জীভূত হয়ে নেমেছিল এই বাংলায়, এই গঙ্গার তীরে, আর এক ঘরছাড়া উন্মাদের অন্তরে···তার কান্নায় ভিজে গিয়েছিল নদীয়ার গঙ্গা-মাটীর বুক···

মহাশূন্যে নিরাবলম্ব এত দিন ছিল সে বিরহের ধাপ, মহাকালের অন্ত-হীন···বিশ্ব-স্রষ্টার অন্তে সৃষ্ট-জীবের অনাদি আকুতি।

নেমে এলো, মহাশূন্যের নিরাবলম্বতা ত্যাগ করে, নতুন দিব্য আধারে···

আর এক মানুষের অন্তরে··অন্তর অশ্রুর ধারায়···

পূজা নেই··মন্ত্র নেই···অর্ঘ্য নেই···আরতি নেই···শুধু এক বিশ্ব-বিদারী কান্না···দেখা দাও···দেখা দাও··· যেমন করে দেখছি তোমার তৈরী, এই গাছ-পালা, পথ-ঘাট, পৃথিবী, তেমনি করে মূর্তি ধরে, এসো তুমি দৃষ্টির সামনে···স্পর্শের মধ্যে···

রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে শিশু-পুত্র, পাশে জননীকে না দেখতে পেয়ে, যেমন আর্ত অসহায় ভাবে ক্রন্দন করে ওঠে, তেমনি মাতৃ-বিরহ-বেদনায় রামকৃষ্ণের অন্তর অসহ্য জ্বালায় কেঁদে উঠলো···লোক-জন, ঘর-বাড়ী, বিশ্ব-প্রকৃতি সব যেন এক চির-রাত্রিতে গিয়েছে ডুবে···আর সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে একা চলেছে পাগল···শুধু মুখে একটি কথা, মা··মা···অন্তরে শুধু এক ভাব, এক ভাবনা, তুমি দেবে দেখা কিসের এ চোখ, যদি চাইলে, না দেখতে পেলাম তোমাকে? কিসের এ জীবন, যদি চাইবার মাত্র না পেলাম তোমার স্পর্শ।

পূজো করতে বসেন কিন্তু সে-পূজার ধারা আলাদা·····মন্ত্র গলে গিয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে—নিথর নিস্পন্দ কখনো বসে থাকেন আসনে...বেলা বয়ে যায়, দিন চলে যায়··রাত চলে যায়...বসেই আছেন আসনে···কখনো বা শিশুর মতন কেঁদে ওঠেন···ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রতিমার পায়ে, শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের বুকে···কখনো বা প্রতিমার পায়ে ফুল দিয়ে, নিজের মাথাতেই ফুল ছড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠেন: কখনো নৈবেদ্য তুলে নিয়ে পাষাণীর মুখের কাছে ধরেন, চুপটী করে বসে দেখেন, বাতাস করেন, যেন জননী সামনে বসে সত্যিই আহারগ্রহণ করছেন... তারপর কি মনে করে নিজেই খেয়ে ফেলেন, নয়তো বা বাইরে এসে পাখীদের ডেকে খাইয়ে যেন·· সন্ধ্যা বেলা

আরতি করতে গিয়ে পঞ্চ-প্রদীপ নোলাতে নোলাতে সময়ের জ্ঞান সব ফেলেন হারিয়ে...পুজো হয় না সেবে—আরতি করেই চলেছেন···

মন্দিরের কর্মচারীরা প্রথম প্রথম দেখে ভাবতো, পুরোহিতের মাথা বোধ হয় খারাপ হয়ে আসছে ক্রমশ তাদের ধারণা বদ্ধমূল হলো যে নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে স্নান-পূজায় কেউ এত সব অনাচার করতে পারে? সেই সব অনাচার দেখে তারা শিউরে উঠতো···রাগ করতো···রামকৃষ্ণ যেন কিছুই গুনতে পেতেন না···শেষকালে নিজেদের কর্তব্য-জ্ঞানে তারা শাসাতে আরম্ভ করলো···বলে, রাণীমাকে তারা সব বলে দেবে···এ অনাচার রাণী-মা সহ্য করবেন কেন?

ক্রমশ সমস্ত কথা রাণী রাসমণির কানে গিয়ে উঠে কর্মচারীদের বিবরণ থেকে তাঁর মনে কৌতূহল জাগলো। আর কেউ তখন না জানলেও, এই ভক্তিমতী নারী, নারীর সহজ আত্মবিকতা থেকে বুঝে ফেলেন, লোকে যাই বলুক, এ-মানুষ সাধারণ মানুষের মত নয়। তাই তিনি ঠিক করলেন, গোপনে গিয়ে দেখবেন, সত্যিই কি হচ্ছে।

যেদিন রাণী আসবেন, মন্দিরের একজন কর্মচারী রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে জানালো, ঠাকুর, রাণী আসছেন তোমাকে···তখন শোন নি···রাণী আসছেন···দেবেন তোমাকে তাড়িয়ে···

ছোট্ট ছেলের মত কি-এক-অজানা ভয়ে রামকৃষ্ণের সারা মুখখানি যেন শুকিয়ে মলিন বিবর্ণ গেল···চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ দিয়ে অনর্গল জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো কম্প-অভিমানে বালকের অধরোষ্ঠ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো···

রাণী মন্দিরে এসে দেখেন, কোথায় পুরোহিত···আসন শূন্য পড়ে রয়েছে···চারিদিকে খুঁজে কোথাও সন্ধান পেলেন না···শেষকালে মন্দির-ঘরে ঢুকে ভাল করে চেয়ে দেখেন, প্রতিমার আড়ালে, জননী জগতারিণীর আঁচল ধরে, ভীত, সন্ত্রস্ত শিশুর মত জড়সড় হয়ে বসে আছেন দু'চোখ দিয়ে নীরবে জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছে···মার কাছ-ছাড়া হবার ভয়ে শিশু মার আঁচলের আড়ালে লুকিয়েছে···

সে-মহাদৃশ্য দেখে রাণীর চোখ অশ্রু-বাষ্প-ময় হয়ে উঠলো···অন্তর থেকে সেই মহীয়সী নারী বলে উঠলো, মাগো, আমি ধন্য···আমি ধন্য···

২২

সেইদিন থেকে মথুরবাবু কর্মচারীদের ডেকে বলে দিলেন, কেউ যেন কোন ভাবে পুরোহিতকে কোন কথা না বলে···তাঁর যা ইচ্ছা, তিনি তাই করবেন মন্দিরে।

এত যে কাণ্ড ঘটছে, রামকৃষ্ণ কিছুই জানেন না···

এক একটা দিন চলে যায়, আর গঙ্গার ধারে পাগলের মত কাঁদতে কাঁদতে বলে বেড়ান, কৈ...আজকের দিন তো চলে গেল···এলি না, আজও মা!

সন্ধ্যা বেলা গ্রামের নারীরা সেই পথ দিয়ে যেতে, তাঁকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়ায়···নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আহা, মা-হারা গিয়েছে, বেচারা···

সারা রাত রাত্রির প্রেতমূর্তির মত নিদ্রাহীন চোখে গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরে বেড়ান···কখন হাসেন কখন কাঁদেন, কখন ধুলোয় পড়ে লুটোপুটি খান আর মুখে শুধু সেই এক কথা, দেখা দে, দেখা দে মা! আমি যদি মিথ্যে না হই, তুই কেন মিথ্যা হবি?

একদিন সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে পূজো করতে এসে আসনে বসলেন...সারা দেহমন যেন গামছা-নিংড়ানোর মতন করে অসহ্য যাতনায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে···এমন সময় হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো, ঘরের দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারের ওপর!

লাফ দিয়ে উঠে তলোয়ারটা টেনে খুলে ফেলেন···যদি এ চোখ না দেখলো তোকে, কি দরকার এ চোখে! শেষ করে দেবো আজ এ অসহ্য জ্বালা!

এই বলে তলোয়ারটা তুলে নেই চোখের ওপর তুলবেন, অমনি দেখেন, সারা ঘর আলোয় আলো হয়ে গেল···আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠলো, আলোর কমলের মত নিখিল-আলোয় প্রসবিনী, বিশ্বের জননী···

নিমেষে গেল দূর হয়ে, সব সংজ্ঞা, অচৈতন্য দেহ পড়ে রইলো মাটীতে···পুরো একটা দিন চলে গেল···সবাই স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে···দিনান্তে যখন জ্ঞান হলো, তখন শোনা গেল, অস্ফুট স্বরে শুধু বলছেন, মা···মা···মা···

২৩

সেই দিনের পর থেকে ঠাকুর আর পূজারীর সম্পর্ক একেবারে গেল ঘুচে। এতদিন যে বিগ্রহকে মনে হতো চৈতন্যময় আজ আর তাঁকে বিগ্রহ বলেই মনে হয় না। সে যেন জীবন্ত মূর্তি, রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ জননী।

সারাদিন ছোট ছেলের মত মার সঙ্গে থাকেন, মার সঙ্গে কথা বলেন, আবদার করেন। খেতে সাজিয়ে খেতে ডাকেন···আর, বেলা যে হয়ে গেলো···

পাখা নিয়ে বাতাস করেন···কখনো বলে ওঠেন, তোর সঙ্গে আমি খাব, বেশ! নৈবেদ্য নিজেই খেতে আরম্ভ করেন।

খাওয়া হয়ে গেলে, মার বিছানার কাছে গিয়ে, শুয়ে পড়েন, যেন ছোট ছেলে মার কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়লো···

রাত্রি হলে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, ছাদে দেখে, পঞ্চবটীর সেই আমলকী তলায় স্থির হয়ে বসে আছেন··· চোখের পাতা খোলা···সারা রাত একবারও চোখের পাতা বোজেন না···

চোখের পাতা বুজলে যদি সেই অবসরে সে এসে চলে যায়!

মাঝে মাঝে স্পষ্ট মনে হয়, যেন বাতাসে এলো তার দেহের সুবাস···গায়ে এসে লাগলো তার তপ্ত নিশ্বাস··· রাত্রি বেলা প্রায়ান্ধকার আলোয় দেখি ছায়াহীন তার মূর্তি···বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকি···কই···দেয়ালে তো পড়ে না ছায়া···কাণে এসে লাগে, কে যেন বাইরে দিয়ে চলে গেল, তার পায়ের নূপুর বেজে উঠলো রিনিঝিনি···ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি, মন্দিরের ওপরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, এলো চুল বাতাসে উড়িয়ে চেয়ে আছে

দেখতে দেখতে আবার হারিয়ে যায় সব···একটী মুহূর্ত্তের দেখা· এই সবকের পরিচয় অলোকসম্ভব অস্তিত্বের শুধু ক্ষণিক আলোক-ইঙ্গিত···

মন কেঁদে ওঠে আবার···ক্ষণিকের দেখা নয়···নিমেষের স্পর্শ নয়···অনন্ত ক্ষুধা···তৃষার পিপাসা···তাই নিত্যকাল ধরে তোকে পরে রাখতে···নিত্য আলোর মত তুই থাকবি আমার সামনে···যখনি এ নয়ন মেলে চাইবো, এ নয়নে শুধু দেখবো তোর দিব্য রূপ···

ঈশ্বর-উন্মাদনায় রামকৃষ্ণ জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত বাহ্য জ্ঞান ফেলেন হারিয়ে···আশে-পাশে কারা আছে নাই—চোখে পড়ে না তাদের...চারিদিকে এই সংসার থেকে উঠছে কত কথা, কত কলরব, কিছুই প্রবেশ করে না শ্রবণে···মন চলে গিয়েছে অদৃশ্য আর এক-লোকে...সেইখানেই নিত্য করেন বাস···সেখানকার বিচিত্র সব দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে চোখের সামনে ভেসে ওঠে···আবার মিলিয়ে যায় ..তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে হাহাকার···

৬৪

মনে পড়ে যায় হনুমানের কথা···নিজের বুক চিরে দেখিয়েছিলেন, সেখানে রয়েছে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি তিনি তো পেয়েছিলেন নিত্যরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে···তবে আমিও পাব না কেন ?

সুরু হয় সেই ভাবনা···ভাবতে ভাবতে ভুলে যান নিজের মানব-সত্তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় মানুষের অভ্যাস, চলাফেরা, ভাষা পর্য্যন্ত···ভেতর থেকে হয়ে যায় পরিবর্ত্তন···যে-পরিবর্ত্তন আনতে সাধকদের যুগ-যুগ ধরে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে, নিমেষে অন্তরে ঘটে যায় সে মহা-পরিবর্ত্তন···তার আনুষঙ্গিক প্রেরণায় বদলে যায় তাঁর দেহ পর্য্যন্ত···হনুমানের মত লাফিয়ে চলেন···বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করেন···গাছের ওপর ডালে পা ঝুলিয়ে থাকেন বসে···

এ পরিবর্ত্তন বাইরের আনুষ্ঠানিক পরিবর্ত্তন নয়···চিন্তার ঐকান্তিকতায় এই মানুষের মনে জন্ম নেয় সেই দিব্য-শক্তি, যে-শক্তি তাকে কীট থেকে ভগবান্ পর্য্যন্ত করে তুলতে পারে···যার প্রেরণায় সে পারে তুলে, উচ্চ-স্তরে এই বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে আত্মরমণ করতে···

এই বিজ্ঞান ধর্ম্মী অবিশ্বাসী যুগে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সেদিন ঊনবিংশশতাব্দীর শেষ-শতকে সুরু হয় সেই মহা-পরীক্ষা··· আধুনিক জগতের সর্ব-শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা···যন্ত্রের শক্তির পরীক্ষা নয়···মানব-মনের শক্তির পরীক্ষা··· কি দিব্য-শক্তি নিহিত আছে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানুষের দেহে···সুরু হয় নতুন করে তার আবিষ্কার !

রামকৃষ্ণের অজ্ঞাতে বদলে যায় তাঁর দেহ-মন-ভঙ্গী···সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবিষ্কার !

দেখেন, একদিন রাত্রিকালে, পঞ্চবটীর আমলকী তলায় বসে আছেন, গঙ্গার দিক থেকে দিব্যমূর্ত্তি একটি নারী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন···কি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর মধুর হাসি···দেখতে দেখতে সহসা তাঁর চিত্তভূমি উদ্ভাসিত করে জেগে উঠলো এক অপূর্ব্ব চেতনা···চিনেছি···চিনেছি···তোমাকে জননী···এস হনুমানের ভক্ত-আরাধ্যা··· আদিকবিস্তুতা···এস মা রাজমোহিনী···ভক্ত-হৃদয় অবারিত করে রেখেছি—তুমি ধাতা চল যাপনে বলে···

দেখতে দেখতে সেই নারী যেন দেহ মধ্যে এসে লীন হয়ে গেল···গভীর সমাধিতে রামকৃষ্ণ সব চেতনা কেন্দ্রন হারিয়ে···

২৫

রাণী রাসমণির কাণে গিয়ে যখন পৌঁছল যে রামকৃষ্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়ে গাছে বসে থাকেন, কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেন না, তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মথুর বাবুর মনে হলো, কঠোর সাধনার ফলে বোধহয় মানসিক বিকার ঘটেছে···চিকিৎসার প্রয়োজন···

সাক্ষাৎভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হবার জন্যে রাণী মন্দিরে এলেন। গঙ্গাস্নান করে মন্দিরে এসে বসলেন। রামকৃষ্ণ তখন আসনে ধ্যানস্থ। নীরবে তিনি বসে দেখছেন, সেই ধ্যানস্তিমিত রূপ।

সহসা রামকৃষ্ণের ধ্যান গেল ভেঙে। তিনি সোজা উঠে রাণীর গালে একটা চড় মারলেন, ছিঃ, এখানে এসেও ঐ সব ভাবনা!

মন্দিরের সামনে কর্মচারীরা যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তো ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল! পাগলের একবার আর নিস্তার নেই! রাণীর গায়ে হাত!

কিন্তু তারা অবাক হয়ে গেল, যখন দেখলো, রাগ করা দূরে থাকুক, গলায় আঁচল জড়িয়ে রাণী মাটীতে লুটিয়ে সেই পাগলের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন।

লজ্জিত হয়ে রামকৃষ্ণ বলেন, ওরে, আমার দোষ নেই···আমি তোর গায়ে হাত তুলিনি···আমি কি করবো, মা যে আমার হাত তুলে নিয়ে তোকে মারলো!

রাণী সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বল্লেন, আমারই অপরাধ··আমি বুঝেছি···

রাণী রাসমণি মন্দিরে ঢুকে সারাক্ষণ ধরে মাদলার কথাই ভাবছিলেন···অন্তর-দ্রষ্টা সাধকের দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি।

২৬

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে মথুর বাবু নিয়ে এলেন। রামকৃষ্ণের কোন ওষুধ-পাণ্ডি দরকার নেই।

কিন্তু ব্যাধি তো দেহের নয়!

মথুর বাবু তবুও বুঝিয়ে বলেন, এমন করে শরীরকে অবহেলা করা ঠিক নয়। সবাই নিয়ম মেনে চলছে···এমন কি ভগবানও তাঁর নিয়মে বাঁধা!

য়ুরোপের নতুন-আমদানী বিজ্ঞান-বুদ্ধি! রামকৃষ্ণ চমকে ওঠেন, বলেন, সে কি কথা! যার নিয়ম ইচ্ছে করলেই সে সে-নিয়ম ভাঙতে পারে···কোন নিয়মের বশ সে নয়!

শিক্ষিত মথুর বাবু তর্ক করেন।

বলেন, যে-গাছে লাল ফুল হয়, চিরকাল তাতে লাল ফুলই ফুটবে···হঠাৎ কোন ভগবানের ইচ্ছের লাল ফুলের গাছে শাদা ফুল হবে না!

রামকৃষ্ণ কিছু আর বলেন না।

রাত্রিতে মাকে ডেকে বলেন, মথুর এ কি বলছে মা! সবের মতন তুই-ও তবে তুচ্ছ নিয়মে বাঁধা?

সারা রাত্রি নিদারুণ যন্ত্রণায় কাটে।

ভোর বেলা গঙ্গার দিকে যেতে দেখেন, শাল জবার গাছে, এক বোঁটাতে পাশাপাশি দুটী ফুল ফুটেছে···একটী রক্ত-রাঙা···আর একটী ধূত্র-শুভ্র···

আনন্দে রামকৃষ্ণের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বোঁটা শুদ্ধ ফুল দুটো নিয়ে মথুর বাবুর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠেন, দেখ, শালা, সে ইচ্ছে করলে পারে কি না।

মথুর বাবু সেদিন থেকে তর্ক করা ছেড়ে দিলেন।

২৭

কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসায় কোন সুফলই দেখা দিল না। তখন মথুর বাবু, বৈজ্ঞানিক মথুর বাবু, কাউকে কিছু না জানিয়ে, ঠাকুরের চিকিৎসার এক নতুন ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বিজ্ঞান বলে যৌন-ক্ষুধা মানব-দেহের স্বাভাবিক বৃত্তি। জোর করে বাইরে থেকে তাকে অতৃপ্ত রাখলে, মানসিক বিকারের আকারে সে নেয় প্রতিশোধ। তখন একমাত্র পথা হচ্ছে, দেহকে দেওয়া তার স্বাভাবিক ক্ষুধার সামগ্রী।

হায় দেহবাদী শিক্ষা! হায়, এ্যানাটমী!

একদিন মথুর বাবু নিজের ফিটনে করে ঠাকুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন।

দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে ফিটন টগ্‌বগ্‌ করতে করতে কলকাতায় এলো···সন্ধ্যা-হয়ে আসছে· মেছুয়াবাজারে এক বাড়ীর সামনে এসে ফিটন থামলো।

ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মথুর বাবু বাড়ীর ভেতরে ঢুকলেন। একটা বড় ঘরে ঠাকুরকে বসিয়ে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুরের কাণে এলো, চাপা হাসি···বহু নারী-কণ্ঠে মৃদু মধুর কলোচ্ছ্বাস···দেখেন, এক দল সুবেশা তরুণী সেই ঘরে এসে ঢুকলো···রঙ্গ-ভঙ্গে দেহ তাদের চলতে গিয়ে যেন চলে পড়ছে···

বিদ্যুৎ-পৃষ্ট পথিকের মত রামকৃষ্ণ চমকে উঠলেন। নিমেষে তাঁর চোখের সামনে জেগে উঠলো, জগৎ-জননীর দিব্য-মূর্ত্তি···নিষ্পন্ন নিথর দেহ···শুধু মুখ থেকে অমৃত-বিন্দুর মত নিঃসন্দিগ্ধ হচ্ছে···জগতের পবিত্রতম একাক্ষরা শব্দ···মা···মা···মা···

মোহিনীরা আর পারলো না এগুতে···দূর থেকে মাটীতে লুটিয়ে তারা করলো প্রণাম···

মথুর বাবু এসে দেখেন, ঘর শূন্য, ঠাকুর সমাধিস্থ···

লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, নির্বোধ আমি, ক্ষমা করুন আমাকে।

চন্দ্রা দেবী তখনো জীবিত···যদিও শোকে তাপে তখন একদম পড়েছেন ভেঙে···

লোকমুখে ছেলের অসুখের কথা শুনে তাঁর মার মন অস্থির হয়ে ওঠে···বার বার চিঠি লেখেন··· অন্তত কিছুদিনের জন্যেও যদি একবার আসে···

মার কাতর আহ্বানে রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে এলেন···

বেছে বেছে খুব ভাল রোজা নিয়ে এলেন মা···রামকৃষ্ণ মনে মনে হাসেন···

রোজা মন্ত্র পড়ে···কত কি করে···ভূত কিন্তু ঘাড় থেকে নামে না···

মা ভাবেন, এ কি রকম ভূত! সবাই বলে, তা নয়, বিয়ে দাও···তেইশ বছরের সমর্থ ছেলে··· বিয়ে দাও সব ঠিক হয়ে যাবে···

চারিদিকে খোঁজাখুঁজি হয়···কিন্তু কোথাও মনের মত পাত্রী জোটে না···

মার মুখে হাসি নেই···মনে কোন সুখ নেই···

কাতর হয়ে ছেলে বলে, কিসের এতো ভাবনা তোমার মা?

মা বলেন, বাবা, বুঝে মার অনুরোধ তোকে বিয়ে করতেই হবে···এত খুঁজছি···কিন্তু কোথাও পাত্রী পাচ্ছি না!

রামকৃষ্ণ হেসে বলেন, তা আমাকে বলো নি কেন মা? একুশি জয়রামবাড়ীতে লোক পাঠাও···রাম মুখুজ্জের বাড়ীতে···সেখানে আমার কুটো বাঁধা আছে যে!

পাগলের সব কথার মত, আত্মীয়-স্বজন ভাবে, এ-ও পাগলের পাগলামী! কেউ আর এ-কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তবুও মা লোক পাঠালেন। খবর এলো, মেয়ে আছে বটে···ঠিকুজী-কুষ্টী সব মেলেও ঠিক···তবে মেয়ের বয়স মাত্র পাঁচ বছর···

চন্দ্রা দেবী বলেন, বরঞ্চ অন্য কোথাও আর মিলছে না, ঐখানেই আমি বিয়ে দেবো!

দু'এক কথায় সব ঠিক হয়ে যায়।

পাঁচ বছরের মেয়ে সারদামণি দেবী—হলেন রামকৃষ্ণের ঘরণী হয়ে।

গরীব মা, সাধ গিয়েছিল দু'একখানা গয়না দিয়ে ছোট বউটীকে সাজাবেন। ঘরে তো ছিল না, তাই পাড়ার বাড়ী থেকে দু'এক দিনের কড়ারে ধার-করে এনেছিলেন।

বিয়ের পর সেগুলো দিতে হবে ফিরিয়ে। কিন্তু ছোট মেয়ের গা থেকে কি করে নেওয়া যায় খুলে?

চন্দ্রা দেবী ছেলেকে সব বুঝিয়ে বলেন।

রামকৃষ্ণ হেসে বলেন, তার জন্যে ভাবছো কেন?

সারদামণি ঘুমিয়ে আছে, এমন ভাবে হাত থেকে গয়না খুলে নিলেন ঠাকুর, যে ছোট্ট মেয়ে জানতেই পারলো না।

কিন্তু ঘুম ভেঙে বালিকা দেখে গয়না নেই। কেঁদে উঠলো। রাম মুখুজ্জে মেয়ে নিতে এসে যখন শুনলো যে, মেয়ের পা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, তিনি রাগ করে তখুনি মেয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

ঠাকুর হেসে বলেন, কিন্তু তা বলে কেউ এ বিয়ে ভাঙতে পারে না। *

মায় আবর-ঘরে দিন কেটে যায়·· কিন্তু মনে মনে চলে ডাক···ডাকে দক্ষিণেশ্বর···পুকুরটা···

মায়ের মনের সাথে মিটিয়ে ঠাকুর চলে এলেন আবার দক্ষিণেশ্বরে।

২৯

কামারপুকুর, বৃদ্ধা জননীর কাতর মুখ···সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য···নব-পরিণীতা বালিকা বধূ···সৌরভ মিলিয়ে গেল সব···যেন এ-জীবনের সঙ্গে তাদের আর নেই কোন সম্পর্ক···

মহা-আবর্ত্ত আবার ফেলে গ্রাস করে···অসম্পূর্ণ সাধনার তীব্র বেদনায় ধমনীর মত শত-ছিন্ন হয়ে যায় দেহ-মন···

যা হয়েছে সুরু করতে হবে তাকে শেষ···

মৃত্যুর অন্তরালে মহাকালের রঙ্গমঞ্চে চলে দিব্য-পরীক্ষা···শত শত বৎসরের ভারতের বহুমুখী সাধনার আজ হবে মহা-সমন্বয়···একটী জীবনের নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে জেগে উঠবে একটী মহাদেশের সমস্ত অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি একটী জীবন···অনন্ত জীবনের প্রতীক···সব বিচ্ছিন্নতা, সব বিভিন্নতা, সব বিরোধের শেষ সমাধান! মানব-ইতিহাসের সব সাধনার চরম ফল, মুক্তাবৎ সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন একটী জীবন···

বাক্‌চিত্র-হীন মহাশূন্য···অনাবিষ্কৃত আত্মার মহাদেশ···একে একে পার হয়ে চলেন···এ-পারে পড়ে থাকে মানুষ যায় ক্রমশ সরে, দূর হতে দূরে···

বিচিত্র দেশ···বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা···এক রহস্যলোক থেকে আর এক রহস্য-লোকে· কি তীব্র তার আকর্ষণ···জগতের সব ভাষা বিশ্লেষণ করেও সে-সাধকতার এক বিন্দুর তুলনা হয় না···

পথ দিয়ে চলে যায় ভিখারিণী মেয়ে···রামকৃষ্ণ দেখেন যেন রাম-নির্ব্বাসিতা চলেছে জনমদুখিনী সীতা···কে এক রাখাল-বালক পায়ে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছের তলায়, মনে পড়ে যায়, নব-দুর্ব্বাদল শ্যামলী বৃন্দাবন···এতটুকু ইঙ্গিত, সামান্যতম ভঙ্গী নিমেষে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে দৃশ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য আত্মার দেশে···চেতনার রাজ্য থেকে সমাধির অচেতন গভীরতায়···

---

* আজন্ম ব্রহ্মচারী হলেও, বিবাহে যে বিধি কেন কেন আপত্তিই করেন নি, স্বকীয় নিজে পত্নীর সঙ্গে বিশেষভাবেন, তার ও রামকৃষ্ণ জীবন যাঁরাই আলোচনা করেছেন, তাঁরাই জানেন। যথাসময়ে তা আলোচনা করা হবে।

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমনি পড়ে যায়···ছ'মাস সেখানে ছিলুম! কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসতো, রাত যেতো, তার ঠিকানাই হতো না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন ন্যাকড়া গোঁজে, তেমনি চুকতো, কিন্তু সাড় হতো না··চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল··· নেতে অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গিয়েছে, তারও হুঁস হয়নি! শরীরটে কি আর থাকতো! সেই সময়েই যেতো। তবে সেই সময় একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে কলের মত একগাছা লাঠী ছিল। সে অবস্থা দেখে চিনেছিল; আর বুঝেছিল, এ-শরীরটে দিয়ে মার অনেক কাজ এখনও বাকি আছে; এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁস আনবার চেষ্টা করতো···একটু হুঁস হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত! এই রকমে কোনদিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনদিন যেতো না। এইভাবে ছ'মাস গেছে। তারপর এই অবস্থায় কতদিন পরে শুনতে পেলুম··· মা বলছে···ওরে, ভাব-মুখে থাক···লোক-শিক্ষায় ওরে ভাব-মুখে থাক্···"

এইভাবে কঠোর সাধনার ফলে শরীর একদিন ভেঙে পড়লো। শরীর একটু সেরে উঠলে, ঠিক করলেন, নিজের বলতে আর কিছু রাখবেন না···সব জগজ্জননীর চরণে একান্তভাবে সমর্পণ করে দেবেন··· সব সংস্কার···বিচার-বুদ্ধি···ভাল-মন্দ জ্ঞান···

এ বেহ বীণার মত তুলে দেবেন, তাঁর হাতে···তাতে তাঁর যা খুশী রাগাবেন রাগিনী···নিজের বলতে এতটুকু থাকবে না কোন বোধ···

শুধু নেই···নয় নেই···হয় নেই···শুধু নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা···শুধু আদি আর আমার মন···আর নেই কোন উপকরণ···কোন যোগ, কোন যাগ···মানুষ চলেছে···নতুন দিগন্তরে···নতুন সাধনায়···

এক হাতে এক মুঠো মাটী···আর হাতে টাকা···সারাদিন ধরে গঙ্গার ধারে বসে নিজের মনকে বোঝান···টাকাও যা···মাটীও তা··যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে-জ্ঞান মনে বদ্ধমূল হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত দিবারাত্র গঙ্গার তীরে বসে, একবার এ-হাত দেখেন, আর-একবার ও-হাত দেখেন, আর বলেন, টাকা-মাটী, মাটী-টাকা···

লোকে এবার স্থির করে নিল, বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু সেই ক'দিনের একাগ্রতায় শুধু তাঁর মনের নয়, মনের সঙ্গে দেহেও এমন অনুভূতি জাগলো যে, টাকা ছুঁলে আপনা থেকে তাঁর হাতের আঙুল বেঁকে যেতো···টাকা ছুঁলে তপ্ত কয়লা রাখার মত জ্বালা করতো···

এমনি ভাবে একে-একে একটী একটী করে শৃঙ্খল নিজের হাতে খুলে খুলে তিনি এগিয়ে চলেন··· আজকের যুগের মানুষের জন্যে নতুন করে আত্মার অমর-রাজ্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে···

সর্বস্বান্তে জগৎ-জননীর পায়ের তলায় পুষ্পপুঞ্জ-প্রতিমার মত নিজেকে নিবেদন করে বলেন, এই যে, নিলাম তোমার মত নিজেকে তোর রাঙা পায়ে কঙ্কণী···এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান···

এই নে তোর ধর্ম···এই নে তোর অর্থ···এই নে তোর কাম, এই নে তোর মোক্ষ···এই নে তোর পাপ··· আর এই নে তোর পুণ্য···এই নে তোর যশ, এই নে তোর অপযশ···আমায় শুধু তোর চরণে শুদ্ধা ভক্তি দে, সেবা দে···*

৩০

শিব-মন্দিরে ঢুকে সেদিন আপনার মনে শিব-মহিম-স্তোত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ আত্মহারা হয়ে উঠলেন··· সেই অপূর্ব ছন্দ লালিত্যের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সেই মধুর ঝঙ্কারে, অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তি-স্রোত কণ্ঠ-রোধ করে এলো···দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে জল···আর চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, মহাদেব গো, তোমার মহিমার কথা আমি কেমন করে···এই পর্যন্ত বলতে না বলতে অধিবাস জগতের যত শব্দ ভাসিয়ে মাটীতে পড়ে গেলেন···বাহ্যজ্ঞান-হীন···মন্দিরের কর্মচারীরা সবাই ছুটে এলো···কে একজন বলে উঠলো, ভট্চাজের ও নিত্য পাগলামী।

কেউ বা তাতেও সরই না হয়ে বল্লেন, আজ কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি যেন···

হেসে আর একজন মন্তব্য করলেন, পাগলা শিবের মাথায় তো চড়ে বসবে না শেষকালে?

সেদিন মথুর বাবু ঠাকুর বাড়ীতেই ছিলেন। মন্দিরে গোলমাল শুনে তিনি তাড়াতাড়ি এসে এলেন মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে, ভেতরের সেই দৃশ্য দেখে, তিনি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেলেন।

একজন কর্মচারী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন, ভটচাজ এমনি থামবে না হুজুর ওকে টেনে বার করে আনলে হয় না?

সিংহ বিক্রমে মথুর বাবু গর্জন করে উঠলেন, যার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে, সে বিনে ঠাকুরের গায়ে যেন হাত দেয়!

ভয়ে কর্মচারীরা ভীত মার্জারের মত কে কোথায় সরে পড়লো···

বহুক্ষণ পরে ঠাকুরের যখন জ্ঞান হলো, দেখেন মন্দিরে তিনি একা···আর মথুর প্রহরীর মত দরজায় দাঁড়িয়ে আছে!

লজ্জিত হয়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, বেন কত অপরাধী···বেমালুম কিছু করে ফেলেছি কি?

মাটীতে লুটিয়ে প্রণাম করে মথুর বলেন, না বাবা, তুমি স্তব করছিলে, পাছে কেউ ব্যাঘাত করে বলে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

---

*এখানে মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের এই প্রার্থনা শুধু উচ্চাস নয়। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ইত্যাদি যে সব জিনিষ সেদিন তিনি বার বার করে-করে মায়ের পায়ে অঞ্জলী দিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটী অনুভব তিনি অন্তরে সাধনা করে নিজ করে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তার একটীর জন্যেও আলাদা আলাদা তাঁর আর কোন দাবী ছিল না। তাই তাকে বিশেষ করে নিবেদন করে, সে-সবের কোন আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর নিজ আত্মেইছে। এই প্রার্থনায় তিনি বলেন নি, মা, এই যে তোর ধর্ম, এই তোর নিয়ে। জগৎ-মাতার কাছে তিনি সত্য-গোপন করেন নি। তিনি নিজেই পরে সেইকথা বলেছিলেন, সত্য যে ঈশ্বর লাভ করি, তা হলেই এই-এর সঙ্গে দিয়ে দিলুম, এ সব মানুষে কি করে?

৩১

রাণী রাসমণি পরলোক গমন করেছেন···মথুর বাবু এখন সেই বিশাল জমিদারীর পরিচালক···

ঠাকুরকে বাড়ী নিয়ে যান, দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করেন। বাড়ীর পুরোনো পুরোহিত হালদার বুড়ো হাড়ে জ্বলে যায়।

একদিন মথুর বাবু একটা কাগজ নিয়ে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে রাখলেন।

—বাবা, আমি যদি না থাকি···তাই একটা জমিদারী আপনার নামে···

সাপে কামড়ালে মানুষ যেমন করে ওঠে, তেমনি ভাবে ঠাকুর আসন ছেড়ে উঠলেন, হ্যাঁরে, এত কাণ্ডের পর তুই আমাকে বিবাগী করতে চাস্?

মথুরবাবু লজ্জিত হয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেল্লেন। হালদার বুড়ো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দাঁড়িয়ে দেখে! রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে যায়···বহু চেষ্টা···ওষুধ-মন্ত্র করে বাবুকে একটু বশ করে আনছিলাম এমন সময় কোথা থেকে উড়ে বলে সব মাটী করে দিলে গা! নিশ্চয়ই কোন বশীকরণ মন্ত্র জানে···বাবুকে একেবারে মুঠোর মধ্যে করে নিয়েছে!

হালদার বুড়োর মনে শান্তি নেই। ঠাকুর ভানবাজার বাড়ী এলেই সে ঘুর ঘুর করে, উদ্দেশ্য ঠাকুরকে ধরে অন্তত বশীকরণ মন্ত্রটা জেনে নেবে···বলবে না বিটলে বামুন?

কিন্তু সুযোগ সুবিধে আর হয় না।

একদিন ভানবাজার বাড়ীতে ঠাকুর দালানে রামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় আছেন···কাছে জন-প্রাণী কেউ নেই··· অমনি সুযোগ বুঝে হালদার বুড়ো শেয়ালের মত এগিয়ে এলো··· তখন একটু একটু করে ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে আসছে···

হালদার কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে বলে উঠলো, অ বামুন বল্ না··· বাবুকে কি করে হাত করলি··· চুপ্ করে চুপ করে আছিস্ কেন? বল্...বশীকরণ মন্ত্রটা কি?

ঠাকুরের তখন কথা বলবার শক্তি নেই···চক্ষের দৃষ্টি স্তিমিত···

বারবার অনুরোধ করে যখন কোন সাড়াশব্দ পেলো না, তখন রেগে হালদার বুড়ো সজোরে পদাঘাত করে বলে উঠলো, যা শালা, না বলি তো মরে গেল!

বলেই পালিয়ে গেল।

ঠাকুরের জ্ঞান ফিরে আসতেই তিনি ভীত সন্ত্রস্ত চোখে চারদিক চেয়ে দেখেন, কেউ কোথায় আছে কি না! যদি কেউ হালদারের সেই কাণ্ড দেখে থাকে, তাহলে হয়ত কোম্পানীর চাকরী যাবে···বড় কষ্টে পড়বে...

যখন বুঝতে পারলেন কেউ আর দেখেনি সে-দৃশ্য, তখন আশ্বস্ত হলেন মনে।

৩২

নানা পথ···নানা দিকে গিয়েছে চলে···পথিকের লোভের অন্ত নেই···সব পথ বিবেচনা দে···দেখে, কোন পথ গিয়ে মিশেছে, একই জায়গায়···

যখন মনে যে-ভাবের উদয় হয়, রামকৃষ্ণ সেই ভাবে যান ডুবে···অন্তরের একাগ্র নিষ্ঠায় সেই মন্ত্রের মত তাঁর চেহারাও হয়ে যায় পরিবর্তিত···

শিশু হয়ে তাকেন মাকে···শিশুর মত হয়ে যায় সব তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখেন, বিশ্বজননী প্রসন্ন হাসি নিয়ে রয়েছেন হৃদয়-মন্দির আলো করে···

আনন্দে ভরে ওঠে মন···সে-আনন্দের মহা-পারাবারে বহাশ্রমের মত ধোয়ে জীবন··

মথুর বাবুর বাড়ীতে চলেছে দোল-পূজা ··কুলললনারা একে একে এসে ভক্তি প্রতিমাকে আরতি করেন সুবেশা, সুসজ্জিতা···ধনীর গৃহলক্ষ্মী সব ..

হঠাৎ মথুর বাবু দেখেন, তাঁর স্ত্রীর পাশে অপরিচিতা কে সুবেশা অপরূপ সুন্দরী নারী আরতি করছেন···ভাবাবেশে মুখ থেকে যেন জ্যোতি ঝরে পড়ছে··তিনি মনে করবার চেষ্টা করেন, কিছুতেই মনে করতে পারেন না···অথচ কে যেন মনে বলে দিচ্ছে, সম্পূর্ণ অপরিচিতা নয় ঐ নারী!

আরতি শেষ হয়ে গেল···কুলললনারা আরতি সেরে অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন···পূজোর কাজেও মথুর বাবুর মনে কিন্তু সেই অপরিচিতার মুখ জাগতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে অন্তঃপুরে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আরতি করছিলেন, তাঁকে তো আগে দেখেছি বলে মনে হয় না!'

স্ত্রী হেসে বলেন, দেখেছ বই কি! তবে, তুমিও চিনতে পারলে না?

মথুর বাবু যখন শুনলেন, নারী রূপে যাঁকে দেখেছেন, তিনি আর কেউ নন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ জগদম্বার সখীরূপে তিনি নিজের পুরুষ সত্তা পর্যন্ত গিয়েছিলেন ভুলে···

সফল শুধু অন্তরের একান্ত একাগ্রতা···আর এই মানুষের মন

মানুষের মন···স্বর্গের দেবতাকে পারে টেনে আনতে এই পৃথিবীতে···

মরুভূমিকে পারে সাগরে পরিণত করতে···সাগরকে পারে গণ্ডুষে শুষে নিতে···

সেইখানেই ফোটে ফুল···পাকে ফল···ওঠে সূর্য্য···হয় দিন···

সেইখানেই চলে ঋতুচক্র···বর্ষ···মাস···দিন···

ঘোরে জীবচক্র···জন্ম-মৃত্যু···গতায়াত···

সেই মানুষের অমৃত-লোক···বিশ্ব-শক্তির আদি-কেন্দ্র···

চলাচলের অভাবে, জীর্ণ পুরাতন বিস্মৃত নগরীর মত, মানুষের সেই আদি-জন্মভূমি ক্রমশ বিলুপ্ত হতে চলেছে বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে বাইরের আবেষ্টনের পুঞ্জীভূত আবর্জনায়···তোমাকে প্রণাম···প্রণাম হে অক্ষয় —শাশ্বত চির - পথিক···

তুমি এসো দীপ হাতে, ফিরে নিয়ে যেতে পথভ্রান্ত মানুষকে আবার সেই পথে···আত্মার অমর লোকে···*

---

* কোন গুরু বা বাইরের কোন বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে, শুধু অন্তরের একাগ্র নিষ্ঠায় এবং পবিত্রতায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেন তারই কাহিনীটুকু শুধু এইখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর থেকে শুরু হয়, তাঁর আনুষ্ঠানিক কঠোর সাধনা। অন্তরের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে এবং ধর্ম-প্রণালী অনুযায়ী তিনি যে-কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তার কাহিনী পরে-তাঁহার পরবর্তী কোন সাধারণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পারের খেয়া

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[সভ্যতার ইতিহাস কার ইতিহাস? আজকের মানুষ নতুন করে দিয়েছে এই প্রশ্নের জবাব। সভ্যতার ইতিহাস হলো বিজয়ীর ইতিহাস...যে-মানুষ সবাইকে ঠেলে এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার বিজ্ঞাপন। কিন্তু সেই কি গড়ে তোলে নি এই সভ্যতাকে, এই পৃথিবীকে? অমরত্বের স্বর্গলোকে তারই কি নয় প্রথম প্রবেশ-অধিকার? আজকের মানুষ এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে নতুন করে···ইতিহাসের বাইরে, চিরকাল নামহীন রয়ে গেল যারা,—যারা যুদ্ধ করেছে বলে সেনাপতি জয়ী হয়েছে, যারা গায়ের রক্ত জল করেছে বলে লক্ষপতি হয়েছে ক্রোড়পতি, যারা নীরবে নিঃশব্দে মাটীর বুক চিরে গজিয়েছে সোনার ফসল, যা নিয়ে কারবার করে গড়ে উঠেছে রাজার রাজপ্রাসাদ, বণিকের বাণিজ্য, শিল্পীর শিল্প, জাতির সম্পদ, সেই সব নামহীন মহাপুরুষদের অলিখিত জীবন-কাব্য, আজকের যুগের মানুষের কাছে নিয়ে এসেছে এক নতুন দাবী···

নতুন করে লেখা হবে নাকি মানুষের ইতিহাস? এই কাহিনী হলো সেই পরম-জিজ্ঞাসারই কল্প-রূপ...]

সূচীভেদ্য অন্ধকার।

হাওয়া যেন জমাট বরফ।

নৈঋতকোণের কালো মেঘের উপর নিঃশব্দে চ'লেছে অদৃশ্য তরণী—তাতে না দেখা যায় নাবিক না আছে যন্ত্র।

যাত্রীর সীমা সংখ্যা নাই—নিদারুণ ভীড়—কিন্তু তবু ঠাসাঠাসি নেই।

একজন ব'লে উঠলো, "যুদ্ধের ঠেলায় ট্রামে বাসে যেমন ভীড় এখানেও দেখছি তাই।"

আর একজন ব'লে, "হবে না? কত যাত্রী রোজ আসছে তার হিসেব রাখ?"

একজনের দিকে লক্ষ্য ক'রে সবাই ব'লে, "তার জন্যে দায়ী ইনি।"—বক্তা একজন ইংরেজ।

যাকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলা হ'ল সে আর্যাণ। সে তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন ক'রে উঠলো, "হাঁ, দায়ী আমি। কিন্তু তার জন্য আমি এক ফোঁটা লজ্জিত বা দুঃখিত নই।—আমি যুদ্ধ ক'রেছি—সারা বিশ্বে চমকে এমন দাবানল জ্বালিয়েছি যা কেউ কখনও কল্পনা ক'রতে পারে নি। জগৎকে স্তম্ভিত ক'রে সেখানে বীরকীর্ত্তি রেখে এসেছি—তাই এপারে বীরলোকে আমার হবে দায়ী আবাস।"

ইংরেজ বলে, "তুমি বীর! চোরের মত অতর্কিতে এসে শান্তিকামী দেশ আক্রমণ ও বিধ্বস্ত ক'রেছ, চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছ সে দেশের লোক যা যুগ যুগ ধ'রে গড়ে তুলেছিল; বধ ক'রেছ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী—কেন না তারা যুদ্ধ চায় নি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নি। বীর বটে তুমি।"

উত্তর হ'ল, "যুদ্ধ যদি না চেয়ে থাকে তারা তবে সে তাদের কাপুরুষতা। তার জন্য প্রস্তুত না হ'য়ে থাকে তবে সে তাদের নির্বুদ্ধিতা। আমি সে যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ যে কখনোই সে কথা কখনও গোপন করি নি। আমার দেশের পরাভবের গ্লানি দূর ক'রে এ জাতির স্বাধীনতা মর্যাদা তাকে ফেরাবার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম। বিশ্বের সার্বভৌমত্বের যারা স্বাধীনতার তাকে তোমরা ভেঙেছিলে বন্দুকের পরিচালনা ক'রে রাখতে তোমাদের ঐশ্বর্যের বসে। সে অধিকার আমি স্বীকার করি নি, বিশ্বের প্রভু হবার যোগ্য যারা সেই জাতিকে বিশ্বে প্রভুত্ব আনি দিতে চেয়েছিলাম—"

"কিন্তু দিয়েছ তাদের দাসত্ব। আজ সে দেশের দিকে চেয়ে দেখেছ কি?"

"দেখেছি—দেখে চোখ জ্বলে গেছে। আমার ব্রত আমি সফল ক'রতে পারি নি। পুঞ্জীভূত অন্ধকার শুধু তার বিপুলতায় গ্রাস ক'রেছে আমার স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন বিলুপ্ত হয় নি, হবার নয়। সে কাল জেগে উঠবে—আমার মত আর একজন—বহুজন আসবে যারা একদিন না একদিন তোমাদের এই রাক্ষসী শক্তিকে পরাভূত ক'রে উত্তরীয় জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ক'রবে।"

"নিঃসন্দেহে পরাজিত হ'য়েও তোমার স্পর্দ্ধা এক চুলও ক্ষুণ্ণ হয় নি দেখছি।"

"না হয় নি! জয় পরাজয়ই শেষ কথা নয় বন্ধু। গৌরবটাই খাঁটি জিনিষ। যে বীরগৌরবের কীর্তি আমি জগতে রেখে এসেছি তা অবিনশ্বর। তার কথা যুগযুগান্তর ধরে লোকে গান ক'রবে তাতে উদ্বোধনা পাবে ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ যুগ। সে গৌরবের গাথা স্বর্গের বীরলোকে যে ধ্বনিত হচ্ছে তা আমি দিব্য কর্ণে শুনতে পাচ্ছি।"

"স্বর্গে যাবার ছাড়পত্র দেখছি তোমার একেবারে মুঠোর ভিতর।"

"সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সন্দেহ থাকে তবে তা দূর হ'তে বিলম্ব হবে না। যখন দেখতে পাবে আমি ও-পারে যাবা মাত্র দুন্দুভি বাজিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রতে আসবেন দেবতারা বীরলোকে, তখন ত আর সন্দেহ থাকবে না।"

"বন্য, তবুও যে-যুদ্ধ নিজের শক্তির মত্তে নির্দোষ জাতিগুলিকে বিধ্বস্ত ক'রেছে সে দেখছে স্বর্গে-যাবার পথ! হায় রে, একবার কি মনে ভেবেছ যে কত লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নিরপরাধ ব্যক্তি-রক্তে তোমার হস্ত কলঙ্কিত? সেই রক্তের প্রত্যেকটি বিন্দু তোমার বিরুদ্ধে এসে সাক্ষ্য দেবে এ কথা কি জান না তুমি?"

"রক্ত! শুধু রক্তপাত যদি এত বড় অপরাধ তবে তুমি কোথায় যাবে বন্ধু! তোমার ও হাতেও রক্ত ও আমার চেয়ে কম লাল নয়।"

"আমার হাতে রক্ত আততায়ীর—নিরপরাধীর নয়। আত্মরক্ষায়, দেশরক্ষায় আমি রক্তপাত ক'রেছি—জয়ী হ'য়েছি—আততায়ীকে বিনষ্ট ক'রেছি! তার জন্য আমি মোটেই কুণ্ঠিত নই। জগতের কাজের জন্য রক্তপাত ক'রেছি—নিজের প্রাণ বলি দিয়েছি। এ গৌরবের পুরস্কার অক্ষয় বীরলোক—সে গৌরব তোমার না হয়—আমার। স্বর্গ হ'তে দুন্দুভি বাজিয়ে আসবেন দেবতারা, কিন্তু সে তোমার জন্য নয়, আমার জন্য। আর, জানো, নিরপেক্ষ বিচার যখন ক'রবে ইতিহাস, তখন তার পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমার নাম, যে বীর মাতৃভূমির মুক্তির জন্য অকাতরে [illegible] তার, যে দস্যু পরস্বাপহারিণী হ'য়ে অকাতরে রক্তপাত ক'রে শেষে অগৌরবে বিদায় হ'য়েছে [illegible]

হো হো ক'রে হেসে উঠলো পাশের একটা লোক—সে ছিল সাংবাদিক।

ব'লে সে, "ইতিহাস ক'রবে নিরপেক্ষ বিচার! পাগল হ'য়েছ। তোমায় দেখছি এখনও এ কুসংস্কার আছে যে ইতিহাসে লেখা হয় নিরপেক্ষ সত্য। দেখ নি বন্ধু, যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের পাতায়, সরকারী ভেস্পাচে কেমন ক'রে ইতিহাসের কাঠামো বাঁধা হচ্ছে। ইতিহাসের উপাদান খাঁটি-সত্য নয় মুখরতা তা সে সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—এক কথায় প্রোপাগাণ্ডা!"

সবাই অবাক হ'য়ে চাইলে লোকটার দিকে।

হুহাতের অন্ধকার, চমকে কিছুই দেখা যায় না। তবু সবাই সবাইকে দেখতে পায়। নীরন্ধ্র অন্ধত্ব, আলোর আভাস মাত্র নেই কোথাও তবু সব আছে—চক্ষেন্দ্রিয়ের অপ্রাধ্য। চোখ কান বুজে কল্পনা বা স্মৃতির পটে যেমন শুনতে পাই ধ্বনি, দেখতে পাই বর্ণ, রূপ ও আকৃতি অনেকটা সেই রকম। বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ এ প্রতীক—শুধু মানস গোচর।

সাংবাদিকের কথাটা নিয়ে তর্ক উঠলো।

সে ব'লে, "ইতিহাসের সব কটা পাতা উল্টে দেখুন, কাদের লেখা আছে তাতে? অতীতে যারা লিখে গেছে নিজেদের কীর্তিকথা—হয় পাথরের গায় কি তামার ফলকে কি গ্রন্থে তাদেরই নাম জানে ইতিহাস, তাদের প্রশস্তি গেয়ে যে সব মিথ্যা রচিত হ'য়েছে তাই ইতিহাসের উপাদান। আর কোটি কোটি লোক হয় ত তাদের চেয়ে অনেক বড় ছিল, হয় ত অনেক কিছু ক'রেছিল তারা, কিন্তু লিখে বা লিখিয়ে যায় নি সে কথা। তাই তাদের সংবাদও রাখে নি ইতিহাস। আর আজ, আজকের ইতিহাসের উপাদান হবে খবরের কাগজে যা ছাপা হ'য়েছে। আমি ত জানি কি ছেপেছি কাগজে? কাদের কথা ছেপেছি? যে কেউ বড় কাজ ক'রেছে তারই কথা লিখি নি। বড় হোক ছোট হোক যে আমার দলের লোক তার কথা দিনের পর দিন মোটা হরপে ছেপেছি—তাদের কথা জানতে পারবে লোকে শত বর্ষ পরে। আর যে প্রতিভাবান মহাপুরুষ উপেক্ষা ক'রেছে আমাদের বিজ্ঞাপন তার চিহ্ন মাত্র পৌঁছবে না পর কালে। আমার, আমার দলের লোকের কথা যাতে উজ্জ্বল অক্ষরে যুগ যুগান্ত বেঁচে থাকে তারই ব্যবস্থা ক'রে এসেছি আমরা। আর আমাদের এই লেখা থেকে তৈরী হবে ইতিহাস। আজকের প্রোপাগাণ্ডার নাম কাল হবে ইতিহাস।"

জার্মান একটু হেসে ব'লে, "তোমার কথা আমি মানি, তাই জীবনে সব চেয়ে বড় ক'রেছিলাম প্রোপাগাণ্ডা! তোমার উপর ইতিহাসের বিচার কি হবে তার ব্যবস্থা ক'রেই এসেছি আমি।"

"কিন্তু ভুলে যাচ্ছ বন্ধু যে তুমি পরাজিত। তোমার দেশ যাদের হাতে গেছে তাদের হবে উল্টো প্রোপাগাণ্ডা। তোমার নাম ইতিহাসে উঠবে বটে কিন্তু তুমি যেমনটি চাও তেমনটি ক'রে নয়—এই নূতন কাল বসলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তোমার যে ছবিখানি উঠবে তা দেখলে তুমি আপনি শিউরে উঠবে।"

একটি সৌম্য-মূর্তি অনতিদেহী লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তার মুখে একটা শান্ত শর্দার ছায়া, হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল।

ব'লে সে, "আমাকে এগিয়ে যেতে দাও ভাই সব—আমার আগে নামতে হবে।"

স্তম্ভিত প্রশ্ন হ'ল চারদিকে, "কেন হে যীশু? কী তুমি যে আগে নামতে হবে তোমার।"

স্মিত-হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে তিনি ব'ল্লেন, "জান না তোমরা? চেন না আমায়? কেমন ক'রে জানবে? তোমরা যখন ব্যস্ত ছিলে হত্যা ক'রতে আমি তখন ক'রেছিলাম মানুষের সেবা। কোটি কোটি টাকা অকাতরে ব্যয় ক'রেছি আমি লোকহিতের জন্য। প্রতিষ্ঠা ক'রেছি শিক্ষাগার, শিল্পাগার, চিকিৎসাশালা, ধনসত্র, কত কিছু। পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে আমার দান, তাতে লক্ষ লক্ষ রোগী পাচ্ছে সেবা, বুভুক্ষিত পাচ্ছে ক্ষুধার অন্ন, তরুণেরা শিখছে নানা বিদ্যা! আমার যে আগে যেতেই হবে! দেবতারা আসনে আমাকে সম্বর্ধনা ক'রতে, তাঁদের কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবো।"

একটা রুক্ষ লোক গর্জন ক'রে উঠলো, "কিন্তু বাবাজী দান যে ক'রেছ এত টাকা, পেলে কোথায়? লক্ষ লক্ষ দুর্বল ক্ষুধার্তের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তোমরা তিন পুরুষ ধ'রে পুঁজি ক'রেছিলে, তারই অংশমাত্র দিয়ে তুমি হ'য়েছ দাতা! হায় রে, দান ক'রেছ তুমি কার ধন?"—লোকটা সোভিয়েট রাশিয়ার।

তর্ক জমে উঠলো—সেই চিরন্তন তর্ক ক্যাপিটালিজম ও সোস্যালিজমের।

তখন আর একজন অবতরণ করবার ব্যস্ততায় অগ্রসর হ'ল অতি সন্তর্পণে সবলের স্পর্শ বাঁচিয়ে। অপরিসীম আনন্দের দীপ্তিতে তার মুখ উজ্জ্বল, পবিত্রতার আভিশয্যে সমগ্র মূর্তি যেন ঝক্ ঝক্ ক'রছে। তার দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত অঙ্গনিহত।

নিজের মহত্ত্বে কুণ্ঠনিস্পৃহতার একটা স্নিগ্ধতা ছিল তার কণ্ঠে। স্মিত-হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে সে ব'ল্লে, "বাপ সকল একটু পথ ছেড়ে দেও আমায়।"

জার্মান ও ইংরেজ একতালে বল্লে, "না, ছাড়বো না পথ।" বলে হাত বাড়িয়ে তার পথ আগলাল।

সঙ্কুচিত হ'য়ে আত্মসংবরণ ক'রে সে ব'ল্লে, "রক্তে কলঙ্কিত তোমাদের হাত, কামিনী ও কাঞ্চনে তোমরা সবাই কলঙ্কিত আমাকে স্পর্শ ক'রে আমার শুচিতা নষ্ট ক'রো না। জীবনে কোনও দিন হিংসা করি নি কাহাও, কামিনী কাঞ্চনে লালসা করি নি, চিরজীবন সাধনা ক'রেছি সেই মন্ত্রের যাতে আত্মার মুক্তি হয়। সকল প্রকার অশুচিতা ও পাপ থেকে আপনাকে রক্ষা ক'রেছি, জগতের মায়া-প্রপঞ্চ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রতে চেষ্টা করেছি। সাধনা আমার সম্পূর্ণ হয়েছে, তাই স্বর্গ আমার সম্মুখে—আমাকে এগিয়ে যেতে দাও।"

"স্বার্থপর ধার্মিক পুরুষ! বড় পুণ্যের পশরা বেঁধেছ ভাবছ? কেন? জগতে কার কি উপকার ক'রেছ তুমি? নিজের স্বার্থের সাধনা ক'রেছ, ভেবেছ তাতেই সোজা স্বর্গে যাবে। সব মানুষ তোমার ভাই, তাদের এতখানি অবজ্ঞা ক'রেছ তুমি যে তাদের স্পর্শ ক'রতেও চাও নি, আর এখন জীবনের খেলা শেষ ক'রে এসে তবু এই অবজ্ঞার খেলা ছাড়তে পার নি।" ব'ল্লেন সেই দানবীর।

তুমুল তর্ক লেগে গেল।

দানবীর, কর্মবীর, রণবীর, জ্ঞানবীর, ধর্মবীর, বহুবীর এসে ঐ বিতণ্ডায় যোগ দিলেন। স্বর্গে যাবার অধিকার নিয়ে একটা প্রচণ্ড নিঃশব্দ কোলাহল চ'লতে লাগলো। বিদেহী এঁরা—নইলে একটা মারামারি রক্তারক্তি হ'য়ে যেতো।

এই কলহের ঝোঁকে তাঁরা সবাই প'ড়লেন পিছিয়ে। পিছনে ব'সেছিল যারা তারা ব্যস্ত হ'য়ে তাদের পথ ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল।

নৌকার গলুয়ের কাছে এসে ব'সলো দু'জন অতি নিরীহ গোবেচারা গোছের লোক।

একজন আর একজনকে ব'লে, "বে ভীড় দেখছি ভাই, ওপারে নামতে পারব ত?"

অপর ব্যক্তি ব'লে, "ঠিক নেবে যাবে সব। তীরে গেলে সব কিউ ক'রে দেবে কি না।"

"ও বাবা! এখানেও কিউ? বেঁচে থাকতে ত অন্নবস্ত্রের জন্য কিউ ক'রে থেকে থেকে পা দুটো অসাড় হ'য়ে গেছে। ম'রেও মুক্তি নেই তার থেকে?"

"এ তুমি বুঝি সহরে থাকতে! কি ক'রতে তাই তুমি?"

"কাপড়ের কলে কাজ ক'রতাম ভাই। আর তুমি?"

"আমি তাই খেতে কাজ ক'রতাম। নিজের জমি ছিল না। পরের জমী ভাগে আবাদ ক'রতাম।"

"সম্বল কিছু ক'রতে পেরেছিলে?"

"সম্বল? বলে দিনান্ত পরিশ্রম ক'রে কোনক্রমে দুটো খেতে পেতাম। প'রতেও পেতাম আগে, কিন্তু তোমাদের দয়ায় শেষ বরাবর কাপড়খানাও প'রতে পেতাম না। দাম বা কাপড়ের, সে ত বলবারই নয়, তাও দাম দিয়ে কাপড় পাওয়া ছিল ভাগ্যি।"

"আমাদের দোষ কিছু কি ভাই? আমরা ত কাপড় বুনে খালাস। তা থেকে একগজ পেয়েছি আমরা? সব বস্তাবন্দী হ'য়ে বোঝাই হ'য়েছে গুদামে। আমরাও পেতে যে পেয়েছি সেই ঢের। কিন্তু সে সম্বলের কথা ব'লছি নে। এই পারাপারের কড়ির কথা ব'লছি। তার কি উপায় ক'রেছ? ও-পারের ঘাট-মাঝিকে কি দিয়ে বোঝাবে?"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কলের মজুর ব'লে, "বোঝাব আর কি মাথা মুণ্ডু, বলবো গিয়ে পায়ে ধ'রে, কিছুই জোটাতে পারি নি বাবা। পুণ্যি সঞ্চয় ক'রবো কি? নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই নি পেট ভরাবার চেষ্টায়।"

চাষী আরও লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে ব'লে, "আমারও তাই সেই কথা। ওই কথাই ব'লবো এখন, যা থাকে বরাতে।"

"হাঁ কি আর হবে বল। এসে যখন পড়েছি হবেই একটা উপায়। আর ঠাকুরমশায়ের কাছে শুনেছি ও-পারের লোকের ধরাধর্ম আছে, আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রবেন না এঁরা।

নৌকা ভিড়লো এসে তীরের কাছে।

পারে ব'সে আছেন চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতাখানা খুলে কানে কলম গুঁজে।

কাগজওয়ালা হেসে ব'লে, "আহা বেচারা! এখনও সেই সেকালের কলম দিয়েই চালাচ্ছেন। একটা টাইপরাইটার বা ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসে বুড়ো বড় খুশী হ'ত।"

চিত্রগুপ্তের পিছনের দেয়ালে আছে অনেকগুলি বয়রা—বন্ধ। প্রত্যেকের হিসাব নিয়ে যার যে পথে যাবার কথা সেই পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হবে।

হুড়োহুড়ি লেগে গেল নামবার জন্যে স্বর্গে যাবার ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে। যারা স্বর্গের যাত্রী সেই জানে তারা মাথা নিচু ক'রে পিছিয়ে গেল।

হঠাৎ আকাশে দেখা গেল দিব্য দীপ্তি। সবাই হাঁ ক'রে চাইলো সেই দিকে।

সেই তীব্র আলোকের মাঝখানে দেখা গেল পুষ্পক রথ। আকাশে বেজে উঠলো অপরূপ ঐক্যতান বাদ্য।

রণবীর, কর্মবীর, জ্ঞানবীর, দানবীর, ধর্মবীর, সবাই উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন, "এসেছে? বলি নি আসবে আমার জন্যে পুষ্পক রথ।"

তর্ক আর হ'ল না। আগ্রহ প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে সবাই সে রথের দিকে চাইতে চাইতে নেমে এলে

কয়েকজন র'য়ে গেল নৌকায়। খাতা থেকে মুখ তুলে চিত্রগুপ্ত হাঁকলেন, "তোরা আর নামিস নে।" ফিরে যা, এখুনি জন্মাতে হবে।"

তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, ভেবেছিল না জানি কত বড় শাস্তি তাদের কপালে আছে।

বীরের দল ছড়িয়ে প'ড়লেন, চিত্রগুপ্তের প্রতীক্ষা না ক'রে। চাষী ও মজুর তাদের একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

মজুর ব'লে, "কই ভাই, তুমি ব'লেছিলে কিউ হবে, কোথায়?"

"কোথায় দরকার নেই। আমরা যতই ঠেলাঠেলি করি না কেন, গায় গায় ত লাগবে না আর।"

পুষ্পক রথ নেমে এলো, বীরের দল অগ্র প্রতীক্ষায় অগ্রসর হ'য়ে এলেন। চাষী ও মজুর স'রে গেল। রথখানা যেন তাদের গা ঘেঁসেই লাগলো।

দেবদূত নেমে এসে তাদের অঙ্গ স্পর্শ করলেন। দিব্যদেহে দিব্যবেশে তারা উঠলো রথে।

পুষ্পক রথ আকাশে উড়ে গেল।

• •

বীরেরা চিত্রগুপ্তের কাছে ভীড় ক'রে এলো।

একজন আশা আশঙ্কায় দোলায়িত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ওগুম'শায়, রথ আবার কতক্ষণে ফিরবে?"

"আর ফিরবে কেন?"

"কেন আমরা?"

"তোমরা? তোমরা স্বর্গে যাবে কোন পুণ্যে? তোমাদের হিসেব খতান হ'চ্ছে, তার পর যে যার জায়গায় যাবে।"

একজন বড় উকীল ছিল, সে ব'লে, "আমরা—মানে এঁরা এত এত মহাপুরুষ থাকতে স্বর্গে যাবার ভাগ্য হ'ল কিনা ঐ চাষী আর মজুর। এ কী বিচার হ'ল? ওরা কী ক'রেছে জীবনে? শুধু খেটেছে, খেয়েছে—আর বংশবৃদ্ধি ক'রেছে।"

চিত্রগুপ্ত মৃদুহাস্য ক'রে ব'লেন, "ওরা জগৎকে দিয়েছে নিজের হাতে সৃষ্টি ক'রে অন্ন, বস্ত্র। কিন্তু জানে নি কখনও, এ অভিমান কখনও তাদের হয় নি—যে তারাই অন্নদাতা, বস্ত্রদাতা। এই ওদের পুণ্য—আর এই যে দানবীর, ইনি ওদেরই দেওয়া সেই অন্নবস্ত্র ভাঁড়িয়ে হ'য়েছেন দাতা। ওদেরই বুকের রক্ত পানিয়ে এই রথবীর হ'য়েছেন বীর। তেমনি তোমরা সবাই। বাপু হে, আমার এ খতেনে তোমাদের জায়গা নেই।

নারদমুনির বঙ্গদর্শন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[নারদ মুনির সঙ্গে সজনীবাবুর পরিচয় যাকে আমরা বলতে পারি অন্তরঙ্গ : সুতরাং এই ত্রিভুবনচারী দেবতাটীর মনের খবর তিনি যেমন ভাবে জানেন, বোধহয় ইদানীং আর কেউ তা জানেন না। সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধ-বিরতির সুযোগে নারদ মুনি নাকি তাঁর দুই প্রিয়-অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ বেড়াতে এসেছেন এবং তাঁর বাসনা, বাংলাদেশের সমস্ত বিশিষ্ট জায়গাগুলি ঘুরে নিজের চোখে দেখে, তবে তিনি আবার স্বর্গে ফিরবেন। এই ভ্রমণ নিছক বায়ু-পরিবর্ত্তনের তাগিদে অথবা এর আড়ালে স্বর্গের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তা আমরা বলতে পারি না; তবে ইতিমধ্যেই নারদ মুনি দু'এক জায়গায় টহল সেরে এসেছেন··· সংবাদ-পত্রের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ বলে, সাংবাদিক মহলে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের অভিজ্ঞতার কথাই সজনীবাবুর কাছ থেকে আমরা আদায় করেছি···সময়-সুযোগে মুনিবরের অন্যান্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বিবরণ সজনীবাবুর কাছ থেকে গল্প-ভারতীর পাঠকদের শোনাবার বাসনা আমার রয়ে গেল...]

হাওড়া ষ্টেশনের ইণ্টার ক্লাস ওয়েটিং রুমের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট নারদমুনি। অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত ভাব। এদিকে ওদিকে যেকে চেয়ারে টেবিলে বিশ্রামকামী ও ট্রেণের জন্য প্রতীক্ষমান পাঁচ-সাত জন ভদ্রলোক। কোণের দিকে একজন সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে জল তরঙ্গ সুরে টপ্পার সুরে একটা আধুনিক চলচ্চিত্রের গান গাহিতেছিল। একজন চিনাবাদাম-ভাজা ঠিকরওয়ালা হাঁকিয়া গেল। বেলা দ্বিপ্রহর।

নারদ। (স্বগতঃ) জ্যালা ক্যাসাদে পড়া গেল রে বাবা! কি আক্কেল এই হোঁড়াটোর। সেই কোন্ ভোরে চা খাবার নাম ক'রে সরে পড়ল আর এখন বোধ হচ্ছে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। খিদেতে প্রাণ যে বেরিয়ে যাবার দাখিল হয়েছে। আর তো পারি নে। এই চিনেবাদাম!

চিনাবাদামওয়ালা। আজ্ঞে কর্ত্তা, দেব এক ঠোঙা?

নারদ। দিবি তো রে বাবা, কিন্তু বুড়োমানুষ চিবিয়ে খাব কি করে? দেখছ তো, একটিও দাঁত নাড়ি নেই। কিছু বখশিস করব, নরম খাবার কিছু আনতে পারবি বাবা?

চিনাবাদাম। তা আর পাবব নি? খুব পাবব। দেন কর্তা। পুরি তরকারী কছু নিয়ে আসি। তা আপুনি বুড়ো মানুষ দেখছি—সঙ্গের লোক-জন গেল কোথা?

প্রশমিত ক্রোধ পুনঃপ্রজ্বলিত হইল।

নারদ। 'তবে আর বলি কাকে? হারামজাদারা সেখানে গাঁজা ভাঙতো খেত, থাকত ভাল, বেশি বেয়াড়াপনা করবার সুযোগও পেত না সেখানে। আর এই এক পেল্লাদ পোড়া সহরে আসা অবধি মাসেদিয়া ভাড়াবার নাম ক'রে সেই যে কি সব ছাইভস্ম খেতে ধরেছে বেটাদের মেজাজের আর অন্ত নেই। এখন বলে খাচ্ছে তো পড়ুই রব। আমি যেন আর কিছু বুঝি না! কি করব, কৈলাসে না কের বরাদ্দি চু খাওতেই হবে। আর লিখেছেন খুব এই ক'দিনে। সাংঘাতিক এই কলকাতা বাপ্ত-মোয়ের, এখানে মানুষ ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করে কি ক'রে? তা বাবা, তুমি আর দাঁড়িও না, যাও কিধেতে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়ে গেল।

বাহিরে বিপুল কোলাহল শোনা গেল। চিনাবাদামওয়ালা ছোকরা ছুটিয়া বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কর্তা, চল্ আমি, পোলের ওপর কি এক কাণ্ড হচ্ছে, ইয়া ভিড় জমেছে সেখানে আমার আপুনি কিনে নেন গিয়ে। ওই দেখা।

কোলাহল প্রবলতর হইতেই নারদও কৌতূহলবশে বাহিরে আসিলেন। দূর হইতে কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না তবে ছাওড়া পোলের উপর একটা বিশৃঙ্খলার কিছু যে ঘটিতেছে তাহা বুঝিলেন। লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের সকল লোক চীৎকার ও বহুবিধ বচসা করিতে করিতে সেদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিনিও ওটি ওটি অগ্রসর হইলেন। একটু নিকটবর্তী হইতেই দেখিলেন পোলের উচ্চতম চূড়ায় দুই জন মুসলমান জাতীয় জীব ত্রিশূল দুই নীচের সমবেত জনতাকে হাত পা নাড়িয়া কি বলিতেছে। নীল কোর্ত্তাপরা একদল লোক পোলের গা বাহিয়া ভয় ভয় করিয়া তাহাদের দিকে উঠিতেছে। আর একটু আগাইয়া যাইতেই শুনিতে পাইলেন দর্শকদের স্পষ্ট কথা।

১ম দর্শক। পাগল, পাগল, না হলে ওই উঠে ওঠে কখনো। সাধারণ মানুষ হলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত?

২য় দর্শক। পাগল না ঘণ্টামাস। ব্যাটারা নিশ্চয়ই জাপানের চর, কি একটা মতলবে উঠেছে ওখানে।

৩য় দর্শক। আরে না বাবা, ওরা লোক ওঁরা, পাওনাদার কাকি দেবার জন্যে গা ঢাকা দেওয়ার মতলব, খুনে আসামীও হতে পারে।

১ম দর্শক। মশায়ের যেমন বুদ্ধি! গা ঢাকা দেওয়ার জন্যে গা ওত গোত কারে কেউ বুঝি ফিন দুপুরে আকাশে চড়ে? হয় পাগল, নয় নৌখীন লোক, যেমন পয়সা নেই টাঁকে, হাওয়া খেতে নাকি কিনা সিঙ্গাপুরে যেতে পারেন না, সস্তায় একটু বিশুদ্ধ হাওয়া খেতে উঠেছেন।

২য় দর্শক। এমনও তো হতে পারে মশাই, উঁচু থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার এক চমৎকার কন্দী।

নারদমুনি পা চালাইয়া দ্রুত আগুইয়া গেলেন। তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল এ নন্দী ও ভেঁকির কাণ্ড। মানুষী বুদ্ধিতে এতখানি উচ্চাভিলাষ সম্ভব নয়। তিনি যখন অকুস্থলে পৌঁছিলেন তখন লোক দুইটাকে সিঁড়ি দিয়া টানিয়া নীচে নামানো হইতেছে। লোকারণ্য ভেদ করিয়া আগাইয়া যাওয়া অসম্ভব। স্বর্গাধিবাসী নিতান্ত মুনি-ঋষি লোক বলিয়া নারদ দৈবীশক্তি বলে ভিড় এড়াইয়া ঠেলিয়া পাশ কাটাইয়া ঘটনার কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন। ফায়ারব্রিগেড এবং পুলিস যে দুইটি ভাগকে ঘিরিয়া আস্ফালন করিতেছে তাহারা ওই দুই মহাপ্রভুই বটে—অত্যন্ত তরল অথচ বিরক্তিপূর্ণ ভাব। জনতার কোলাহল।

পুলিস। চল রে চল, থানায়ে চল। তাস খেলিবার আর জায়গা মিলল না জুয়াড়ের। মাতোয়ারা কাঁহাকা।

নন্দী। কোথায় নিয়ে যাবে চল বাবা, শুঁতোও কেন? স্বভাবতই একটু উর্দ্ধলোকে বাস আমাদের, উঁচু জায়গা দেখে লোভ সামলাতে পারি নি বাবা! যা করবে চটপট করে ফেল। আমাদের কর্ত্তাটি আবার ছাতওলা ঠেলনে নিরিবিলি বসে আছেন। সেখানে একটা খবর পাঠাতে হবে।

ভেঁকি। সর্ব্বনাশ নন্দী, দেখ দেখ বুড়ো স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। এখন কি বলা যায় বল দেখি ওঁকে।

নারদমুনি কাছে আসিতেই পুলিসগ্রস্ত অবস্থাতেই দুইজনে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

নারদ। (কুপিত স্বরে) থাক্ থাক্ আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। বলি, কাণ্ডখানা কি?

নন্দী। আজ্ঞে, ম্যাদেরিয়ার সেই ওষুধটা খেয়ে কেমন গা বমি বমি করতে লাগল, মাটিতে দাঁড়িয়ে পা টলতে মাথা ঘুরতেও লাগল, তাই ভাবলাম মাটি ছেড়ে একটু—

নারদ। চোপরাও হারামজাদা। তা সকালবেলায় ও ছাইভস্মগুলো গিলতে গেলে কেন? এখন আমি যে কি করি।

ভেঁকি। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) থামায় যেতে পারব না কর্ত্তা, শুনেছি সেখানে খুব মারে। আপনি বাঁচান আমাদের।

নারদ। যাও, মার খেয়ে এসো। কিছু আক্কেল হোক তোমাদের। কি মুস্কিলেই যে পড়লাম।

পুলিস। চল্ চল্।

পুলিসের দল দুই জনকে হিড়, হিড়, করিয়া টানিয়া লইয়া ভ্যানে চড়াইল। ভ্যান চলিয়া গেল। জনতা কোলাহল করিতে করিতে ছত্রভঙ্গ হইতে লাগিল। নারদের সহিত আসামীদের পরিচয় যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহারা তাঁহার চারি পাশেই ভিড় করিতে লাগিল। দুইজন কোটপ্যাণ্টধারী সুবেশ ছোকরা, একজনের হাতে ক্যামেরা, নারদের দিকে আগাইয়া আসিল। ইহারা সুবিখ্যাত দৈনিক 'খবরবার্তা'র রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার বীরেন ও শম্ভু।

বীরেন। শম্ভু, বুড়োর ছবি তুলে নে একটা, বোধ হচ্ছে ছোড়া দুটোর বাপ।

শম্ভু। যা বলেছিস। (ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল)

বীরেন। ধরে নিয়ে গেল মশাই। তা কি হয়েছিল? রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়েছিল বুঝি?

নারদ। বাবা, এই ভিড় থেকে আমাকে বাঁচাও, আগে একটু জল দাও খেতে। মরে যাচ্ছি।

বীরেন। বেশ তো, আসুন আমাদের গাড়ীতে। আমাদের আফিস কাছেই। সেখানে বসে জিরিয়ে নেবেন, জলটল খাবেন।

নারদ। সে তো খাব বাবা, কিন্তু এই ছেলে দুটোর উদ্ধারের কি হবে। বিদেশ বিভূঁই, এ বয়সকালে এসে মহাবিপদে পড়লাম দেখি।

বীরেন। সে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না সার। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে পুলিশ কমিশনার সাহেবের খুব ভাব। তাঁকে বুঝিয়ে বললেই—

নারদ। তাই চল বাবা।

ব্যবসার আফিস। বিরাট রোটারি মেশিনের ঘর পার হইয়া উপরে যাইতে হয়। নারদের মনের অবস্থা ভাল নয়। তবু বিস্মিত হইলেন। কী কাণ্ডকারখানা এ।

নারদ। এটি কি যন্ত্র বাবা?

বীরেন। জানেন না বুঝি? রোটারি মেশিনের নাম শুনেছেন? ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার ১৬ পৃষ্ঠার কাগজ ছাপা হয়ে ভাঁজ হয়ে কাঁটা হয়ে বেরিয়ে আসবে। সেরা ছবি একসঙ্গে ছয়টার বেশি ছয়টিও হতে পারে।

নারদ। বল কি? পঁচিশ হাজার দু রঙে। তা এ যন্ত্রটির দাম কত হবে?

বীরেন। দু লাখ বল লাখ—বিরাট বিরাট দৈত্যের মত ব্যাপার, দু তলা, তিনতলা। সিসে গলছে, ছাঁচে ঢেলে হরপ বানানো হচ্ছে, কল টিপলেই আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে সব। হরফ পাশাপাশি বসিয়ে প্রথম কাগজের উপর ছাপ নেওয়া হচ্ছে তখনি সেই ছাঁচে সিসে ঢেলে লেখা আর ছবিশুদ্ধ পাত তৈরী হচ্ছে। সেই পাত বসিয়ে দিয়ে মেশিন চালিয়ে দিলে, দেখতে দেখতে বিজ্ঞীর খবরের কাগজ হয়ে বেরিয়ে আসছে। এ এক তাজ্জব কাণ্ড এ যুগের বিজ্ঞানের।

নারদ। তা বটে বাপ। তা চল তোমাদের কর্ত্তার কাছে। এখনও অভুক্ত রয়েছি আমি।

শম্ভু। সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সার। একটু জল খেয়ে জিরিয়ে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলে ফেলুন, বীরেন লিখে নেবে। কাল আপনার ছবিশুদ্ধ বেরিয়ে যাবে কাগজে। ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। দেখুন, ছেলেরা ঘণ্টাটে হলেও যে কাজে লেগে যায় আপনি তার একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। আসুন নিউজের ঘরে।

জল খানাদি করিয়া একটু সুস্থ হইয়া নারদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলেন।

নারদ। বাস্ রে এ কী কাণ্ড! এত লোক, এরা সব কি করছে?

বীরেন। আজ্ঞে, চারদিক থেকে খবর আসছে ইংরাজীতে, নিজস্ব প্রতিনিধিদের চিঠি আসছে, তার আসছে, এঁরা সব বাংলায় অনুবাদ করছেন, হেডিং লিখছেন, এডিট করছেন, সাবএডিট করছেন। ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন লোক।

নারদ। আর এই যে উর্দিপরা ডাকহরকরা লোকগুলো ঘন ঘন আসছে যাচ্ছে—

বীরেন। জানেন, না বুঝি, ওরা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস আর ইউনাইটেড প্রেসের পিওন, যেমন যেমন খবর আসছে সেখানে তেমন তেমন পাঠিয়ে দিচ্ছে এপাশে ওপাশে হাতে, এরা সাইক্লোস্টাইল করে ছাপতে আসছে যাচ্ছে। এমনি চলছে সারা রাত আর দিন। আর ওইযে ঘরটি ওই কোণে দেখছেন ওটির নাম হচ্ছে টেলিপ্রিন্টার। পিওনের ছোটাছুটি বন্ধ করেছে এই ঘর। খবর যা আসছে এর ভেতর দিয়ে একেবারে ছাপা লেখা হয়ে বেরুচ্ছে ঠিক টেলিগ্রামের মত।

নারদ। বল কি বাবা? তা এসব পরে দেখব'খন, ছেলে দুটোর জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে। যা করবার একটু তাড়াতাড়ি কর বাবা।

বীরেন (অন্যদিকে শঙ্কুর প্রতি)। তুই যা না শঙ্কু, বাঁড়ুজ্জে সাহেবের কাছে নিয়ে যা এঁকে। বুঝিয়ে বলবে—

শঙ্কু। ওরে বাস্ রে, ও বাঘের ঘরে আমি যেতে পারব না, যোগা তো নই। কিছু বলতে গেলেই সাত শতেরো কৈফিয়ৎ। জানোই তো সব জায়গায় সব সময় কর্তা নই ইণ্টারেস্টের। তার চাইতে তুড়াকে পৌঁছে দিয়ে আয়, বল্ কি দরকারী কথা আছে। তুতো নিজের ব্যবস্থা নিজে করুক সেখানে

বীরেন। সেই ভালো। (নারদকে) আজ্ঞে, আপনার নামটা—

নারদ। শ্রীযুক্ত কিবাহন শর্মা।

বীরেন। বলেন কি, এই নাম ব্যবহার করছেন আপনি?

নারদ। তা করছি তো বাপু, কখনো লজ্জায় তো পড়ি নি।

বীরেন। এবার পড়বেন। দেখেন নি তো আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। এই যে এসে পড়েছি। আসুন। ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার, স্যার, ইনি মিঃ শর্মা, একটা বিশেষ জরুরি দরকারে আপনাকে ইণ্টারভিউ করতে এসেছেন। ওঁর দুটি ছেলে—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আচ্ছা আমি দেখছি, তুমি যাও বীরেন। ইয়েস মিঃ শর্মা, কি করতে পারি আমি? আপনি যান আমাদের বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেণ্টে। সেখানে উত্তরমুখো যে আছেন নিবারণবাবু, তিনিই হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বিভাগের ইনচার্জ। বেট কম নেবেন কিছু। ওরে বনমালী।

নারদ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই বনমালী উঁহাকে গুঁতা মেরাইয়া বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেণ্টে লইয়া গেল। উত্তরমুখো নিবারণবাবু বসিয়াছিলেন। বনমালী নারদকে তাঁহার সামনের চেয়ারে বসাইয়া নিবারণবাবুর কাণে কাণে কি বলিয়া চলিয়া গেল।

বনমালীবাবু। নিরুদ্দেশ তো? ব্লক আছে কিছু? কত ইঞ্চি কত কলম জায়গা নেবেন। সিঙ্গল কলম চার ইঞ্চিতেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। ইঞ্চি আট টাকা করে আটাশ টাকা, আপনাকে ফিফ্‌টি-পার্সেন্ট কমিশন হিসেবে ফেরত দেওয়া হবে। আটাশ টাকায় আটাশ আনা লেস, স্যাট ইজ ছাব্বিশ টাকা চার আনা। ঠিক দেবেন, না কাশ?

নারদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢোকা অবধি চমকাইয়া গিয়াছিলেন, এবার হাসিয়া উঠিলেন।

নারদ। আরে মশাই থামুন থামুন। আপনারা একেবারে অস্থির করে দিচ্ছেন যে! স্বর্গলোকের বাস করবারেও তো এমন কাণ্ড দেখি নি। আমি মুখ খুলবার আগেই আপনারা ইঞ্চি বলছেন, টাকা বলছেন। আমি কি চাই সেটা তো শোনবার কৌতূহলই হল না কারো।

বনমালী। হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন নয়?

নারদ। আজ্ঞে না, হারানো-প্রাপ্তি বটে কিন্তু নিরুদ্দেশ নয়। দুটি ছেলে পুলিশে ধরা পড়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে চাই।

বনমালী। আপনি এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টে যান। ওরে মহিষর!

মহিষর আসিয়া হেডলাম এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্টে লইয়া গেল নারদকে। একজন মুরব্বি গোছের লোক ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া অর্ধনিমীলিত নেত্রে আলবোলায় তামাক টানিতেছেন। তিনিই সম্পাদক। পাশের খোপে খোপে সহকারী সম্পাদকেরা নিবিষ্টচিত্তে লিখনরত।

সম্পাদক। কি চাই আপনার?

নারদ। আজ্ঞে পুলিশে দুটি ছেলেকে—

সম্পাদক। ব্রিটার পুলিশ, ক্যালকাটা পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, বেঙ্গল পুলিশ না মিলিটারী পুলিশ? কোন্ ডুরিসডিকসনে? ওয়ারেন্ট ছিল, না—একস্‌কিউজ মি।

একজন সহঃ সম্পাদক এক কর্দ লম্বা কাগজ হাতে উঠিয়া সম্পাদকের কাছে আসিলেন।

সম্পাদক। ইয়েস শৈলেন?

শৈলেন। আড়াই ইঞ্চি ম্যাটার সট পড়ছে সার এই কলমটাতে। কি দেব?

সম্পাদক। ভাড়াটেদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করছে বলে, বাড়ীওয়ালাদের বধে টুকে দাও। আমার বাড়ীওয়ালা শালা বড্ড জ্বালাচ্ছে। খুব কড়া লিখবে, বুঝলে?

শৈলেন চলিয়া গেল।

সম্পাদক। হ্যাঁ, কি বলছিলাম—

নারদ। (ফেলিয়া দিয়া) দুত্তোর খবরের কাগজের অফিসের নিকুচি করেছে। (জোড় হস্তে) ভুল হয়ে গিয়েছিল মশাই, মাফ করবেন। আমরা কলের মানুষ, মর্জ্যলোকে এসে পড়েছিলাম এই ভেবেছিলাম। নীচে নামবার পথটুকু অনুগ্রহ করে দেখিয়ে দিন।

সম্পাদক। ওরে কার্তিক—

পরদিন নিয়মিত আড্ডায় নন্দী, ঢেঁকি ও নারদ

ঢেঁকি। বাস্ রে বাস্, খুব বাঁচিয়েছেন কর্ত্তা, আর এ দেশে নয়, চলুন এবার কেটে পড়া যাক।

নন্দী। এর মধ্যেই এসে গেলে ঢেঁকি, তবু তো তনেইবলের শুঁতো খেতে হয় নি, দারোগাটি কানমলা পর্যন্তই পৌঁছেছিল মাত্র। অ্যাপোলজি কর্ত্তা দিয়ে চাকরি হলেন—

নারদ। তা খেয়ে-টেয়ে দিয়েছিল তো বাবা তোদের?

ঢেঁকি। আরে রামঃ, এক ছটাক জল পর্য্যন্ত নয়। আপনাদের যা খুশি করুন, আমি আর এখানে থাকছি না কর্ত্তা।

নন্দী। আরে বাপু, আর মাসখানেক পরেই তো পুজো, মা আসবেন বাপের বাড়ীতে, চার দিন থাকবেন এখানে, হৈ চৈ মজা কিছু হবে, শুনছি যুদ্ধটাও থেমেছে। একেবারে মায়ের সঙ্গেই ফেরা যাবে, কি বলেন মুনিবর?

নারদ। এটা তুমি মন্দ বল নি নন্দী, খবরের কাগজের অফিসে ওই রোটারি মেশিনে ছাপাটা একদিন দেখে আসতে হবে। কারখানাটা অফিসের বন্ধ, তা হলেও স্বীকৃতং দুষ্কৃতাদপি শাস্ত্রে বলেছে। জ্ঞান কিনিস একটা দেখতে বলাতেই আপত্তিতেও যাওয়া যেতে পারে।

ঢেঁকি। যাই বলুন কর্ত্তা, শেষ পর্য্যন্ত সেনাকর্তাই তো আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন—

নারদ। দিলেন তো কিন্তু আমাকে যে কি নাস্তানাবুদটা হতে হয়েছে বাপু তা তো জানো না। ওপর ওপর এভিডেন্টলি কন্ট্রিবিউশন ওপর নীচ করতে করতে জান বিকলে গেছে না? তবু শাপ্রিস ওই ছিপছিপে মেয়েটা ছিল বলে কোনও গতিকে কাজটা হাসিল হয়েছে। ছোকরা অফিসার বড়িবাজ, প্রশ্নে প্রশ্নে আমাদের আসল পরিচয়টা প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কি। ওদের পাল্লায় আর কিছুতেই পড়ছি না বাবা।

নন্দী। তা হলে কর্ত্তা, আপনি এখানে একটু বসে হরি নাম জপ করুন, আমরা এই সামুত্যালীতে দু'কাপ চা খেয়ে আসি।

নারদ। আবার চা? চা তো খাবে কত। আবার সকালবেলায় সেই ছাইভস্ম ম্যাগেরিয়ার ওষুধ গিলে রক্ত টাসের তাড় ঘরে ফুলতে থাকবে। তার চাইতে চল, আমিও যাই। গাটা আমারও ম্যাজ ম্যাজ করছে।

নন্দী ও ঢেঁকি (সোল্লাসে), তাই চলুন কর্ত্তা।

প্রচণ্ড চৌধুরী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[গল্পের দাদু আমাদের দাদু। বাংলাসাহিত্যিকের দাদু। গল্পের নাতীদের খুশিতে ভরে দিতে, দাদুরই খোল-বিচুলী শুদ্ধ ধরতে পেরেছিল, আমাদের দাদু ঐ খুটি খায় আমাদের লেখাতে দাদ কাটিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কি মনে করে, নিজেই ধরা দিলেন আবার। তাই নাতির ছিটিছাড়া মিষ্টিকথা সবাই মিলে শুনেছি এখানে...তবে দাদু এবার আমাদের হাতে ভূত চালান দিয়েছেন, ভূতুড়ে তার নাম, প্রচণ্ড চৌধুরী.....দাদুর মুখে এই "ভূতায়ণ" রবীন্দ্রনাথের কথকের "রামায়ণে"র চেয়ে আমাদের যে বেশী ভালো লাগল, সেই কথাটুকু, আপনাদের তথা দাদুকে যদি জানিয়ে দিই, নিশ্চয়ই আপনারা আপত্তি করবেন না...এখন শুরু হোক্ দাদুর ভূতায়ণ...]

১

বৈকাল-প্রায় পাঁচটা। গরুগুলো জাবড়ি কিরেছে। দাদামশাই গোয়াল বন্ধ করে—তাদের খোল-বিচুলি দিয়ে এসে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক সাজতে বসেছেন। একটু ব্যস্ত ভাব। ও-পাড়ার দিগম্বরের বাড়ি প্রসিদ্ধ রবীন্দ্রের কথকের কথা শুনতে যেতে হবে—রামায়ণ কথা। ঘুলঘুলিতে বসে গেছেন। ঘড়িঘড়ির ঘাঁচ, আলো, শিখা, শব্দ সব তাঁর মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে যেত, সকলেই স্তব্ধ হয়ে শোনে, অদ্ভুত বলা।

আজ ছুটির দিন—সেটা তার মনে ছিল না। বুধ ভুলতেই বেরিয়েছে—বৈশাখ, ধীরেন, অজিত—ছেলেপুলে হাজির।—"দাদা খেলে দেখছি!" ছেলেদের চিরদিন ভালবাসেন।

"কিরে—কথা শুনতে যাবি বুঝি,—চল্..."

"কথা শুনতেই তো এলুম, যাব আর কোথায়?"

"ওরে রবীন্দ্রের কথা শুনে রাখ, ও আর কেউ দিন পাবি নি..."

"রামায়ণ তো, ও আর শুনব কি!"

"তা বটে, তোদেরি তো ধাতে-কলমে করা কীর্তি। তা হোক্ নিজেদের গুরুকে চিনিবি, দেখলেও আনন্দ আছে..."

ছেলেরা রাজি হল না।

"ও বুঝেছি, এখনকার অধিকাণ্ড দেখে শঙ্কা পাচ্ছিস বুঝি? ওটা তোদের ভুল—'আদির' সম্মান আছেই, চিরদিন থাকবেও। ভাবিস নি—তোরা চিরদিনই তার Starter হয়ে থাকবি।"

"আমরা এসব গল্প শুনতে, আপনি বাজে কথায় আমাদের এড়াবার চেষ্টা পাচ্ছেন, এই তো।"

"ওরে না—না, মোস্।" ছেলেদের ক্ষুণ্ণ করবার সামর্থ্য দাদামশায়ের নেই। গুড়ুকের টান্ আর অবাধ হইল না—ঘন ঘন 'সেমিকোলন্' পড়তে লাগলো। চিন্তিত ভাবে বললেন—"কি শুনবে? প্রেমের কাহিনী শুনে শুনে তো সব পেকে গিয়েছে, ওর খোঁচ-খাঁচ বুঝতে বাকি নেই—থিসিস' লিখলেই Ph. D. আর একটা ভূতের গল্পই শোন, মুখ বদলান হবে।"

অজিত বলল—"সে তো সিদিমার কাছে শুনি।"

"আর ওই, হয় দাদামশায়ের কাছেই শুনলে—তফাৎ পেতে পার। তিনি ইংরাজী-পড়া ভূত বড় দেখেন নি। তাঁরে থাকলেও হয়তো তিনি চিনতে পারেন নি—তাদের পশ্চাতে একটা intelligent force কাজ করে কিনা। আমার এটা ইংরাজী-পড়া ভূত।" শৈলেন বলল—"ও—বে—বলুন।"

"না, এখন কোৎপেড়ে বলে হবে না। তা হলে আমাকে আবার—"বনবালা" কি "ফুলমালা" খুঁজতে হয়—পাওয়া যিনিস, বাঁচিয়ে রাখতে হবে—"

"না আমরা বানানো কথা শুনতে চাইনা। আপনি বলুনতো, আপনাকে মিছে কথাই বা কওয়াব কেন?"

"বড় খুশি হলুম, 'সত্য' ভঙ্গা হয়েছে। সত্যযুগকে আর ঘুমুতে দিদি নি। তবে শোনো—

"প্রচণ্ড চৌধুরী ছিলেন—"

"ও আবার কি নাম?"

"তা বটে, ঠিক বলেছ—সরোজাক্ষ, বিপিনবিহারী, কি কীরপুরি গ্রাতপিয়" নয়। তা প্রচণ্ডের চেয়ে অমিতাই কি—ঘটোৎকচের চেয়ে বেয়াড়া ঠ্যাকে কি? তোমরা আমাকে সত্যভ্রষ্ট করবে না বলছ।"

শৈলেন বলল—"বলুন—বলুন, যদি anglo-germanular ভূত, তবে নিশ্চয়ই খুব Interesting হয়ে পারে—আপনি বলুন।"

২

প্রচণ্ডের পিতা যদুপতি চৌধুরী। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত—ভালবাসত। বিপদে আপদে, রাত্রে অকালে সকলেই তাঁর পরামর্শ নিত, সাহায্য পেত। কিন্তু অপাত্তি ও অসন্তোষের তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রচণ্ডই ছিল তাঁর কারণ। গাঁয়ের মুরুব্বি হাতে-ধরিদ পর থেকে নিজেই একটা না একটা ফ্যাসাদ লেগে থাকত। অসৎ ছোকরা, গাছ থেকে পড়া, সাপেরকাটা—

অর্থাৎ বিয়ের ওপর দিয়ে যা না ঘটতে পারে ১ বছরের মধ্যেই সে সব ভয়ের কারণ শেষ হয়ে গেছিল। শেষ হয় নি কেবল—তার মা বাপের চিন্তা আর দুর্ভোগ।

সেকালের বর্ধমানের ভদ্রমহাশয় বলে যে পদার্থ বা সম্প্রদায় ছিলেন, অনেকের কাছেই তার অর্থ ছিল—বাল্যকাল হ'তে যমের ভয় যাঁদের সহজ ও মুক্ত হয়ে যায়,—তাই তাঁদের অনেকের রূপেই আবির্ভূত হ'ত। এ যেন অবতার প্রচণ্ডের কাছে হার মেনেছিলেন। তার কারণ বর্ণনা যেহেতু সে বালাই এখন আর নাই। পাঠশালার আটচালার আঙন লাগবার পর গ্রামে পাতাড়ির পাতাও আর নাই।

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রচণ্ড-প্রকৃতির জ্বালায় গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে, নিজের নিজের ছেলেদের নাম করে বাঁচতেন। তাঁদের ফুল ফলের বাগানগুলি প্রচণ্ডের অধিকারে আসে।

বাপ মার প্রতি প্রচণ্ডের বিদৃষ্টি ছিল অকারণ। বিজেরা বলতেন—"অমন বাপ মার এমন কি করে হ'ল!" বৃদ্ধিরা বলতেন—"গ্রহনক্ষত্রের নিরীখেতে অমন হয়।" ইত্যাদি সে অনেক কথা।

বহুপতিবাবুর পত্নী ১১।১২ বছরের প্রচণ্ডকে রেখে গঙ্গাযাত্রা করে গেছেন। বহুপতি চৌধুরী তাঁকে বলেন—"তুমি তো মুক্তি পেলে, আমাকে যে অ্যান্তেই চিতায় তুলে চলসে," ইত্যাদি। কথাগুলি প্রচণ্ডের কানে গিয়েছিল।

সকলেই আশা করলেন, এইবার একটা পরিবর্তন হবেই। হ'লও তাই।

চৌধুরীমশাই অনেক বুঝিয়ে, শেষ সকল প্রকার ভাল-মন্দ চেষ্টা করেও কোন ফল না পেয়ে,—একদিন রেগে ফ্যালেন—"দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে আর চাই না।"

প্রচণ্ডও ইংরাজিতে vice versa বলে একদম বিদেয়।

গুরুদয়াল ব্রাহ্মণ বালক। উপনয়ন দেখে, কাছেতার এক সন্ন্যাসীর মুখবন্ধনিক, প্রচণ্ডকে আশ্রম নেন—লেখাপড়াও করান। বুদ্ধির প্রাখর্যই ও-সব ক্ষেত্রের প্রধান অস্ত্র বা সম্বল। প্রচণ্ড সহজেই কাম চালাবার মত লেখাপড়া শিখে, তাঁদেরি তাড়নায় কর্মীকর্মীর হয়, দীনদীও কেনে।

আমি তোমাদের সঙ্গেতেই আছি। গ্রামের লোকদের প্রতি তার মমতার পূর্ববৎই ছিল, গ্রামে একদিনও আসে নি। সব খবরই সে রাখত। গ্রামত্যাগের পর সকল বাড়িতেই হরিলুটের সুর পড়েছিল, তা সেও জানত। সে কথা একদিনও ভোলে নি। বাপ নিজেই তার প্রতীক্ষা করতেন, সেও নিজে ছেলেকে আনতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, মাঝিদের চুপকারও করেছিল। কিন্তু বিধাতার তা' ইচ্ছা ছিল না, হঠাৎ কলেরায় তিনি মারা যান।

ডিস্ট্রিক্ট বি চৌধুরী—অর্থাৎ আমাদের প্রচণ্ড, তখন চৌরঙ্গীর বাড়ির বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল

আর ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম ঠিক করছিল। নিজের সম্বন্ধে পিতার বৃদ্ধা মাতার সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—"একি হল!" সে অনেক কিছুই ভেবেছিল, হয়তো হবে। কিছুক্ষণ পর থেকে—"ওঃ মনে আমাকে ঘৃণা করা। সুখী হতে দেবেন না। বেশ—আমিও দেখে নেব।"

প্রচণ্ড এখন বড় কন্ট্রাকটার। খ্যাতি ও অর্থ দুই তার হস্তগত। পিতৃশ্রাদ্ধের কয়েকদিন পূর্বে গ্রামে মস্ত একখানি ঝকঝকে মোটর এসে ঢুকলো। "কে—কে—কে—এলো?" গ্রামের মেয়ে পুরুষ দেখবার জন্য ভেঙে পড়লো। সিল্কের ধান, গলায় কাছা, খালি পা, হাত জোড় করা প্রচণ্ড নামিলো। সবিনয়ে বলল—"আমি আপনাদের ভাগ্যহীন প্রচণ্ড। বড় সাধ ছিল, বিদ্যেধরী বাবা বাংলোন। এখন এ ভাগ্যহীনের আপনারাই সব। আমি তো কিছুই জানি না, আপনারাই আমার কর্ণধিতরসা; কি করলে ভালো হয়, বাবা পারলৌকিক শান্তি পাবি—যেমন যেমন আজ্ঞা করবেন আমি তা পালনে প্রস্তুত। সরকারী কাজ, ছুটি ছাটা নেই, আপনাদের সব সংক্ষেপে করা করে করতে হবে। আর আমি কেবল আপনাদের অনুমতি ও আদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি। শ্রাদ্ধের দুদিন আগে আমি গুরুবংশের সাহায্যে পণ্ডিত, পুরোহিত—যতদূর সম্ভবাক্ষর পাচকাদি সঙ্গে করে আসব। ইতিমধ্যে যা যা প্রয়োজন—বাড়ি পরিষ্কার, মেরাপ, সামিয়ানা প্রভৃতি খাটির গোলাস, পুরি, দরা করে আপনাদেরই করিয়ে ও আনিয়ে রাখতে হবে। আমার আর কে আছেন? খরচের জন্যে আপাতিক এই ৩০, টাকা রেখে যাচ্ছি। শাস্ত্রসম্মত বৃদ্ধাদি আমি বানাতে দিয়েছি: সঙ্গেই আনব। আজ আমাকে সম্মতি ও অনুমতি দানে কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত করুন। আমাকে রক্ষা করুন।"

তখন গ্রামের বিজ্ঞেরা খুবই তুষ্ট হলেন, বললেন—"সে কি বাবা, এ তো আমাদেরই আপন কাজ, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। তোমার পরিচয় জানে, গ্রামে যে কতটা শান্তি পেলুম তা বলবার নয়। তোমার বাপ বহুপতি প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ছিলেন—তাঁর কাছে গ্রামের সকলেই ঋণী। তুমি ভেব না, তাঁর শ্রাদ্ধে কোন বিঘ্ন বাধাবিপত্তি নাই, সব সুশৃঙ্খলায় সমাপ্ত হয়ে যাবে বাবা। আমরা আছি চিন্তা কি?" ইত্যাদি কথার পর কাকেও আঠারআনাই, কাকেও ষোলোআনাই, কাকেও চৌদ্দআনাই সম্বোধন শুনিয়ে প্রচণ্ড সকলের অনুমতি হাসিল করে ফিরে এলো।

তাদের মধ্যে প্রচণ্ডকে বড় বড় ৩ আধিপত্য আরম্ভ হয়ে গেল।—"দুধে দাঁত" কি বাপের বেটা! বাল্যকালে কে না কি করে? এখন পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলে? তবে ইতেই হবে—আজকে তাদের ঐ কিরিত্তি মেনে নেবো। আমার কথা ওই মেয়াদে লিখে রাখো।"—তাঁর বাড়ী ফিরলেন।

প্রচণ্ড রাত্রিবেলা অর্থাৎ একদিন পূর্বে গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরদিন প্রাতে কাজারম্ভ। প্রচণ্ডের চক্ষু ছল ছল দেখে একটি বিধবা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন—"কেনো বাবা, এ ভাব কেনো?" প্রচণ্ড কাতর স্বরে বললেন—"মোটামুটি বিবরণ সবই ত বিধবা করুন। কোন রাত্রে

স্বপ্নে বাবা দেখা দিয়ে এমন কয়েকটি কথা বলে আমাকে [illegible] দিলেন যা শুনে আমি শিউরে গিয়েছি। এ জীবনে আর অমঙ্গল করে আর আমার দ্বারা এ মিথ্যা ছদ্মবেশে থাকা সম্ভব নয়। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বৈদিকে তপস্যায় চলে যাব। আর নয়। বাবা পরে বলেন—তাই করো, বিধি-বিধিহিত না হয়, মহাত্মি অনধিকারীরা না পৌরোহিত্য—আমার স্বপ্নকথা যেন সমাধা হয়। পুরোহিত সব করে যাবেন, তুমি মনে মনে আবৃত্তি কোরো, উচ্চারণ কোরো না। তাঁকে শুধু দেখাবে আর সব জানাবে। কাঁদতে দাগবে, বলেন—"কেঁদ না—অমঙ্গলের গতি এসে থাকে, ঐতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে, অপরাধ খণ্ডন হবে, উদ্ধার হয়ে যাবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা, বাবার স্বপ্ন—কথা ও কাজে আপনাদের জানিয়ে যাব।"

বিধনাথ চক্ষে, শ্রীনাথ জ্যেঠা সকলেই স্তম্ভিত, নির্বাক।—"দেখ বাবা, যা মনের পেয়েছ তাই অন্যথা যেন না হয়। আমরা কাজকর্মে কাশীধামে যেতে দেব না। তুমি নিশ্চিন্তে, নিজের কাজ করো। পিতার অনুমতি বিধি করে নিলেই চলবে—সব করতে পারবে—এই আমরা যেমন করছি। ওটি দিয়ে রাখলেই চলবে। আচ্ছা সে সব কথা পরে।

আয়োজন প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর ব্রাহ্মণাদি আসি [illegible]। বিরাট প্যাণ্ডেলে গাড়ি ভেঙে খানা পাকিয়েছে। নানাবিধ আয়োজনে অতিরিক্ত বেলা হয়ে গেছে। [illegible] পুচি, পোলাও, তরকারি পাতে পড়লেই পরিষ্কার। কারো আবার নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না। [illegible] সামনে, সব মুখ চাওয়া-চাউই, ও সঙ্গে সঙ্গে নাদাব্রাব—কথা বেরোয় না। দ্বিতীয় ঘর আর পরিবেশন হয়ে নেয়ে না, কেউ স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, বহুবার উঠে গেছেন।

একজন হাত জোড় করেই পরিচর্যায় ছিল—"ওবি—সে কি, হ'ল কি? শুনুন—মিষ্টান্নাদি আসছে, ওরে দীনবন্ধু কলের বাস্তুটা নেগেছে বুঝি। ওতে ঘি নিবে আর, ঘি বেশিই যাবে, ঘাবাবার না নয়। বাবাকে তো খাঁটি ঘিয়ের পিঠেই দিয়েছি, তিনি তো অজ্ঞান বদনে—কই হ কথা কাল [illegible] উঠবেন না—ব্রাহ্মণেরা না খেলে তাঁর তৃপ্তি হবে না—ইত্যাদি-ইত্যাদি। সে কথা আর কে শোনে, তখন কান পাতা ভার হয়েছে। কেহ কেহ বিকৃত স্বরে কাতে আরম্ভ করেছে—"বেটা বামুনও ওই মাখা ঘিয়ের পিঠে খাইয়েছে—তবেই তো। কি নরাধম!"

একজন বলেন—"সব খবর তো রাখ না—বেটা কুল খানিয়ছে [illegible] ঘাটের—ওরেই অতিতোষ, পাণ্ডেরা বলে।"

অপরজন পণ্ডিতমশাই বলেন—"হারাধনদাদা আজ বড় বাবার হাপিত্যেশ করেছিল, পাওয়া যায় নি তাই চৌধুরীমশাই বেঁচে গেছেন।"

[illegible] ব্রাহ্মণ ভোজন না, ব্রাহ্মণ নিধন।

কেউ বাড়ী, কেউ সোনা [illegible] সে কি বিষম কুটকুটুনি। [illegible] কাজে [illegible]।

প্রচণ্ড এখন ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলছে—"অতো অধীর হবেন না—তার চেয়ে 'হরিয়-মুট' কিনেই চাঙ্গা। কুটকুটুনিতের 'ট' হরির মুটের 'ট', দুয়ের কত সংযোগে 'ঠ' হতে কতক্ষণ? একদল কৌতূহলী চাঙ্গা এলেন। ব্যাকরণ অকারণ হবে না, ব্যঞ্জন আর স্বর কবে আর অতিথি ছিল। বাহু ব্যঞ্জন পেয়ে একটু লাগা বয়েছে বই তো নয়—ও একটু বেরিয়ে যাওয়া ভালো। সে নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করছে, বাধা দেবেন না।"

বদু খুড়ো বললেন—"বলছো পাপিষ্ঠের কথা। চৌধুরী বলতেন—ও আমার পুত নয় জারজ ভূত। ওঁর কথা মিথ্যা হবে না।"

বারাকপুরে কথা ভায়াডাকের কাজ চলছিল। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আড়াই লাখ টাকার কাজ। সর্দার, কুলি, মজুর কেউ এক পয়সা পায় নি। তিন মাস থেকে তারা খাটছে। কাজ তো ফুরিয়ে [illegible]

প্রচণ্ড তাদের মধ্যে চলেছে—"বাপ সকল, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। তোরাই আমার হাত পা—কেউ পাবি কেউ দেড় হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী যাবি। একটা কাজের মত কাজ হবে। এক মাসের মজুরি চাই কিন্তু। ছোটলাট নেই। অতএব তোদের আর মজুরি করতে হবে না। কন্ট্রাক্টরি করবি। ইনাম সেওয়ারই ঠিক করে রেখেছি। কাল থেকে এ তারা খুলতে হবে। আজ বেলাবিবার—Engineer সাহেবের আসবার কথা এই হাত তোদের পাওনা ৩৪ হাজার টাকার চেক সইই হয়েছে, নাম দুই ফরিয়ে নেব—" ইত্যাদি।

কুলিরা মাথামাথি আলাপা করে সন্ধের পরে হতাশ হয়েছিল। চৌধুরীকে বিশ্বাস নেই, সর্দার ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় পেয়েছে, সে বলল—"না হয়ত, টাকা ওদের কাছই চাই,—তার দিন পরে রাম-মজুরি ওদের প্রাণান পাবে, তারা বাড়ী যাবেই।"

"বেশ তো, পরশু দিন, আমার মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে, বেরিয়ে যেতে হবে। টাকা না নিয়ে ছাড়ছি না।"

তার মেজে ওদের ভরসা হয়েছিল—টাকা পাবে। সাহেব আসবে, তারা দেখবে, টাকা দেবে, কে তার খোঁজ নেয়। [illegible] থেকে [illegible]

[illegible] সাত রাত থেকে তারা [illegible]

যে চিঠিটা দেখিয়েছেন বলেছিলেন সেটা বিশেষ ভাবেই [illegible] হয়েছিল। সর্দার কুলিদের বলে—"সাহেব যদি ঘরে আসে যায়, কখনো দশ মিনিটের বেশী থাকতে দেখি নি, একটা ছাড়া দুটো কথা কয় না। টেনাম্না হয়ে···ধরীন্দরের গাধা বানালে দেখছি—একে আমি অনেকবার দেখেছি, খুব জানি। পেটের জ্বালায় ভুলে যাই—আসতে হয়।"

দুয়েকজন বলিষ্ঠ কুলি, দরিয়া হয়ে বললে—"আমাদের কথি কথি গে চল, এখন ভেবে আর কি হবে। রাতদিন আছে—আমরা কেনো বেইমান হ'ব। হুকুম টাকা হুক তো আসবেই। জয় বঙ্গেশ্বরী (বাঁদরের প্রিয় দেবতা) বলে, বুক ফুলিয়ে চললো।

প্রচণ্ড দেখতে পেয়ে এসে বললে—"হাঁ জোয়ান, ঐ পলিশ দিকের ভাঙাটায় আমি উঠে কাজ দু'একটা আয়গা দেখাবো। মজবুতিটা দেখে রাখিস বাবা।

"কুছ চিন্তা নেই হজুর" বলে তারা উঠে পড়লো।

মিনিট ১৫ পরেই একজন কুলি ছুটে এসে খবর দিলে—বড় সায়েবের কিটন্ আসছে হজুর।

প্রচণ্ড ব্যস্ত ভাবে তিন লাফে ভারায় উঠে পড়লেন—এ কি ব্যাপার ভাই! চন্দ্রাকে বললেন—তোমাদের তো সব ঠিক হোলো, সে আমার নিজের হাতেই, তোমাদের খুই আনে...কে কিছু খেতাবের আশা দিয়ে, কাজ করিয়ে নিবে। কাজ হয়ে গেলে আর কি কেউ দেয়, খুব ঠুকিয়ে দিবে। যাক্, তোমরা টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে গেলেই আমি খুশি।

প্রচণ্ড ভারায় উঠে এটা ঠোকেন ওটা ঠোকেন। ঠোকাই তাঁর বড় কাজ।

আজ সাহেব হাসি মুখে, "চৌধুরী, Mr. চৌধুরী!" হাঁকতে হাঁকতে গাড়ি থেকে—"Where is চৌধুরী?" বলতে বলতে নেমে পড়লেন—হাতে পার্সিয়েটের roll. উঁকে ভারায় কাজে ব্যস্ত দেখতে পেয়ে—"Jolly good day come down soon—" Roll খানা উঁচু করে ধরে—"Here you are—you have become Rai Bahadur—I am so glad—come sharp."

আনন্দে আত্মহারা বিহ্বল চৌধুরী, সাহেবকে সেলাম করতে করতে মাচার ভারায় দাঁড়িয়ে পড়াতেই পা ফেঁসে, দড়ি ছিঁড়ে, সেই আড়াই মন বৃত্তি—ইট পাথরের ঝুড়ির ওপর সজোরে ধরাশায়ী পড়ে অজ্ঞান। সকলে ছুটে গিয়ে তুলিল,—রক্ত ছুটছে, নাকটা থেঁতো হয়ে গেছে। তখনি 'এম্বুলেন্স' গাড়ি আনিয়ে হাসপাতালে চালান। সাহেব হুমাগে চোখ মুছলেন—Promising worthy young fellow—what a sad accident.

মিনিট হাসপাতালে [illegible] ঘণ্টা পর্যন্ত ছিলেন, তখনো প্রচণ্ড অজ্ঞান। সর্দারকে বলে গেলেন, "খরচ যত লাগে দিবে। চৌধুরীর আপন···" সাহেবের কথা আর শেষ হয় নে—

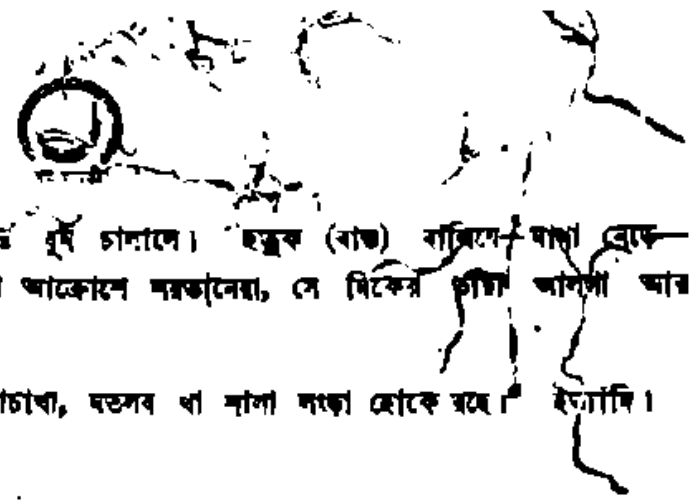

তিনি চলে গেলেন। কুলিরা ঝেড়ে ঝুড়ে বুঁই চালালে। হুস্কুক (বাস) বাজিয়ে—ঘাণ্ডা ব্রেড়ে—"আরে রামা জো" চললো। টাকা না পাওয়ার আক্রোশে সরতানেরা, সে দিকের ঢাকা আলগা আর মধু করে রেখেছিল। বাঁচ্—

বিলাসরা বললে—"এয়সা হোগা নেহি, সোচাথা, মতলব থা শালা সরকা হোকে রহে।" ইত্যাদি।

দীর্ঘ দিন হাসপাতালে থেকে একটু বল পেয়েই প্রচণ্ড চুপ চাপ হাওয়া বদলাতে দক্ষিণে মাউ বলে যাহাকর স্থানে চলে যায়। বুদ্ধিতে বিচক্ষণ সে ছিলই, বুদ্ধি খেলিয়ে নিজে সহজেই রটায়—বাংলাদেশ থেকে প্রচণ্ড বলে কে একজন নামী কন্ট্রাকটার হাওয়া বদলাতে এসে মারা গিয়েছেন। কোন পরিচয় বা কাগজপত্র পাওয়া যায় নি ইত্যাদি। পাণ্ডাদারদের এখানেই শেষ করলে।

বছর তিনেক পরে—ভিটে বেচতে দেশে আসা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকটি পরিচিতের সঙ্গে দেখা। চোখোচোখি হওয়ায় প্রচণ্ড হেসে বললে—"চিনতে পারচ না হেথন, মরেও শোঁক বাঁচে হেঁ—বাঁচে—"

তার কথাগুলো কিন্তু একেবারে সেই ব্যাকরণ-দুরস্ত অনুনাসিক ছিল।

দেখে কিন্তু সকলেই শুনেছিল—প্রচণ্ড হাসপাতালেই মারা গেছে—ভূত হয়েছে। বারাকপুরের বেলায় [illegible] ভয়ে—[illegible] কেউ বেরয় না। যতিবর ঘোর গলায় বলেছিলেন—"ও জো জানা কথা, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হয় না, ও তো হবেই হবে। বাপকে ওলের পিণ্ডি কি বৃথা হয়?" এই বলে ২।৩টি ঢোকও আওড়ে ছিলেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে কারো সন্দেহের মাত্র ছিল না। আজ প্রত্যক্ষে প্রচণ্ডের pointed accent on চন্দ্রবিন্দু, ভিন্নর হেলেদের পূর্ব সংস্কারকে ঠেলে জাগিয়ে দেয়, তারা পা ঘসে এবং পেছু হটছিল, শেষ "রাম রাম" বলতে বলতে উল্টে ছুট মারলে।

প্রচণ্ড এখন সেই ভূত হয়েই আছে,—বুধ সাহেবের চাল রপ্তানির পেয়ারের সহায়।

তবে এখন যদিই কখনো ভূত পত্নির "রাম" নাম শুনে আসা যাক। পাছ বিধি মানতে হয়, ডিগডিগে হয়েই চলা।

বাঘিনী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

[পণ্ডিতেরা বলেন, এ যুগে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ হলো সব চেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার, কিন্তু আমার মনে হয় শরদিন্দুবাবু তার চেয়েও এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা তাঁর এই গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন...সেটা হলো, "বাঘের সত্যি পরিচয় আজো জানি না। অমন স্নেহশীল উচ্চমনা জন্তু আর নেই। পৃথিবীতে যদি ভদ্রলোক থাকে তো সে হলো বাঘ।" মনে করছেন হাস্যরসিক সাহিত্যিক ব্যঙ্গ করেছেন, মোটেই নয়...পড়লেই বুঝতে পারবেন তিনি তাঁর নায়কের মতই এই মতবাদে সম্পূর্ণ আস্থাবান্.....]

একটা বাঘিনী শিকার করিয়াছিলাম।

আমি শিকারী, অনেকগুলা বাঘ ভালুক মারিয়াছি। কিন্তু এই বাঘিনীটাকে মারিবার পর তাহার সম্বন্ধে যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার মত পুরাণো শিকারীকেও অবাক করিয়া দিয়াছিল। সাধারণ পাঠক হয়তো গল্পটা বিশ্বাস করিবেন না, মনে করিবেন আমি ঈশ্বরের নব সংস্করণ রচনা করিতেছি কিম্বা বাঘিনীকে লইয়া একটু রঙ্গ-পরিহাস করিবার চেষ্টা করিতেছি। একথা সত্য, আমরা বাঙালী জাতি বাঘ-ভালুক লইয়া রঙ্গরস করিতে ভালবাসি; কাতুকুতু দিয়া বাঘ মারা কিম্বা ভালুকের দাড়ি কামাইয়া তাহাকে বর করার পর আমাদের অবাধিল আনন্দদান করিয়া থাকে। ইহাতে নিন্দারও কিছু নেপি না। আমি শুধু বলিতে চাই, এ কাহিনীটি সে-জাতীয় নয়। আমি ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং আমার পাঠকগণের মধ্যে বাঘের হয়তো প্রবীণ শিকারী যদি কেহ থাকেন তিনিও হয়তো ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে বন বিহারের সমতলভূমি যেখানে দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে, সেই পাহাড় জঙ্গল ভরা দুর্গম কঠিন ভূভাগ এখনও মানুষের করায়ত্ত হয় নাই; এখনও সেখানে হরিণ শম্বর চমরী নীলগাই প্রভৃতি জন্তু এবং তাহাদের ভক্ষক বাঘ নেকড়ে চিতা হায়েনা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে যে সব উপত্যকা আছে তাহাতে মানুষ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গ্রাম রচনা করিয়া বাস করিতেছে বটে কিন্তু তাহা যেন নিতান্তই ভয়ে ভয়ে—সন্তর্পণে; শ্বাপদের অধিকারই এখনও প্রবল আছে।

শিকারের সন্ধানে একবার ঐদিক পানে গিয়া পড়িয়াছিলাম। তখনও বিহার উপল খণ্ডের তরাইয়ের সীমান্ত ঘেঁষিয়া স্থানে স্থানে ছোট ছোট সরকারী চৌকি আছে, আমরা একটি চৌকিতে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম নিকটবর্তী একটি গ্রামে এক বাঘিনী বড় উৎপাত করিতেছে। গ্রামের দুইজন মাতব্বর চৌকিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে বাঘিনীর কাহিনী শুনিলাম।

মাতব্বর দুইজন লোকটি খাটো ; রোগা খাটো, চক্ষুর একটু বক্রতা আছে, মুখে দাড়ি গোঁফের বাহুল্য নাই। আমি শিকারী শুনিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল। তাহাদের গ্রাম্য সর্দার বাঘের ধরিয়া একটা বাঘিনী দারুণ উৎপীড়ন করিতেছে ; কত যে স্ত্রীলোক আর গরু-মোষ মারিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ তাহার হিংস্র অভিযান কিছুকালের জন্য বন্ধ ছিল, আবার সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। তবে গাঁয়ের মেয়েরা ঘরের বাহির হইতে পারে না। বাঘিনীর বিশেষত্ব এই, সে পুরুষকে বড় একটা আক্রমণ করে না, কিন্তু সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোক মারে। ফলে মেয়েদের জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, ক্ষেতে কাজ করা প্রভৃতি বন্ধ হইয়াছে।

এই লইয়া গ্রামের লোকেরা বারবার সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে কিন্তু কোনও ফল পায় নাই। সরকার পঞ্চাশ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এখন আমি যদি বাঘিনীটাকে মারিয়া এই করাল বিভীষিকার হাত হইতে গ্রামটিকে উদ্ধার করি তবেই রক্ষা, নচেৎ গ্রামে আর মানুষ থাকিবে না।

কাঁটিয়ার মহাশয়কে প্রশ্ন করায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অনুমতি দিলেন, বাঘিনীটার নিদানকাল যে এতদিন আসিয়াও একজন ভাঁহারেল শিকারীর দৃষ্টিই অপেক্ষা করিয়াছিল এবং পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার যে একমাত্র আমারই প্রাপ্য এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় দৃঢ়বিশ্বাস জানাইলেন। তাঁহার এত উৎসাহের কারণ কিন্তু বুঝিলাম না। তাঁহার নিজেরও বন্দুক আছে, তবে তিনি নিজেই বাঘিনীকে মারিতে যান নাই কেন? আমার মত একজন শিকারীর জন্য প্রতীক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার কি তাঁহার কাছে এতই তুচ্ছ?

যাহোক পরদিন অতি প্রত্যূষে মাতব্বর দুইজনের সঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। গ্রাম মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে, শিকারীর পক্ষে পঁচিশ মাইল হাঁটা কিছুই নয়। সুতরাং দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যে ও দুই-অঞ্চলে গিয়া পৌঁছিব তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে আজ রাত্রেই বাঘিনীকে মারিয়া কাল সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারি।

পথের বিস্তারিত বিবরণ আর দিব না। দুইদিন পরে, ক্ষতবিক্ষত চরণ ও কাঁটা লাগিয়া ক্ষতীর হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইলাম। দূরত্ব পঁচিশ মাইলই বটে, কাঁটিয়ার মহাশয় মিথ্যা বলেন নাই। শিকারীর পক্ষে এ গ্রামে আসা খুবই সহজ ; কিন্তু যিনি মহত্বের যে এখানে আসিতে হইলে তিনটি উঁচু উঁচু পাহাড়ের গা উতরাইয়া, কখনও গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে, কখনও ইঁদুরের গর্তের মত সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে হামাগুড়ি দিয়া আসিতে হয়, একথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং কেন যে তিনি পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারের সৌভাগ্য নিজে না অর্জন করিয়া অযাচিতভাবে আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা এই পথ অতিক্রম করিবার পর অতি বড় অনভিজ্ঞেরও অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

গ্রামের মধ্যে গিয়া এক বড় হৈচৈ পড়িয়া গেল। গ্রামবাসীরা তিন্ন খুবই আদর যত্ন করিল। গ্রামের প্রান্তে একটা খড়ের ঘর পুরাপুরি আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং অতিশয় সমবেদনা করিয়া যে তাহারা আমার একটা কন্যার বিবাহ সত্বরই নিষ্পন্ন হয়। তাছাড়া, ইহারা অনাদর যত্ন হইতে এমন উৎকৃষ্ট শিকার-কাবার তৈয়ার করিতে জানে যে তাহার স্বাদ কখনও ভুলিবার নয় এবং ইহাদের চোলাই করা মহুয়ার আরকও অবহেলার বস্তু নয়।

গ্রামের লোকসংখ্যা ছত্রিশেরও বিশটায় গ্রাম শ'দেড়েক হইবে। সকলেই পাহাড়ী। তাহাড়া পুলিশের গুপ্ত রোষ ছাড়া আছে। গাঁয়ের চারিপাশে জঙ্গল কাটিয়া চাষযোগ্য ভূমি ও ধানের ক্ষেত তৈয়ার হইয়াছে। কাছে-পিঠে অন্য গ্রাম নাই ; সব ক্ষেত্রে নিকটবর্তী গ্রামটী দশ মাইল দূরে—এমনিভাবে পৃথিবীর কলহ-কোলাহল হইতে একান্ত নির্বিবাদে, চর্গম গিরিসঙ্কটের পাদদেশে এই ক্ষুদ্র বসুন্ধরা গোষ্ঠি বাস করিতেছে। ইহাদের জীবনে মহাকালের ঘটার ঘণ্টারবের কোনো প্রয়োজন নাই, সময় সম্বন্ধে ঘুলঘড়ির উপর অহংকার নাই। কেবল সম্প্রতি একটা বাঘিনী আসিয়া তাহাদের নিবিড় নিয়ন্ত্র জীবনযাত্রাকে অস্তব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পরদিন, দ্বিপ্রহরের নিষ্ঠুর কড়া রৌদ্রে কোনো আবগায় বসিয়া বন্দুকটীকে তৈলাক্ত করিতেছিলাম ও গ্রামবাসীদের গল্প শুনিতেছিলাম ; তাহারা অনেকগুলি জানোয়ারকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। কেবল একটী ছোকরা অদূরে গাছের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে আমার মুখের পানে তাকাইয়াছিল। পাহাড়ীদের বয়স অনুমান করা সহজ নয়, তবু তাহার বয়স যে কুড়ি-একুশের বেশী নয় তাহা বোঝা যায়। খর দেহ, মুখখানি [illegible] কিন্তু কেন জানিনা তাহার নিষ্পলক চক্ষুদুটি অস্বস্তিকর একাগ্রতায় আমার মুখের উপর স্থির [illegible]

গ্রামবাসিদের কথাবার্তায় বাঘিনী সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল। বাঘিনীটা অন্তত তিনটি দিনের বেলাতেও গ্রামের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, পাহারতলীর ঝর্ণাটির কাছে ওৎ পাতিয়া থাকে। জল আনিতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া গাঁতি-কাটারি-টাঙি লইয়া জল তুলিতে যায়। মেয়েদের কাজ পুরুষদের করিতে হয় এজন্য পুরুষেরা লজ্জিত। আর একটা আশ্চর্য কথা শুনিলাম, বাঘিনী কেবল এই গ্রামটিকেই বিশেষভাবে নিজের লক্ষ্যবস্তু করিয়া বাছিয়া লইয়াছে, অন্য কোনও গ্রামের প্রতি তাহার কোনও আক্রোশ নাই।

আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগিল। বাঘের চরিত্রে এরূপ পক্ষপাত তো দেখা যায় না। একজন মানুষ বাঘের স্বাভাবিক খাদ্য নয়, নেহাৎ মাত্রে পড়িয়া উহারা নরভুক হইয়া উঠে। শিকারীরা জানে, কারণে বাঘের দাঁত ভাঙিয়া গেলে কিম্বা পায়ে ঘায়ী জখম হইয়া গতিবেগ হ্রাস হইলে তাহারা হরিণ ধরিতে পারে না, তখন বাধ্য হইয়া নরভুক হইয়া পড়ে। সকল সময় বাঘ এখনও মানুষ খায় না। এই বাঘিনীর যদি শারীরিক কোনও অসামর্থ্যের জন্যই নরভুক হইয়া থাকে, তবে সে কেবল স্ত্রীলোক ধরিয়া খাইবে কেন? তাছাড়া, তিন মাইল পরিধির মধ্যে আরও পাঁচখানা গ্রাম আছে, সেগুলি ছাড়িয়া একান্তভাবে এই গ্রামের উপরেই তাহার নজর কেন?

গ্রামের অনেকেই বাঘিনীকে চক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে খোঁকাইতে দেখে নাই। বাঘিনী বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবতী। সে কখনও জঙ্গলে ঢেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়, কখনও বিদ্যুতের পটভূমিকায় রেখার ন্যায় নিমেষে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে অদৃশ্য হয়। সুতরাং সে যে খাদ্যাভাবে কাতর হইয়া পড়ে নাই, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এই কাহিনীর, এটা বাঘিনী—বাঘ নরভোজন-প্রবৃত্তির কী করিয়া বুঝিব? ইহার সদুত্তর কেহ দিতে পারিল না, কিন্তু অল্পবয়সী তরুণ যুবক লোধি বাঘ ফিরাইয়া বৃক্ষতলস্থ ছোকরার পাশে চলিয়া আসিল।

আমিও চকিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। তাহার মুখের কোনও ভাবান্তর নাই, সে তেমনি একাগ্র নির্নিমেষ চক্ষে আমার পানে চাহিয়া আছে। সমবয়স্কের হাসির ইঙ্গিত তাহার কানে পৌঁছিল কি না সন্দেহ।

অপরাহ্ণের দিকে গ্রামবাসিরা একে একে যে যার কাজে চলিয়া গেল, কেবল ছোকরাটি গাছের তলায় পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল। স্নান একেবারে শুষ্ক হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল,—'সাহেব, বাঘিনীকে মারিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আছে কি? উহাকে কোনও উপায়ে তাড়াইয়া দেওয়া যায় না?'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম,—'তাড়াইয়া দিলে আবার আসিবে। আমি তো চিরকাল এখানে থাকিয়া বাঘ তাড়াইতে পারিব না।'

সে আর কিছু বলিল না, খানিকক্ষণ অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

এ পর্যন্ত লিখিলাম, দেখিতেছি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত তাহা বাঘ-মারার গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। পাঠক নিশ্চয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিতেছেন বাঘিনী কৈ? আমার দুর্ভাগ্য, আমি লেখক নই, শিকারী মাত্র। বাস্তু বিক্রমের উদ্যোগ আয়োজনই দীর্ঘ, আসল হত্যাকাণ্ডটা অতি অল্পই সংঘটিত হয়। তাই বোধহয় আমার কাহিনীতেও উদ্যোগপর্বটাই লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর নয়, এবার চটপট বাঘিনীকে সংহার করা প্রয়োজন।

বলার কথা এই যে, বাঘিনীকে সংহার করিতে আমাকে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে নিচুভূমিতে গ্রামের জলাশয়; প্রথম সেটি আবিষ্কার করিতে গেলাম। দেখিলাম জলের ধারে কে বড় পায়ের দাগ রহিয়াছে—বাঘিনী জল খাইতে আসে। সুতরাং তাহার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই, এইখানেই তাহাকে পাওয়া যাইবে।

জলাশয়টি বেশী বড় নয়; দুই পাশের পাহাড়-ঝরা জল এখানে সঞ্চিত হইয়া একটি কুণ্ড রচনা করিয়াছে। জলাশয়ের একদিকের পাহাড়টা প্রায় খাড়া উর্ধে উঠিয়াছে। আমার তাহি সুবিধা হইল, মাচান বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না; সন্ধ্যার পর ঐ পাহাড়ের গায়ে সমতল হইতে পঁচিশ হাত উঁচুতে একটা ঝুপসি গাছ দেখিয়া তাহার ডালে উঠিয়া পাহারা আরম্ভ করিলাম। এখানে বাঘিনী কোনও ক্রমেই আমার নাগাল পাইবে না, অথচ সে জল খাইতে আসিলে আমি তাহাকে সুস্পষ্টই দেখিতে পাইব। আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চাঁদ ছিল, সুতরাং শেষ রাত্রি পর্যন্ত আলো পাওয়া যাইবে।

শেষ রাত্রি পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল না, দশটার মধ্যেই বাঘিনী আসিল। আমি জীবনে আটটা বাঘ মারিয়াছি কিন্তু এমনও অতর্কিত বাঘ সম্মুখে উপস্থিত হইলে বুকের একটা স্পন্দন বাদ পড়িয়া যায়। দেখিলাম, জলাশয়ের ওপারে একটা কাঁটার ঝাড় নড়িয়া উঠিল, তারপরই বাঘিনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হলুদবর্ণ সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর চাঁদের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে—গতির কি অপূর্ব নির্ভীক স্বাচ্ছন্দ্যতা! বন্য সকল জন্তুর মধ্যেই এমন উগ্র ভয়ানক লাবণ্য আর কোনও জন্তুর নাই।

বাঘিনী তাহিনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপ করিল না। সটান জলাশয়ের কিনারায় দাঁড়াইয়া চকচক করিয়া জলপান করিতে লাগিল। চাঁদ মধ্যগগনে উঠিয়াছে, দেখিবার কোনও অসুবিধা নাই; প্রায় দিনের মতই আলো। আমি নিঃশব্দে বন্দুক তুলিয়া লইলাম। টোটা ভরাই ছিল; লক্ষ স্থির করিয়া সন্তর্পণে সেফ্‌টি-ক্যাচে টিপিলাম। খুট করিয়া একটু শব্দ হইল। অমনি বাঘিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া টিপিলাম—কড়াৎ। বাঘিনী তীব্র একটা হুঙ্কার করিয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠিল, তারপর মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। মিনিট খানেক পরে তাহার ছটফটানি শান্ত হইল।

আমি আরও দশ মিনিট বন্দুক বাগাইয়া অপেক্ষা করিতে বসিয়া রহিলাম, কিন্তু বাঘিনী আর নড়িল না। তখন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া গ্রামে ফিরিলাম। গ্রামের লোকেরা কান পাতিয়াছিল, নিস্তব্ধ নৈশ-বাতাসে বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছিল, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের বাহির হইতে সাহস করিতেছিল না। এখন খবর পাইয়া তাহারা মহানন্দে হৈ-হল্লা সুরু করিয়া দিল। একদল লোক তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মৃতদেহটা আনিতে ছুটিল। গ্রামের মেয়েরা, যাহারা এতকাল নিরাপদ স্থানের চৌকাঠ পার হইতে সাহস করিত না, তাহারা দলে দলে বাহিরে আসিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

যুবকেরা বাঘিনীর মৃতদেহটা বাঁশে ঝুলাইয়া যখন লইয়া আসিল তখন আমার কুটীরের সম্মুখে একটা ধুনী জ্বলিতেছে; গ্রামের লোকেরা পর্বতপ্রমাণ কাঠ জড় করিয়া তাহাতে আগুন দিয়াছে। বাঘিনীর দেহ আগুনের পাশে শোয়াইয়া দিতেই সকলে সেটাকে ঘিরিয়া বসিল। জীবন্ত অবস্থায় যে জন্তুটা গ্রামের যম-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার মৃতদেহটাকে কেহই সম্ভ্রম দেখাইল না।

অতঃপর প্রায় সারারাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিল। কয়েকটা আস্ত ছাগদেহ আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া শূল্য মাংস তৈয়ার হইতে লাগিল। বড় বড় মহুয়ার নির্য্যাস অতি শ্রুত পরীর আঁধারে ঘুনাচক্ষরে লইয়া গ্রাম্যবালাদের নৃত্যগীতানুরাগ অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিল।

গ্রামবাসিদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, শূল্য মাংস এবং মহুয়ারস সেবন করিয়া আমি আগুনের পাশেই কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। উৎসবকারিদের ঢোল-খঞ্জনী প্রভৃতির শব্দের মধ্যেও ক্রমশঃ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, আগুনের আরাম, সার্থকতার নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে এবং উপরন্তু খাদ্যপানীয়ের অলক্ষিত প্রভাবে বোধহয় ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিলাম।

হঠাৎ এক সময় চটকা ভাঙিয়া দেখি, উৎসবকারিরা কখন চলিয়া গিয়াছে, ধুনীর আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রকাণ্ড অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইয়াছে। হাত ঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি তিনটা। আগুন সত্ত্বেও শেষ রাত্রির ঠাণ্ডায় একটু গা শীত-শীত করিতেছিল, ঘরের ভিতর গিয়া শুইব কি না মনে মনে গবেষণা করিতেছি, চোখ পড়িল মৃত বাঘিনীটার উপর। দেখি, একটা মানুষ বাঘিনীর মৃত কোলে লইয়া বসিয়া আছে এবং অত্যন্ত স্নেহভরে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। ভাল করিয়া চক্ষুর জড়তা দূর করিয়া দেখিলাম, সেই ছোকরা। তাহার মুখ সম্পূর্ণ আবরণহীন নয়, চক্ষু দিয়া নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে; প্রিয়জন বিয়োগের নিঃসঙ্গ বেদনা তাহার মুখে অঙ্কিত হইয়াছে।

এই সব একটা উৎকট হাস্যরসাত্মক গল্প বলিয়াই মনে করিতাম যদি না ছোকরার সহিত দ্বিপ্রহরের আলাপের কথা স্মরণ থাকিত। আমি সা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিলাম। ইহার পিছনে একটা গল্প আছে সন্দেহ নাই।

আমি আগিবাহি দেখিয়া সে বাঘিনীর মাথা নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিল। নিজের অন্তর্নিহিত শোক লুকাইবার চেষ্টা করিয়া, ভগ্নস্বরে বলিল,—ওর সঙ্গে আমার বড় ভালবাসা ছিল।'

বলিলাম,—'গল্পটা গোড়া থেকে বল।'

অতঃপর, সে যে-কাহিনী বলিয়াছিল, তাহাই বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতেছি। তাহার নাম রূপদমন, সম্ভবতঃ ত্রিপুরদমনের অপভ্রংশ।

পাঁচ বছর আগে যখন রূপদমনের বয়স বোল বছর ছিল, তখন সে কাটারি লইয়া বনে কাঠ কাটিতে যাইত। ঐ বয়সের ছেলেরা বনের গাছে উঠিয়া গাছের সরু ডালগুলি কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া আসিবে, পরে সেই ডালগুলি গ্রামের মেয়েরা গিয়া বাঁধিয়া আনিবে, ইহাই তাহাদের কাঠ আহরণের রীতি।

ছেলেরা দল বাঁধিয়া দুপুর বেলা কাঠ কাটিতে যাইত, তারপর এগাছ ওগাছ করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। কখনও বা কাঠ কাটা শেষ হইলে তাহারা একত্র হইয়া বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলিত, শেষে সকলে মিলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। একটা মানুষ-খেকো বাঘ সম্প্রতি গ্রামে উৎপাত করিতেছে ইহা তাহারা জানিত। কিন্তু ও বয়সের ছেলেরা ভানপিটে হয়; বাঘের ভয় তাহাদের ছিল না। শিশুকাল হইতে তাহারা বনে বাঘ দেখিয়াছে, বাঘ কখনও তাহাদের অনিষ্ট করে নাই। বাঘ দেখিলেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; তাহা হইলে বাঘ আর কিছু বলে না, ধীরে ধীরে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ইহাই বনের শিক্ষা।

একদিন লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে রূপদমন একটি ভারি সুন্দর লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইয়াছিল। কতকগুলা বড় বড় পাথরের চাঁই এক জায়গায় ঘাড়ে মুণ্ডে হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে মাটি খাড়িয়া ভিতরে ঢোকা যায়। ভিতরে ছোট একটি কুঠরীর মত স্থান, উপরদিকে কয়েকটা ফোকর। আলো কিছু তাহাদের চারিপাশে কাঁটার ঝাড় এত ঘন হইয়া জন্মিয়াছে যে আকাশ দেখা যায় না। এইখানে সবুজ আলোর ভরা নিভৃত আশ্রয়টিতে রূপদমন লুকাইয়াছিল। সেদিন তাহার খেলার সাথীরা তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই।

অনেকক্ষণ একলা বসিয়া বসিয়া রূপদমন ঝিমে ঝুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া কখন চলিয়া গিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

ঘুম ভাঙিল মুখের উপর খাঁড়াশো একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শে এবং সেইসঙ্গে কাণের কাছেই বহু গভীর ঘড় ঘড় শব্দে। রূপদমন একটা পাথরে ফোকর দিয়া ঘুমাইয়াছিল, চোখ মেলিয়া দেখিল চোখের সামনেই একটি বাঘের মাথা! মুহূর্তে সব সে চাহিয়া আছে। বাঘিনী ঠিক তাহার পাশে আসিয়া

বসিয়াছে এবং হিংস্র প্রখর দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার গলা দিয়া একটা অদ্ভুত আওয়াজ বাহির হইতেছে—গর্‌র্‌র্‌র্‌।

বাঘের এতটা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রূপদমন আর কখনও লাভ করে নাই। সে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার শরীরের স্নায়ু পেশী এমন পরিপূর্ণ ভয়ে শিথিল হইয়া গেল যে মনে হইল সে আর কোনও কালেই হাত-পা নাড়িতে পারিবে না। তাহার পেটের ভিতরটা কেবল ফাঁপিয়া ফুলিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সাড় ফিরিয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বোধকরি একটু নড়িয়াছিল, বিদ্যুৎবেগে বাঘিনী থাবা তুলিল। সেই থাবার একটি থাবড়া খাইলে রূপদমনের মাথাটি বোধকরি পচা ডালের ডিবের মত ভাঙ্গিয়া যাইত; কিন্তু থাবা শূন্যে উদ্যত হইয়াই রহিল, বাঘিনী রূপদমনও সম্মোহিতের মত থাবার পানে তাকাইয়া রহিল।

থাবার কাছে খুন-রক্ত মাখানো রহিয়াছে। রূপদমন দেখিল, বাঘিনীর পুরু চামড়ার ভিতর কয়েকটা বড় বড় শজারুর মত কাঁটা এদোঁড় ওদোঁড় বিঁধিয়া রহিয়াছে। সেইদিকে তাকাইয়া রূপদমনের ভয় কাটিয়া গেল; সে বুঝিতে পারিল কেন বাঘিনী মানুষ মারিয়া তাহার মাংসটি ভক্ষণ করিতেছে নাই—নিজের বেদনার ভয় তাহাকে নিরস্ত করিয়াছে।

কাহারও গায়ে কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে তাহা টানিয়া বাহির করিবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকিবার কথা। মনস্তত্ত্ববিদেরা একথা জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার শিকারী-জীবনে আমি ইহা অনেকবার লক্ষ করিয়াছি। কাহারও শরীরে কাঁটা বিঁধিয়া আছে দেখিলেই হাত নিস্‌পিস্ করিতে থাকে এবং সেটা টানিয়া বাহির না করা পর্যন্ত প্রাণে শান্তি থাকে না।

রূপদমন আস্তে আস্তে বাঘিনীর থাবার দিকে হাত বাড়াইল। বাঘিনী তাহাকে তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এবার তাহার নড়াচড়ায় বিশেষ আপত্তি করিল না। কেবল তাহার গলার গর্‌র্‌র্‌ একটু গাঢ় হইল এবং ঘুষখানা ঈষৎ উদ্যত হইয়া ভয়ঙ্কর দাঁতগুলাকে প্রকট করিয়া দিল।

কিন্তু থাবাটিতে হাত পড়িতেই বাঘিনীর কণ্ঠ হইতে এমন একটি ভয়ঙ্কর গর্জন বাহির হইল যে মনে হইল বাঘিনী এখনি রূপদমনকে সত্যসত্যই ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য! বাঘিনী তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল না; যে থাবাটা চুম্বিতের জন্য সরাইয়া লইয়াছিল তাহা আবার পূর্বমত তুলিয়া ধরিয়া রহিল। বাঘিনী মনে মনে কি বুঝিয়াছিল বাঘিনীই জানে, কিন্তু আমি এই প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলেটার দুর্জয় সাহস ও অসীম পরাক্রমের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

বাঘিনীর গায়ে রক্ত দেখিয়া রূপদমন হাত টানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে আবার সন্তর্পণে হাত বাড়াইল। প্রথম কাঁটা বাহির করার সময় বাঘিনী গর্জন করিয়া রূপদমনকে থাবার এক আঘাতে কাবু করিতে গেল কিন্তু শেষ মুহূর্তে কাঁধের বলে তাহার গাল চাটিয়া দিল। বেদনায় উহার মত জিভের ঘর্ষণে রূপদমনের গাল আরও ছড়িয়া গিয়া কিন্তু পরবর্তী মানব হুঁ শব্দটি করিল না। অতঃপর বাঘিনী কেন

নিজের সকলাত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিবার জন্যই রূপদমনের সর্বাঙ্গ চাটিতে আরম্ভ করিল। এই অবসরে রূপদমনও কাঁটাগুলি একে একে বাহির করিল। কাঁটাগুলি সাধারণ উদ্ভিদ কাঁটা নহে, সজারুর কাঁটা। বাঘিনী বোধ হয় কোনও সজারু মারিয়া সদ্ব্যবহার করিতে গিয়াছিল, ইহা সেই অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

কাঁটাগুলি সব বাহির হইয়া গেলে, বাঘিনী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটু সরিয়া গিয়া গলার মধ্যে গরগর শব্দ করিতে করিতে ক্ষতস্থান চাটিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, কোটরের আর বড় কিছু দেখা যাইতেছিল না, কেবল বাঘিনীর চোখদুটা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রূপদমন আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া কোটর হইতে বাহিরের দিকে চলিল, বাঘিনী চোখ ঘুরাইয়া দেখিল কিন্তু বাধা দিল না। বাহিরে আসিয়া রূপদমন এক দৌড়ে গ্রামের দিকে রওনা হইল। ছুটিতে ছুটিতে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল বাঘিনী কোটরের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গলা উঁচু করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে সে আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল রূপদমন বুঝিল ঐ দেনাটা বাঘিনীর বাসস্থান, লুকোচুরি খেলিতে গিয়া সে বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল!

সেই রাত্রে রূপদমনের তাহার দিয়া [illegible] আর তিনচার দিন রহিল; তারপর সে সারিয়া উঠিল।

দিন দশেক পরে রূপদমন জ্বালানি কাঠ কাটিতে গেল। সঙ্গিসাথীদের বাঘিনীর কথা বলিয়াছিল, কেহ বিশ্বাস করিয়াছিল কেহ করে নাই। কিন্তু বনের ওদিকটাতে আর না যাওয়াই ভাল এবিষয়ে সকলেই একমত হইল। রূপদমনও প্রথম দিন অন্য সকলের সহিত রহিল, ওদিকে গেল না।

দ্বিতীয় দিন বনের ঐ দিকটা তাহাকে টানিতে লাগিল। সে সঙ্গীদের এড়াইয়া ঐ দিকে চলিল। আগুন লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন, যে-বিপদের সহিত উত্তেজনা জড়িত আছে তাহার লোভ সে ছাড়িতে পারে না।

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার গতি আপনিই হ্রাস পাইল, পা আর চলে না। তাহার অবস্থা অনেকটা নবীনা অভিসারিকার মত। আর অগ্রসর হইবে না ফিরিয়া যাইবে তাহাই ভাবিতেছে, তোলাপাড়া করিতেছে এমন সময় পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সড়সড় শব্দ শুনিয়া চমকিয়া সেইদিকে ফিরিয়া দেখিল, কিছুই দেখিবার প্রয়োজন নাই, বাঘিনী নিজেই আসিতেছে। বাঘিনী এবার খোঁড়াইতেছে না, অক্ষত সাবলীল পাদক্ষেপে বিদ্যুৎগতিতে তাহার দিকেই আসিতেছে।

রূপদমন কাঠের পুতুলের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বাঘিনী ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া লেজ চইয়া বসিল। চাক্ষিকুর নিষ্পলক বিস্ময় অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। বাঘিনীর স্ট্রাক্ষির ডগাটি একটু একটু নড়িতেছে, গলার ঘুরুর আওয়াজ হইতেছে; বাঘিনী এখনও রূপদমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। রূপদমন আর পারিল না, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

বাঘিনী জিভ বাহির করিয়া পায়ের তাহার মুখ চাটিয়া লইল, তারপর থাবাটি চিৎ করিয়া তাহার

কোলের উপর রাখিল। রূপদমন দেখিল, ঘায়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, কা'র চামড়ার উপর কয়েকটা দাগ আছে মাত্র।

এইরূপে বাঘিনীর সহিত রূপদমনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ইহাকে বন্ধুত্ব বলিব কিনা অন্য কিছু বলিব বুঝিতে পারিতেছি না। যাহোক, রূপদমনের মুখের কথাই খানিকটা তুলিয়া দিতেছি—

—'সাহেব, মানুষে মানুষে ভালবাসা হয়, কিন্তু বাঘের মন এমন ভালবাসতে কেউ পারে না। কুকুরের সঙ্গেও মানুষের ভালবাসা হয়, সে অন্য কথা, সেখানে মানুষ প্রভু, কুকুর তার অধীন। এখানে কিন্তু তা নয়; মানুষ আর বাঘ সমান সমান কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়।

তিনটি বছর আমি বাঘিনীর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি জানি, এ তিন বছরের মধ্যে এমন দুদিন যায় নাই যেদিন আমাদের দেখা হয় নি। আপনি শিকারী, অনেক বাঘ মেরেছেন কিন্তু বাঘের সঙ্গে পরিচয় আপনি জানেন না। অমন মৈত্রীর ইচ্ছা আর নেই। পৃথিবীতে যদি কেউ তো সে বাঘ।

'আমরা দুজনে দুজনকে কি ক'রে এত ভালবেসে ফেলেছিলুম তা জানি না; একদিন দেখা না হলে আমাদের মন মানত না। আমার সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে সে গ্রামের মানুষ গরু ছেড়ার ওপর উৎপাত করা ছেড়ে দিয়েছিল; গ্রামের দিকেই আর যেত না, বনের শম্বর পাহাড়ী ছাগল মেরে খেত। কিন্তু কোন কারণে যদি আমি একদিন বনে না যেতে পারতুম তাহলে রাত্রে বাঘিনী গ্রামে আসত—গ্রামের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত আর ডাকত। আমি ঠিক বুঝতে পারতুম আমাকে ডাকছে। একবার কয়েক দিনের জন্যে অসুখে পড়েছিলুম, সে রোজ রাত্রে এসে আমাকে ডাকত। গাঁয়ের লোকেরা আগুন জেলে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তাকে তাড়াতে পারত না।

'অসুখের পর যেদিন প্রথম বনে গেলুম সে তার কী আনন্দ! আমার গা চেটে চেটে গায়ের ছাল তুলে দিলে। আপনারা মনে করেন বাঘ হাসতে জানে না, সেটা আপনাদের ভুল। বাঘ হাসতে জানে। শুধু হাসতেই জানে না—ঠাট্টা করতে জানে, ঠাট্টা করলে বোঝে। আমার সঙ্গে ওর এক ঠাট্টা ছিল, আমাকে ভয় দেখানো। হঠাৎ গর্জন ছেড়ে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ত। কিন্তু আশ্চর্য, ওর একটা নখের আঁচড় কখনও আমার গায়ে লাগেনি। প্রথম প্রথম আমার ভয় করত; তখন বাঘিনী আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে গিয়ে বসত, মিটমিট ক'রে আমার পানে চাইত আর হাসত।

'দুপুর বেলা আমি বাঘিনীর গুহায় যেতুম। যেদিন সে শীকার সেদিন দুজনে মিলে খেলা করতুম। কী খেলা? কত রকম খেলা; লাফালাফি হুড়োহুড়ি—লুকোচুরি! বাঘেরা লুকোচুরি খেলতে জানে। যেদিন সে থাকত না সেদিন আমি গুহায় শুয়ে ঘুমোতুম; বাঘিনী এসে আমার পাশে শুতো, আমার বুকের ওপর থাবা তুলে দিয়ে ঘুমোত। এমনি ভাবে কতদিন যে আমরা ঘুমিয়েছি তার ঠিক নেই।

'একদিন আমি এর জন্যে একগলা কাঁসের মত কিনে নিয়েছিলুম, খেয়ে রাখি গুণে।

পরদিনই আমার জন্যে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ী ছাগল মেরে এনে হাজির। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি যে ওটা আমার জন্যেই এনেছে। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়ল না; কাঁধে তুলে নিয়ে ছাগলটা গাঁয়ে নিয়ে গেলুম। গাঁ সুদ্ধ লোক ভোজ খেলে।'—

এই ভাবে তিন বৎসর কাটিয়াছিল। আরও কত বৎসর কাটিত বলা যায় না যদিনা আর একটা ঘটনা ঘটিয়া বাসিনীর চরিত্রের আর একটা দিক প্রকট করিয়া দিত। রূপদমনের বয়স যখন উনিশ বছর তখন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। রূপদমনের মা-বাপ ছিল; এ কাহিনীতে তাহাদের কোনও অংশ নাই বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করি নাই।

বিবাহ হইবে বন বাইশ দূরের একটি গ্রামে। বিবাহ সম্বন্ধে রূপদমনের মনের ভাব কিরূপ ছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই, সম্ভবতঃ তাহার কোনও মতামতই ছিল না। এই বয়সে সকলেরই বিবাহ হয়, বাপ-মা সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ দেয়, ছেলে বিবাহ করে। রূপদমনের বিবাহও তেমনি একটা পারিবারিক ঘটনা।

যথাসময় বরবেশ পরিয়া কাঁসি বাঁশি ও ঢোলের সমারোহ করিয়া শুটিদশবারো বরযাত্রী সহযোগে রূপদমন বিবাহ করিতে গেল। মেয়ের গ্রাম বন বাইশ দূরে হইলে কি হয়, যাইতে-আসিতে তিন দিন লাগে। হাঁটিয়াই বিবাহ করিতে যাইতে হয়; যান-বাহনের ব্যবস্থা নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে কয়দিন রূপদমন বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের বাহিরে ছিল, সে কয়দিন রাত্রে বাসিনী গ্রামে তাহার খোঁজ লইতে আসে নাই বা ডাকাডাকি করে নাই। ইহা হইতে অনুমান হয়, রূপদমনের যাত্রাকালেই বাসিনী জানিতে পারিয়াছিল যে সে বাহিরে যাইতেছে—হয় তো [illegible] তাহাকে বাজনা বাজাইয়া সাজোপাজ লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল—এবং অলক্ষিতে বরযাত্রীদলের পিছু লইয়াছিল। বাসিনী রূপদমনের অনুসরণ করিয়া ও-গ্রামে গিয়াছিল এবং ফিরিবার পথেও সবধূ রূপদমনকে লক্ষ্য করিতে করিতে আসিয়াছিল। ইহা অনুমান হইলেও পরবর্তী ঘটনায় তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

চতুর্থ দিন অপরাহ্নে রূপদমন নববধূ লইয়া বাড়ী ফিরিল। গ্রামে ঢুকিতে আর সোয়াটাক রাস্তা আছে, বাজনদারেরা সুমধুর বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বিকট গর্জন ছাড়িয়া বাসিনী ঝোপঝাড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া বরযাত্রীদলের ঠিক সম্মুখে বাঘ পাড়িয়া বসিল। রূপদমন দেখিল বাসিনীর রক্তবর্ণ চোখদুটা আগুনের গোলার মত জ্বলিতেছে, গোঁফের সবাদ দিয়া যেন বিদ্যুতের শিখা বাহির হইতেছে। বাসিনীর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা সে আগে কখনও দেখে নাই; তাহার পায়ার মত উদ্যত চোখদুটা একবার রূপদমন ও একবার তাহার বধূর উপর তড়িদ্বেগে যাতায়াত করিতেছে। সে আর একবার গর্জন ছাড়িল; বন্য হইল, ক্রোধে হিংসায় সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল; বাজনদারেরাও নীরব হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেহ ভয় পাইয়া এদিক ওদিক পালাইবার চেষ্টা করে নাই। একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকাই যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তাহা তাহারা জানিত। রূপদমন সম্মুখেই ছিল, তাহার অব্যবহিত [illegible]

হইল দল ছাড়িয়া বাঘিনীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বাঘিনীর মূর্তি দেখিয়া তাহার ভয় হইল, সে বুঝিল শান্ত বাঘিনী তাহাকে হাতের কাছে পাইলে মারিয়া ফেলিবে—তাহার সমস্ত ভালবাসা মারাত্মক হিংসায় পরিণত হইয়াছে। রূপবন পা বাড়াইতে সাহস করিল না। পা না বাড়াইবার আর একটি কারণ ছিল, সবযূ ভয় পাইয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

বাঘিনী সেদিন বোধহয় তাহাদের ছাড়িত না, দলের মধ্যে হইতেই দাঁড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এই সময় বাধা পড়িল। গাঁয়ের লোকেরা বাজনার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া হল্লা করিতে করিতে বরযাত্রকে আগাইয়া লইতে আসিতেছিল। বাঘিনী পিছন দিকে মানুষের কলরব শুনিতে পাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; সুযোগ বুঝিয়া বরযাত্রীদলের বাজনাদারেরাও সজোরে বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বাঘিনী আর পারিল না, ব্যর্থ আক্রোশে দুইবার লাফ আছড়াইয়া গরজাইতে গরজাইতে পাশের জঙ্গলে গিয়া ঢুকিল। যাইবার আগে নরদম্পতির প্রতি যে-অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল তাহার সরল অর্থ বুঝিতে রূপবনের কষ্ট হইল না।

পরদিন বাঘিনী বনে কাঠাহরণরতা একটি স্ত্রীলোককে মারিল। দ্বিতীয় দিন আর একটি। এই ভাবে আরম্ভ হইয়া বাঘিনীর প্রতিহিংসা যেন প্রায়ই সুন্দর নারীজাতির উপরেই সংকলিত হইল। মেয়েদের ঘরের বাহির হওয়া বন্ধ হইল।

এইভাবে দেড় বৎসর কাটিয়াছে। রূপবনের স্ত্রীকে মারিবার চেষ্টাতেই হয়তো বাঘিনী সম্মুখে যে স্ত্রীলোককে পাইয়াছে তাহাকেই বধ করিয়াছে; কিন্তু তাহার ঈর্ষাবিষাক্ত হিংসা তৃপ্ত হয় নাই। রূপবনের বিশ্বাস বাঘিনী যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তাহার স্ত্রীকে না মারিয়া ছাড়িত না।

* * * * * *

পরদিন দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া চলিয়াছি।

প্রথম পাহাড়ের ওপার উঁচুতে পিছু ফিরিয়া তাকাইলাম। নিম্নে উপত্যকার প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে প্রায়দিন রৌদ্র উপভোগ করিতেছে আর তাহার ভয় নাই, এখন হইতে গ্রামের মেয়েরা নির্ভয়ে বনে কাঠ কুড়াইতে যাইবে, জলাশয়ে জল আনিতে যাইবে। গ্রামের সহজ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আবার আরম্ভ হইবে। রূপবনের বধূ বোধহয় স্বামীর দুখের পানে চাহিয়া প্রথম বন খুলিয়া হাসিবে। কিন্তু রূপবনের মনের কাঁটা কখনও দূর হইবে কি?

এই গ্রামে, নরসমাজ হইতে একান্ত বিজনে, জঙ্গল ও পাহাড়ের আদিম বাতাবরণের মধ্যে, একটি স্বভাব-হিংস্র পশুর সহিত একজন মানুষের প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। বার্কালের মারক-বিষাক্ত অস্ত্রের সহিত কৌশলী মানুষের লোকদেখানো দুশমনী নয়, সত্যকার অকৃত্রিম ভালবাসা। এবং অকৃত্রিম বলিয়াই বোধহয় শেষে উহা এমন ভয়ানক রূপধারণ করিয়াছিল।

অনেকে এ কাহিনী বিশ্বাস করিবেন না। মানি, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এতই কি অসম্ভব? নিজের কথা বলিতে পারি, আমি রূপবনের গল্প অবিশ্বাস করিতে পারি নাই।

সতলা

সুবোধ বসু

[যে-কোন নারী,...গল্পলেখক তাঁর নাম দিয়েছেন মনোরমা চৌধুরী স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্... বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কাছাকাছি...হাঁটাচলায় গাম্ভীর্য্য, মুখের রেখায় রুক্ষতার আভাস, চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত ও বিরক্ত...ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এই চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য্যের ফলে তিনি আজ নিজেকে অন্য সব মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র মনে করেন—যে-স্বাতন্ত্র্য আজ তাঁর চারিদিকে এমন একটা সম্মানিত একঘ'রের প্রাকার রচনা করেছে যে, তার দুর্ভেদ্যতার আড়ালে তিনি মনে করেন তিনি পরম নিবিঘ্নেই আছেন...এমন সময় সেই একাকিত্বের দুর্গ ভেদ করে এলো এক নামহীন পত্র লেখকের সকরুণ প্রেম-পত্র...দুর্গের অভ্যন্তরে সুরু হলো মহা-বিপর্য্যয়...কিন্তু তার পরিণতি ?]

মনোরমা চৌধুরী কেলী গার্লস স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্। মেয়েদের বয়সবিচার কঠিন কর্ম, কিন্তু বয়সের উল্লেখ শুধু কঠিন নয়, রীতিমত বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও তাঁর বয়সকে ত্রিশ বত্রিশের কোঠায় ফেলা যায়। স্বাস্থ্যবান শরীর যেন আঁটসাট, লম্বায় মাঝারি ধরণের, দেহবর্ণ শ্যাম ও উজ্জ্বল শ্যামের মধ্যবর্তী। হাঁটাচলায় গাম্ভীর্য্য, মুখের রেখায় রুক্ষতার আভাস, চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং কিছুটা বা বিরক্ত। পোষাকে পারিপাট্য নাই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। সাদা ব্লাউসের হাতা কনুই পর্য্যন্ত লম্বা; সাদা চাকাই বা শান্তিপুরী শাড়ি পরাই অভ্যাস, অপ্রচুর চুলে রোগা করিয়া বেণী বাঁধা।

ভাল শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মনোরমা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। তাহার এখানকার চাকরির পাঁচ বৎসরে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কুলের ছাত্রীদের একজন জেনারেল স্কলার্সিপ ও চারজন মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট জলপানি পাইয়া স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। শৃঙ্খলার উপর তার কড়া দৃষ্টি; মেয়েরা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিলেও এই সকল বিভিন্ন কারণে কমিটির কাছে মনোরমার খুবই আদর। বেতনও টাকা মাহিনা পাইয়া পাঁচ বৎসরে আড়াইশো টাকা হইয়াছে।

এ হেন ভাসভারী এবং সম্মানিত মহিলার কাছে যদি ডাকযোগে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের কাছ হইতে এক প্রেমপত্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? মনোরমা প্রেমপত্র পাইয়াছেন। আদ্যোপান্ত পড়িয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রায় বিরাম অসম্ভব রকম ঝাঁকুনি খাইয়া অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাও কি সম্ভব? জীবনের ত্রিশ বৎসরেরও বেশী কাল তাহার জীবনে এমন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে নাই। পাড়ার যে সব ছেলেরা মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাইবার সময় সজীব হইয়া উঠিয়া দৃষ্টি

আকর্ষণ করে, যাহারা শিষ্ট বেশ বা নির্ব্যাজিক রসিকতা করে, তাহারা পর্য্যন্ত মনোরমার গাম্ভীর্য্যের সম্মান করিয়া সভয়ে দূরে থাকিয়াছে। কলেজে সহপাঠী ছাত্রদের সম্পর্কে মনোরমাকে আসিতে হইয়াছে। ছেলেরা তাহাকে নোট বা বই ধার দিয়া সাহায্য করে নাই, এমন নয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; কেহ তাহার সহিত প্রয়োজনের ছুতা করিয়া বাসা পর্য্যন্ত আসিয়াছে বা ট্রামে অকারণে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে, এমন কি, খামোখা অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া একটু বেশীক্ষণ গল্প করিয়াছে, এমনও মনোরমা মনে করিতে পারে না। অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে ইহার বহু ব্যতিক্রম মনোরমা লক্ষ্য করিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাতে সে সঙ্কুচিত কিছুটা ক্ষুণ্ণই বোধ করিত; কিন্তু তাহা অল্পদিনের জন্য মাত্র। শীঘ্রই তাহার এই দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গেল। স্ত্রী পুরুষের এইরূপ সহজ মেলামেশাকে সে বিসদৃশ মনে করিতে শিখিল; আর সহজ লভ্য নহে বলিয়া নিজের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। তাহাকে সহপাঠীরা যে সমীহ করিয়া চলে ইহা তাহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূল্য সার্টিফিকেট বিক্রেতা করিয়া অন্য মেয়েদের অপেক্ষা নিজেকে যে উঁচু সরের মনে করিল।

পড়া সমাপ্তির পর কিছুকাল একটা অনিশ্চিত অবস্থা গিয়াছে। কি তাহার জীবনের আদর্শ, এইবার কি করিবে, কি সে হইতে চায়, কিছুই স্থির হয় নাই। নিজের অভিরুচি এমন স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই বা ব্যক্তিত্ব এমন সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই যে, নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইতে পারে। এই সময় বাপ-মা বাপমায়ের রীতি অনুসারে মেয়ের বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। মনোরমা বড় রকম কোনও আপত্তি করে নাই। অপরিচিত এক ব্যক্তির স্ত্রী হইয়া তাহার সহিত বাসা-বাঁধা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার মনে হয় নাই। আর পাঁচজন মেয়ের মতো স্ত্রী হইয়া, মা হইয়া সে ও এতদিনে গৃহের গর্ব্ব করিত। কিন্তু তাহার ভিতরকার সন্ধানী মানুষটি আঘাত পাইয়া বেকিয়া বসায় সে সম্ভাবনা পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের ব্যাপারে ক্রমে যেখান হয়, পছন্দ অপছন্দ হয়, কথা বহুদূর অগ্রসর হইয়া ভাঙিয়া যায়, এমন কি কথা স্থির হইয়াও উলটাইয়া যাইতে পারে। হিন্দুবিবাহ বিবাহে পাত্রী-নির্ব্বাচনের এই প্রথাকে না মানিয়া লইয়া আর উপায় কি? কিন্তু এই ধরণের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মনোরমার অভিমান আগ্রত হইল। বহু পক্ষের তাহাকে অপছন্দ হইল, রং কেহার, নয় উচ্চশিক্ষা অথবা বয়সের জন্য। অতঃপর চেষ্টা বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল সেটাও হয় শেষ মুহূর্ত্তে বিগড়াইয়া গেল, ছেলের মেয়ে পছন্দ হয় নাই বলিয়া।

ইহার পর মনোরমাকে আর কিছুতেই নূতন কোন পাত্রপক্ষের সম্মুখে বাহির করা যায় নাই। তাহার অভিমানী সম্মানবোধ বিদ্রোহ করিয়াছে; নূতন অপমানের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সে ক্রমে ভিতরে এবং বাহিরে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গৃহ অপেক্ষা স্বাধীনতাই যে অধিক কাম্য নিজের কাছে বারবার এই কথা সম্মোহন-মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করিয়াছে।

পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিকের শিক্ষয়িত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। দু তিন বার স্কুল পরিবর্ত্তন করিবার পর ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। অতঃপর বয়স, অভিজ্ঞতা, সাহস এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইলে বাংলার বাহিরে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ পাইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করে।

ইহার পাঁচ বৎসর পরে, যৌবন যখন শেষ বসন্তের মতো ক্রমে ক্রমে পাতা ঝরাইতেছে, স্বপ্নের

যৌবন-রেখা এবং রূপের স্বর্ণ রশ্মিতে রূপান্তর লাভ করিয়াছে, চাপল্যকে যখন অমার্জনীয় মনে হয়, তখনই তরুণ চারিদিকে ছুটোছুটি স্বর্গ রচনা করিয়াছে। তখন শিক্ষয়িত্রী মনোরমার নিকট অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ হইতে অত্যন্ত আপত্তিজনক আত্মীয়তার ভঙ্গিতে লেখা প্রেমপত্র আসিয়া পৌঁছিল!

লেখক বাঙালী ক্লাবের বার্ষিক উৎসব সভায় মনোরমাকে প্রথম দেখিয়াছেন। উভয়েই পরিচিত এক মহিলার কাছ হইতে তাহার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিলেন; অতঃপর একাধিক বার মনোরমার সহিত আলাপের তাহার সুযোগ হইয়াছে। তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন; তাহার স্বপ্নের মধ্যে অবিরত মনোরমার যাতায়াত চলিয়াছে। তিনি অপাত্র বা অভদ্র নহেন, মনোরমা যদি উপরের ঠিকানায় পত্র লেখেন, তবে তিনি সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তখন মনোরমা তাহাকে অপরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিবে; তৎপূর্বে তিনি তাহার প্রকৃত নাম গোপন রাখিতেছেন। একটা সুযোগ কি মনোরমা তাহাকে দিবেন, না? ইহাতে মনোরমার কি ক্ষতি হইবে?

স্পর্ধা দেখিয়া মনোরমা হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। এমন স্পর্ধা তাহার কল্পনাতীত। শুধু তাহার নতুন আলাপিতদের কথা একে একে সে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার বিশেষ পদাধিকারের দরুণ বহু লোকের সহিতই তাহার কমবেশী আলাপ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কে এমন অসম্ভব এবং অনুচিত রসিকতা শোভন করিতেছে? কে সে? বহু সম্ভব-অসম্ভব মুখ তাহার কল্পনার আলোকের সমুখ দিয়া ছায়া চিত্রের ছবির মতো মিছিল করিয়া গেল।

মনোরমা কাহাকেও নির্দিষ্ট করিতে পারিল না। মুগ্ধ পুরুষের দুর্বলতা আবিষ্কারে সে অভ্যস্ত নহে। অতি সহজ এবং নির্লিপ্ত ভাবেই সে এখন অপরিচিত যুবাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিতে পারে; কোনও সঙ্কোচ, কোনও অনাবশ্যক স্নায়ু-স্পন্দন কোনও ক্ষেত্রেই আর অনুভব করে না। কিন্তু পত্রের এই নির্লজ্জ দুঃসাহসে সে বিচলিত হইয়া উঠিল; যেন নিজের কাছেই লজ্জা করিতে লাগিল।

মনোরমা চকিতে প্রসাধন-মুকুরে নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা দিয়াছে; মুখের বর্ণ অস্বাভাবিক উজ্জ্বলিত, ঈষৎ কোলা গণ্ডদেশ যেন আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরমা চিঠিটা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এত বড় আস্পর্ধা! মনোরমা যেন মেয়ে নয়। তাহার ব্যক্তিত্ব আছে, চরিত্রের দৃঢ়তা আছে, গাম্ভীর্য আছে, তাহা কি কাহারও চোখে পড়ে নাই? তবে কোন্ দুঃসাহসে সে এমন পত্র লিখিতে পারিল?

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং ছাত্রীরা ইহার দুইদিন পর পর্যন্তও মনোরমার কিছুটা অন্যমনস্কতা, কিছুটা বা অতিরিক্ত বিরক্ত ভাব লক্ষ্য করিল, কিন্তু ইহার দরুণ বিশেষ কোনও অনর্থ না ঘটায় তাহারা

বসিয়াই সে বৈকালিক চা পান করে। কোনও কোনও দিন পাশের বাড়ি হইতে মিসেস্ নরকার বা মিসেস্ চৌধে বেড়াইতে আসেন বা স্কুলের কোনও খিদমতগার গল্প করিতে আসেন। কিন্তু অধিকাংশ দিনই তাহাকে নিঃসঙ্গ বসিয়া কাটাইতে হয়; গায়েপড়া আত্মীয়া চা পরিবেশন করিয়া গৃহকার্যে চলিয়া যায়। মনোরমা একা বসিয়া চা পান করে, হয়তো ফুলের গেটের কাছ ঘেঁষিয়া দু' পাঁচবার পায়চারি করিয়া আসে, আবার ফাঁকিয়া ফেরাবে বসে। সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া উঠে, আকাশে তারা দেখা দেয়, নিস্তব্ধ পাড়াটা আরও নিস্তব্ধ হইয়া উঠে; বাঙালী কোনও প্রতিবেশীর বাড়ি হইতে হারমোনিয়ম বা শাঁখের শব্দ উত্থিত হয়। মনোরমা ক্লান্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আয়া পড়া-কামরার আলো জ্বালাইয়া দিয়াছে, মনোরমা অবশ্য তাবে সেই দিকে যাত্রা করে।

আজও উঠিব উঠিব করিতেছে, এমন সময় দারোয়ান আসিয়া খবর দিল, দেখা করিতে এক বাবু আসিয়াছেন। গেটের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।

মনোরমার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এ সব নিতান্ত পরিচিত ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির আসিবার কথা নহে। কিন্তু বিশেষ চেনা কেহ আসিলে সে গেটের কাছেই বা পাঠাইয়া থাকিবে কেন? অন্যত্র দারোয়ান বাবুদের দিকে অবশ্যই আগাইয়া আসিত। নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই মনোরমা সতর্ক হইয়া উঠিল; এত বড় নির্লজ্জ পত্র যে লিখিতে পারে, তার পক্ষে কোনও একদিন সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া বিচিত্র কি? ভৃত্য এবং দারোয়ান ছাড়া বাড়িতে অন্য পুরুষ নাই। এ খবরটা নিশ্চয়ই এমন দুঃসাহসী অপত্র লোকের কাছে অজানা নাই!

'বাবু! কৌন্ বাবু?'

'হাম্ তো পহচানে নেহি, মেমসাব।' হিন্দুস্থানী দারোয়ান সবিনয়ে জানাইল। 'কার্ড ভি দিয়া নেহি, হুজুর। উসনে সির্ফ কহা, মেমসাবকা সেলাম দো ও, মাঈ বংগালী হ্যঁ।'

'কোই বাৎ নেই? উনকো কহ্ দেনা, আভ্ ভেট্ হো নেহি সকতা।'

'জী হুঁজুর।' বলিয়া দারোয়ান ফিরিল।

'শুনো।'

'জী হুজুর' প্রহরীসুলভ দারোয়ান সসম্ভ্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'ক্যায়সা বাবু?'

'উমর জ্যাদা নেহি; মগর লম্বা ঔর গোরা। বংগালী জরুর হোবে, ধোতি ঔর কান্ধিমে পিন্হা হায়।'

এইরূপ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সহিত এমন অসময়ে দেখা করা মনোরমার রীতি নহে। বিবিধ কার্ড এবং পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানাইলেও সে অপরিচিত বা অল্প পরিচিতদের সহিত এক তোর বেলা ছাড়া অন্য সময় দেখা করে না, ইহার তো সে কোনওটুকুও নাই। তবু 'বাঙালী' এই পরিচয়ে এমন সময় অপরিচিত এক মহিলার সহিত দেখা করিতে আসা কম দুঃসাহসের নয়! তবে কি এ সত্যই সেই ব্যক্তি? মনোরমার সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল। নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরের মধ্যে সাক্ষাৎ দেখা যাইতেছে। এমন দুঃসাহসী লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়; আগে পত্র লিখিয়াছিল, জবাব না পাইয়া হয়তো এবার সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে!

মনোরমা স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। বুকের ভিতর ধপাস ধপাস করিতে লাগিল; আঙুলগুলি অনাবশ্যক কাঁপিতে লাগিল। বুঝি এলোমেলো হইবার উপক্রম হইল।

'চলা যানে বলেছে, হুজুর?'

'নেহি। বেরিয়ে যাও।' প্রায় কম্পিতকণ্ঠে মনোরমা কহিল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, ব্লাউসের ভিতর হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্ষিত হতে সে বারবার কপালে বুলাইতে লাগিল। ভয় কি, আস্ত গিলিয়া খাইতে পারিবে না! দেখা যাক কে সে, কি তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিরূপ তাকে দেখিতে; এই অদ্ভুত আচরণের স্বপক্ষে কি তাহার বলিবার আছে? এমন সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কেন? এ কোন্ বিচিত্র ধরণের পাগলামি? ইহাকে অনায়াসেই বেপরিবাস্যের পর্যায়ে ফেলা যায়।

লম্বা, কর্শা, একহারা লোকটি। বয়স ত্রিশের নিচেই। গায়ে ছিটের শার্ট ইন্ত্রির রেখা হীন। বুকের পকেট কাগজপত্রের ভারে নামিয়া পড়িয়াছে। হাঁটিবার শব্দ শুনিয়া বুঝা গেল, পায়ে স্যাণ্ডাল। অতি বিনীতভাব, বড় সঙ্কোচের সঙ্গেই আসিয়াছে।

'বসুন', মনোরমা কহিল। 'কি চাই আপনার?'

'আমি আসছি স্থির আপনার এলিয়েন্ প্রেস্ থেকে। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।' লোকটা নমস্কার করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। 'আপনাদের ফাস্ট টাবিনেলের কোচ্চেন পেপারগুলি আমাদের দিতে হবে। বদলে অন্তত তিনশো টাকার কাজ যোগাড় করে' দেব, এই কড়ারে চাকরি নিয়েছি, এখন আপনারাই ভরসা...'

'আপনার প্রয়োজনটা কি কালি ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত না?'

'আজ্ঞে!' লোকটি না বুঝিয়া, কিন্তু শঙ্কিত ভাবেই কহিল।

'এমন সামান্য কাজে এই অসময়ে আমাকে বিরক্ত করতে আসতে আপনার সঙ্কোচ হয় না?' মনোরমা রুক্ষ কণ্ঠে তিরস্কার করিয়া কহিল। 'কোথাকার আহাম্মক আপনি? এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন কতদিন? আমি বরঞ্চ ভাবলাম,—যাক গে, আপনি এসে আত্মপরিচয় কতক্ষণ সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলেন। আপনাদের মস্তকে কি সামান্য বিবেচনা শক্তিও নেই...'

'আজ্ঞে, বড়ই অপরাধ হয়ে গেছে' লোকটা কাঁচুমাচু মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শুনেছিলাম, এই সময়ই আপনি নিরিবিলি থাকেন। তাই ভাবলাম, এখন এলেই সুবিধে হবে।—এই বিদেশে বিভূঁয়ে বড়ই অসুবিধেয় পড়েছি। বাঙালীকে বাঙালী না রাখলে আর কে রাখবে বলুন? আপনি স্থির নিন তবে...'

'আমার ব্যবসায়সংক্রান্ত আলোচনা সুস্থেই হয়ে থাকে। দরকার থাকলে সেখানেই যাবেন, বিবেচনা করে দেখা যাবে...'

অপ্রস্তুত লোকটা চলিতে চলিতে বার-দুয়েক হোঁচট খাইয়া ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। মনোরমা চুপ করিয়া সেখানেই বসিয়া রহিলেন। নিজেকেও তার অপ্রকৃত মনে হইতে লাগিল।

সামান্য একটা ছাপাখানার ব্যাপার; তাহার সম্পর্কে এত ভয়, এত উৎকণ্ঠা, এত সঙ্কোচ-জড়িত বিস্ময়! একবার মনে হইয়াছিল, বেশভূষা হইতে আরম্ভ করিয়া উৎপেক্ষের ব্যাখ্যান সবই ইহার জানকীর, সবই অভিনয়। নাটকীয় ভাবে অকস্মাৎ সেই দুঃসাহসী লোকটি ইহার মধ্য হইতেই আত্মপ্রকাশ করিবে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র। ইহার বিনীত সঙ্কুচিত অনুগ্রহপ্রার্থীর সুর শুনিয়া এমন আশা বেশিক্ষণ পোষণ করা চলে নাই।

মনোরমার বেলাটা বিগড়াইয়া গেল। আপনার কাজের ঘোর বহিল, বাসীকে ডাকিয়া অকারণে ভাবে বাজে লোকের অনধিকার প্রবেশের জন্য ধমকাইয়া দিল, ঘরের ঘোর ঘষিয়া পাচকের রন্ধন নৈপুণ্যের গর্বকে ধূলিসাৎ করিল। ফলে, নিজের মাথাই গরম হইয়া উঠিল; ঘুম আসিতে চাহিল না। বিনিদ্র শয্যায় শুইয়া শুইয়া সে আরও অনুযোগ করিল। কে এই লোকটা? কি তাহার পরিচয়? সত্যই কি সে একদিন নিজেই আসিয়া হাজির হইবার চেষ্টা করিবে?' অদ্ভুত মানুষের কৌতূহল। কেন মনোরমা চিঠিটা অমন শতছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ঠিকানাটা থাকিলে কোন একদিন এই ঘরের কিছু সন্ধান পওয়া যাইত। যদি সে নিজে না আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তার কোনও সন্ধানই আর পাওয়া যাইবে না! মনোরমার নিশ্চুপ ঔদাসীন্যের পরও কি তাহার স্পর্শ বজায় আছে? কি ভাবিয়াছিল সে-আমাকে?' নিশীথ অনুনার সিদ্ধান্ত চিন্তায় মনোরমা নিজের মনে যাদুকরীর মতো নিজের মনোবলকে অটুট প্রমাণ করিল।

বেঙ্গলীক্লাবের উদ্যোগে থিয়েটার হইতেছে। শহরের গণ্যমান্য বাঙালীদের একজন হিসাবে মনোরমা না আসিয়া পারে নাই,—যদিও এই ধরণের অভিনয় দেখিয়া কোনও আনন্দই সে পায় না। পাশেই মিসেস্ সরকার বসিয়াছেন, যবনিকা এখনও ওঠে নাই, গল্প-গুজব চলিতেছে। সহসা মিসেস্ সরকারকে হাত উঠাইয়া প্রতি-নমস্কার করিতে দেখিয়া মনোরমাও চোখ তুলিয়া তাকাইল। প্রবেশ-দ্বারের কাছে থামটার ধারে দণ্ডায়মান যে ভদ্রলোক এই প্রতি-নমস্কারের লক্ষ্য, মনোরমার কাছেও সে সম্পূর্ণ অপরিচিত নহে। স্থানীয় শাখা-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হইয়া ইনি মাস কিছুকাল হইল এখানে আসিয়াছেন; ইতিপূর্বে দুতিনবার ওঁহার সঙ্গে মনোরমার সামান্য দাপ্তরিক আলাপ হইয়াছে। বয়স চল্লিশের নীচে, দোহারা সুগঠন, একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ভালো ব্যাঙ্কারের প্রকৃতি অনুসারে ধীরস্থির; ওজন করিয়া কথা বলেন, বিবেচনা করিয়া মন্তব্য করেন। বাক্যে এবং আচরণে হাল্কা চঞ্চলতার একেবারেই অভাব।

'জানেন ভাই, মিস্ চৌধুরি', মিসেস্ সরকার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'কত আপনার সম্বন্ধে একটু বোধ হয় বেশিই ইন্টারেস্টেড্। আমাদের ওখানে এসেই আপনার সম্বন্ধে অনেক্য প্রশ্ন-বর্ষণ করেন। এর মতলবখানা কি বলুন তো?'

'সেটা ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেই ভালো হয়বেন', অনমনীয় হইয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে মনোরমা জবাব দিল এবং গম্ভীর হইয়া গেল।

'হি ভাই, রাগ করবেন না' মিসেস্ সরকার তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'আপনার সঙ্গে কি একটু

কথাও চলবে না। হুঁ-ও ম্যাচিলর, জানেন তো? আমরা এরকম যোগাযোগ পেলেই নানা রকম কল্পনা শুরু করি...'

মনোরমা গম্ভীর হইয়াই রহিল। তবে এই কি সেই পত্র-লেখক? বিদেশী ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, গম্ভীর চলন-বলন, ইহার পক্ষে কি নবীন-ছোকরা-সুলভ এমন চাপল্য প্রদর্শন সম্ভব? সম্ভাবনা অপ্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু তবু মনোরমা যেন কিছুটা আশ্বস্ত হইল। শত হোক, ইনি কোনও অপরিচিত অভদ্র আচরণ করিবেন না, এমন ভরসা করা চলে। কিন্তু এমন ধরণের চিঠি লিখিয়া তিনি এরূপ অভিবেচনা দেখাইলেন কেন? এত সামান্য পরিচয়ে এইরূপ আকুলতা কি বিধাতৃ? অথবা অবিবাহিত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ইহাও অন্যতম পেশা।

পরদিন বেলা ঠিক দশটার সময় মনোরমা ব্যাঙ্কের অফিসে উপস্থিত হইল। খবর পাওয়া মাত্র ম্যানেজার নিজের কামরার দরজার কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল।

এতদিন পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কেই মনোরমা টাকা রাখিয়া আসিয়াছে; ইহাতে কখনও কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় বলিয়া ব্যাঙ্কেও একটা অ্যাকাউন্ট খোলা স্থির করিয়াছে। এজন্যই মূলে অবশ্য তাহার এখানে আসা।

ম্যানেজার সুব্রত দত্ত অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হাসিয়া কহিলেন, 'মূলের অ্যাকাউন্ট তো আপনার আগে হতেই আছে; এইবার সুদের কর্মীর অ্যাকাউন্ট পাওয়ায় আমাদের ব্যাঙ্কের সুনাম প্রমাণিত হলো।'

'অ্যাকাউন্টের টাকার পরিমানটা দেখেও কি খুব ভরসা হচ্ছে?' মনোরমা ঈষৎ হাস্য গলাতেই প্রত্যুত্তর দিল।

'আপনাকে পেয়েছি, এও কি যথেষ্ট নয়?' সুব্রত স্পষ্ট এবং ছোট করে কহিলেন।

চমকিয়া মনোরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সুব্রতর মুখের উপর নিমেষে বুলাইয়া লইল। ইহা কি শুধু ব্যবসায়ের ভাষণ, না আরও কিছু? ব্যবসায়ে কর্তব্য কি এতটা ঘোলাটে করা সম্ভব? মনোরমা কি ইহার ঔদ্ধত্যটাকে ধমকাইয়া থামিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে? ইহাতে পত্র-প্রেরকের পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয়ের অবকাশ থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুধু অশোভনই নয়, ইহা তাহার নিজের কৌতূহল এবং আগ্রহও ইহার নিকট প্রমাণিত করিবে। আর যা-ই হউক, ইহা সে জানিতে পারিবে না। আর জানিয়াই বা লাভ কি? জানিবার পর সে কি করিবে? বিরক্ত হইবে, না আহ্লাদিত হইবে? তিরস্কার করিবে, না গৃহে আহ্বান করিবে? মনোরমা নিজের মন খুঁজিয়া ইহার জবাব পায় নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া কোন সিদ্ধান্তও সে করিতে পারে নাই।

'আজ তবে উঠি।' বলিয়া মনোরমা বক্তব্যের অভাবের অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটাইল।

ম্যানেজারও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'বেশ!' মনোরমা এই উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই, স্তম্ভিত হইয়া গেল। 'কবে? কেন? বেশ তো। ছুটির দিনে আমার ওখানে গেলে···বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আমি কারুর সঙ্গে...আচ্ছা আসি, নমস্কার। বিকেলে আমি সব দিনই বাড়ি থাকি···'

ইহার দশ বারো দিন পরের কথা। মনোরমা প্রথানত বৈকালিক চা-পানের জন্য বাগানে বসিয়াছে। মানেজারকে একটু পূর্বে খবর পাঠাইয়াছিল, সে আসিয়া সেলাম করিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। মনোরমা এক মিনিট চুপচাপ নীরবে চা-পান করিল, প্রশ্নের দ্বারা দারোগানের অস্তিত্ব বা উপস্থিতি স্বীকার করিল না। অতঃপর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ কোই সাহাব মিলনে কো আয়া থা?'

'নেহি হজুর।'

'আয়সা কভি তো নেহি হুয়া। তুম ফটকমে জরুর নেহি রহতা।'

'নেহি হজুর; হাম্ উধারই রহতা। ভাত্ খতি খানা পাকায়া, বহিনো খাতিয়া মে শো রহা।'

মনিব গত দশ দিন ধরিয়া প্রত্যহই তাহাকে দুতিন ঘণ্টা পর করিয়া এই অজ্ঞাত নামা সাহাবটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে, এবং ইহার উপস্থিতি ঘোষণায় অকৃতকার্য প্রতিদিনই অধিক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই উষ্মার কারণ কি বা ইহাতে তাহার নিজের অপরাধ কোথায়, বৃদ্ধ দারোগান হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। উক্ত সাহেবটিকে মনিব-সকাশে হাজির করিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইত।

'যাও।' নীরস কঠিন কণ্ঠে মনোরমা আদেশ দিল, এবং সশব্দে পেয়ালাটা পিরিচের উপর স্থাপন করিল।

গত কয়দিন ধরিয়াই মন বিগড়াইয়া আছে; ইহার অনিবার্য ফলস্বরূপ বেলাও এমন রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে বাড়ির বা স্কুলের কাহারও তাহা চোখ পাইতে বাকি থাকে নাই। এমন কি মনোরমা নিজের কাছেও এই অস্বাভাবিক রুক্ষতার কথা কখনও কখনও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দারোয়ানকে এই অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত প্রস্থান করিবার আদেশ, এই নির্জন উদ্যানের নিঃশব্দ আবেষ্টনে নিজের কানেই সহসা বড় বেখাপ্পা শুনাইল। মনোরমা চমকিয়া উঠিল। এইরূপ আচরণের অর্থ কি? সে জানে নাই, তাহাকে কোন্ প্রক্রিয়ার ফলে উপস্থিত করা যাইবে? তবে কি তাহার নিরন্ন আশাভঙ্গের বিভীষিকা তাহাকে কেপাইয়া তুলিয়াছে? কিন্তু কেন? সে ব্যক্তি না আসিলে তাহার এমন কোন্ ক্ষতিটা হইতেছে? সে উপস্থিত হইলে মনোরমা এমন আর কোন্ রাজা হইয়া উঠিবে? এতগুলি দিন ধরিয়া সে-যে অমার্জনীয় অবহিত বোধ করিতেছে, সে-কি এই লোকটি আসিতেছেনা বলিয়াই?

'হজুর মেমসাব!'

'ক্যা' বলিয়া অকস্মাৎ মনোরমা চমকাইয়া সম্মুখে চাহিল। দারোয়ানের হতোদ্যম পরিচ্ছন্ন মুখ চোখে পড়িল; নিমেষে তাহার প্রসারিত হাতে মনোরমা একটি 'ভিজিটিং কার্ড' দেখিতে পাইল।

'এক সাহাব মে ইয়ে কার্ড দিয়া।'

মনোরমা কম্পিত হস্তে কার্ডটি গ্রহণ করিল। নামটা পড়িল,—সুব্রত বসু। নিমেষে পরিবর্তিত

বসিয়া রহিল। সহসা তাহার জ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল, গণ্ডের মাংসপেশী কঠিন হইয়া উঠিল, ঠোঁট জোড়া দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইল। মুঠার মধ্যে কার্ডটা চাপিয়া ধরিয়া মনোরমা কহিল, 'সাহাব কো বলো, আজি ভেট নেহি হো সকতা···মেরা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি।'

সাহেবের আগমনের জন্য গত দশ দিন যাবৎ এইরূপ অদ্ভুত অপেক্ষার পর 'সাহেবকে' এইরূপে ফিরাইয়া দিবার তাৎপর্য্য দারোয়ানের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না, কিন্তু বিস্ময়-প্রকাশ তাহার অধিকারের মধ্যে না পড়ায় সে বিনাবাক্যে হুকুম বহন করিয়া লইয়া গেল।

নির্জ্জন বাগানের ঘনায়মান অন্ধকারে বেতের চেয়ারের উপর নির্জ্জীবের মতো বসিয়া মনোরমা নিজের মনে বলিতে লাগিল, 'আমি অত দুর্ব্বল নই; মোটে দুর্ব্বল নই!'

কিন্তু গভীর রাত্রে বিনিদ্র বিছানায় ছটফট করিতে করিতে মনোরমার সকল সবলতা সহসা যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিজেকে অসম্ভব দুর্ব্বল বোধ হইল, কোন সবল ব্যক্তি যদি বুকে জাঁকড়াইয়া ধরিয়া তবেই নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হওয়া যাইত। এই বিরাট সংসারে বিরাট একাকিত্ব ভূতের মতো সম্মুখে হাজির হইল। দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের মধ্যে একান্ত দিশাহারা মনে হইল। অতীত পুত্র-পরিজন নিজ কৈশোরের জন্য হয়, মনে হইল, তাহার মতো নির্ভরযোগ্য আর কিছু নাই। 'তবে কেন তাঁকে অপমান ক'রে ফেলাম?' বারবার এই প্রশ্নটা মনোরমার বিনিদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে অস্বস্তি উৎপাদন করিয়া মুখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

'আরে, আসুন, আসুন, মিস্ চৌধুরি, বসুন। কাল আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম, শুনলেন বোধহয়। শরীর খুব খারাপ ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ। খুবই খারাপ ছিল। মাথার যন্ত্রণায় সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। কিন্তু আমি খুবই দুঃখিত যে···'

'কিছু নয়, কিছু নয়।' অতিথি বসিবার পর ঘুরত ঘন্ত চেয়ারে পুনরুপবেশন করিয়া কহিল, 'অসুখ এমন জিনিস যে হুট্ করে ঘুরে উঠলাম, নইলে আগেই যেতুম। আরেকদিন যাওয়া যাবে।'

'আপনি কাল বিকেলেই আসুন,' আরক মুখে মনোরমা কহিল, 'এসে চা খাবেন। তখন গল্প করব, আজ ফুলের ফোঁ বেড়েছে, উঠি।' বলিয়া মনোরমা স্থির ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রীতি অল্প পরিচয়ে কোন মেয়েকেও মনোরমা ইতিপূর্ব্বে নিমন্ত্রণ করে নাই, পুরুষ (এবং অবিবাহিত পুরুষ) তো দূরের কথা। কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হইল। মনোরমার অনিচ্ছুক বহুদিন পরে মুখের ছাপ পড়িল। বসন ও বাচনে তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল, এমন কি, প্রসাধনের অনভ্যস্ত মেয়েদের মধ্যে যে নাটকীয়তা দেখা যায়, মনোরমার চলন-চালনে, চা-পরিবেশনে, অতিথির অবিরাম আদরে তাহার প্রকাশ দেখা গেল।

বাগানে চা পান শেষ করিয়া মনোরমা তাড়াতাড়ি তাহার পড়ার ঘরে লইয়া আসিয়াছে। এক বিষয় হইতে সে অতি দ্রুত বিষয়ান্তরে পৌঁছাইতেছে। যেন বেশী লাগিতেছে মনোরমার; কথার তোড় ছুটিয়াছে।

'আচ্ছা মিস্ চৌধুরি,' দর অপাঙ্গে মনোরমার উজ্জ্বলিত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কিছুদিন আগে এক অজ্ঞাতনামা লোকের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন কি?...'

'চিঠি!'

'বেনামী চিঠি। তাতে অজ্ঞাতকুলশীল এক ব্যক্তি আপনার কাছে উপস্থিত হবার অনুমতি চেয়েছিল, কারণ অযাচিত আসবার মতো সাহস তার ছিল না। হয়তো সেটা নেহাৎ ছেলেমানুষী হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, সেই ব্যক্তি—আমি...'

'আপনি!' মনোরমা যেন অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়িল। পত্রলেখকের পরিচয় সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যে সে নিঃসন্দেহ হইয়াছে, সে-কথা তাহার আর মনে রহিল না; নিতান্ত আহতস্বরে কহিল, 'না, না, সে অসম্ভব; কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে কোনও ভদ্রমহিলার কাছে এমন অদ্ভুত চিঠি...কিন্তু আপনি, আপনি-ও রকম চিঠি লিখতে গেলেন কেন?'

'কারণ তাই যে আমার মনের কথা, মিস্ চৌধুরি!' ধীর শান্ত স্থির গলাতেই কহিলেন। 'তাতে কোন অত্যুক্তিই আমি করিনি। আপনি হয়তো জানেন, আমি অনাথ। ইতিপূর্বে এমন দুর্বলতা কখনও বোধ করিনি। কিন্তু হাতী যখন একবার জোড়ের জলে পিছলে পড়ে সে-ও তো ভেসে চলে যায়। বলুন, নিজেও কি আপনি এমন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে ওঠেন নি? মানবচিত্ত সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা আছে। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই আপনার মুখে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার ছায়া আবিষ্কার করেছি, অনুভূতির বিরক্তি দেখেছি; স্বামীপুত্র-পরিজনের জন্য আপনার মনে অব্যক্ত, সম্ভবতঃ আপনার নিজের কাছেও অপরিজ্ঞাত, আকুলতা আমার নজরে পড়েছে...'

'মিথ্যা কথা!' মনোরমা অপরুষ কণ্ঠে কড়া করিয়াই বলিয়া উঠিল।

'উত্তেজিত না হয়ে মনের ভিতরটা হাতড়ে দেখুন। যে-দুর্বলতা বাইরে চোখে পড়েনা, অনেকের মন তাই চুপ করে সয়ে থাকতে পারে।'

'কোনও দুর্বলতা আমার মধ্যে নেই।' মনোরমা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল। 'যদি কিছু আবিষ্কার করে থাকেন, ভুল তা আপনার নিরীক্ষণ শক্তির মিথ্যা অহমিকা, নয়তো মস্তিষ্কই তা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু আর আমি তর্ক করতে চাইনে। আমি অসুস্থ বোধ করছি। আপনি এবার আসুন। নমস্কার।' বলিয়া মনোরমা উত্তর দিকে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ধীরেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত মনোরমার মুখে নিরুপায় করিয়া কহিলেন, 'নমস্কার। অপরাধ হয়ে থাকলে মার্জনা করবেন। কিন্তু যদি সংসার আপনাকে খোলা চোখে আরও একবার চাইতে দিতো,

সুকোশল এবং পত্রের আচরণ লক্ষ্য করে আমার নিঃসংশয় জ্ঞান হয়েছিল, বেনামী পত্রের লেখকের পরিচয় আপনার কাছেও আর অজ্ঞাত নেই, বরঞ্চ পত্রের প্রস্তাবে আপনার সম্মতি…'

'সম্মতি!' মনোরমা কণ্ঠের উপর বল হারাইয়া ফেলিল, 'কি, কি আপনি আমাকে হীন করেন? কোন্ দুঃসাহসে আপনি আমাকে অপমান করতে সাহস করেন? যে-ধরণের মেয়েদের আপনি দেখে এসেছেন, মনোরমা চৌধুরী সে প্রকৃতির মেয়ে নয়। তার মনের জোর, তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে।'

'শক্তির অধিকা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে তবেই ভয়, মিস্ চৌধুরি। কে জানে, হয়তো আপনার চারিত্রিক অধিকা দেখিয়েই আপনি জীবনের খুব একটা সুন্দর এবং স্বাভাবিক পরিণতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু সে-শক্তি দেখিয়ে লাভ কি বলুন? যাকগে, আপনাকে যথেষ্ট বিরক্ত এবং উত্তেজিত করেছি। ত্রুটি স্বীকার করে বিদায় নেই। আমার দুঃসাহস যখন আপনার শক্তির কাছে টিকলো না, তখন আমার বিচারশক্তির উপর ভরসাও আর রাখতে চাই না। কিন্তু যদি আবার কখনও স্মরণ করেন, তবে রাগ করে দূরে থাকব না, এটাও ঠিক।'

ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়াই মনোরমা রাতের অন্ধকার তরল হইতে দেখিল। সারা রাত সে ঘুমায় নাই। এ কি রকম হইল! সে কি এই রকম পরিণতি সত্যই চাহিয়াছে? পত্রলেখকের পরিচয় সে কি জানিত না? জানা সত্ত্বেও কি সে তাহাকে গৃহে আহ্বান করে নাই? তাহার জন্য এমন করিয়া সাজ করিয়াছিল কেন? চিত্তের কিরূপ অবস্থায় এমন উচ্ছ্বসিত গল্প ও প্রগল্‌ভ হাস্য করা সম্ভব? সুব্রত কোনওটাই তো ভুল সিদ্ধান্ত করে নাই। তবে সহসা সে এমন কঠিন ও অনমনীয় হইয়া উঠিল কেন? এমন কতগুলা প্রদর্শনী করিয়া একটা যথাকাম্য অবস্থা তচনচ করিয়া দিল কি কারণে? নিজের অন্তরের দুর্বলতা প্রকাশ পাইলেই কি সে এইরূপ অযৌক্তিক আচরণ করে না? শক্তির অধিকা দেখাইয়া কতদিন ইহাকে চাপা দেওয়া যাইবে?—অর্ধজাগরিত অবস্থায় শুইয়া শুইয়া মনোরমা এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিল।

'আমিও কি প্রেমে পড়েছি?' যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলিয়া উঠিয়া মনোরমা চমকাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

টানাওয়ালা কহিল, 'কাঁহা যায়েঙ্গে, 'মেমসাব্?'

'বাঙালী বাজার।' বলিয়া মনোরমা চুপিতে লাগিল। এইবার ত্রুটি স্বীকার করিতে গেলে নিজের দুর্বলতা আর সামান্যতমও গোপন থাকিবে না, ইহা সম্পূর্ণ জানিয়াও মনোরমা গতরাত্রের দুর্ব্যবহারের জন্য সুব্রতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিতে চলিয়াছে। অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষাকে কতদিন গোপন রাখা যায়? যে তাহা নিজে আবিষ্কার করিয়াছে এবং মনোরমাকেও যে-সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছে, তাহার নিকট ইহা গোপন করিয়া লাভ কি?

বড় বাজারটায় একগলা বিভিন্ন অভিজাত দোকানের মধ্যে কলিকাতার এই শাখা যাদুরই। কাছাকাছি আসিয়া টানা থামিল। মনোরমা সাবধানে ছাড় দেয়া নামিয়া পড়িল।

'মিস্ মৌলুমি যে। এখানে কেন?'

মনোরমা মুহূর্ত ফিরিতে মিসেস্ সরকার সহাস্য বদনে আগাইয়া আসিলেন; পার্টিতে যোগদান দিয়া এই ভোরেই তিনি গাড়ি লইয়া মার্কেটিং ঘুরিয়া বেড়ান।

'অমন চোখমুখের এমন অবস্থা কি করে করলেন? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি? হাঁ ভাই, কাল মিঃ দত্ত আপনার ওখানে চা খেতে গিয়েছিলেন? চমৎকার গল্পপে লোক, তাই না? সাইকোলজিতে এম-এ; মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বলে দিতে পারেন। কি বলেন, একটা সাইকালি আয়ত্ত করা যাই বলুন, স্বামীর উপর ভয় করতে না পারলে মেয়েরা স্বস্তিই পায় না, যা দুর্বল আমরা, একজন পুরুষ সর্বদা রক্ষক হিসেবে কাছে আছে জানলে…'

'যে খাটে শুয়ে থাকে', মনোরমা কহিল, 'সে ভাবতেই পারে না, খাট ছাড়া কি করে শোয়া চলে। কিন্তু শোয়ার পক্ষে খাট অপরিহার্য নয়।'

'জানেন, মিঃ দত্ত কি বলেছেন? বিয়ে একদিন আপনাকে করতেই হবে। আপনার মুখে অনেক এই দুর্বলতার ছাপ নাকি স্পষ্ট করেই লেখা আছে। শুনুন একবার কথা, এও নাকি মুখে লেখা থাকে! বলিয়া মিসেস্ সরকার সকৌতুকে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মনোরমার মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে নিরস কণ্ঠে কহিল, 'বলে থেকেন আপনাদের মি দত্তকে, কোনও ভদ্রমহিলার মুখ দেখে তার অন্তরের খবর বলে বেড়ানো ভদ্রলোকের রীতি নয়। আ তাঁকে এও বলে থেকেন, সরলা নারীর তিনি সাক্ষাৎ পান নি; এখানে আরও কিছুদিন থাকলে হয়তো এমন একজনের সন্ধান পেতেও পারেন। যাকগে, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে। একটা কুকুরের বাচ্চা কেনা দরকার।' বলিয়া সম্মুখের চামড়ার জিনিসের দোকানটার দিকে পা বাড়াইল।

'কিছু মনে করবেন না ভাই। একটু ঠাট্টাও কি আপনার সঙ্গে করতে পারব না?' সরকার-গৃহিণী অপ্রতিভভাবে তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

মনোরমার অভিমান-নয় ওলোট-পালট হইয়া গেল। আর কোন দিনই তাহা ফিরিয়া আসিল না। যাঁহা সহজ-সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রবীণা শিক্ষয়িত্রীর বদনমণ্ডলের রেখা ক্রমেই আরও কঠিন হইয়া উঠিল। সেবাদের ক্ষমতা প্রতিদিনই বাড়িতে লাগিল। মানুষের স্থা নিয়মানুবর্তিতা, চিত্তের স্থলে বুদ্ধি, স্বভাবের স্থলে দূরদর্শিতা এবং কোমলতার স্থলে গৌরব ক্রমেই, মনোরমা চতুর্দিকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়া তুলিল। এই দুর্গে প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে বাস করিতে লাগিলেন। আর কেহ তাহাকে উঁকো-ঝুঁকি দিতে সাহস করিল না। কেহ তাহার চিত্তের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ও করিল না।

মনোরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সগর্বে সিদ্ধান্ত করিল, সে দুর্বল নয়, তাহার প্রাণ সাধারণ মেয়েদের অনেক উর্ধ্বে।

একটি দেব নৈতিক গল্প

শ্রীপরিমল গোস্বামী

[চন্দ্রদ্বীপ একদা দুটী প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল, পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ...এই দুই অংশে একই জাতীয় লোক বাস করতো কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে গুরুতর ভেদ ছিল...বিষয়টী হলো, ছাতা আর পাগড়ী...কিন্তু একদা এই ছাতা ও পাগড়ীর অতি গুরুতর ভেদের একটা আলোচনা মীমাংসা করে নিয়ে তারা মিলিত-ভাবে একেবারে স্বর্গে গিয়ে হানা দেয়, স্বর্গের অমৃত অধিকার করে নিয়ে আসবার জন্যে। স্বর্গের অমৃত যে মর্ত্যে আসে নি, তার প্রমাণ আমরা প্রত্যেকেই জানি কিন্তু কেন যে আসে নি, সেই অতি প্রয়োজনীয় সংবাদটী, যা ইতিহাসকার চেপে গিয়েছেন, রসিক সাহিত্যিক এতদিন পরে তা উদ্ঘাটিত করলেন...ধন্যবাদ !]

(১)

জম্বুদ্বীপে এমন একটা সময় ছিল যে-সময়ের কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সেই সময়ে এই দ্বীপ দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল : পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ। দুই অংশে একই জাতীয় লোক বাস ক'রত কিন্তু তাদের মধ্যে একটা বিষয়ে গুরুতর ভেদ ছিল।

ভেদের বিষয় ছিল ছাতা ও পাগড়ী।

পূর্বের লোকেরা ব'লত, ছাতাই হচ্ছে মাথা রক্ষার একমাত্র উপায়, কেননা ছাতা একই সঙ্গে মাথা থেকে মুক্ত এবং মাথার সঙ্গে যুক্ত। একই সঙ্গে ত্যাগ এবং ভোগ। একই সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদ। একই সঙ্গে দৃঢ়তা এবং সীমাহীনতা।

পশ্চিমের লোকেরা ব'লত, পাগড়ী হচ্ছে মাথার রক্ষক এবং ভূষণ। যে-জিনিস মাথা বাঁচাবে, মাথার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হওয়া চাই ঘনিষ্ঠ, একেবারে অভেদী ভাব। ছিলেক ছিলেক নেই। যাকে বন্ধু ব'লে মনে তাকে বন্ধু ব'লেই ভেবে ব'সব। তাকে অর্ধেক ছেড়ে অর্ধেক ধ'রে রাখার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। যাকে একবার মাথায় তুলে নিয়েছি তাকে চিরদিনই মাথায় রাখব। পাগড়ী আমাদের চিরশিরোধার্য।

পূর্বের লোকেরা যখন ছাতার গৌরব প্রচারে একটু বেশি মুখর হ'য়ে উঠত, তখন পশ্চিমের লোকেরা অপমানিত বোধ ক'রে তাদের মাথা ভাঙত। আবার পশ্চিমের লোকেরা যখন পাগড়ীর গুণগানে মেঘ কাঁপিয়ে তুলত, তখন পূর্বের লোকেরা তাদের উপর চড়িয়ে যেত ঘা কিল।

এমনি ক'রে কেটে গেল তাদের বহু যুগ। পূর্ব-পুরুষ থেকে গেল, পশ্চিম, পশ্চিম।

কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে যত বৈপরীত্যই থাক, তবু দুইয়ের মাঝখানে একটা মিলন-রেখা থাকেই। সেইখানে স্বভাবতই একটা মিলন-ভূমি গড়ে উঠতে থাকে। সেইখানে বিরোধ যত তীব্র, ঠোকাঠুকি যত হয় কঠিন, তবুই পরস্পর লাভ-প্রত্যাশার ভিতর দিয়ে একটা মিলন ঘটতে থাকে। এখনও হয়েছিল তাই। এইখানে পূর্বের লোকেরা পাগড়ী এবং পশ্চিমের লোকেরা ছাতা সহজেই ব্যবহার করতে শুরু করল। আর নতুন বিরোধেরও সূত্রপাত হল তাই থেকেই।

পূর্বের চরম পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিমের চরম পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এতে আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। অতি মারাত্মক ব্যাপার। পূর্বের লোক পাগড়ী পরবে—এই অভূতপূর্ব ব্যবহার পূর্বের লোকেরা কিছুতেই সহ্য করবে না। ছাতাই তাদের ধর্ম, ছাতাই তাদের ধর্ম, ছাতাই তাদের জীবন। এত বড় সভ্যতা যাদের গড়ে উঠেছে ছাতাকে বেদ ক'রে। তারা হয়েছে ছত্রপতি, যাদের পূর্বপুরুষেরা হয়েছে ছত্রধর। ছাতার কথা মনে হ'লে গর্বে তাদের বুকের ছাতি ফুলে ওঠে। এই ছাতা তাদের একতাসূত্রে গেঁথেছে, ছাতা ত্যাগ করা আর ঐক্যবদ্ধ পূর্বের ছত্রভঙ্গ হওয়া একই কথা।

পূর্ব যতই ছাতার মাহাত্ম্য অনুভব করে পশ্চিমও ততই পাগড়ীর প্রতি তাদের ভক্তি বাড়িয়ে তোলে। পশ্চিমবাসী যে-কোনো লোক পাগড়ীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, পাগড়ীর মান বাঁচাতে প্রাণবিসর্জনের চেয়ে পুণ্য আর হ'তে পারে না। পাগড়ী দেওয়া আর শির দেওয়া তাদের চোখে এক। পাগড়ীর বদলে শির নেওয়াই তাদের ধর্ম।

আপোষ-প্রয়াসী মধ্যবর্তীদের নিয়ে এইভাবে বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে—আর তার ফলে পূর্ব পশ্চিমবাসী সবার শান্তি ভঙ্গ হয়। যুগ যুগ ধ'রে চলে এই অশান্তি। দুই পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ে একদিন।

কিন্তু কোনোক্রমেই আপোষ সম্ভব হয় না।

দুটি মাত্র আপোষ প্রস্তাব উঠেছিল:

এক—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে সবাই ব্যবহার করলে কেমন হয়।

দুই—ছাতা ও পাগড়ী একই সঙ্গে ত্যাগ করলে কেমন হয়।

প্রথমটির বিরুদ্ধে বলা হয়, পূর্ব পশ্চিম সংস্কৃতি একসঙ্গে মিলতে পারে না, তাতে সংস্কৃতির বিকৃতি হবে।

দ্বিতীয়টির বিরুদ্ধে বলা হয়, সংস্কৃতি মানেই ধর্ম, সুতরাং সংস্কৃতি ছাড়া মানেই ধর্ম ছাড়া, আমরা তাতে রাজি হইব কেন? নিধনং শ্রেয়ঃ।

(২)

মীমাংসা হ'ল না, উপরন্তু দুপক্ষেরই উত্তাপ ক্রমশ এত বেড়ে গেল যে একটা বড় রকমের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল। নানারকম ম্যাল-প্রেক্টিস পাশল অক্রমণের।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল অদূরীপে।

কিছুদিন হ'তেই আকাশে লালচে রেখে; খবর প্রচার হ'য়ে গেল, এবারে বাদ-খাদের ঐ যে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য।

সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মাঠে শস্য নেই।

পরস্পর আক্রমণের এমন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাটাও মাঠে মারা গেল। উদ্যোগকারীরা, ঠাণ্ডা ঘরে পড়ল। পূব পশ্চিম দুদিকেই বৈজ্ঞানিকেরা অভিনব অস্ত্র তৈরি করেছিল, কবিরা দেশের লোকের মনে হিংস্রতা জাগানোর জন্যে গান লিখেছিল—সবই বৃথা যায়! দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কি লড়াই করা যায় না? ধর্মের চেয়েও কি পেট বড়? —দুর্ভিক্ষই এ মীমাংসা ক'রে দিল। খেতে না পেয়ে কিছুই করা যায় না।

এল দুর্ভিক্ষ প্রবল মূর্তিতে। পূব পশ্চিম দুদিকের লোকেরাই মরতে লাগল হাজার হাজার। অল্পকারুত ভাগ্যবানেরা অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগল। এই মহা বিপদে দুপক্ষই তুলল ডালের পিরোধ, দুপক্ষই পরস্পরের আরও কাছে সরে এল।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এল মহামারী। বছরের পর বছর চলল মড়কের লীলা। পূব পশ্চিম মরতে লাগল একই নিয়মে। ছাতা এবং পাগড়ী কারও মাথা বাঁচাতে পারল না।

এখন উপায়?

পূব প্রশ্ন করল পশ্চিমকে, পশ্চিম প্রশ্ন করল পূবকে।

আবার বসল পরামর্শ-সভা।

প্রাণ বাঁচাতে হবে।

পূবকে বাঁচতে হবে, পশ্চিমকে বাঁচতে হবে। অর্ধাহারে অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে জীবন-ধারণের কোনো অর্থ হয় না।

পূব পশ্চিমকে ডেকে বলল, ভাই ছাতা মিথ্যা, ত্যাগ করলাম ছাতা।

পশ্চিম পূবকে ডেকে বলল, পাগড়ী আমরা আগেই ফেলে দিয়েছি। আমরা দুনিকের লোকেই বিস্তর মড়কের নিরাপদ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছি, এখনও যদি আমরা আমাদের নিশ্চিত ধ্বংসের প্রতিকার খুঁজে না পাই তা হ'লে ধিক আমাদের মড়কের।

পূব বহু চিন্তা ক'রে বলল, অমৃতের অধিকারী হতে হবে।

সে চেষ্টা তো আমরা করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি।

আমরাও করেছি, তাতেও কোন ফল হয়নি।

তা হ'লে চেষ্টা করে লাভ কি?

লাভ আছে। এতদিন আমরা চেষ্টা করেছি পৃথকভাবে, আবারে চেষ্টা করতে হবে এক সাথে মিলে।

তা হ'লে হবে ঠিক?

হবে, যদি কিন্তুটা ঠিক হয়।

মিলতেই হবে অসুরদের সঙ্গে। অমৃত না পেলে আমরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাব।...কিন্তু মিলনেই যে সমুদ্র লাভ করব, তার নিশ্চয়তা কোথায়? দেবতারা তো বলেছেন, অসুর তাঁরা ছাড়তে রাজি নয়।

অসুরদের দেবতারা সঙ্গেও তাই বলেন, কিন্তু আমরা শুনিনে বা। কেননা এবারে জোর ক'রে অমৃত আদায় করব, আর ভিক্ষা নয়।

আমাদের মিলিত শক্তি কি দুর্বার হবে না?

মিলিত শক্তিতে যদি আক্রমণ করলে দেবতারা বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।

•

(৩)

স্বর্গের আজ সত্যই বিপদ। এতদিনের অমৃত ভোগের নেশায় এবারে ঘোর হয় ঘুমিয়ে

অসুরদের লোকেরা একজোট হয়ে স্বর্গে আসছে অমৃত দখল করতে। দেবতাদের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনা এবং তদমিশ্রিত অস্থিরতা জেগে উঠেছে।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বর্গের রক্ষী-ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছেন। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় তাঁর বাহিনী প্রস্তুত করে আত্মরক্ষার জন্যে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ তাঁর দূরবীণ। ব্রহ্মা হাঁকলেন, সেনাপতি!

কার্তিকেয় চমকিত হয়ে আদেশের অপেক্ষায় চুপ ক'রে রইলেন।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে?

কার্তিকেয় বিনীতভাবে বললেন, ভাবছি।

তা হ'লে ভাব—ব'লে ব্রহ্মা ইন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন।

অমৃত কার কাছে আছে?

ইন্দ্র বললেন, আজ্ঞে আমারই কাছে রেখেছি।

ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন, পারবে?

কি? —শিবোধের মতো ইন্দ্র পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসলেন।

ব্রহ্মা মহা বিরক্তভাবে বললেন, তোমার মাথা।

মাথা রক্ষা করতে পারব কি না প্রশ্ন করছেন?

সে প্রশ্ন আমার দরকার নেই। অমৃত রক্ষা করতে পারবে কি না বল?

চেষ্টা করব।

ব্রহ্মা অত্যন্ত রুক্ষভাবে বললেন, তোমরা সবাই দেখছি কাপুরুষ, ভীরুপ্রাণ, অকর্মণ্য। তোমরা অপদার্থ। অসুরদের লোকদের কি ক'রে ঠেকিয়েছ তাই ভাবছি।

আজ্ঞে, সোজা উপায়েই ঠেকিয়েছি, বলছি, দেব না।

ওরা অমৃত চায় কেন, বলেছে?

বলেছে। ওরা দেবত্ব লাভ করতে চায়। ওদের মধ্যে হিংসা দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি চলছে বহুদিন। ওরা বহু রকম দুঃখ ভোগ [redacted] দূর হয়, আর পারছে না। ওরা আমাদের সঙ্গে এখন ওয়ার্ল্ডপেরিটি চায়।

তুমি এই সব চুপ ক'রে শুনেছ, এবং আমাদের জন্যে কিছুই বলনি?

আজ্ঞে, বলবার আর কি আছে।

কেন বলনি যে আমরা অমৃতের অধিকারী হ'য়েও তোমাদেরই মতো ছোটলোক, হিংসা দ্বেষ হানাহানিতে তোমাদের মতোই পটু? কেন বলনি যে অমৃত খেলেও তোমাদের দুঃখ ঘুচবে না?

বললে বিশ্বাস করত না বলেই বলিনি।

এখন বাঁচবে কি ক'রে ওদের হাত থেকে? ওরা এবারে একজোট হ'য়ে আসছে, এবারে তো আর মুখের কথায় কাজ হবে না। এবারে লড়াই করতে হবে।

ইন্দ্র চিন্তিতভাবে বললেন, আজ্ঞে মানুষের সঙ্গে তো কোনো দিন লড়াই করিনি।

তা হ'লে আমাদের তোমারও সন্দেহ আছে? যা ভেবেছিলাম তাই হ'ল শেষটায়। তা হ'লে এখন যে যার পথ দেখ। আমি চললাম নারদকে খুঁজতে।—ব'লেই ব্রহ্মা ছুটলেন নারদের গুহার দিকে।

সঙ্গে বিশ্বকর্মার, সঙ্গে দেবা।

বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাকে ছুটতে দেখে সভয়ে প্রশ্ন করলেন, প্রভু, ব্যাপার কি?

ব্যাপার অতি গুরুতর। এখন সব বলবার সময় নেই। তুমি সাইরেন বাজাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাক। ইঙ্গিত পেলেই বাজিয়ে দেবে।

বিশ্বকর্মা বললেন, তথাস্তু, তবে—

তবে কি?

[redacted] নদীর উপর যে সেতুটি তৈরি করেছিলাম, যমরাজ তার উপর দিয়ে সবাইকে পারাপার [redacted] সেতুটি ভেঙে পড়েছে, সেইটি মেরামত করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, সেতুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস কর। কেন, তা জিজ্ঞাসা না, বা বলি চোখ বুজে শুধু দেখে যাও। এখন আর সময় নেই। অসুরদের মানুষেরা আসছে [redacted] আক্রমণ করতে, হুঁশিয়ার থাক।

ব্রহ্মা আবার ছুটতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়েই দেখেন, একটা নিরিবিলি জায়গায় নারদ ব'সে তাঁর [redacted] মুখখানি খুশি খুশি।

ব্রহ্মা এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই নারদ হাতের ইসারায় তাঁর ধ্যান ভাঙতে নিষেধ [redacted]

তাঁর চারদিকে ধোঁয়ার আবরণ ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল, কিছুক্ষণ পরে আর তাঁকে দেখাই গেল না।

ব্রহ্মা কতটা বিরক্ত হলেন নারদের এই স্বার্থপর ব্যবহারে। যারা প্রবীণ তাঁদের উচিত আর সবাইকে বাঁচবার পথ দেখে দেওয়া, তা না ক'রে নারদ নিজেকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত! এই পলায়নী মনোবৃত্তি নারদের পক্ষে অতি অবশ্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ডেকে নারদের চারিত্রিক ত্রুটির কথা নিবেদন করলেন।

ইন্দ্র বললেন, কিন্তু এখন আমাদের প্রত্যেকেরই তো ও ছাড়া আর পথ নেই। আপনিও তাই বলেছেন।

ব্রহ্মা বললেন, সে বলেছি তোমাদের জন্যে। তোমাদের উচিত ছিল দেবেশের পাড়ায় গিয়ে তাঁদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। তারা হয়তো এখনও কিছুই জানে না।

ব্রহ্মার কথা শেষ হ'তে না হ'তে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল তাঁদের কানে। দাবদাহি পথে এসে পড়েছে। তাদের পূর্বাগত ধ্বনি, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র দুজনকেই দিশাহারা করে দিল।

ইন্দ্র, আমি চললাম নন্দন কাননের দিকে, পার তো তুমিও এস।—ব'লে ব্রহ্মা উন্মাদের মতো ছুটে পালালেন।

ইন্দ্র বললেন, আপনি আগে পালান, আমি অমৃত ভাণ্ডটি নিয়ে এখুনি আসছি।

ইন্দ্র অমৃত ভাণ্ডটি ঘাড়ে ঝুলিয়ে একটু পরেই নন্দনকাননের দিকে ছুটে চললেন।

মানুষদের কোলাহল আরও কাছে শোনা যেতে লাগল। তারা এসে পড়েছে স্বর্গে। বিশ্বকর্মা গাইডেন বাজিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেব-সেনাপতি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন, তার কোনো পাত্তা নেই। মেয়েরা নির্বিঘ্নে অন্দরে প্রবেশ করেছে।

অম্বুবীপের লোকেরা সম্পূর্ণ সশস্ত্র হয়ে এসেছে। ব্রহ্মা ধোঁয়ার আবরণে বসেই বুঝতে পারলেন তারা সংখ্যায় কয়েক হাজার হবে।

নারদ আরও শুনতে পেলেন তারা নানারকম শ্লোগান আওড়াচ্ছে, তার মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে তারা এবারে দেবতাদের শক্তি চূর্ণ ক'রে অমৃতভাণ্ড লুণ্ঠন ক'রে নেবেই।

নারদ মুহূর্তকালীর ভিতর থেকে সব শুনে আরও একাগ্রচিত্তে প্রতিকার চিন্তা করতে লাগলেন তবে একটা বিষয়ে তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে মানুষেরা দেবতাদের সন্ধানে খুঁজে পাবে না। কারণ তাঁরা যে ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই নেই।

(৪)

নারদের ধারণা ঠিক।

মানুষেরা স্বর্গে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। বাইডেন বাজার পর তারা যতটা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, দেবতাদের আত্মগোপনের কোনো সন্ধান না পেয়ে তারা তেমনি হয়ে গেছে।

তারা এসে জড়ো হ'ল মন্দাকিনী নদীর ধারে।

কিন্তু আসতে না আসতেই কপাং ক'রে নদীতে এক শব্দ। সবারই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল।

কি হ'ল! কি হ'ল?—চেয়ে দেখে একটা গাভী তার ন্যাজটি শূন্যে তুলে নদী পার হ'য়ে যাচ্ছে।

—গোরু এল কোত্থেকে?

কামধেনু!

সে নদীর ধারে একটি ঝোপে লুকিয়েছিল, বিপদ বুঝতে পেরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কামধেনুই যেন তাদের পথ দেখিয়ে দিল। তাহ'লে নদী পার হবে। তারা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজ এস্পার কি ওস্পার একটা কিছু করবেই। তা ছাড়া দেবতাদের অমৃত হওয়ার ব্যাপারে ওরা স্পষ্টই বুঝতে পারল তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রায় হার স্বীকার করেছেন। আত্মসমর্পণ ওঁদের করতেই হবে, না হয় তো স্বর্গ থেকে তাঁরা নড়বে না।

ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দাকিনীর জলে।

নদীটি বেশি প্রশস্ত নয়, পঁচিশ কিংবা ত্রিশ গজ হবে।

স্বর্গীয় নদীর জলে পঞ্চাস্ত মানুষদের সমস্ত ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল।

নদী থেকে উঠেই সম্মুখে দেখতে পেল পারিজাত বৃক্ষ। এই বিখ্যাত বৃক্ষের কথা এবং এর বিখ্যাত পুষ্পের কথা তাদের আগে থাকতেই জানা ছিল। তারা গিয়ে দাঁড়াল সেই গাছের নীচে। প্রচুর ফুল ফুটে ছিল গাছে, কিন্তু আপাতত তারা সে দিকে মন দিতে পারল না। মনোযোগ দিলে ইন্দ্রের পক্ষে একটু মুস্কিল হ'ত, কারণ তিনি ইতিমধ্যে অমৃতভাণ্ড নিয়ে সেই গাছের ডালেই গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন।

ওদের একজন প্রশ্ন করল, যদি কামধেনু দেখা না পাই?

আর একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গটা দখল করলে কেমন হয়?

আর একজন বলল, দেবতারা পৃথিবীতে গিয়ে অমৃতলোকে বসবাস করুক, আমরা থাকি এখানে।

ইন্দ্রের কানে-এই সব মারাত্মক কথা গিয়ে তাঁকে আরো উতলা ক'রে তুলল। স্বর্গও যাবে, অমৃতও যাবে, এমন যে ওরা কিনারা।

ওদের আর একজন বলল, স্বর্গ দখল করা এখন আর ইচ্ছে নয়, কিন্তু এখানে আমরা থাব কি?

যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন।

একজন প্রশ্ন করল, স্বর্গেও কি খাওয়া-দাওয়া আছে?

আর একজন বলল, না হ'লে এতদিনে বেঁচে বর্তে হ'ত কেন?

আর একজন বলল, তোমার খাবার ইচ্ছে তো বিচার করে দেখ।

দু হাজার লোকের সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, আমরা সবাই খেতে চাই, খিদেয় পেট জ্বলতে আরম্ভ করেছে।

ইন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায়রে দুর্ভিক্ষের দেশের লোক!

একজন প্রস্তাব করল, কামধেনুকে খুঁজে বের করতে হবে।

ওদের কেউ কেউ কামধেনুর পশ্চিম জানত না। তারা এ প্রস্তাবে হতাশ হয়ে বলল, তাকে দিয়ে কী হবে, ফসল ফলিয়ে খাব?

প্রস্তাবকারী বলল, না। ওকে পেলেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান। এর কাছে যা চাইবে তাই পাবে, এবং চাওয়ামাত্র পাবে।

সে আবার কেমন গোরু?

ও আসলে গোরুই নয়। গোরুর ছদ্মবেশে ও স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যে সাধারণ। ও যে সবার কামনা পূরণ করে।

কামধেনু ওদের কাছাকাছি এক গর্তে লুকিয়েছিল, সে এ-কথায় বেশ কৌতুক অনুভব করে।

(৫)

ওরা এইখানে নানা রকম আলোচনা এবং আক্রমণ আর অনুসন্ধান পরিকল্পনা শেষ ক'রে চারটি পৃথক দলে বিভক্ত হ'ল এবং চতুর্দিকে অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

ইন্দ্র বৃক্ষতল নিরাপদ জ্ঞান করায় তাঁর আশ্রয়-শাখা থেকে নীচের দিকে পা বাড়াতেই গাছের মাথা থেকে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন ধ্বনিত হ'ল, ওরা কি চলে গেছে?

ইন্দ্র চমকে উঠে চেয়ে দেখেন, ব্রহ্মা পদ্মাসনে বৃক্ষশীর্ষে বসে আছেন।

ইন্দ্রের অভয় পেয়ে তিনিও নেমে এলেন নীচে। এসেই প্রশ্ন করলেন, বিষ্ণুবর্মা কোথায়? তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি এমন একটা দুর্গ তৈরি করানো দরকার যেখানে মানুষেরা প্রবেশ করতে না পারে। নারদ বেরিয়ে গেছে—ও নিতান্তই নির্বোধ, ওকে এখুনি ডেকে আন।

ডেকে আনতে হ'ল না। দেখা গেল নারদ বীণা বাজাতে বাজাতে ওঁদের দিকেই আসছেন।

ব্রহ্মা বললেন, তা হ'লে কি মানুষেরা অদৃশ্যলোকে ফিরে গেল? তা হ'লে কি নারদের বীণাকে 'অদৃশ্য-ফিরার' মনে করতে পারি?

নারদ কাছে এগিয়ে এসে বললেন, পারেন। তার কারণ আমি স্বর্গের বিপদ আশঙ্কা ক'রেই ওদের বলেছিলাম। বিশ্বাস করুন, এ রকম একাগ্রচিত্ত শ্রোতা আমি ইতিপূর্বে আর কখনও পাইনি। আমার বিশ্বাস আমি সাফল্যও লাভ করেছি। বিদ্যুৎবর্ণ ওদের মধ্যেই আমি দেখলাম মুক্তির উপায় অতি সহজ। আমরা মানুষের সম্পর্কে এতদিন একটা মতবদ্ধ ধারণা নিয়ে আসছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম অদৃশ্যলোকের লোকেরা কখনও একসঙ্গে মিলতে পারে না। তাই যখনই পূর্বের লোকেরা এসেছে তখনই বলেছি অমৃত মেলে না। পশ্চিমের লোকেরাও যখনই এসেছে তাদেরও ঐ এক কথাই শুনিয়েছি। আমরা জানতাম,

ওরা যতদিন পৃথক থাকবে ততদিন আমাদের কোনো আশঙ্কাই নেই। শুধু পুর শুধু পশ্চিম কখনও পৃথকভাবে আমাদের কাছ থেকে অমৃত কেড়ে নিতে পারে না। আমরা এই ভেবে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম।

ব্রহ্মা বললেন, এখন কিভাবে ওদের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করবে?

নারদ বললেন, সেটা মুখে না ব'লে একেবারে কাজেই দেখিয়ে দিই। মানুষেরা তো দেবতাদের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর আবার ফিরে এদিকেই আসছে। আপনারা নির্ভীকচিত্তে এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন, এবং আমি যা করি, বিনা প্রতিবাদে তা দেখুন।

ব্রহ্মা বললেন, তোমার কথা বরাবরই বিশ্বাস করেছি, এখনও করলাম, কিন্তু এ পরীক্ষাসাপেক্ষ তার উপরে তোমার এতখানি ভরসা করা কি ঠিক হচ্ছে?

নারদ বললেন, দেখুনই না। আমার বিশ্বাস আমি সফল হব। পারব স্বর্গকে বাঁচিয়ে দিতে। ঐ তো মানুষেরা সব এসে পড়ল।

ইন্দ্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, অমৃতভাণ্ডটা কি সামনেই প'ড়ে থাকবে?

নারদ বললেন, যেমন আছে তেমনি থাকবে।

ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত এবং সভয়ে নারদের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাদামেখা ক'রে-পড়া পারিজাত ফুলগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

(৬)

জম্বুদ্বীপের লোকেরা আসছে যেন বন্যার স্রোতের মতো। তারা দেখতে পেয়েছে ব্রহ্মা নারদ ইন্দ্রকে। তারা মুহূর্তে মুহূর্তে অধিকতর উল্লাসে নন্দন-কাননের প্রান্ত কাঁপিয়ে তুলছে। তারা দুর্বার, তারা দুর্বাধ, তারা দুর্নিবার, তারা দুরন্তপনের। তাদের স্রোত যদি প্রতিহত না করা যায় তা হ'লে তারা সমস্ত স্বর্গকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তারা গর্জন করতে করতে আসছে, বর্ষার নদীর মতো তারা পাক খেয়ে খেয়ে ফুলে ফুলে উঠছে।

ব্রহ্মা কম্পিত কণ্ঠে নারদকে বললেন, বাবা, এখনও হয় তো সময় আছে।

নারদ বললেন, নির্ভয়ে অপেক্ষা করুন পিতঃ।

ইন্দ্র মাথা নীচু ক'রে রইলেন, ঊর্ধ্ব পার্থীর বিপদাশঙ্কায় বালিতে-মাথা গুঁজে থাকার মতো।

তবু তিনি অমৃতভাণ্ডের কথাও ভুললেন।

জম্বুদ্বীপের প্রবল জলপ্রপাত মাথার উপর থেকে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নারদ হাত তুলে বললেন, স্তব্ধ হও। আমরা আজ তোমাদের অমৃত দান করব ব'লেই এতদূর ছুটে এসেছি। এই নাও অমৃত।

রাশি-অমৃতের ভাণ্ডটি তাদের সম্মুখে এগিয়ে দিলেন।

জলপ্রপাত মুহূর্তে যেন প্রস্তরীভূত হ'ল।

আর পাথর হয়ে গেলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং কামধেনু।

এই অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা দেখে জম্বুদ্বীপের লোকেরা কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারল না। এত বড় প্রতিশ্রুতি তাদের মনে আর কিছুতে এত দিন হয় নি। এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

একজন মাত্র অমৃতভাণ্ডটি ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু মধ্যপথে তারও হাত থেমে গেল।

অমৃত তারা কেড়ে নিতে এসেছিল, কিন্তু এ যে দিতে চায়!

আরও একজন হাত বাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু তারও মনে সন্দেহ জাগল, দিতে চায় কেন?

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে শুধু বলে, একি হ'ল। এ যে দিতে চায়।

সাহসী লোকটি বলল, সত্যিই দিতে চান, না প্রতারণা?

নারদ গম্ভীরভাবে বললেন, অমৃতভাণ্ড তোমাদের সামনেই।

ওরা এ কথায় আবার চমকিত হ'ল, আবার ওদের মনে সন্দেহ জাগল।

একজন এগিয়ে এসে পরীক্ষা ক'রে বলল, অমৃতই বটে। এরকম বর্ণ এবং গন্ধ আর কোনো বস্তুর হ'তেই পারে না।

ওরা আরও কিছুক্ষণ পরস্পর মুখ-চাওয়া চাওয়ি ক'রে বলল, আমরা অমৃত নিতেই এসেছি, নিচ্ছি তার, কিন্তু তার আগে নিজেদের মধ্যে একটুখানি পরামর্শ ক'রে নিই, কারণ অমৃত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ওর ফলাফল কি হতে পারে এতদিন বিস্তারিতভাবে তাবার দরকার হয়নি, আজ সেটা বিশেষ দরকার মনে করছি।

দূরে একটি লতাকুঞ্জ দেখা যাচ্ছিল, গোপন পরামর্শের পক্ষে স্থানটি উত্তম বিবেচনা ক'রে ওদের দলপতিরা সেইখানেই গেল।

সেখানে স্বর্গের গুপ্তচরেরা লুকিয়েছিল, তারা মানুষের পর পেয়ে পিছন দিক দিয়ে লতাকুঞ্জ ভেঙে পালিয়ে গেল।

দলপতিদের পরামর্শ সভা বসল এইখানে। একঘণ্টা আলোচনার পর, অমৃত ভোগ করতে পারলে জম্বুদ্বীপের কি অবস্থা হবে, সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ একমত হ'ল।

ওরা কল্পনা ক'রে খুশি হ'ল যে—

(১) কারও কোনো দুঃখ থাকবে না।

(২) সবাই স্বাধীনভাবে সুস্থদেহে প্রফুল্লমনে বাঁচতে পারবে।

(৩) অকালমৃত্যু সম্পূর্ণ লোপ পাবে।

(৪) দেশে প্রচুর ফসল ফলবে।

(৫) কোনো অভাব না থাকাতে পরস্পরের মধ্যে অকারণ প্রতিযোগিতাও থাকবে না।

(৬) পূব এবং পশ্চিম দু দিকেই সমানভাবে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।

(৭) ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আলোচনা শেষ ক'রে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠল। সবাই বলল, এখন অমৃত নিশ্চিন্ত মনে ফল্গু যেতে পারে, কোনো দিক দিয়েই অসুবিধার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অতএব অবিলম্বে অমৃতভাণ্ডটি হস্তগত হওয়া দরকার।

সভা শুরু হ'ল, সবাই উঠল।

একজন কিন্তু উঠল না। সে বলল, মস্ত একটা সন্দেহ ঢুকেছে আমার মনে।

সন্দেহ! সন্দেহের কথায় সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাইতো সন্দেহ যখন আছে তখন ওদের মনেও তো তা জাগা উচিত। এত সহজে তা হ'লে মতের মিল হওয়া ঠিক হয়নি।

সন্দেহ যাদের মনে জাগেনি তারা নিজেদের নির্বোধ মনে করতে লাগল।

সন্দেহবাদী বলল, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে কি জান?

ওর মধ্যে কি কোনো প্যাঁচ আছে না কি? ওরা সবাই প্রশ্ন করল।

সন্দেহবাদী বলল, আছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা মানে হচ্ছে পশ্চিম পূব ইচ্ছে করলে পাগড়ী ব্যবহার করতে পারবে, পশ্চিম ইচ্ছে করলে হ্যাট ব্যবহার করতে পারবে।

সবাই হতাশ ভাবে ব'সে পড়ল।

পূব অনেক চিন্তা ক'রে বলল, তাই তো, তা হ'লে অমৃত নিয়ে আমাদের লাভ কি?

পশ্চিম বলল, আমরাও ভাবছি, লাভ কি? অমৃতে তা হ'লে তো সমস্যা মিটছে না। বিরোধ বিবাদই থেকে যাচ্ছে, উপরন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হ'য়ে যাওয়াতে এবং মনে এবং দেহে নতুন শক্তি লাভ হওয়াতে আমাদের মধ্যে আগের চেয়েও বেশি ক'রে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।

পূব বলল, এটা সম্পূর্ণ ভাবা কথা।

একজন আলোচনারী ছিল, সে বলল, বেশির ভাগই যদি ভাল হয় তবে একটা বিষয়ের খুঁতিয়া ছাড়লে ক্ষতি কি?

পূব পশ্চিম সমস্বরে বলল, ছাড়তে হয় তো অমৃতই ছাড়ব, ধর্ম ছাড়ব না।

দু পক্ষই উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এল সভাকক্ষ থেকে এবং এসেই নারদকে গিয়ে বলল, অমৃত স্বর্গেই থাক।

ব্রহ্মা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।

(৮)

স্বর্গে বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে। দেবতারা আজ যুক্তি বিদ্যা পারদর্শী, এই উপলক্ষে নারদকে সম্মানসূচক দান করা হবে।

ব্রহ্মা নারদকে বলছেন, আমরা স্বর্গে ব'সে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছি, কিন্তু বিজ্ঞানসৃষ্টিতে তুমি অদ্বিতীয়।

নারদ বিনীতভাবে বললেন, আপনাকে স্মরণ ক'রেই আমি বলছিলাম। আমার এই সত্যটি মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে 'জ্ঞেয় না' হ'লে যদি অকৃতকার্য হয়ে থাকি, তা হ'লে জ্ঞেয় জানা সফল হ'তে পারে। পরীক্ষাতেও তা প্রমাণিত হ'ল। এখন আর আমাদের ভয় নেই। ওরা যখনই আসবে, বলবে

রোমন্থন

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

[অতি পুরোণো শহর...আজ গণ্ডগ্রাম...পরিত্যক্ত...অধিকাংশ পুরুষ সপ্তাহ-অন্তে আসা-যাওয়া করে...সন্ধ্যা নামতেই পথঘাট পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে আসে...এ হেন শহরে যদি কোন দিন গিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন, প্রকাণ্ড বাড়ী...দেওড়ী যে ছিল, তার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এক থাক ইঁট দাঁড়িয়ে আছে...লাল ইঁটগুলো গুঁড়ো, গুঁড়ো হয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে...রাস্তা থেকেই দেখা যায়, সোজা, এক-থাক, দু-থাক, অন্দরমহল...বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ...শূন্য...দেখছেন না? এতো হলো তার বাইরের চেহারা...তার জীর্ণ কাল-দগ্ধ দেহ.. কিন্তু তার আত্মা! তাকে দেখেছেন কি? অনুভব করেছেন তার প্রাণ-স্পন্দন? বিদীর্ণ-প্রস্তর পূজা-হীন তীর্থ-দেবতার অন্তরের অবিনাশী আশীর্ব্বাদ...তাই বহন করে এনেছে এই অপূর্ব্ব কাহিনী যাতে পাঠক এবং লেখক উভয়েই হাঁস ফাঁস !]

বাকইহাটীতে গেছলাম মাছ ধরতে। কাছেপিঠে অর্থাৎ কলকাতার আশেপাশে পুকুরের অভাব নেই, তবু যে চল্লিশ মাইল দূরের এই অচেনা-অজানা গ্রামে গাঁটগাঁড় বেঁধে বংশ-শিকারে বেরিয়েছিলাম, তার একটু কারণ আছে।

বাকইহাটির রায়েদের মণীশ কাজ করতো আমাদের আপিসে এবং সে তাদের গ্রামে নিয়ে যাবার জন্যে বহুবার জোরাজুরি করেছে।

যাবো যাবো করে এতদিন যাওয়া হয় নি।—গণেশ রাজী হয় তো সুধীর রাজী হয় না, সুধীর রাজী হয় তো বীরেন রাজী হয় না।

যাক, এতদিন পরে তোড়জোড় করে সদলবলে মণীশদের গ্রামে গিয়ে তো ওঠা

ষ্টেশন থেকে গ্রাম প্রায় মাইল-দুয়েকের পথ। আমরা যখন গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো হবে। বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া করে সব বেরিয়েছিলাম, কাজেই তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিল না,—পৌঁছেই পুকুর-ঘাটে ছিপ নিয়ে সারিসারি বসে পড়া যেতো বরং।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ জমতে সুরু করেছিল। মণীশদের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন হাজির হলুম, তখন আকাশ বেশ ঘনঘটা করে এসেছে।

মণীশদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। সে যে এক অতি-প্রাচীন জমিদার বংশের ছেলে তা সকলেরই জানা ছিল, কিন্তু তাদের বাড়ীটা যে এত প্রকাণ্ড এবং বিরাট হতে পারে তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি।

সত্যিই তাদের বাড়ীটা একটা দেখবার জিনিস। আজ আর পূর্বের শ্রী নেই। অনেকখানিই ভেঙে পড়েছে এবং যেটুকু আস্ত আছে, তাও পতনোন্মুখ। মেরামতের অভাবে দেওয়ালগুলোর রং ধরেছে, আর সেই ফাটল্ বেয়ে অশত্থ এবং বটের চারা অবাধে শেকড় নামিয়ে দিয়েছে।

সদরে প্রকাণ্ড সিং-দেউড়ী। দেউড়ীর দুদিকে বিরাট দুটো পিলুপে আজও মরিবাটি করে কোন রকমে খাড়া হয়ে রয়েছে। পিলুপে দুটোর ওপর এককালে দুটো সিংহ ছিল;—আজ তাদের সবই লোপ পেয়েছে, আছে কেবল পায়ের তলাকার কতকাংশ আর থাবা-চারটে।

দেউড়ী পার হয়েই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড্। কম্পাউণ্ডের মাঝখানে পুকুর। পুকুর না বলে তাকে দীঘি বললেই বোধ করি ঠিক হয়।

এতবড় প্রকাণ্ড বিরাট বাড়ীখানা যাদের, তাদের বংশধর যে কোনদিন সদাগর-আপিসে কেরাণী-গিরী করতে পারে—একথা ভাবতেও যেন মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতে থাকে। মণীশকে আজ নূতন চোখে দেখলুম। আমাদের আপিসের বড়বাবুকে আজ তার কাছে নিতান্ত খেলো মনে হতে লাগলো;—এমন কি আপিসের বড় সায়েবকে পর্যন্ত।

বাইরের একতালার একটা ঘরে গিয়ে সব বসলুম।—প্রকাণ্ড ঘর।—দেয়ালের বালি খসে পড়ে স্থানে স্থানে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। ঘরের নাতিবৃহৎ একটা দেয়ালে ওক্‌লোষ হয়েছে। কোন্ সাকাতার আমলের একটা শেল্লায় সতরঞ্চি তিন-চার ভাঁজ করে তার ওপর পাতা। সতরঞ্চিটার রং এককালে কি ছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। বহুকালের সঞ্চিত ধূলোর প্রলেপে আজ তার আদিম পরিচয় বেমালুম ঢাকা পড়ে গেছে। একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ঘরখানার আবহাওয়া যেন ভারাক্রান্ত। বেশ বোঝা গেল, বহুকাল পরে আমাদের জন্যে ঘরখানা খোলা হয়েছে।

ঘরে একটা খোলা জানলা দিয়ে ভিতরের উঠানের কতকাংশ দেখা যাচ্ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না, জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিরাট উঠোন। চারিদিকে চকমেলানো থামের সারি। উঠানের মেঝে তিনহুকুরে পুজোর দালান। পুজোর দালানের থামগুলোর বালি খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। ছাদের কতকাংশ ভেঙে পড়ায় পুজোর দালানের মাঝখানটাতে একরাশ ইঁট পাটকেল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। তারা ঘরময় চওড়া কার্ণিসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কবুতরের দল বাসা বেঁধেছে। তাদের চাপা বুকবকানির মধ্যে কোথায় যেন একটা একঘেয়ে বৈরাগ্যের সুর গুমরে গুমরে উঠছে।

প্রাণটা কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠলো। জানলা ছেড়ে তক্‌লোষটার উপর এসে বসলাম।

মণীশ আমাদের ঘরে বসিয়ে তাদের সন্ধানে বেরিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরে এলো। তার পিছন পিছন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে একটি চাষা-ভুষো গোছের আধাবয়সী লোক। মাথায় তার এক বুড়ি ডাব আর একটা কাটারি।

চা-খাওয়ার পালা শেষ করে চায়ের পুটলি আর বইপত্র নিয়ে সব বেরিয়ে পড়লুম। আকাশ উত্তর দিকে বেশ মেঘলা হয়ে এসেছে এবং একটা এলোমেলো জোলো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে। বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়।

জলে চায়ের ফেলে তোড়জোড় করে বসতে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। ইতিমধ্যে দুর্যোগ বেশ ঘনিয়ে উঠেছিল।

প্রথমে উঠলো ঝড়। দূরের গাছপালাগুলো হেলে পড়ল একদিকে। একটা শোঁ-শোঁ শব্দ চারিদিক থেকে যেন সবেগে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। তারপরেই নামলো জল।—এক একটা ফোঁটা নয় ত যেন তীরের ফলা।—পালা, পালা, পালা! ছিপ গুটিয়ে ছুটলুম আড্ডা ঘরের দিকে।

কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলুম কে জানে!—

ঘরের মধ্যে ঢুকেই গণেশ বললে—"ট্রেণে উঠেই সুধীরটা বড়বাবুর নাম করেছিল মনে আছে?—এখন বোঝো ঠ্যালাটা!"

বীরেন বললে—"ট্রেণ ফেলটায় নি এই যথেষ্ট!"

গণেশ বললে—"বাড়ী ফেরবার সময় হয়ত কপালে তাও আছে।"

ছিপগুলোকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে সব শুয়ে পড়লাম তক্তপোষের উপর। বাইরে তখন প্রলয়কাণ্ড সুরু হয়েছে। বৃষ্টির ঝাপ্টের উৎপাতে ঘরের জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রুদ্ধ দ্বার অন্ধকার ঘরে তক্তপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম ঝড়ের চাপা আর্তনাদ।

হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে ঢুকলো একটি লোক। মাথাটা তুলে গণেশ বললে—"কে, মহেশ? কি খবর রে?"

"আজ্ঞে, বড়বাবু একবার···

"বলগে যা—যাচ্ছি।" বলে গণেশ গায়ের চাদর দিয়ে উঠে বসলো।

জিজ্ঞেস করলুম—"বড়বাবু মানে?—তোরা তো সবাই কলকাতায় বাসায় থাকিস।"

তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গণেশ বললে—"হাঁ সবাই কলকাতায় থাকি বটে, কেবল বড় আঠারখাই থাকেন এখানে।"

বললুম—"একলা?"

"না, ঠিক একলা নয়, আমার এক বিধবা মিসি আছেন এখানে। ওঁরই মেয়ে আর কি! তিনিই ওঁকে দেখাশুনো করেন।"

বললুম—"অনেক ব্যাপার হয়েছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, তা প্রায় পঁচাশী হবে। তার ওপর আবার অন্ধ।"

"অন্ধ?—কতদিন থেকে অন্ধ হয়েছেন।"

"তা প্রায় দশ-বারো বছর হবে।"

মণীশ চলে গেল অন্দরের দিকে।—কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল—"আঠাইমাই তোদের ডাকছেন।"

জগন্তা উঠতে লাগলো। প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠলুম। সুমুখেই লম্বা টানা বারান্দা। আমাদের পায়ের শব্দে একঝাঁক পায়রা ফড় ফড় শব্দে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে গিয়ে বসলো।

বারান্দার কোলে সারিবন্দী ঘরের শ্রেণী।—সবই তালাবন্ধ।

মণীশকে অনুসরণ করে বারান্দার একবারে শেষের ঘরটায় গিয়ে সব ঢুকলুম।

প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। হল বললেই চলে। বৃষ্টির জন্যে জানলাগুলো সব বন্ধ। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে ঘরখানা কেমন যেন থম্ থম্ করছে।

ঘরের একবারে শেষ বরাবর একটা সেকেলে পুরু গদির ওপর বিছানা পাতা। তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। দেহে মাংসের বালাই নেই বললেই চলে,—আছে কেবল হাড় কখানা,—সেকেলে চওড়া হাড়। দেখলেই বেশ বোঝা যায়,—এককালে কাঠামোখানি দেখবার মতই ছিল। বনেদী বাড়ী খাবার মতই বৃদ্ধের বনেদী দেহে ভাঙন ধরেছে,—যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।

আমাদের পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে বৃদ্ধ বললেন,—"কে মাণু?—তোর বন্ধুদের নিয়ে এলি বুঝি?"

মণীশ বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

একে একে বৃদ্ধের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। শুনে শুনেই বৃদ্ধ বললেন—"এসো বাবা এসো!—হ্যাঁরে, ওদের বসবার জন্যে কিছু পেতে দিয়েছিস তো?"

মণীশ বললে—"দিয়েছি আঠাইমাই।"

দুখানা ছেঁড়া মাদুর বৃদ্ধের শয্যার সুমুখেই পাতা ছিল। তারই উপরে গিয়ে সব বসলুম।

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন—"সেই ইতাদুলী গালচেটা পেতে দিলি না কেন?"

মণীশ সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো—"আজ্ঞে, সেইটেই পেতে দিয়েছি।"

অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠে বৃদ্ধ বললেন—"বেশ, বেশ।—ওগুলো চাদীর ওপর জড় করে রেখে পোকায় খাওয়ানোর চেয়ে মাঝে মাঝে ব্যবহার করলেই ভাল হয় না কি?—তোমরাই বল না বাবা?"

কানুর—"আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

বৃদ্ধ আরম্ভ করলেন—"ও জিনিস এখন আর খাবা খুঁজলেও কোথাও পাবে না।—ওর কারণগুলো লক্ষ্য করে দেখেছ বাবা?"

চোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললুম—"আজ্ঞে দেখেছি।—খুব সুন্দর!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন—"সখ করে অতদূর থেকে ওরা মাছ ধরতে;—গোড়া শুদ্ধ সব মাটি করে দিলে।"

বললুম—"আজ্ঞে তাতে আর কি হয়েছে?—বেড়াল তো কোলা।"

অত্যন্ত চাপা দীর্ঘশ্বাস বৃদ্ধ বললেন—"এখানে দেখবার মতন তো কিছু নেই!—শুধু শুধু কেবল কষ্টভোগ বৈ তো নয়।"

বললুম—"আজ্ঞে, আপনাদের বাড়ীটাই তো একটা দেখবার জিনিস।"

বৃদ্ধের মুখখানা সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—বললেন—"তোমাদের তা হলে ভাল লেগেছে?"

বললুম—"শুধু আমাদের কেন, যে দেখবে তাকেই তারিফ করতে হবে।"

বৃদ্ধ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—বললেন—"আমাকে ধরে বসিয়ে দিতে পারিস বাবা?"

মণীশ বললে—"কষ্ট হবে না আপনার?"

"না না, কিছু কষ্ট হবে না। তুই আস্তে আস্তে ধরে বসিয়ে দেনা। বিছানাগুলো পিঠের দিকে উঁচু করে দিলেই ঠিক বসতে পারব।"

মণীশ অনেক কষ্টে ধরাধরি করে বৃদ্ধকে বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"হাঁ, কি বলছিলে?—যে দেখবে তাকেই তারিফ করতে হবে?"

বললুম—"নিশ্চয়ই!"

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে বৃদ্ধ বললেন—"তুমি ঠিক বলেছ বাবা!" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন—"উডবর্ণ সাহেবের নাম শুনেছ বোধ হয়? বাংলার যিনি ছোটলাট ছিলেন একদা? তখন বাংলার লাটকে বলা হোতো লেফ্‌টানেন্ট্ গভর্ণর।—আমরা বলতুম ছোটলাট। ঠাকুরদাদাই অর্থাৎ রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের সঙ্গে উডবর্ণ সাহেবের খুব দহরম মহরম ছিল। সেই সূত্রে উডবর্ণ সাহেব একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। বাড়ী দেখে তিনি.....

এই পর্য্যন্ত বলেই উত্তেজনার প্রাবল্যে বৃদ্ধ হঠাৎ খক্ খক্ করে কাশতে সুরু করে দিলেন।

কাশির বেগটা একটু কমতেই বৃদ্ধ বললেন—"পশ্চিম দিকের জানলাটা বন্ধ রয়েছে বুঝি? উঠে খুলে দেতো বাবা।"

মণীশ উঠে জানলাটা খুলে দিলে। বাইরে তখনও সমানে বৃষ্টি চলেছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলাটা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

একটু দম নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখতে পাচ্ছ বল দেখি?"

বৃদ্ধের কথামত বাইরের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যিই বৃষ্টি ছাড়া কেবল একঘেয়েকার জমি আর ঝোপঝাড়।

উত্তর না পেয়ে বৃদ্ধ বললেন—"রাসমঞ্চ দেখতে পাচ্ছ না? ঠিক চোখের সোজা!"

আমি উত্তর দেবার পূর্বেই মহীশ বলে উঠলো—"ঐ যে রে কাঁঠালগাছটার ঠিক ডানদিকে।" সঙ্গে সঙ্গে চোখ টিপে একটা ইসারা করলে।

বুঝলুম এও সেই ইতালুলী গালচের মতই ব্যাপার। বললুম—"হ্যাঁ এইবার দেখতে পেয়েছি।" কিন্তু কাঁঠাল গাছটার ডানদিকে দৃষ্টিপাত করে যা দেখলুম তা যে কোনদিন রাসমঞ্চের আকার ধারণ করে খাড়া হয়ে উঠেছিল, তা কল্পনাও করা যায় না।—দেখলুম, কাঁঠালগাছটার ডানদিকে খানিকটা খোলা জমির ওপর স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে একরাশ ইটপাটকেল আর রাজ্যের যত রাবিশ। একটা ছোটখাটো পাহাড় বললেই চলে।

বৃদ্ধ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওর গড়নটা লক্ষ্য করেছ?" তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে উঠলেন—"সারা বাংলা-দেশ ঘুরে এসো, ও ছন্দের গড়নের রাসমঞ্চ আর একটিও খুঁজে বার করতে পারবে না।"

তার পরেই মহীশকে বললেন—"চূড়োর ওপরকার পেতলের কলস ছিনটে অনেকদিন মাজা হয় নি মাহু! একদিন কবরীকে লাগিয়ে দেনা!—কিছু না, একবালতি তেঁতুল-গোলা আর খানিকটা শুঁড়ো-খড়ি নিয়ে উঠে একটু ঘষাঘষি করলেই ঝক্ ঝক্ করে উঠবে।"

মহীশ শুধু বললে—"হুঁ!"

বৃদ্ধ আবার সুরু করলেন—"রাসমঞ্চ থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে দক্ষিণ দিকে একটা ছোট দোতালা বাড়ী দেখতে পাচ্ছ?"

চেয়ে দেখি, সত্যিই সেখানে একটা দোতালা বাড়ী কোন রকমে খাড়া হয়ে রয়েছে। দোতালাটা জেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে। ছাতের কড়ি-বরোগাগুলো পর্য্যন্ত খসে পড়েছে। খাড়া হয়ে রয়েছে কেবল থিলেনগুলো। একতালাটা আজও অক্ষত রয়েছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে যেরকম ফাট ধরেছে, তাতে করে ওর পরমায়ু আর বেশি দিন নয়।

বৃদ্ধ বলে চললেন,—"দোতালার পাশা-পাশি ছুটো ঘর দেখতে পাচ্ছ বোধ হয়?"

বললুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দক্ষিণ দিকের ঘরটাতে কে থাকতো জান?—মুরেশ্বরী! মুরেশ্বরীর নাম শোন নি তোমরা?"

মহীশ—"আজ্ঞে না!"

"অতবড় খেয়ালী সারা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় জন্মায় নি। মুরেশ্বরীর খেয়াল যে না শুনেছে....."

এই পর্য্যন্ত শুনেই বৃদ্ধ কপালে হাত ঠেকিয়ে জিবের লোল টুকলেন। তারপর আবার সুরু করলেন—সে প্রায় বহুকালের কথা। ঠাকুরদাদামশাই তখন বেঁচে। আমাদের দোতালার বৈঠকখানায় গানের আসর বসেছে। মুরেশ্বরী এসেছেন সেতার। আসর একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে। ঠাকুরদাদামশাই ছিলেন

একজন বড় সমজদার। গান থামতেই বলে উঠলেন—"ধন্যিাদি ওস্তাদজী,—কুমারী কায়। তোমার গান শুনে মনে হচ্ছে যেন সত্যি সত্যি ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে।"

"এর উত্তরে সুরেখা কি বলেছিল জান?—বলেছিল—'শুধু মনে হলে চলবে না বাবুসাব, সে দিন গলা খুলে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামিয়ে দেবো আসমান থেকে, সেইদিন বুঝবো হুয়ে যায় বিশ্বত।"

কথাটা শেষ করে বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বোধ করি, বহুকাল আগেকার সেই পুরাণো দিনের অস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে একে একে ভেসে ভেসে উঠছিল।

কিছুক্ষণ পরেই বৃদ্ধ আবার সুরু করলেন—"মোতাহার আর একটা গল্প কে থাকবে আমি?—মিশির-জী—জগদীপ মিশির। অতবড় তবলচি আজ পর্যন্ত জন্মে নি।—কি মিষ্টি হাত ছিল মিশির-জীর, আবার তেমনি তৈরী!—যেমন হুন্ তেমনি ঠাব। বোলের ধরণগুলো যেন কথা কইতো। মিশির-জীর মৃত্যু হয়েছিল কোথায় জান?—গানের আসরে—সঙ্গত করতে করতে।"

"তবে যদি শোন!—সে আজ বহুকালের কথা। আমার বয়স তখন বছর কুড়ি কি একুশ হবে। সরস্বতীপুজোর দিন রাত্তিরে বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে।—চলবে রাত—উঠোনে। বিরাট আয়োজন হয়েছে। বাংলার যত বড় বড় গাইয়ে-বাজিয়েরা ত এসেছেই, তা ছাড়া বাইরে থেকেও বহু ওস্তাদ নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। আসর একবারে জম-জমাট।"

"রামপুর থেকে এসেছেন দিলওয়ার খাঁ। হিন্দুস্থানের সেরা পরিয়া। সেবারকার আসরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এই দিলওয়ারখাঁর বাজনা।"

"সন্ধ্যে থেকেই আসর সুরু হোলো। প্রথমে ধ্রুপদ, তারপর খেয়াল, তারপর টপ্পা, ঠুংরী, গজল। সব শেষে হবে যন্ত্রসঙ্গীত।"

"গানের পালা শেষ হতে রাত দুটো বেজে গেল। সকলে হাঁ করে বসে আছে দিলওয়ারের বাজনা শোনবার জন্যে। দিলওয়ার বাজনা সুরু করলেন রাত আড়াইটের সময়। আগে থেকেই শোনা ছিল দিলওয়ার ভয়ানক হুনে বাজায়। এক হুন্ যে কত বড় তবলচির হাত থেকে যায়।"

"মিশির-জীর বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। কমিথার আর সে জোর নেই। কাজেই গয়া থেকে বলদেওপ্রসাদকে আনা হয়েছে। তাগড়াই সমর্থবান এই বলদেওপ্রসাদ। ভারতজোড়া নাম। বিশেষ করে হুনে একেবারে সিদ্ধহস্ত। বয়েসও বেশি নয়, কাজেই অফুরন্ত হুন্।"

"দিলওয়ারখাঁ শরদ্ সুরু করলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ আলাপ চললো তারপর সুরু হোলো লয়। বলদেও-প্রসাদ সঙ্গত সুরু করলেন।"

"লয় ক্রমেই বেড়ে চলেছে।—বলদেওপ্রসাদও সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। লয় আরও বেড়ে চললো। বলদেও তখন পর্যন্ত ঠিক চালিয়ে যাচ্ছেন। লয় ক্রমে আরও বাড়তে লাগলো, আরও; আরও। বলদেও ঘেমে উঠেছে, হাতের ধরণ বদলিয়ে যাচ্ছে। কোন রকমে ঠেকাটি বজায় রেখে চলেছেন।"

"গল্প আরও বেড়ে চললো। কলকেওর হাত আর চলে না।—ঠেকা বন্ধ হয়ে গেলো।—সভাশুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে উঠলো। ঠাকুরদার মুখের দিকে চেয়ে দেখি কে যেন সেখান থেকে সমস্ত রক্ত নিংড়ে বার করে নিয়েছে। অপমানে লজ্জায় সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।"

"দিলওয়ার তখনও সমানে বাজিয়ে চলেছেন। সঙ্গৎ থেমে গেছে—দিলওয়ারের বাজনা কিন্তু সমানে চলেছে। সে যেন তাল টুকে আসরকে হাঁক দিয়ে বলতে চায়—আউর কৌ হ্যায়?"

"বৃদ্ধ মিশির-জী আসরের মধ্যে চুপ করে বসেছিলেন, হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে উঠলেন। ঠাকুরদাদাই তাড়াতাড়ি মিশির-জীর হাতখানা চেপে ধরে বললেন—ক্ষেপেছ মিশির-জী!"

"কে কার কথা শোনে?—মিশির-জী কলকেওর কোলের কাছ থেকে তবলা তুলে নিলেন। দিলওয়ার-খাঁর বাজনা সমানেই চলছিল, মিশির-জী সঙ্গৎ সুরু করলেন। দিলওয়ারের গৎও যত বেড়ে চলে, মিশির-জীর সঙ্গৎও তত বেড়ে চলে।"

"সভাশুদ্ধ লোক সব হায় হায় করে উঠলো। সত্তর বছরের বুড়োর হাড়খানা আজ ভেল্কি দেখিয়ে ছাড়লে।"

"মিশির-জীর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে; কপালের মোটা মোটা শিরগুলো দড়ির মত শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে; সেই শীতের রাত্রেও ঘাম বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।—তবু হাতের কামাই নেই।"

"সকলে চেঁচিয়ে উঠলো—'কেয়াবাত সঙ্গৎ!' দিলওয়ারখাঁ পর্যন্ত বাজনা থামিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'বলিহারি ওস্তাদ!"

"ঠাকুরদাদাই বলেছিলেন, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন—'জিতা রহ মিশির-জী, তুহারি কাম!' তারপর নিজের গা থেকে ৫০০৲ টাকা দামের জামিয়ারখানা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন মিশির-জীর দিকে।"

"মিশির-জী একটি কথাও বলেন না, পাথরের মত নিশ্চল হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপরেই হঠাৎ আসরের উপর ঢলে পড়লেন।"

"ঠাকুরদাদাই চিৎকার করে উঠলেন—"কবিরাজ মশাইকে বৈগনির ডেকে নিয়ে আয় কেউ, বৈগনির বৈগনির!"

"কিন্তু কবিরাজ এসেই আসরে আগেই মিশির-জী....."এই পর্যন্ত বলেই বৃদ্ধ হঠাৎ থেমে গেলেন।

একটা থমথমে নীরবতা ঘরখানার মধ্যে যেন থম্‌থম্ করতে লাগলো। বাইরে তখনও ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে এবং মেঘের দল আকাশে থেকে থেকে ডেকে ডেকে উঠছে।

অন্ধ

"বনফুল"

[বনফুলের পরিচয় অনেকেই জানতে চান...এই গল্পে তিনি নিজের বুদ্ধিগত পরিচয় দিয়েছেন; তবে তাঁর যেটা আসল পরিচয় সেটাও এই ছোট্ট কাহিনীটির মধ্যে পাবেন...রোগের [illegible] করতে করতে রোগীর যে পরিচয় তাঁর চেতনায় আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে...তার মননীয় অভিজ্ঞতার মূল্যে আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ...]

১

যাঁহাদের গায়ের চামড়া শাদা তাঁহাদের একটা প্রধান গুণ তাঁহারা ভারী পরোপকারী। বিশেষতঃ কালা আদমির, উপকার করিতে পারাটাই যেন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই সমুদ্র ডিঙা নদী পার হইয়া, পর্ব্বত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কেবলই তাঁহারা পরোপকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

সদ্য-পাশ-করা ক্যাপ্টেন জোন্স আই, এম, এস, মহাশয়ও ভারতভূমিতে পদার্পণ করিবামাত্র পরোপকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'টুরে' বাহির হইয়া তাঁহার অধীনস্থ জনৈক নেটিব ডাক্তারের নিকট একদা নিজের মহৎ অভিপ্রায়টি ব্যক্তও করিলেন। অবশ্য ইংরেজিতে।

"দেখ," আমি ঠিক করিয়াছি দিন পাঁচিশজনকে গরীবদের চোখের ছানি কাটিয়া দিব রোগী জোগাড় করিয়া সদর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিও।"

নেটিব ডাক্তারটি কালা আদমি। সুতরাং অকৃতজ্ঞ। সাহেবের এতখানি উদারতায় গদ্‌গদ না হইয়া মনে মনে বাংলায় বলিলেন—"ব্যাটা হাড় পাকাবার মতলবে আছে।"

মনের কথা কিন্তু মুখে বলিতে পারিলেন না। সাহেব মানুষ, তাহার উপর ধনিব। সুতরাং ভুল ইংরেজিতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—"ও ইয়েস সার। এ তো খুব ভাল কথা। আমি তথাস্তু চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার হাসপাতালে যে সব রোগী আসে তাহারা সাধারণতঃ বড় গরীব। ট্রেণের ভাড়া দিয়া সদরে যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ!"

সাহেব ইহাতে দমিলেন না। তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"বেশ তো, তেমন গরীব যদি হয় আমিই তাহার যাইবার খরচ বাবদ দিব। তুমি যত পার রোগী জোগাড় কর। তাহার জন্য আটকাইবে না। এখান হইতে সদরে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবার ভাড়া আট আনা। রোগী পিছু আট আনা আমিই দিয়া দিব। বল তো পাঁচটা টাকা তোমাকে অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"

ডাক্তারবাবু দেখিলেন ব্যাটা বহুপরিকর।

বলিলেন—"না, না, টাকা অগ্রিম দিতে হইবে না। রোগী মোটামুটি হইলে ভাড়ার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এখানে তো চোখে-ছানি-পড়া রোগী বেশী আসে না। যদি আসে এবং যাইতে চায় আমি আপনাকে খবর দিব।"

"থ্যাঙ্কিউ।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুও মনে মনে 'খ'কার 'ঘ'কার করিয়া যথারীতি ঘাসের মলম কয়েকদিন ফিকশ্চার প্রভৃতি পরিবেশনে মন দিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় পনর দিন কাটিল। ইহার মধ্যে ডাক্তারখানায় কোন 'ক্যাটারাক্ট' রোগী আসিল না। আসিলে হয় তো ডাক্তারবাবু চেষ্টা করিতেন। চাকরি করেন। মনিবের মনোরঞ্জনের সুযোগ পাইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু সুযোগ আসিল না। ক্রমশ তিনি সে কথা ভুলিয়া গেলেন। সাহেবও কিছু বলেন নাই। তাহার প্রমাণ কয়েকদিন পরে পাওয়া গেল। একটি টাইপ করা পত্র আসিয়া উপস্থিত।

প্রিয় ডাক্তারবাবু,

আশা করি ক্যাটারাক্ট বিষয়ক আমার প্রস্তাবটি আপনি ভুলিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি সুযোগ ঘটিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার সরকারকে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক থানার দারোগাকে জানাইয়াছেন যে প্রত্যেকের এলাকায় যত অন্ধ রোগী বা রোগিণী আছে তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আপনার নিকট চৌকিদার মহ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আগামী রবিবার দিন বিভিন্ন এলাকা হইতে আপনার হাসপাতালে রোগী সমবেত হইবে। আমি সকালের ট্রেণে যাইব এবং অপারেশনের উপযুক্ত রোগী নির্বাচন করিয়া লইয়া আসিব। তাহাদের আপনি যত্ন করিয়া রাখিবেন এবং বলিবেন যে তাহাদের যাতায়াতের সমস্ত ভাড়া আমি দিব। তাহারা হাসপাতালে থাকিবে। কোন খরচ লাগিবে না। যদি খুব গরীব হয় চশমাও কিনিয়া দিব। আশাকরি আপনি এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

বশম্বদ

জে, জোন্‌স

ক্যাপ্‌টেন আই, এম, এস,

ডাক্তারবাবু আর একবার মনে মনে 'খ'কার 'ঘ'কার করিলেন। এ আবার এক ফ্যাসাদ জুটিল। কিন্তু একটি কথা মনে করিয়া তিনি একটু পুলকিতও হইলেন। কি-খরচার কেস. যার মকরধ্বজাদি করিয়া যদি সাহেবটাকে খুশী করিতে পারেন মন্দ কি। অনেক দিন হইতে সাব একটা ভাল জায়গায় বদলি হইবার। সাহেব প্রসন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ সম্ভব।

২

নির্দিষ্ট দিবসে হাসপাতালের সম্মুখস্থ ময়দানে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পুলিস কর্তৃক নীত হইয়া বহু চক্ষু-রোগী সমবেত হইল। বিরাট জনতা। সকলেরই চোখে যে ছানি পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু

থানার দারোগারা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। পুলিশ সাহেবের হুকুম—চোখের অসুখ থাকিলেই তাহাকে হাজির করিয়া দিবে—সিভিল সার্জন বাছিয়া লইবেন। তাহারা নিখুঁতভাবে হুকুম পালন করিয়াছে। এত চক্ষু-রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুরও চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি ইহাদের ভিতর হইতে ছানি-গ্রস্ত রোগীগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া একধারে জড়ো করিতে লাগিলেন। করিতে গিয়া দেখিলেন কেহই আলাদা একটা দল-ভুক্ত হইতে রাজী নয়। কেবল পুলিশের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছে না। একটি বৃদ্ধ ধর ধর করিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমার ঘরে আমার বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে তাকে দেখবে কে? দোহাই ডাক্তারবাবু, আমাকে বাদ দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এতে ভয় পাবার কি আছে। সাহেব নিজের খরচে তোমাকে পাঠাবেন, তোমার চোখ ভাল হয়ে গেলে আবার তুমি ফিরে আসবে।"

বৃদ্ধটি ডাক্তারবাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু তাহার ভয় ঘুচিল না। বেচারা দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একটু পরেই ভয়ের কারণটা বোঝা গেল। তখন 'সারা-ব্রিজ' তৈয়ারি হইতেছিল। কে যেন রটাইয়া দিয়াছিল যে নর-কঙ্কাল দিয়া ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের এই আয়োজন। কানাগুলাকে লইয়া গিয়া সেইখানে পুঁতিবে। জীবন্ত পোতা যায় না—তাই চিকিৎসার ছুতায় হাসপাতালে লইয়া গিয়া আগে শেষ করিবে—তাহার পর সারা-ব্রিজে চালান দিবে। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসন সত্ত্বেও এই অসম্ভব গুজবে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। পুলিশ কর্তৃক রোগী সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তাহারা সত্যই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের চোখের অসুখের জন্য পুলিশের এত মাথা ব্যথা কেন? বিরাট জনতা ভয়ে থর থর করিতেছে। কখন কি হয়।

৩

যথাসময়ে সাহেব আসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু যে কয়েকটি ক্যাটারাক্ট রোগীকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন সাহেবকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। এত রোগী দেখিয়া সাহেব অসন্তুষ্ট। ডাক্তার-বাবু ভীড়ের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। আধকাঁচা দাড়ি, পাকা ভুরু, দুই চোখেই ছানি পড়িয়াছে। একেবারে অন্ধ।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এই কেসটি আমার খুব ভাল বলিয়া মনে হইতেছে।"

"চোখের কেমন দেখিয়াছ?"

"আপনি দেখুন।"

বৃদ্ধ ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

"ভয়ো মৎ, ভয়ো মৎ, আচ্ছা হোগা।"

কুকের কাঁপুনি থামে না।

সাহেব তখন তাহাকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া চোখের উপরে পাতায় আঙুল দিয়া ঈষৎ চাপ দিলেন—উদ্দেশ্য 'টেন্‌শন্' দেখা। সামান্য চাপ—গণিবার কথা নয়—বৃদ্ধ কিন্তু দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আঁ—আঁ—আঁ—"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এক বিদঘুটে কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অন্ধ, অর্ধ-অন্ধ, চক্ষুষ্মান যে যেদিকে পারিল দৌড়াইতে লাগিল। কেহ পড়িয়া গেল, কেহ হোঁচোট খাইল, কাহারও মাথা ঠুকিয়া গেল, ভীড়ে আটকাইয়া গিয়া চীৎকার জুড়িল। নিমেষের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সাহেব থতমত খাইয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"লোকটি লোক, ভয় পাইয়াছে।" কয়েকজন লাঠি উঁচাইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করাতে গোলমাল আরও বাড়িল। তারস্বরে অনেকে আর্তনাদ সুরু করিয়া দিল। সাহেব চতুর লোক। নিমেষের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন বল-প্রদর্শন করিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।

ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—"যাহারা চলিয়া যাইতে চায় তাহাদের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। যে যেচ্ছায় যাইবে সে-ই চলুক। একজনও যদি যায় আপাতত তাই যথেষ্ট। তুমি এই লোকটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।"

দাড়ি-ওলা বৃদ্ধ তখনও সাহেবের কবলে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

"ভয়টা তোমার কিসের? এস তুমি আমার সঙ্গে।" ডাক্তারবাবু তাহাকে লইয়া হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাহেব ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া আরও দুই এক জনকে বাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন যে তাহা অসম্ভব। তিনি যে দিকে যান সেই দিকেই হাহাকার পড়ে, যে দিকে চান সেই দিক হইতে সকলে পলায়ন করে।

স্বেচ্ছায় কেহই যাইতে রাজী নয়।

দাড়ি-ওলা বৃদ্ধকে একটি নিভৃত ঘরে বসাইয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে বুঝাইতেছিলেন।

"কিসের ভয়টা তোমার বল না।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বৃদ্ধ অবশেষে কাহিনীটা চুপি চুপি বিবৃত করিল।

"তবছি না কি সায়ার যে পুল হচ্ছে তাতেই আমাদের পুঁতবে।"

"পাগল না কি তুমি! তা হলে কি আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি পাগি?"

বৃদ্ধ তখনও নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। সত্যই তো, ডাক্তারবাবু কখন তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন, তখন ভয়টা নিতান্তই অমূলক। এই ডাক্তারবাবু তাহার ছেলেকে বাঁচাইয়াছেন, স্ত্রীকে

বাঁচাইয়াছেন, তাহাকেও দুইবার যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। সব সময় ফিস্‌ও লন নাই। ইনি নগদ নিয়া তাহাকে কখনও এর বিপদে ফেলিবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ইহাও মনে হইল—হয় তো ডাক্তারবাবু নিজেই জানেন না। সাহেব হয় তো ইঁহাকেও ধাপ্পা দিয়াছে। এ কথা কিন্তু সে প্রকাশ করিল না।

বলিল—"কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাকে, আপনিই ওষুধ দিন। আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভাল হয়ে যাবে। আপনার কাছে কি ওষুধ নেই?" ডাক্তারবাবু সোজাসুজি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বলিলেন—"আমার কাছে যে ওষুধ আছে তাতে সারতে অনেক দেরি লাগবে। সাহেবের কাছে দু'দিনেই সেরে যাবে। অত বড় ডাক্তার, নিজে এসে দেখছে, এমন সুযোগ আর পাবে না। চলে যাও কয়েক দিন কষ্ট করবে দেখো। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, খেতে দেবে, শুতে দেবে, চোখ সারিয়ে চশমা পর্যন্ত দিয়ে যাও, চলে যাও।"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—"একা যেতে যদি সাহস না হয় তোমার ছেলেকে সঙ্গে নাও। ভয় কি আমি যখন কাছি চলে যাও।"

অনেক বলা কহার পর পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ যাইতে রাজি হইল।

ডাক্তারবাবুর কথায় অন্ধ বৃদ্ধের সত্যই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সাহেব সত্যই তাহার হিতৈষী এবং আপনার লোক। তাহা না হইলে কি সঙ্গে করিয়া এমন করিয়া লইয়া যায়। ডাক্তারবাবু নিজে আসিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া গেলেন। ট্রেন ছাড়িলে বৃদ্ধ তাহার পুত্রকে চুপি চুপি বলিল—"সাহেব কোথায়? তার সঙ্গে আলাপ কর না একটু। বল, সাহেব আমি ভাল হয়ে গেলে—ঘরের তৈরি গাওয়া ঘি, দই, মাছ—তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

চক্ষুষ্মান পুত্র বলিল—"সাহেব তো কামরাটা কেলাসে উঠল। এটা থার্ড কেলাস।"

"ও, তাই না কি। তবে যে বললে—"

বৃদ্ধ ইতস্তত করিয়া চুপ করিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে গন্তব্য ষ্টেশনে নামিতে হইল। ভাগ্যে পুত্রটি সঙ্গে ছিল তাহা না হইলে নামিতে গিয়া কোথায় হয় তো পড়িয়া যাইত। গাড়ী হইতে নামিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল—"ওরে সাহেব কোথা, দেখ তাঁকে আমাদের খুঁজছে হয় তো—"

"এই বুড়া হামারা সাথ চলো।"

"তুমি কে?"

"হাম সাহেব কা চাপরাসি।"

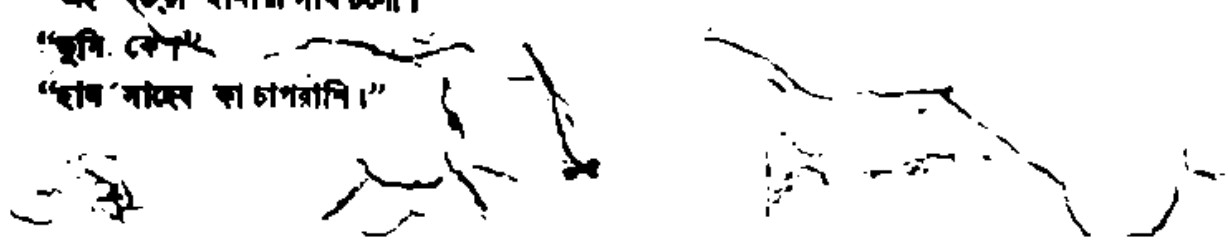

"সাহেব ডাকছে বুঝি। ও—চল, চল।"

"সাহেব মোটর দে গিয়া। তুম হামারা সাথ পয়দল চলো—"

বৃদ্ধ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর চোঁক গিলিয়া বলিল—"চল।"

হাসপাতাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র বিভিন্নস্থানে একটি ঘরে পাশাপাশি শুইয়া আছে। সামনে বারান্দা। জুতা খটখট করিয়া নার্সরা যাতায়াত করিতেছে। মাঝে-মাঝে কাহাকে যেন ডাকিতেছে। চতুর্দিকে কার্বলিক এসিড ও আয়োডোফর্মের গন্ধ। ঘরের ঘর হইতে কাহার যেন অস্ফুট কাতরানি শোনা যাইতেছে।

আসিয়া পর্যন্ত সাহেবের সহিত বৃদ্ধের দেখা হয় নাই। অবশ্য আর একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ এমন কি ভুরু পর্যন্ত কামাইয়া দিয়াছেন। চোখে কি একটা ঔষধ দিয়া চোখটা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন! চোখের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে।

বারান্দায় পদশব্দ হইল।

বৃদ্ধ শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি?"

পুত্র চুপি চুপি উত্তর দিল—"আর একটা।"

"আর একটা মড়া?"

"হ্যাঁ, ঐ নিয়ে তিনটে হল।"

সেদিন হাসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা বেশী।

বারান্দার এক প্রান্ত হইতে সুরাসক্ত একটা ভোম জড়িতকণ্ঠে বলিল—"সব শালা খতম্ হোগা আজ।"

খানিকক্ষণ কোন শব্দ নাই।

"বাপ রে—বাপ রে—জান্ গিয়া—উঃ—ও:—"

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন কোথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। আবার চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

৬

ভোর হইতেছিল।

ডাক্তারবাবুও বিনিদ্র নয়নে জাগিয়াছিলেন। কল্পনা করিতেছিলেন যে সাহেব যদি খুশী হয় তাহা হইলে হয় তো তাঁহাকে মুঙ্গেরীগঞ্জ ডিস্পেনসারিতে বদলী করিতে পারে। অবশ্য তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বেলোয়াটিকে আনিতে পারিবেন। মুঙ্গেরীগঞ্জে কোয়ার্টার আছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বেলোয়াটির চলচলে

মুখখানি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই বুড়াটাকে বুঝাইয়া যখন পাঠাইতে পারা গিয়াছে তখন আরও দুই-চারিজনকেও হয় তো পাঠা যাইবে। তাহা হইলে হয় তো—

"ডাক্তারবাবু—"

আর্তকণ্ঠে বাহিরে কে যেন ডাকিয়া উঠিল।

"কে—"

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

প্রথমটা তিনি চিনিতেই পারিলেন না। বুড়ার চুল দাড়ি ফুল কিছুই নাই।

বাহিরে আসিতেই বৃদ্ধ আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভাল চিকিৎসার আমার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। আপনার খারাপ ওষুধই আমাকে দিন আপনি। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, বুড়িকে বাঁচিয়েছেন, আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভাল হবে—"

ডাক্তারবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ক'রে এলে? এ সময় তো ট্রেণ নেই—"

পুত্র উত্তর দিল—হেঁটে এসেছি। বাবা কিছুতেই থাকতে চাইলেন না। একটু ফাঁক পেতেই পালিয়ে এলাম—"

"এঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলে?"

"না, বাবাকে আমি কাঁধে করে' এনেছি।"

জখ্‌মী দিল্‌

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

[পোষাক পরিচ্ছদ কুমাওনীদের মত...যোধপুর ব্রীচেসের ওপর গলাবন্ধ কোট, মাথায় দেশী টুপী...কপালে চন্দনের ফোঁটা...লম্বা চওড়া চেহারা...মনে করছেন হিন্দীতে কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে...এমন সময় শুনলেন স্পষ্ট বাংলা ভাষায় আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন...পরিচয়ে জানলেন,...'নন্দা দেবী রেষ্টোরাণ্টে'র মালিক...পাশ কাটিয়ে আসছেন, আপনাকে জার্মাণ ভাষায় ফিরে অভিবাদন করলেন...ফরাসী ভাষায় অভিবাদন করলেন...এবং আপনি অবাক হয়ে গিয়েছেন মনে করে [illegible] ধরণে চমৎকার হেসে উঠলেন...তেমন লোককে আপনি পরিচয় না করে চলে আসতে পারে[illegible] তাঁর হোটেলে, তাঁর টেবিলের সামনে চা খেতে খেতে শুনলেন...না...সে অপরূপ কাহিনী [illegible] নিজের মুখেই শুনুন...]

নয়নারের বছর আলমোড়া গিয়ে দেখি সেখানেও মানুষের মুখে হাসি নেই। তারা বলাবলি করছে, "ডিসেম্বর মাসে এখানেও আকাল পড়বে।" শুনে নিরাশ হলুম।

নিরাশ হয়েছি, এই কথাটা ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে সমঝিয়ে দিচ্ছি আমার বাবাবুর্চিকে, খেয়াল হল নি যে ঠিক সঙ্গে কুমাওনী ভাষায় আলাপ করছেন যিনি তিনিও বাঙালী। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ কুমাওনীদের মতো। যোধপুর ব্রীচেসের উপর গলাবন্ধ কোট, মাথায় দেশী টুপি। কপালে চন্দনের ফোঁটা। লম্বা চওড়া জমকালো চেহারা। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে, গোঁপদাড়ি কামানো।

ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে চমৎকার বাংলায় বললেন, "নৈরাশ্যের কথা যদি তুললেন তো বলব যে কাশ্মীর—যাকে ভূস্বর্গ বলা—সেখানেও মানুষ খেতে পায় না। ভারতের এমন অঞ্চল নেই যেখানে আমি যাই নি কিন্তু কোথাও দেখি নি যে মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।"

পাহাড়ী কত দূর বুঝলেন জানি নে, তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি কাশ্মীর যাবার কথা ইতিপূর্বে ভাবছিলুম, কিন্তু এর পরে সে ভাবনা ত্যাগ করলুম। আমার চিন্তিত দশা লক্ষ করে তাঁরাই বললেন হিন্দীতে, "মালিকজীর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই? আপ পলিটিকল পীড়ত হে। অব অথবী দিল্‌।"

শুনলুম ভদ্রলোক এখন এখানকার "নন্দা দেবী রেষ্টোরাণ্টে"র মালিক। তখন আমার মনে পড়ল যে ইনিই তিনি যাঁর কথা স্থানীয় বাঙালীদের মুখে শুনেছি...স্বামীর মোকদ্দমায় ইনি বাকি ছিলেন ফেরার আসামী।

"ওঃ আপনি!" আমি নমস্কার করলুম। মল্লিক কি না মল্লিকজী। তিনি বললেন, "নমস্তে।" তার পরে আমরা দু'জনেই খাবারের কাজ সেরে এক সঙ্গে বা তুললুম।

মল্লিক যখন জানালেন যে তাঁর রেস্টোরাঁট খুব কাছেই তখন আমিও জানালুম যে আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই। চললুম তাঁর সঙ্গে।

রেস্টোরাঁটের উপরে ফ্ল্যাট। বারান্দা থেকে হিমালয় দেখা যায়। হিমালয়ের কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে তন্ময় হলুম দু'জনে। কথন এক সময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠল।

"যা বলছিলুম। কাশ্মীর দেখে যে আপনি কোটি মানুষের সুখ দেখে সুখ পেলেন তা নয়। আমি তো আর ভারতের কোনোখানেই পাই নি। যে দেশে যা নেই তা আমি খুঁজলেও নেই, আপনি খুঁজলেও নেই। যেমন সুখ যদি দেখতে চান তো ছুটি নিয়ে ভারতের বাইরে যান। এই অভিশপ্ত দেশে—" বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

তাঁকে দেখে মনে হয় না যে কখনো ভারতের বাইরে গেছেন। আন্দাজমতো ঢিল ছুঁড়লুম। তাই প্রশ্ন করলুম, "ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে গেছেন?"

"ইংলণ্ডে, সুইটজারলণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র।"

এবার মেশ আমারও ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "ক' বছর ছিলেন?"

এর উত্তরে তিনি কী জানি কী ভাবলেন, তার পরে বললেন, "বার বছর নির্বাসনে ছিলেন।"

"চোদ্দ বছর!" আমি আশ্চর্য হলুম। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোষাকপরিচ্ছদে তার আভাসমাত্র নেই।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না লক্ষ্য করে তিনি বিলিতী ধরণে হা হা করে উঠলেন। তার পর ফরাসীকে মাত চাইলেন, "পারদঁ।" তার পর জার্মান ভাষায় গান ধরলেন, "Herz, mein herz, sei nicht beklommen···"

হৃদয়, আমার হৃদয়, ব্যথায় কাতর হোয়ো না...

তাঁর কণ্ঠের জারণা আমার নয়নপল্লবে সঞ্চারিত হলো। আমি চোখ ধরলুম, "থামুন না, কী আশ্চর্য ব্যাপার। যদি গোপনীয় না হয়।"

এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সবটা মনে নেই, মনে থাকলেও লেখবার সময় আসে নি। একাশে লিখছি।

আর জানছি তিনি এখন কোথায়!

তখন স্বদেশীর যুগ। বয়স কাঁচা। দেশের মাটির দিকে চেয়ে আমার মনে ভাব জাগত, মাটি কি সত্যি মাটি? না চিন্ময়ী মায়ের বহিঃপ্রকৃতি? আমরা প্রতিমা পূজা করি ভুল, তবু ও আমাদের অবজ্ঞা

করে, ওরা কি জানে যে এই মাটি এই জল এই হাওয়া সবই এক একটি প্রতিমা। যাঁর প্রতিমা তিনি ভারতমাতা।

একালের ছেলেরা শুনে হাসবে, কিন্তু সেকালে আমরা সত্যি বিশ্বাস করতুম যে ভারতমাতা বলে সত্যিই কেউ আছেন, যেমন জগন্মাতা বলে কেউ আছেন। সেই ভারতমাতাকেই বন্দনা করে বলতুম, মা, তুমি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী। মনে মনে বলতুম, মা, তুমি যদি শাক্তময়ী তবে তোমার শক্তি কেন সুপ্ত রয়েছে। মা, তোমার শক্তির পরিচয় দাও। মহিষমর্দন করো। সিংহবাহিনী, সিংহটা যে বড় বাড়াবাড়ি করছে, মা। ওকে সায়েস্তা করো।

হাসছেন। কিন্তু তখন আমরা ভুলেও হাসতুম না। আমরা প্রত্যেকেই ছিলুম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। ভিতরে ভিতরে জ্বলতুম। ভিতরের আগুন বাইরেও জ্বলত। হাসবেন, কিন্তু আমরা আন্তরিক বিশ্বাস করতুম যে মা একদিন আক্ষরিক অর্থে আসবেন। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করব জাগ্রত দেবতা দশপ্রহরণ ধারণ করে দশ হস্তে সংগ্রাম করছেন। আজ কলকাতায়, কাল পাটনায়, পরশু দিল্লীতে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করছেন। বেশব কয়েক দিন পরে একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। দেশ স্বাধীন।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হলো, ভগবৎ সত্তা যুগে সম্ভব, কলি যুগে নয়। এ যুগে মা তাঁর আপন শক্তি আমাদের মন্ত্রে ভাগ করে দিয়েছেন। আমরাই তাঁর এক একটি হাত, আমরাই তাঁর এক একটি প্রহরণ। আগব আমরাই, আমরাই যুঝব।

তখন আমরা অস্ত্রসংগ্রহে মন দিলুম, অস্ত্রচালনা শিখলুম। কেমন করে বোমা তৈরী করতে হয়, কেমন করে বারুদ তৈরী করতে হয়, সেখা সেও সব। ভেবেছিলুম, কেউ টের পাবে না, জানতুম না যে বেয়ালেরও কান আছে। দলের লোক ধরা পড়ল, আমিও পড়লুম, কিন্তু বাবার ছিল ওষুধের দোকান, তলে তলে চোরাই মদের কারবার। জাহাজী গোরাদের কাছ থেকে তিনি মাল আমদানী করতেন। সেই সূত্রে জাহাজী গোরাদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। তাদেরই আমাকে লুকিয়ে চালান দিল ইংলণ্ডে। তখনকার দিনে পাসপোর্টের ঝামেলা ছিল না। ইংলণ্ড আমাকে আশ্রয় দিল। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে রক্ষা পেলুম দ্বীপান্তর হতে। ইংরেজ আমাকে উদ্ধার করল ইংরেজের রোষ থেকে।

এই ঘটনার পর আমার ব্রিটিশ বিদ্বেষ আপনি অন্তর্হিত হলো। বিলেতে বাস করে দেখলুম ওরা রাক্ষস নয়, পশু নয়, পাষণ্ড নয়, আমাদেরই মতো মানুষ। বিলেত দেশটাও মাটির। সে মাটিও মাটি নয়, মৃন্ময়ী মা। তাঁকে প্রণাম। মা ব্রিটানিয়াকে মনে মনে বন্দনা করলুম। বললুম, মা, তুমি জাগ্রত দেবতা। তোমার শক্তি ধ্বংস নয়, বিকীর্ণ। তোমার শক্তির অভিব্যক্তি কত উপনিবেশ, কত অধীন দেশ, কত বন্দর, কত নৌঘাঁটি, কত যুদ্ধজাহাজ, কত কামান। আবার কত বড় সাহিত্য, কী মহান ধর্ম, কী উন্নত বিজ্ঞান, কী উদার গণতন্ত্র। মা, তুমি তোমারই গৌরবের জন্যে ভারতকে মুক্তি দাও।

আমাদের উঠে নাম বন্দেমাতরম। সেই নামে টাকা যেত বাড়ী থেকে বিলেতে। টাকার অভাব ছিল না। নতুন স্যাটিলুপেনের জন্যে পড়াশুনা করতুম আর সন্ধ্যাসমিতিতে হাজিরা দিতুম। আমাদের কী

ভাবে তার স্বাধীনতা ফিরে পায় তাই লক্ষ করা ছিল আমার প্রধান কাজ। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের কর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিনের পর দিন কাটত। আইরিশদের মতো তখন আরো একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তার নাম সিন ফেন। এই তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল। সেই সূত্রে অনেক বার আয়ারলণ্ডে গেছি। বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করত ডাবলিনে আইন পড়তে। কিন্তু লণ্ডনের আকর্ষণ বেশি। নানা দেশের আশ্রয়প্রার্থীতে লণ্ডন তখন ভরা। কেউ রাশিয়ান, কেউ ইতালি, কেউ তুর্ক, কেউ পোল। তাদের আড্ডা বসত এক একটা রেস্তোরাঁতে। আমি যে সব রেস্তোরাঁতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম না তাদের কর্মনীতি। আর তারাও বুঝত না ভারতীয় রাজনীতি। কাজেই আইরিশদের সঙ্গেই আমার বনত ভালো। অথচ মিশতে মন চেত স্বাধীন জাতিদের সঙ্গে। হাঙ্গারিয়ান হোক রুশরা চীনারা তুর্করা স্বাধীন। পোলরা অবশ্য তা নয়, সেটা ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মহলে আমার অবাধ গতিবিধি। ভারতীয়দের একাধিক দল, নরম গরম দুই দলের সঙ্গে আমার সামাজিকতা ছিল, কিন্তু গভীর সখ্য ছিল কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। ওঁর ওখানে কেউ এলেই ডাক পড়ত আমাকে। একবার দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যারিস্টার এসেছেন। গান্ধী তাঁর নাম। শুনে উঠলেন যে! হাঁ, আপনাদেরই মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি মহাত্মা ছিলেন না, ছিলেন নিতান্তই বিদেশি। তখন আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবি নি যে এই নিরীহ গোবেচারি একদিন ভারতের মহানেতা হয়ে প্রকাণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে ধাক্কা লেগেছিল। পরে আমরা সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

ও আপনি শুনতে চান কী কথাবার্তা? আচ্ছা, বলছি। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, বছরটা ১৯০৮ কি ১৯০৯ সালের কথা। সাভারকার সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাঁ, আপনাদেরই বীর সাভারকার। আশ্চর্য। না? কে জানত তিনি একদিন হিন্দু মহাসভার কর্ণধার হবেন। কই, তেমন কোনো হিঁদুয়ানী তো তখনকার দিনে দেখিনি। যা হোক, যা বলছিলুম।

সাভারকার শুধালেন গান্ধীকে, "মনে করো মস্ত একটা সাপ তোমার দিকে ফণা তুলে ছোবল মারছে তোমার পালাবার পথ নেই, পিছনে গভীর খাদ। তোমার হাতে একগাছা ছড়ি আছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষা করা যায়। তখন তুমি কী করবে? মারবে, না মরবে?"

গান্ধী এক মুহূর্ত ভাবলেন না, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ছড়িখানা আমি ফেলে দেব, পাছে আমার লোভ জাগে তাকে মারতে।"

অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। এমন কথা আমি মনে কখনো শুনি নি, তাই পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"I would drop the stick lest I should feel tempted to kill it."

সেদিন সেখানে আমরা যে কয়জন উপস্থিত ছিলুম সকলের শ্বাস উড়ে গেল। ছড়ি ফেলে দিলে সাপ কি আমাদের ছাড়বে। মনের সুখে গিলবে। সাভারকার বললেন, "গান্ধী, তুমি আমার ধর্মগুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে অক্ষম।" সে কথা আমাদের সকলের মনের কথা।

গান্ধী কিছুদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেলেন, আমরাও ভুলে গেলুম তাঁকে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার কোনো মানে হয় না, ওটা নিছক পাগলামি। তাই আমরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করি নি। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সাধারণতঃ এই যে, স্বরাজ কি যোগ্যতার প্রমাণ দিলে পাওয়া যাবে, না অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নিতে হবে? অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়াই যদি স্থির হয় তবে অস্ত্র কোথায় পাব, আর পেলেও তা প্রয়োগের কী উপায়।

আমাদের মধ্যে জন কয়েক ছিলেন, তাঁরা বলতেন, জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ একদিন বাধবেই, তখন অস্ত্র জোগাবে জার্মানী, অস্ত্রবিদ্যাও সেই শেখাবে। এত বড় কথা ভাবতে আমার ভয় করত। তা ছাড়া আমি ছিলুম সত্যি সত্যি ইংরেজভক্ত। না, রাজভক্ত নয়, ইংরেজভক্ত। যুদ্ধে জার্মানীর হার হওয়া যদি অস্ত্রসংগ্রহের ও অস্ত্রশিক্ষার একমাত্র উপায় হয় তবে চাই নে স্বরাজ। কিন্তু আমার ও আমার মতো অনেকের তখন ধারণা ছিল অন্য উপায় আছে। সে উপায় যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেওয়া।

যুদ্ধ যখন বাস্তবিক বাধল তখন আমাদের সেই ক'জনকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা ততদিন বার্লিনে। আমরা গিয়ে কর্তাদের জানালুম, আমরা লড়তে প্রস্তুত, সৈন্যদলে আমাদের নেওয়া হোক। আমার নিজের পক্ষপাত আর্টিলারির উপর। ঘোড়ায় চড়ে সোলজার হতে। তদবির করলুম। কিন্তু তদবির কেন ফলবে! কর্তারা বললেন, তোমাদের চেহারা যুদ্ধিষ্ঠিরের নয়। অর্থাৎ রাজনীতি যুদ্ধিষ্ঠিরের নয়।

তখন, যে যার নিজের কাজে মন দিল। আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারলুম না। এত বড় সুযোগ জীবনে দু'বার আসে না। এমন সুযোগও ব্যর্থ গেল। এ জীবন রেখে লাভ! মনের অসুখ শরীরে সংক্রামিত হলো। ডাক্তার বলল, সুইটজারলণ্ডে না গেলে সারবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বে ইংলণ্ড থেকে বিদায় নিলুম। সুইটজারলণ্ডে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা দেশ, সেও কেমন স্বাধীন, কেমন সমৃদ্ধ! পর্বতকে মানুষ বশ করেছে, তার পিঠে সুখে বসিয়েছে, সেখানে যত রকম আরাম চাও পাবে, যত রকম খেলা, যত রকম আমোদ। সুইটজারলণ্ড আমার ইংলণ্ডের চেয়েও ভাল লাগল। সেখানেও নানা দেশের রাজনৈতিক শরণার্থী।

সুইটজারলণ্ডে থাকতে খবর পেলুম রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদেশে যা ঘটেছে তার নাম নাকি বিপ্লব। উল্লাসে অধীর হলুম। ইচ্ছা করল সে দেশে উড়ে যেতে, কিন্তু উড়ব কী করে? ডানা নেই যে। দেখলুম শরণার্থীরা সবাই উত্তেজিত। বিপ্লব যদি এক দেশে ঘটল তবে অন্য দেশেও ঘটবে। অস্ট্রিয়াতে, জার্মানীতে, ঘটছে। আমি মনে মনে ঘুরে নিলুম, তাহলেও। নেই ও কথা তাঁর অমনি শরীর সেরে যাওয়া। আমি আমার লুৎসার্নের বন্ধুদের ডেকে তোল দিলুম। কিন্তু কে জানত সেই বছরই সেই মাসেই আর এক বিপ্লব ঘটবে। কেন ঘটল কিছুই ঠাহর হলো না। আমার কয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলুম। তাঁরা তো হেসে উঠে। আমার উপর নয়, বোলশেভিকদের উপর। বললেন, ওরা ডাকাত, ওরা চোর, ওদের ওটা বিপ্লবই নয়, ওটা বর্বর হাঙ্গামা।

কিন্তু আমার সন্দেহ মিটল না, উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আমার এক বার্কলেপন্থী আত্মীয় ছিলেন, তিনিই আমাকে ধীরে ধীরে বোঝালেন মানুষের ইতিহাসটা শ্রেণীসংঘাতে ভরা। ওর একটা বিশেষ অবস্থায় এক

দিন আসন্ন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবে, বুর্জোয়া আধিপত্যে। এতদিনে শেষ হলো কেরেন্স্কীর শাসনে, বুর্জোয়াদের মুর্ছায়। এখন থেকে সুরু হলো ইতিহাসের শ্রমিক অধ্যায়। সব দেশেই এই ক্রম। এ কথা মনে আসায় মনে প্রশ্ন জাগল, জারের সঙ্গে জারতন্ত্রের সঙ্গে একশো বছর ধরে যুঝল যারা তাদের প্রাপ্যদানের, তাদের নির্বাসনের, তাদের কারাভোগের এই কি পুরস্কার! দু'সাত মাস রাজত্ব করতে না করতে রাজ্যকাল গেল ফুরিয়ে! শেষ হয়ে গেল তাদের যুগ, সেই রক্ত পঙ্ক শহীদের পুরস্কারের যুগ। এর উত্তরে মার্কস্‌পন্থী বললেন, ইতিহাস ওদের ক্ষেত্রে দেখছে লেনিন তো নিমিত্তমাত্র।

ইতিহাস পড়ি নি, এই যদি ইতিহাসের ব্যাখ্যা হয় তবে ইতিহাস পড়ে সুখ নেই। তাকে মনে মনে ডেকে বললুম, মা, আমরা যে তোমাকে এত কাল বন্দনা করে আসছি, তোমার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছি, দ্বীপান্তরে মরছি, কারাগারে পচছি, সে কি এইজন্যে! এই কি তোমার বিচার যে আমরা দু'দশ মাস রাজত্ব করেই সিংহাসন থেকে নামব, আর সেই সিংহাসনে উঠবে শ্রমিক শ্রেণী! তা হলে আমরা কেন এমন করে বুকের রক্ত পাত করছি!

এর পরে কিন্তু আমার ভগবানে বিশ্বাস চলে গেল, সুতরাং ভারতমাতায়। জগতে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে ভগবানও থাকেন না। দেশজননীও না। রাশিয়া থেকে আরো সরবরাহে এসে জুটল, এবার বোলশেভিকদের অত্যাচার থেকে। তাদের মুখে শ্রেণীবিদ্বেষের কথা শুনতে শুনতে আমার ধারণা জন্মাল যে ইতিহাসটা শ্রেণীসংঘাতে ভরা। তাই যদি হলো তবে বুর্জোয়ারা চির দিন রাজত্ব করতে পারে না। দু'মাস পরে হোক, দু'বছর পরে হোক, দু' শতাব্দী পরে হোক, এক দিন না এক দিন তাদের পুনর্মূষিক হতে হবেই। ত্যাগ করলেও যে পরিণাম, ত্যাগ না করলেও সেই একই। ত্যাগ তবে করব কেন? করব ত্যাগের জন্যেই।

বুকটা দমে গেল। তার আগে আমার বুকের ব্যামো ছিল না, তখন থেকে হলো। বৈরতন্ত্রের অবসানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদেরই পরিবারের লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রাণ নিয়ে। এরা এখন নিঃস্ব। দেশ থেকে কেউ এদের টাকা পাঠাবে না, এরা বিদেশীর দয়ানির্ভর। এক দিন ভারতেও কি এই রকম হবে, এই ভাবে বেশান্তরী হবে আমার আত্মীয় স্বজন? এই কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধারা?

এর পরে জার্মানীতে বিপ্লব ঘটল ও সে বিপ্লব বিফল হলো। বিপ্লব তা হলে সব দেশে সফল হয় না। আমি আশ্বস্ত হলুম। হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা ঝঞ্ঝাটের বোঝা নেমে গেছল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্যারিসে গিয়ে হাজির হলুম ও বাসা করলুম পীস কন্‌ফারেন্স দেখতে। ভের্সাইতে যেদিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি ছিলুম সেখানে। জার্মানীর দাহনা দেখে আমারও চোখে জল এলো। ভাবলুম, জার্মানদের বিপ্লব যদি সফল হতো তা হলে কি ভের্সাইতে তাদের এ দশা হতো। মনে হলো, মধ্যবিত্তদের মাথা দুর্বল, অতি সহজেই তারা অপমান মাথা পেতে নেয়, ইতিহাস তাই তাদের ঘাড়ে ভের্সাই চাপিয়ে দেয়।

ফল হলো এই যে আমার অন্তরের প্রতি আমার অনাস্থা জন্মাল। আমি আমার নিজের অন্তরে মার্কসপন্থী হয়ে উঠলুম। না, কমিউনিষ্ট না; এমনি সাধারণ অর্থে মার্কসিষ্ট। ক্রিয়াকর্মে নয়, মতবাদে। হিন্দুর ছেলে ব্রাহ্মসমাজে নাম না লিখিয়েও তো নিরাকারবাদী হয়। আমিও তেমনি কমিউনিষ্ট না হয়েও মার্কসিষ্ট। আমার জীবনে এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে গেল। প্রতিমাপূজক আমি, সর্বপ্রথমে ভাঙলুম দুর্গামাতার প্রতিমা। "বন্দে মাতরম্" এর উপরীত বর্জন করলুম। অতঃপর যত দেশ ঘুরি, কিন্তু রাশিয়ার যাবার ছাড়পত্র পাই নে। হয় তো আরো কিছু দিন পরে পেতুম। কিন্তু দেশে ফেরবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। মস্ত ভুল করলুম দেশে ফিরে। আমার ধারণা ছিল দেশ একেবারে বদলে গেছে, এবং সে পরিবর্তন দেখবার মতো। অনেক তদ্বির করে দেশে ফেরবার অনুমতি পাই। অভয় পাই যে আর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে না। আমার সহকর্মীরা মার্জনা পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরেছিলেন, অতএব আমাকে মার্জনা করা কঠিন হলো না।

দেখলুম জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তার নেতা হয়েছেন গান্ধী। গান্ধীর মতো অদ্ভুত লোকদের যারা নেতা করতে পারে তারা সব পারে। দেশের অবস্থাগতি আমাকে হতাশ করল। রাজনীতি-ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের প্রয়োগ দেখে আমি তো ধরে নিলুম দেশ তিন হাজার বছর পেছিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। এক তো দেশটা যারপরনাই গরম, তার উপর খবর পেলুম সরকার ফরমায়েস শুনে মেজাজ গেল বিলকুল বিগড়ে। তার পরে যখন কানে এলো যে মদ খাওয়া পাপ তখন আমি পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলুম। ইউরোপে ফিরে যাবার পাসপোর্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার অভিলাষ রটিয়েছিল যে আমি আমেরিকাতে গিয়ে গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছি ও বাংলাদেশের ছেলেদের সে বিদ্যা শেখাতে চাই। খবরটা সরকারী মহলে আতঙ্ক সঞ্চার করে। তার ফলে আমার পাসপোর্ট পাওয়া তো হলোই না, তার বদলে হলো মাদ্রাজের কেল্লার ভেলে বিনা বিচারে অবরোধ। মদ খাওয়া যখন কপালে লেখে নি তখন কী আর করি! ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে সুরু করে দিলুম। বাহুমাংস ছাড়তে হলো মাদ্রাজীদের মুরগীর সঙ্গে অসহযোগ করে। সকলেই স্বীকার করল যে অসহযোগী বটে। কিন্তু সরদে মারা যাচ্ছিলুম। সবর্ধকেটকে লেখালেখি করে বদলি হলুম এই আসবোড়ায়। মানে, আসবোড়া জেলে। ছাড়া পেলুম তিন বছর পরে।

ছাড়পত্রের আশা ছিল না। অথচ ইউরোপের আকর্ষণ তীব্র। চললুম বম্বে, সেখানে একটা রেস্টোরাণ্ট খুলে বসলুম, বিলা খরচে মদ খাবার ফন্দী। জাহাজ ভিড়লেই আমি যাই ইউরোপীয় যাত্রীদের সঙ্গে ভাব করতে, তাদের ঘরে এনে মদ খাওয়াতে, মদের গেলাসের উপর গল্প জুড়তে। ইউরোপের তাজা খবর সেই ভাবে আমার কানে আসত, আর সেরা মদও আসত আমার সেলারে। বম্বে আমার বেশ সুট করেছিল, মাঝে মাঝে সেখান থেকে জলপথে সিংহল বেড়িয়ে আসতুম, কলম্বোতে বড় বড় জাহাজ ধরতুম। ইউরোপের যাত্রীদলের সেরা জাহাজে। বরাত থাকলে আবার পালাতুম তার কোনো একটা জাহাজে, কিন্তু এত বরাত আর অ্যাডভেঞ্চার সইবে না। ধরা পড়লে জেল।

বম্বে থাকতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কংগ্রেসে ঢুকে দেখলুম ওর নেতারা কেউ বিপ্লব

মৈমন সিং-গীতিকা ওঁরা যাতে করেন তার ব্যবস্থা করছেন। সে কারণই হয় যে গীতিকা এবটির লোক যিনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন কাজে রত থাকেন। সেই দিনের ডিস্ট্রিবিউশনের দিন সন্ধিত এলো অথচি আমাদের ঠেকা কেটে যাবার পরে মনের শেষ ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি কাউকার জন্য ছুটি হলুম। আমার মার্কসীয় বন্ধুবান আমাকে নিবৃত্ত করতে পারল না, আমি গলা ছেড়ে হাঁকলুম "অল যাতস্"

"আরে হো আকবর!" "মহাত্মা গান্ধীজি জয়!"

ব্যস, আর বাড়াব না। কয়েক বছর পরে ভাঙা শরীর ও ভাঙা মন নিয়ে জেল থেকে বেরোবার আগে ভালো করে মার্কস্ লেনিন পড়েছিলুম, পড়ে গান্ধীজীর ব্যর্থতার হেতু উপলব্ধি করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল নতুন উদ্যমে কাজে লেগে যাব, কিন্তু বুকের ব্যামোর জন্যে বাধ্য হয়ে বছর খানা কাটাতে হলো। আলমোড়ার সুবিধে এই যে এখানে চুপচাপ থাকা যায়। অন্যান্য হিল ষ্টেশনের মতো হইচই নেই। আর হিল ষ্টেশনে থাকার কানুন গরম আমার একেবারে সয় না। ইউরোপ আমাকে হাতি করেছে। তাই দিন রাত ভাবি, কবে আবার ছাড়পত্র পাব। রয়ধান্ত করেছিছি কলকে যাব। কিন্তু যুদ্ধ না থামলে আশা নেই।

আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ খুব শিগগির থামবে? না, আমারও সে ভরসা নেই।

সেদিন মল্লিকজী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না, কাজেই আমিও তাঁকে অনুরোধ জানালুম একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে আমার স্ত্রী যখন তাঁকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন তখন জবাব এলো তাঁর ভাগনের কলম থেকে। মল্লিকজী নেই, নৈনিতাল গেছেন, কবে ফিরবেন বলে যান নি। আমরা ভুল বুঝলুম।

এ কথা শুনে আমার আলমোড়ার বন্ধু লাহিড়ী বললেন, "বেশ হয়েছে! মল্লিকজী আসবেন আপনার হোটেলে খেতে। আপনার হোটেলের বাবুর্চি যে মুসলমান এ খবর কে না রাখে!"

আমি আহত হয়ে বললুম, "কিন্তু মল্লিক যে ইউরোপে চোদ্দ বছর ছিলেন।"

"হাঁ, কিন্তু সে মল্লিক আর নেই। এঁর নাম মল্লিকজী, এঁর কপালে কত বড় চন্দনের ফোঁটা, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি যে বড় বড় চুলের সঙ্গে এক গোছা টিকিও আছে।"

"কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় বন্ধুবানে বিশ্বাসবান।"

"বোধ হয় সেইজন্যেই বড় ভালো বোঝেন। টাকা ঢেলেন।"

কিন্তু এরকমই তিনি নৈনিতাল গেছেলেন। আমি অন্য মনে ভেবেছিলুম। লাহিড়ী তা শুনে ভাষান্তর করলেন, "তা হলে আপনার নিমন্ত্রণ এড়ানোর জন্যেই তিনি নৈনিতাল গেছেন। আপনি খুশি হবেন না।"

লাহিড়ী আমাকে খুলে বললেন যে মল্লিকজী বাঙালীর ব্রাহ্মণ, আভিজাত্য মেনে চলেন এবং এই বোধহয় নিষ্ঠাবান শহরে পসার জমে ভালো।

মাস খানেক পরে উদয়শঙ্করের ইডিয়ো থেকে আসছি, পথে মল্লিকজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি বলে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। লক্ষ্য করলুম সেদিন ওঁর পরণে ইউরোপীয় পোষাক। হালকা গ্রে রঙের স্যুট। হেল্‌ট্‌ হ্যাট। কপালে চন্দনের চিহ্ন ছিল না।

শুধালুম, "ভালো কথা, আপনার বাবুর্চি কেমন রাঁধে?"

"কেমন রাঁধে তা আজুন না পরখ করে দেখবেন। তবে আসতে পারবেন বলুন।"

"তার কি আর সময় আছে, ভাই! আমাকে যে-কাল নৈনিতাল ফিরে যেতে হবে। সেখানে নতুন একটা রেস্তোরাঁ খুলছি কি না। নাম রাখছি রেস্তোরাঁ আঁতেরনাসিওনাল (Restaurant Internationale)।"

"তাই নাকি?" আমি চমৎকৃত হলুম। "তা হলে কি আপনি এখানকার পাট তুলে দিচ্ছেন?"

"না। এখানকার ভার নিচ্ছে আমার ভাগনে।"

"কিন্তু হঠাৎ নৈনিতাল!"

"ঠিক হঠাৎ নয়। ভাবছিলুম অনেক দিন থেকে। পাসপোর্টের জন্যে এখন থেকে তদ্বির না করলে নয়। আর তদ্বির করার মোক্ষম পদ্ধতি হলো উদরের অভ্যন্তর দিয়ে।"

আমি হাসলুম। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বুঝছি আমার পতন হলো। কিন্তু পতন কি এই প্রথম? এতদিন যে মল্লিকজী সেজে আলমোড়ায় বসেছিলুম সেই বা কম কী! আসল কথা, আমার কিছু পুঁজি চাই। কী নিয়ে ইউরোপে যাব? আর তো বাবা নেই যে বাড়ী থেকে টাকা পাঠাবেন।"

শেষের উক্তিটিতে করুণ রস ছিল। আমি সমবেদনায় আপ্লুত হলুম। বললুম, "কিন্তু দেশ যে আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, মল্লিক—"

"—জী না। শুধু মল্লিক।" তিনি আমার কোটের বাটনহোলে আঙুল ঢুকিয়ে একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, "দেশ যখন তৈরি হবে তখন আবার আসব। যদি বেঁচে থাকি।"

তার পর তিনি জানতে চাইলেন ভুলুকে তালিম দিলে সে কি 'অক্স রোস্তি' 'রাও ম্যু মুতো' ইত্যাদি বানাতে পারবে? আমি পরিহাস করলুম, "রোস্ট বীফ বানালে চেখে দেখবে কে? আপনি?"

তিনিও অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন। বললেন, "ও না খেলে আমার তাকত ফিরবে না। কিন্তু রোস্ট বীফ নয়। বফ রোস্তি। আমার ওখানকার মেন্যু ছাপা হবে ফরাসী ভাষায়। মুক্তির হিড়িকে আজকাল কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাইই চাই। আপাতত ওই আমার ইউরোপ, আমার সঞ্জীবনী। যাক, সেখানেও আসতে হবে একদিন। বৌমাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো, ভাই। তিনিও যদি আসেন তো সত্যি খুব খুশি হব।"

রাঘব মালাকর

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পুরাণে বলে একদা নর-রূপী ভগবান স্নানরতা গোপিনীদের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে তাদের অন্তর পরীক্ষা করেছিলেন—বহুকাল পরে আবার তিনি.....এবার অদৃশ্য থেকে প্রতিনিধিদের দিয়ে, সমগ্র বাংলা দেশের নর-নারীর বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে, কি পরীক্ষা করে দেখছেন, তা তিনিই জানেন...তবে দুঃশাসনকে জব্দ করে বস্ত্রহীনা হওয়ার নিদারুণ লজ্জা থেকে দ্রৌপদীকে তিনিই রক্ষা করেছিলেন, হে রাঘব মালাকর, ছেলে বসে কাটা কপালে মলম দিতে দিতে অন্ততঃ সেই কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিও—আশা করি এই ছোট্ট কাহিনীটি পড়ার পর আপনিও ঠিক এই কথাই বলবেন...]

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই। লাঠির ঘায়ে মাথাটা তার কেটে চৌচির হয়ে গেছে।

কুলবাড়ীর চৌধাথা থেকে নামমাত্র পথটা মাঠ জলা বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে দু'ক্রোশ তফাতে বালদিয়া গিয়েছে। এই দু'ক্রোশের মধ্যে গাঁ বলতে কিছু নেই, এখানে ওখানে কতগুলি কুঁড়ে জড়ো করা বসতি আছে মাত্র। হাটবারের দিন কিছু লোক চলাচল করে পথ দিয়ে, অন্যদিন সন্ধ্যার পরটা থাকে প্রায় জনহীন।

নির্জন হোক, পথটা নিরাপদ। গত কয়েক বছরের মধ্যে এ পথে কোন পথিকের বিপদ ঘটে নি। বছর তিনেক আগে দিঘলপুরে একজনকে পাগলা শিয়ালে কামড়েছিল শোনা যায়। কেষ্টোমের পোষা মাদ্রাজী তার চুম্বকপাথরের চিকিৎসাতেও সে নাকি বাঁচে নি। সাপটাপ হয় তো কামড়ছে দু'একজনকে ইতিমধ্যে, কুকুর হয় তো তেড়ে গেছে ঘেউ ঘেউ করে, গরু শিং নেড়েছে। কিন্তু বিষের কিছু হয়ে হয় নি, কারণ হলে সেটা মানুষের মনে থাকত। যাযাবালির দু'একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়, কিন্তু কবে যে সে ঘটনাগুলি ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না, একেবারে ঘটেছিল কিনা তারও কোন প্রমাণ নেই। পথের আশেপাশের বস্তি-গাঁগুলিতে যাদের বাস, চুরি ডাকাতি তারা যদি করে, ধারে কাছে কখনো করে না। এ পথের একলা পথিকের গায়ে হাত দেয়া দূরে থাক, তাকে ভয় দেখাবার ভরসা পর্যন্ত ওদের নেই। ওরকম কিছু ঘটলে দায়ী হবে ওরাই। পুলিশও প্রমাণ খুঁজবে না, জমিদার কার্তিক চক্রবর্তীও নয়—দু'পক্ষের শাসনে খেঁতো হয়ে যাবে ওরা, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আশেপাশের কুঁড়েগুলি, বসতি ছাড়তে হয়ে যাবে আশেপাশে বাস করার অনুমতি।

এবার সদরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল গোমস্তা রাধাচরণ, সঙ্গে ছিল দু'জন পাইক। রাধাচরণের পোক্ত

ওদের মাঝখান থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে যায়। পরে তারা ধরা পড়ে জেনে গিয়েছিল ফুলবাড়ীর, পাঁচজন আর মালদিয়ার দু'জন—পরে। দু'দিকের চাপে রাঘবের আর কাছাকাছি আরও ছিনতাইটে বস্তি গাঁয়ের মানুষেরা খেঁতো হয়ে যাবার পরে।

ঝাঁক থেকে ছাঁক এসে এরা সাড়া দেয়। ঠিক লোক যাবী করলে সঙ্গে পৌঁছেও দিয়ে আসে এদিকে ফুলবাড়ী বা ওদিকে সড়কের মোড় পর্যন্ত। একলা ঠিক পথিকের ভালমন্দের দায়িত্ব ওরাই নিয়ে।

শেষ বেলার ফুলবাড়ী—মালদিয়া আসবার ঘন ঘন দৌড়ুনো বাধায় দু'জন লোক চলেছে মালদিয়ার দিকে। জেনে, রৌতকায় আকায়, বয়সে, সাজ গায়ের ঙঙ ছাড়া দু'জনের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই—অর্থাৎ, গায়ে চওড়ায় দু'জনেই প্রায় সমান হবে। গায়ের জোরেও কিসা বলা অসম্ভব, জোরের পরীক্ষা কখনো হয় নি। রাঘব মাঝারকের কোমরে একহাত একটি গামছা জড়ানো, জাঙ্গিয়ে পুরানো খাকি। গৌতম দাসের পরনে প্রায়সাইজ ঘরে কাচা আধপুরাণো মিলের ধুতি, গায়ে পুরানো ছিটের সার্ট, ঘাড়ের কাছে একটু ছিঁড়েছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। রাঘবের রৌতকাটা বেশ গড়ন, গৌতমের রৌতকা তার সিকির চেয়ে ছোট হবে। রাঘবের আছাটা চুলে পাক ধরেছে, গৌতমের ছাটা চুলেও তাই, তবে রাঘব পনের বিশ বছরের বড় হবে গৌতমের চেয়ে। রাঘব মিশকালো, গৌতম মেটে।

খান দশেক ছুঁচের মাঝখানে খাঁচার কাছে এসে একটু হাঁপ ধরে রাঘবের। গতবারের চেয়ে এবারের বোঝাটা বেশী ভারি। ছুঁচার মিনিটের জন্য বোঝাটা একটু সে নামিয়ে রাখে।

গৌতম বলে, 'আবার নামালি? আজ তোর হয়েছে কি রা?'

'ওরে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে বলছ!' আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম টেঁছে এসে বেড়ে ফেলে রাঘব বলে, বাবু। কাপড়ের এত ওজন হয় জানতাম না বাবু! এত কাপড় তবে দেবি যি দোকান ছাড়া!'

গৌতম চোখ পাকিয়ে ছাকিয়ে বলে, কাপড়? কাপড় কিসে ব্যাটা? কলাম বা বস্তা নিয়ে যাচ্ছি! বস্তা সা বস্তা চেনেছে চাল চালানের জন্যে!'

'বস্তার চৌন সেইছি বাবু, কাপড়।'

'হ্যাঁ, কাপড়। তোকে বলেছে। সবাই খা খা করছে লোকে কাপড়ের জন্যে, বিশ টাকা দিয়ে কাপড় পাচ্ছে না একখানা, আমি কাপড় নিয়ে চলেছি মালদিয়া। ব্যাটার বুদ্ধি কত!'

রাঘবের হাসিটা বড় খারাপ লাগে গৌতমের।

'সবারেই তো বেচছো বাবু। ভরোসা করেছ মালদিয়ার। একলে মাল আমরা রাখলে দুশোর চারশোর, পাঁচশোর পরে রোজ এদিক ওদিক ভাঙিয়ে-ভাঙিয়ে বিক্রি খানিক খানিক। মোরা বলি যে চাকুরবাবু পাঁচশোর পরে হলে ফেলে মালদিয়া যায় না কেনে—ফুলবাড়ী ফেলে মরতি গিয়ে মাল নিয়ে দু'কোশ হাঁটে? পাঁচশোর পরে মোরা বাবুরা পাহারায়ে—সেই তো বিপদ।'

'থেকে তোদের? আর কাছে থাকবি?' সাজ গর্জনে গৌতম নিরাশ করে।

'কে কহুর বাবু? আমরা করিছি। মুখু মনে কি এমন হয়ু গোছে?'

গৌতম চট করে একটা বিড়ি ধরায়। একটু ভাবে। রাঘব যে বলল, মোরা আমরাও করিছি, তার মানে কি এই যে আনাআনি হয়ে গেছে? মোরা কারা? রাঘব আর তার আত্মীয়স্বজন, না আরও অনেকে?

'তোকে চার টাকা মজুরি দি' রঘু।'

'আজ্ঞে বাবু। তোমার দয়া।'

'তাই বুঝি বলে বেড়াচ্ছিস আমার কারবারের ব্যাপার দশখনকে? তোকে বিশেষ করলাম, শেষে নেমকহারামি করলি রঘু।'

মন কুঁড়ের গাঁ যেন জনহীন—কুকুর পর্যন্ত তাকে না। পথের পাশে জলায় পাটকে ডুবেছে অন্তত—ছ'মাস আগে পর্যন্ত এই পাটুকের ফসল তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বস্তি-গাঁওলির স্ত্রীপুরুষ—অবশ্য সবার নয়। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পিছনে হেলে যায় রাঘব, আবেগের ভারে ভারাক্রান্ত গলায় বলে, 'নেমকহারামি ঠাকুরবাবু? বলছ নেমকহারামি? হাটে সেদিন সভা করে যখন পঞ্চরা বললে, যে যা জানে থানায় বলবে। বলিছি থানায়? থানায় মোরা বলতে যাই নি ঠাকুরবাবু ভালোমন্দ। যা বলি তাদেরই শুঁতো। বলাবলি করেছি নিজেদের মধ্যে। তোমার তাতে কি?'

'সে সে মোট ছোট্।' গৌতম বলে খুশী হয়ে, 'চটিস কেন? আটআনা কেটে পাবি আট্স, যা।'

রাঘব নিঃশব্দে বোঁচকা মাথায় তুলে নেয়, গৌতমের সাহায্য। গৌতম তাকে ফেরা দর্শনের কথা শোনায়, যে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে মেরে রাখা হয়েছে কোটি গৌতমকে বহুকাল ধরে, কি ভাবে কর্ম থেকে ফলে যাতে আর কি ভাবে খারাপ হয়ে বাঁচলে লোকসান। তেজী গলায় গৌতম কথা কয়' শুনে গলা বন্ধ হয়ে আসে রাঘবের। মন তার মাথা কুটে বলে, হায় কি করিছি, হায় কি করিছি!

পরের গাঁয়ে রাঘবের ঘর, ফুলবাড়ী আর কাশবিলার প্রায় মাঝামাঝি। একটাকে মোটামুটি গাঁ বলা যায়। ঘর তিরিশেক মানুষ আছে, আসল পথের প্রায় সমান চওড়া পথ আছে গাঁ পর্যন্ত সাত আট রশি, নামও আছে গাঁয়ের—পত্। এইটুকু এসে রাঘব আপন বোঁচকা নামিয়ে রাখে। অনুশ বিঘে শুধু কপালের ঘাম ফেলে খাওয়া হয় না, বোঁচকার ভার চেপে বসে বেশ আরাম অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, 'একটা বিড়ি দেন গো ঠাকুরবাবু!'

সাত আট রশি দূরে খান তিরিশেক ঘরের নামকরা বস্তি-পাঁ, এটাও যেন খানিক আগের মন-কুঁড়ে গাঁটার মত নিঃশব্দ, জনহীন মৃত। উলঙ্গ ছেলে মেয়ে পর্যন্ত ছুটে আসে না পয়সা ভিক্ষা করতে, পথ দিয়ে পথিক কেউ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তাতে যেন কিছু এসে যায় না তাদের। পত্ গাঁয়ের দক্ষিণে ঘন জঙ্গল, নীচু জমিতে বছরে ছ'মাস বর্ষার জল জমে থাকলে সোঁদাগন্ধী বর্ষীন সে বিকেল জঙ্গল জঙ্গল করে। শিয়ালী ডাকে বস্তার ওপারে, আড়ালায় রাত্রির ইঙ্গিত...এখনো সন্ধ্যা নামে নি। বাইরে সন্ধ্যা না

নামলেও ঘরগুলির ভিতরে যে গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়েছে রাঘব তা জানে। গৌতমও জানে, এ অঞ্চলেরই মানুষ তো সে। রাঘবকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশুর কান্না কানে আসায় গৌতম চমকে উঠে থেমে যায়। কে যেন মুখ চাপা দিয়েছে শিশুটির মুখে। গা ছম ছম করে গৌতমের। এই জনমানবশূন্য ভূতুড়ে গ্রামের এই গা-ছমছম-করা মানুষ এসব পুরাণো সব কিছু যেন নতুন নতুন মনে হয়, গাঁয়ের শব্দহীন স্তব্ধতায়, মানুষের সন্দেহতায়, শিশুর কান্নার মুখ-চাপায়, রাঘবের বোঁচকায় বসবার ভঙ্গিতে।

রাঘবকে সে বিড়ি দেয়। নিজে বিড়ি ধরাবার আগেই রাঘবকে দেয়। বলে, 'টেনে নিয়ে চট্‌পট চল বাবা, পা চালিয়ে বাকী পথটা মেরে দি। খিদের পেট চোঁ চোঁ করছে, মাইরি বলছি তোকে রঘু, কালীর দিব্যি। চ' ভাই চটপট। পৌঁছে দিলে তুইও তো খাবার। ওখানে খাবি তুই আজ। জানিস, আমার ওখানে খাবি। খেয়ে দেয়ে ফিরবি তো আজ ফিরিস, নয় শুয়ে থাকবি।'

ঘাড় হেঁট করে রাঘব বসে থাকে বোঁচকায়, করুণ চোখে চোখের পলকে তাকিয়েই চোখ নামায়। ধরা গলায় বলে, 'বাবুঠাকুর, এ কাপড় মোদের চাই।'

'কাপড় চাই? আচ্ছা, আচ্ছা, দেব'খন তোকে একখানা—' গৌতম চোঁক গেলে, 'একজোড়া কাপড়। গেলে দিকি নি, চল দিকি নি এবার। ওঠ।'

রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গৌতমের পায়ে, দু'হাতে দু'পা চেপে ধরে বলে, 'আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর। কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গে। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর কাপড়গুলো। মোদের ঘরে মেয়ে-বৌ ন্যাংটো হয়ে আছে গো।'

গৌতমের ভয় করে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে তার ভয় খুব অল্প, তাই মন তার ভয়ের সীমা পেরিয়ে যায়। আঁকড়া চুল ধরে রাঘবকে টেনে তুলে গর্জন করে সে বলে, 'হারামজাদা! গাঁজাখোর! বজ্জাত! এই, বলছি! ছোট ছোস! নন্দবাবুকে বলে তোকে জেল খাটাব ছ'মাস। ভৈরববাবুকে বলে তোকে চালা কেটে তুলে দেব দেশ থেকে। ছোট ছোস, পা চালিয়ে চল।'

'মেয়েগুলো ন্যাংটো যে বাবুঠাকুর? মা-বুন ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—'

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে.....'

বলেই গৌতম অনুতাপ করে। এমন কুৎসিৎ কথা বলা উচিত হয় নি, রাঘবদের মা-বোন মেয়ে-বৌকে এমন কদর্য্য গাল দেওয়া। কি দুটো মন-রাখা কি কি কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ভীষণ কথাটা গৌতম তাই মনে মনে স্থির করার চেষ্টা করে। বেশী নরম হলে আবার ঘাটা পেয়ে বসবে। যেন সাপকেই খুঁজছে, ওজনসই কথা বলা চাই।

'কাপড় তবে হইল বাবুঠাকুর?'

বলে রাঘব হাঁক দেয় গলা চড়িয়ে। মরা গরুটা যেন জীবন্ত প্রাণ পেয়ে কলরব করে ওঠে,

কিল কিল করে বেরিয়ে আসে উলঙ্গ-প্রায় স্ত্রী-পুরুষ। গন্ধুতে এত লোক থাকে না, অন্য সব বস্তি-গাঁয়ের লোকেরাও আজ এখানে এসে জড়ো হয়েছিল। গৌতম প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়, তারপর ওঠে হাঁপিয়ে ছুটে পালাবার উপক্রম করে। রাঘব দাঁড়িয়ে গিয়ে তার হাত ধরে।

'আর ভয় না বাবুঠাকুর। কলরাম ধান করে দিয়ে যাও কাপড়গুলো—তা তো শুনলে না।'

'না না কাপড়গুলো বাবা। সব কাপড় নে। আমায় ছেড়ে দে।'

'আর তা হয় না বাবুঠাকুর। ধান দিয়ে নেতে সে ছিল ভিন্ন কথা। কাপড় নিই হলে তোমায় ছেড়ে দিয়ে মরব মোরা?

উত্তেজিত মানুষগুলিকে রাঘব সংযত রাখে। তার ধমকে অন্য সকলের চেঁচামেচি অসাড় কয়েকজনের আর্ত ও তীব্র প্রতিবাদ সে থামাতে পারে না চেঁচায়, 'মারবি তুই, সবাইকে মারবি তুই রাঘব। পুলিশ আসবে সবাইকে ধরে মারবে। ওরে বাবা রে সর্বোনাশ করবে রাঘব।'

দুটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে কান্না ধরে।

তিনজন মাঝবয়সী লোক চোখ পাকিয়ে বলে, 'মোরা এক-মণি নাই, রাঘব।'

রাঘব বলে, 'নাই তো দেঁড়িয়ে রইছ কেন? কাপড়ের ভাগ নিও না, যাও ঘরে।'

কাপড়ের বোঁচকা আর গৌতমকে গাঁয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাঘবের ঘরের দাওয়ায় বোঁচকা নামিয়ে বড়দের মজলিস বসে, এবার কি করা উচিত আলোচনার জন্য। কি করা যবে না হবে সব ঠিক হয়ে আছে কদিন থেকে, গৌতমকে পুঁতে ফেলার জন্য জঙ্গলে গভীর গর্তও কেটে রাখা হয়েছে একটা। তবু একটু আলোচনা না করে তারা পারে না। কাপড়গুলি তাড়াতাড়ি বিলি করে ফেলা দরকার, বাইরের যারা তারা ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে, এখানকার যারা তারা যাবে যার যার ঘরে। এত লোক বেশীক্ষণ জমায়েত হয়ে থাকা উচিত নয়, কে যাবে পথ দিয়ে, কার কি চোখে পড়বে কে বলতে পারে। রাঘব থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, ঘাসালো দা উঁচু করে একদল চুপ হয়ে যেতে বলে সবাইকে—গোলমাল শুনে কেউ যদি ব্যাপার দেখতে আসে পথ থেকে? তাকেও তো পুঁততে হবে বাবুঠাকুরের সঙ্গে। একটা লোক নিখোঁজ হওয়া এক কথা। বেশী লোক নিখোঁজ হলে রাঘবদা হবে না।

'কথা যে কইবে সে কাপড় পাবে না।'

রাঘবের গর্জনের চেয়ে কলরামের এই মোক্ষম কাজ হয় বেশী। সবাই চুপ হয়ে যায় একেবারে, যারা প্রতিবাদী ছিল তারা পর্যন্ত। বুড়ী পচার মা শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকে।

গৌতমের কান্না, বিলাপ, অনুনয় বিনয়ের অন্ত ছিল না, রাঘব একবার ধা'টা উঁচিয়ে ধমকের পর ধমক দেওয়া থেকে বিরত হয়েছিল। এবার সে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, 'আমায় ছেড়ে দে বাবা তোরা। আমায় মেরে কি হবে তোদের! কাপড় পেয়েছিস, বাবুদের ছেলেকে মেরে কেন অপরাধ করবি? ছেড়ে দে আমায়।'

কলরাম বলে, 'কি করে ছাড়ি? ছাড়া পেলে তুমি গিয়ে তো পুলিশ আনবে বাবুঠাকুর।'

গৌতম শৈশব ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে, বাপ-মার নামে আর দেব-দেবীর নামে দিব্যি গালে, পুলিশকে সে কিছু বলবে না।

'এ কথা কি মনে থাকবে বাবুঠাকুর?

তখন হতাশ হয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে' গৌতম বলে, 'শোন বলি, পুলিশকে আমি বলতে পারি না। সাধ থাকলেও পারি না।'

'পার না?'

'না। বললে আমারি জেল হবে। এ কাপড় চৌরাবাজারের মাল, পুলিশ যখন শুধোবে কাপড় পেলাম কোত্থেকে, কি জবাব দেব বল? সত্যি বললে যার কাছ থেকে এনেছি তাকে ধরবে, আমাকে ধরবে, কারবার তো বন্ধ হয়ে যাবেই, জেল হয়ে যাবে আমাদের। চোরা মাল না হলে কি এপথে পা দিয়ে আসি, তোমাই বুঝে ছাখ। পুলিশ কেন, তোমা কাপড় লুটে নিয়েছিস তারো কাছে বলবার উপায় নেই আমার।'

রাঘব বলে, 'তা বটে। এটা তো খেয়াল করি নি মোরা।' সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে। বাবুঠাকুরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলে তাদের উপায় ছিল না, কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে এভাবে মারতে কি সায় দেয় মানুষের মন। বাবুঠাকুর নিজেই যখন চোর, তার চোরাই মাল কেড়ে নিলেও কি করতে পারবে বাবুঠাকুর? ওকে ছেড়ে দিলে তাদের কোন ভয় নেই।

রাঘব বলে, 'তবে তুমি যাও বাবুঠাকুর। অপরাধ নিও না।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গৌতম পড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে গলায় আওয়াজ বার হয় না। কাঠের মত শুকনো গলায় ঢোক গিলবার চেষ্টা করে সে কোনমতে বলে, 'জল। জল যে একটু।'

'জল দেব তোমা জল যে বাবুঠাকুর।'

গৌতম মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বলে, '

জল খেয়েই সে পালায়।

পরদিন পুলিশ আসে জল বেঁধে, বিকালের দিকে। দলিলপত্র তৈরী করে ঘাঁটিঘাট বেঁধে মাল গাড়িয়ে ওছিয়ে নিতে এক বেলা সময় লাগে, নইলে সকালেই পুলিশ আসত। রাঘবগঞ্জের গগন সাহার একটা কাপড়ের দোকানও একটা আছে।

তিন দিন আগের তারিখে প্রাণদিয়া গাঁয়ের জন্য কিছু কাপড় বরাদ্দ করিয়ে নিয়ে, গৌতম মুহুরীমশায়কে এজেন্ট নিযুক্ত করে, যথাশাস্ত্র যাতায়াত খরচা ইত্যাদি ঠিক করে বেলাশ পত্র গাঁয়ে লুট করা কাপড়গুলির চোরাই মালত্বের দোষ কেটে যায়।

পত্র পাঁয়ে দিয়ে পুলিশ-সাহেব বড়দারোগা ইন্সপেক্টর চৌকশ আরও দু-একজন ছোট দারোগা ও সহিত আরেকটা কারণ উপস্থিত হয়েছে। লুট করা কাপড়ের তাল বাঁটোয়ারা নিয়ে ঘোরালো একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে-গত রাতে। খুন হয়েছে দু'জন, আহত হয়েছে অনেকে। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।'

রাঘব বাঁচবে কি মরবে ঠিক নেই।

আধুনিকা

শ্রীমনোজ বসু

[বাংলা দেশ...বাঙালী মেয়ে. একদল আজও বসে আছেন রান্নাঘরে, কাপড়ে হলুদের দাগ... এক কোল ছেলে-মেয়ে নিয়ে মা মনসার পুজো দিতে ব্যস্ত...স্বামী-পুত্র নিয়ে তাঁদের বিশ্ব-সংসার... আর একদল চলেছে টগবগিয়ে পথে...হাইহিল্...পালিস-করা নখ...কানানো-ভুরু ওপরে আঁকা আকর্ণ ভ্রু···চিবিয়ে কথা...এনামেল-করা মুখ...মেট্রো...পার্টি...রেসার-টিপ...এই দুই দলের মাঝখানে, একটী, দুটী, তিনটী করে ফুটে উঠছে, সন্ধ্যা-তারার মত...নতুন বাঙালী মেয়ে পুরোণো ঘরে তাদের মানায় না...নতুন ঘরে তাদের আসন এখনো হয়নি পাতা...তাদের দেখেছেন কি? যদি দেখে থাকেন, তাহলে লিলিকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন,—আর যদি না দেখে থাকেন, লিলিকে ভাল করে দেখে রাখুন, হয়ত পথ চলতে চলতে গল্পের পাতা থেকে একদিন সত্যি সত্যি দেখতে পাবেন তাকে আপনার পাশেই পথ চলতে . সেদিন যদি দেখেন তার মুখে রয়েছে এনামেলের সাদা রঙ, একটু ভাল করে দেখবেন, দেখতে পাবেন তার আড়ালে রয়েছে বাংলার শিশিরে-ভেজা অতসীর প্রভাতী শুভ্রতা...]

দু-দিন আজ বিষম বাদলা নেমেছে। বিকালে ঐ ঘুপচুপে বৃষ্টির মধ্যে তিনটে নাড়াশের লোকালে বেরিয়েছিলাম রোগী দেখতে। ফিরছি এখন। রাত্তের গাড়িতে ফিরতে হবে, তাই যাবার সময় বেডিং অর্থাৎ সতরঞ্চি ও মেশি কম্বল জড়ানো বালিশটা ষ্টেশনে রেখে গেছলাম

টিকিট বাবু বিশেষ চেনা আমার। হাসপাতালে রেখে সেবার এঁর কার্বঙ্কল অপারেশন করে দিয়েছিলাম। খাতির করে আমায় অফিস-ঘরে এনে বসালেন। বললেন, এ গাড়িতে কেন যাচ্ছেন ডাক্তার বাবু? পৌঁছুতে রাত—

তিনটে নিশ্চয় বাজবে। তা-ও পথে যদি আপনাদের মেলগাড়ি ধরা করে ঘুমিয়ে না পড়েন কোথাও—

তাই বলছি, শুয়ে থাকুন এখন ষ্টেশনে। ওয়েটিং-রুমের তালা খুলিয়ে দিচ্ছি। সকালবেলা ঘী-আলো চলে যাবেন।

হবার জো নেই মশায়। তাহলে কি এই ভোগ ভুগতে আসি?

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিয়ে বললাম, টিকিট দিন। শেষ রাত্তির থেকে বৌনির

ভিড় লাগে। কুইনিন নেই বলে পানা পুকুরের জলই রঙ করে লাগ কেটে চালাচ্ছে ফটিক কম্পাউণ্ডার। তাই শেষ করে উঠতে তার দুপুর গড়িয়ে যায়।

টিকিট আর বাকি টাকা-পয়সা হিসাব করে দিলেন টিকিট বাবু।

ক্লাসের ?

নয় তো আর আট টাকা সাড়ে বারো আনা কেরত দিচ্ছি ? শুণে নিন।

কিন্তু বলছিলাম কি—জোর থেকেই হেডোসকোপ টুকে কলরব চালাতে হবে। আমার ভয়ে ঘাবার দরকার।

টিকিট বাবু বললেন, তোফা নাক ডাকতে ডাকতে যাবেন, আমি বলছি। সেকেনটিন ডাউন গেল, নেক্সট আপ যেল—সব খা-খা করছে, কাকস্য পরিবেদনা। এমন অজহায় দুটুস-বেড়াল ঘর থেকে বেরোয় না—

কিন্তু ডাক্তার বেরোয়। আর ডাক্তার আনতে যারা যায়, তারাও—

তা যা বলেছেন।

টিকিট বাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। গলা বাড়িয়ে বলতে লাগলেন, বুঝি বাতলে দিই ডাক্তার বাবুরা থার্ড ক্লাসে জায়গা না পান, যে ক্লাসে পাবেন উঠে পড়বেন—পয়োয়া করবেন না। ঠেকার করে কোলে হাতে কিছু গুঁজে দেবেন, না ধরল তো কথাই নাই। যদি বলেন, পছিলন থাকে না—এ দুর্নাম কে দেখতে যাচ্ছে যে অমুক ডাক্তারবাবু থার্ড ক্লাসে চলেছেন। আর দেখেই যদি, ফ্রেন্ড বলে নেবেন—পি, সি, রায় মশায়ও এই লাইনে কতবার গেছেন থার্ড ক্লাসে।

চির-চিকা করে টেলিগ্রাফের সঙ্কেত হল, টিকিট বাবু সেই দিকে দৌড়লেন। আর উপদেশ শোনা হল না।

গাড়ি এল। ফাঁকা সত্যি। টর্চ ছিল, অসুবিধা হল না। একটা কামরায় উঠে পড়লাম। বাইরে থেকে দেখেছিলাম, জনপ্রাণী নেই। সেটা ঠিক নয় অবশ্য, তবে সজাগ অবস্থায় কেউ নেই। সাঙ্ঘাতিক জম জমাট ঘুম, সবাই বেঞ্চির উপর পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরে ঘুমুচ্ছে যেন। টর্চের আলো গায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে চলে গেলাম, কেউ নড়ল না একটু খানি।

জায়গা রয়েই আছে। একেবারে কোণের দিকে একটা বেঞ্চি পুরোটা কম সঙ্কুচিত পেতে ফেললাম। নিরিবিলি থাকা যাবে। কেউ উঠে হঠাৎ খুঁজতে পারে না, এ জায়গাটুকুতেও বেঞ্চি দিয়েছে। না—বেঞ্চি না হোক, বাঙ্ক আছে খুঁজতে পেয়েছে তো।

বাঙ্কের উপর বিছানাটা গাঁটি দিয়ে রেখেছে কে-একজন।

পুরো হাসপাতালের ডাক্তার আমরা—কেবা একটা অবধি হাসপাতালের কাজ করে পনের মিনিটের ছিপ নেয়ে খেয়ে প্রাইভেট প্রাকটিসে বেরোই—সময়ের অপব্যয় যাতে নয় না। বাঙ্কটির উপর

বালিশটা গোঁজার ফলে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লাম। শীত শীত করছিল—কম্বলটা গায়ে ভালো করে টুইও আমাদের সামনা ঢেকে আসতে করা—এখানে যে অবস্থায় তোলে, শুটিসুটি পড়ার অপেক্ষা।

বৃষ্টি জোরে এল আবার। কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে, কখন নড়বে গাড়িই জানে। আমার অবশ্য তাড়া নেই কোনও, নীলগঞ্জ রেলওয়ে আগে পৌঁছলে হয়। ঘুমটা যত দেরি হবে, ততই ভাল আমার পক্ষে। বাকীটা ট্রেনে ঘুমোবার সুবিধা হবে মনে হয় না। নিশ্চিন্ত আলস্যে চোখ বুজলাম।

স্বপ্ন দেখছি, মনে হচ্ছে। চুড়ির মৃদু আওয়াজ, শাড়ির খসখসানি। শাড়ির আঁচলটা আবছায়ে আমার মুখ ঢেকে ফেলেছে, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে চেতনা আরও আচ্ছন্ন হচ্ছে। একটি মেয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে আমার! মুখ দেখতে পাচ্ছি না। বাঙ্কের বিছানা-বেডিংগুলোর মালিক ও হবে মেয়েটি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি-সব নাড়াচাড়ি করছে, মৃদু স্বরে কথোপকথন কি যেন কথা বলিনি মনে। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝে তখন আমি দোল খাচ্ছি, সোজা হয়ে ভাল করে চোখ মেলে দেখবার অবস্থা নেই। এটা ঠিক, আমি একটা পুরুষ মানুষ নিচে শুয়ে পড়ে আছি মেয়েটি টের পায় নি। নূতন কামরার মহিমায় গাড়ির কামরায় আলো থাকে না, নীলচে অন্ধকার। আর তার উপর কালো কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছি, চোখের দৃষ্টি জোর থাকুক—ঠাহর করা সোজা নয়। নিজেকে সামলে নিলাম, কিন্তু অদ্ভুত অবস্থা—নিশ্বাসটাও নিতে হচ্ছে অত্যন্ত সন্তর্পণে। মেয়েটা বুঝতে পারলে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবে।

বাঁচলাম রে বাবা—চলে যাচ্ছে। মৃদু ঘুরে মৃদুক করে বাঙ্কে কতক্ষণ পোঁছায়। মেয়েটির মুখটা, শাড়ির আঁচল, গহনার ঝিনিমিনি—সকল উপসর্গ নিয়ে অন্ধকারবর্তিনী মেয়েটা মেঝে গেল।

গাড়ি জংশন-ষ্টেশনে এল। 'চা-গরম—' হাঁক শুনে বুঝতে পারছি। ট্রেনটা এখানে থামে, কাছাকাছি উপর গাড়ি থাকে, এখানে। শীত করছে, মন্দ হয় না এক কাপ চা পেলে। মাটির ভাঁড়ে ধূমায়িত বিক্রয় যে তরল বস্তু বিক্রি করছে, ও নয়। প্লাটফরমের উপরেই রেস্তরাঁ—হাবেশাই এ পথে যাতায়াত করলেই মুখস্থ জানাশোনা। পাকা-দাড়ি বোকলা-দাঁত এক বয় আছে, কাপগুলি দু-পয়সা বেশি করে নিলে সে চমৎকার চা বানিয়ে দেয়।

সেদিন নিচু গদা টেবিল। কাঁচের আধারে কেক-বিস্কুট, পড়িতে টাটকা মাখন কাটা। বার একটা প্রেসিডেন্সি ছিলুম দিকে, উনুনের উপর ডেগচিতে টগবগ করে ফুটছে, পরম জল হাতে কেটে ফেলে চায়ের ফেটলিতে। আর পাশে বড় একটা ফ্লেটে করে টিন-কাটলেট সাজিয়ে রেখেছে, উনুনের আঁচে গরম থাকছে ওগুলো। এই হল জংশন-ষ্টেশনের সুবিধাভোগ রেস্তরাঁ। খদ্দেরের বসবার জন্য সামনে কম্পাম ট্রেনের বেঞ্চ আছে। ভিড়ের চোটে কোনদিন কিছু চোরাল করে

পারিনি, পাড়িয়ে ছাড়িয়েই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে চলে গেছি। আজকে দুর্যোগের দরুণ তাপ্ত সুপ্রসন্ন। দিব্যি লাটসাহেবি মেজাজে বসে টবের উপর পা ছড়িয়ে ঠোকে ঠোকে চা খাচ্ছি। এক কাপ শেষ করে ফের এক কাপের কল্পনাবেস করেছি, এমন সময়—

বঙ্কিম যে! তুমি কোত্থেকে এখানে?

হাতে টিফিন-কেরিয়ার, ছুটতে ছুটতে এসেছে বঙ্কিম। বলে, বলেন কেন দাদা। ডিউটিতে আছি।

টিফিন-কেরিয়ার এগিয়ে ধরে বলল, এদিকে—আমার এটা ভরতি করে দাও। যা তোমাদের হাঁস আছে, সব রকম দাও দুটো চারটে করে। কুইক—

পুলিশে চাকরি করে বঙ্কিম। পুলিশ রূপ ধরনের মধ্যমণি আই-বি-তে ঢুকেছে নাকি। কম বয়সে উন্নতি করেছে। কিন্তু হাবা-গবা ভালো মানুষটি কি কৌশলে যে উন্নতি করল, আমার কাছে এক প্রহেলিকা। আর দ্বিতীয় প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল, তার মতো রূপণ মানুষ রেস্তরাঁয় এসে ঢালা হুকুম ছাড়ছে। এখনো আমি ঘুমিয়ে নেই তো?

ব্যাপার কি যে?

বঙ্কিম বলল, এই ট্রেনে যাচ্ছেন? আসুন, আসুন। খিদে পেয়েছে কিনা বলুন!

নোট দিয়েছে, তার বাকি পয়সা ফেরত নিতে সবুর সয় না, এমন ব্যস্ত। হাত ধরেছে আমার, দাঁড় একহাতে টিফিন-কেরিয়ার। ছুটছে। বলে, মুখফুটে আমার খিদের কথা বলল। সেই মেয়ে দাদা। মনে পড়ছে না—লিলিমিত্তির।

অতঃপর মনে না পড়বার কথা নয়। চার পাঁচ বছর ঐ চিমটি নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে বঙ্কিমকে। একবার ফ্রেমে আমাকে ওদ্ধ। হাত-পা ধরাধরি করে বঙ্কিম আমাকে আর তার খুড়ো সম্পর্কের একজনকে পাঠাল ওদের বাড়ি মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার জন্য। মেয়েটাই গেট অবধি এগিয়ে এসে ঘুলোপারে আমাদের বিদায় করে দিল, উঠানে পা ফেলতে দিল না।

রাগ করে বললাম, লিলি বিত্তির তো ছুতোর ছিলে কাদা ছিটকে ছিটকে মুখে দেয়, এখনো দেখছি ছাড়োনি। আশ্চর্য মানুষ তুমি।

হেসে বঙ্কিম হেসে বলল, বড্ড রেগে আছেন দাদা, কিন্তু সে লিলি আর নেই। আসুন না, দেখবেন উল্টোপ করে। আমার মধ্যেও আছে বৈকি দেখা এই গাড়িতে। এখন সে-ই লেপটে রয়েছে আমার গায়ে। ডিউটিতে আছি, কিন্তু গল্প···গল্প···গল্প। সব স্টেশনে উঠে দেখাও আর হয়ে উঠছে না।

গরম ছুপে বসতে লাগল, তার মাস পড়ে গেল—মুহূর্তে যা মন দেবার দেখছি, নির্ঘাৎ এবার গিন্নি দেওয়া নেবে।

শুধু বাকি নয়—নিয়ম রাত্রি সে এখন। কিন্তু হলে কি হবে—অমাবস অবধি হা-পিত্যেস করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

সেই লিলি বদলে এখন কি হয়েছে, দেখবার কৌতূহল কিছু আছেই—তার উপর রহিম হাত গ্রেপার করে নিয়ে চলেছে, হাত এড়াবার উপায় নেই। তার ভাবীস্ত্রীর সম্পর্কে আমাকে রাগি করে থাকতে দেবে না, মিটমাট করে দেবেই।

বৃষ্টি একেবারে ধরে গেছে, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। একটা সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টের সামনে দেখলাম মেয়েটা অধীরভাবে পায়চারি করছে। রহিম বলিয়ে দিল, ঐ—

কাছে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেব, এঁকে চিনতে পার লিলি?

লিলি চমকে তাকাল। মনে হল, তার চোখে বিরক্তি পুঞ্জিত হয়েছে। আবার এই দুটো গেঁয়ো স্ত্রীলোক ছুটতে ছুটতে তার গায়ে একরকম ধাক্কা দিয়ে গেল। এক পা হটে দাঁড়াল। নুচকে নাক সিঁটকে বলল, মানুষ না জানোয়ার? নোংরা কাপড়-চোপড়—কি দুর্গন্ধ বাপের।

জলের কল কাছেই, জল পড়ছিল। হয় তো হাতে ছোঁয়া লেগেছিল তাদের, বুঝতে পেরে ঘুরে এল। জানেছে কি রকম, বুঝতে পারি না। দুলোজন্তু নোংরা পৃথিবীতে সেই তো আমের মধ্যে ডিগিয়ে ডিগিয়ে হাটে। ধুলো না হবে যদি আগাগোড়া কার্পেট বিছানো থাকত, সোয়াস্তি পেত এই লিলির জাতের মেয়েগুলো।

হাত ধুয়ে এসে দাঁড়াতে রহিম নাছোড়বান্দা—আবার শুরু করল, চিনতে পারলে না আমাকে? সেই যে সেবার—মনে পড়ছে না? শান্তিময়-দা গো—যাঁর বাড়িতে খেয়ে আমি মানুষ। আমার নিজের বড়-দার চেয়েও বেশি। প্রণাম করো।

লিলি হাত দু-খানা একটু তুলল—হাত জোড় হল না, কপাল অবধিও পৌঁছল না। তা যা-ই হোক, বদলেছে একটু সত্যিই। এ কালের মা-লক্ষ্মীরা গড় হয়ে প্রণাম করতে শেখেন না—কিন্তু যে হাত একদিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কপালের দিকে সেই হাত উঠল তো উঁচু হয়ে।

ওদের গাড়িতে উঠে বসতে হল। বেশ জোৎস্না ফুটেছে, জানলা দিয়ে এসে পড়েছে মুখে। বাইশ বছর মেয়েটার। রং খুব ফর্সা। সেটার কতখানি নিজস্ব, আর কতটা ফ্রিজ-পাউডারের দান—তখন তা ঠাহর করিয়েছে—সঠিক বলা যাবে না। ঠোঁটে আর গালে রক্ত, নখে রঙ, একহাতে চুড়ির গোছা আর একহাত খালি, রুক্ষ চুলের বোঝা···মুখের উপর 'হায়—হায়—' গোছের একটা ভাব, কতবিক্ষত করুণ ক্লান্তি যেন জমে আছে সেখানে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি—কত কষ্টা সময় লেগেছে না জানি প্রসাধনে! ছবি আঁকার মতো সৈরেখানি সাজিয়ে গুছিয়ে বুরুশ চোখের সামনে তুলে ধরে। সিল্কের আঁটো ব্লাউস গায়ে, শাড়ির ওটানো আঁচল আলগোছে আছে কাঁধের উপর। ছুরার রহিম আজও কাঁচের পাত্র থেকে যেন বেরিয়ে আসছে। গা শির-শির করে ওঠে। দু-চোখে দেখতে পারি না এই চিঠি লেখা চালু মেয়েগুলোকে—যারা দিনের অর্ধেক সময় ঘরে সাজে, আর সাজ কতটা খুলব বাকি অর্ধেক সময় তারই পরখ করে বহিমের মতো হাঁদারামগুলোর উপর।

মনের ভিতরে যাই থাক, ছেলে আলাপ জমানোর চেষ্টা করতে চায়। আলাপ করিই বা কি ছাইপাশ নিয়ে? বোঝে তো দুটো জিনিস পৃথিবীতে—সিনেমা আর টুরনেট, আর আমি নিতান্ত আনাড়ি ঐ দুটো জিনিস সম্পর্কে।

লিলি বলল, আপনার কথা শান্তিময়-দা, অনেক শুনেছি। উঠেছেন কোন্ গাড়িতে?

বঙ্কিমই বলল, ও ধারে কোথায়। ঘুম—ঘুম—ঘুম—এমন ঘুম-কাতুরে দাদা আমার! তোমার সঙ্গে দেখা করাতে আনব, ঘুম কামাই হবে বলে তা-ও আসতে চান না।

লিলি বলে, ভাই তো—ওঁকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। দেখাশুনা তো হল—যান শান্তিময়-দা, ঘুমুনগে আপনি।

অর্থাৎ সরল বাংলায় ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়াচ্ছে, আপদ-বালাই বিদায় হও তুমি এখান থেকে। যখন রাত্রে কাঁকা গাড়িতে দু-জনে আছি, পাকা চুল আর ভারি গোঁফ জোড়া নিয়ে মোহাই তোমায় ডেকে বসে থেকো না এর মধ্যে।

কিন্তু বঙ্কিমটা বুঝবে না এ সব কিছু। বলে, কষ্ট না আরো-কিছু? কি হয় মানুষের জন্যেও না খুচরো? কত কথা জমে আছে, বসুন। দেখাশুনার পাট একেবারে উঠিয়ে দিয়েছেন, তার শাস্তি।

এইটুকুর মধ্যে খোরাক জমা জিনিস-কেরিয়ারের খাবার যেমন তেমনি রয়েছে।

কই লিলি, খাচ্ছ না যে?

এখন থাক—

কিসে পেয়েছে বলুন—

লিলি মৃদু হেসে বলে, কখন?

আমি জানি, বড্ড কিসে পেয়েছে তোমার। খাও।

আমি বললাম, খাওয়ানোই যদি মতলব, আমায় ট্রেনে আনলে কেন এখানে? আমি উঠি।

শঙ্কিত হয়ে লিলি বলল, না না, বসুন আপনি, গল্প করুন। মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে যাই আমি। বাথ-টাথ-পোশাক দরকার, নিচে তো নামতেই হবে—

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, বাপরে, অত এনেছ কেন? যাও অতি-সামান্য কিছু—

নিজেই সে একটা বাটিতে করে তুলে নিল। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখি; যা নিল মোটে অতি-সামান্য নয়। যাক—একেবারে বেহায়া হয় নি তা হলে, পুরুষের সামনে হাঁ করে গিলতে লজ্জা লাগে এখনো।

লিলি গেল তো কাঁকা পেয়ে অতঃপর বঙ্কিম ছেঁকে ধরল। অতকণ্ঠে লিলির কথা। ঘুরিয়ে একটু বেশি চটপটে হলেও মনে মনে সে অত্যন্ত সরল ও আদিম; পাকে-প্রকারে প্রেমে গদ-গদ অবস্থা জোরির। লিলি অলোকসামান্য নারী, পৃথিবীতে একটি দ্বিতীয় অস্তিত্ব নেই, বিধাতার

যেন নিজেও আড়াআড়ি পাই না। বঙ্কিম বিপুলতর উৎসাহে আবার তার গুণের ফিরিস্তি দিতে লেগে যায়। এ পাগল দেখছি মাথা খারাপ করে দেবে।

লিলি ফিরে আসছে। ছুটোয় মিলে গল্প করুক, এবার আমি পালাব। না ঘুমুলে চলবে না। অবি-কিন্তু—। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখতে পাচ্ছি, হাঁ—লিলিই তো! সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ—মেয়েটা সিগারেট ধরিয়েছে নাকি?

যখন কাছাকাছি এসে উঠল, তখন অবশ্য ও সব কিছু দেখলাম না। চুলোয় যাকগে। কতক্ষণ বা এদের সঙ্গে, ক'দিনই বা দেখা হবে জীবনে!

বঙ্কিম বলে, এর মধ্যে হয়ে গেল?

যাচ্ছেতাই খাবার। ফেলে দিতে হল প্রায় সবই।

লজ্জায় মরে গিয়ে বঙ্কিম বলে, তাই নাকি? সব তাতে জোচ্চুরি চলেছে অনেকদিন। আচ্ছা, মামুদপুর পৌঁছই। সেখানে—

মামুদপুর আমার নীলগঞ্জেরই ঠিক পরের ষ্টেশন। আট বছর আছি, আমার ঘরবাড়ি বললেই হয় নীলগঞ্জ—মামুদপুর ইত্যাদি ঐ অঞ্চলটা। আশ্চর্য হয়ে বললাম, ফ্লাগ-ষ্টেশন—এক ঠোঙা খাবার জল জোটানো যায় না, জলখাবার মিলবে কোথা মামুদপুরে?

মুচকি হেসে রহস্যপূর্ণ চোখে বঙ্কিম বলল, আমাদের মিলবে দাদা, ষোড়োশোপচারে রাজভোগ। লোক আছে কিনা আমাদের।

আমি বললাম, এ গাড়ি আগে ধরতই না ওখানে।

আজকাল ধরে। মিলিটারি ঘাঁটি হয়েছে কিনা! ক্যান্টিন থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা আছে। আর তা ছাড়া—কথার মাঝে বঙ্কিম থেমে গেল হঠাৎ।

আমি আর লিলি চেয়ে আছি। বঙ্কিম বলল—মিলির খাতিরেই বিশেষ—তা আপনাদের কাছে বললে আর দোষ কি? বাইরে খবর ছড়াতে যাচ্ছেন না তো?

গলা নিচু করে বলতে লাগল, কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েছে। পেট্রোল দিয়ে পোষ্টাপিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

লিলি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি? পোষ্টাপিস পোড়াতে গেল কারা?

বঙ্কিম বলে, মাথা খারাপ যাদের। দেশ উদ্ধার হবে নাকি এই সমস্ত করে করে।

মুখ দিয়ে আমার বেরিয়ে গেল, করাচ্ছে যে তাদের দিয়ে—

লিলি সায় দেয়, ঠিক। দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনীরা—না, সরকারি লোক তারা—

বঙ্কিম হাঁ করে আমার মুখ তাকাল।

হাঁ—গভর্নরই বলা। কতগুলি কি মতলব, দেখবার-শুনবার দায়িত্ব করল না। জেল—ভাবখানা তাদের।

যারা সর্বস্ব দিয়ে যারা পরাধীনতার অবসান চাচ্ছে, আর এক নতুন বিদেশির পায়ে মাথা বিকোবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে তারা?

লিলি উত্তেজিত হয়ে মাথা নাড়ল। না না—দুয়োরে শত্রু ওসব চুল-চেরা বিচারের সময় এ নয়। বুঝা পড়েছে, কেউ বঙ্কিমবাবু?

বঙ্কিম পরমোৎসাহে বলে, একটা এখন পর্যন্ত। কিন্তু যাবে কোথা? বেড়া-জালে আটকানো হয়েছে। এ গাড়িটার আমার নজর রাখবার কথা। ষ্টেশনে ষ্টেশনে নেমে যাচ্ছি, দেখছ না? মাদুরপুর থেকে ছ-সাতজন আমাদের উঠবে, তন্ন তন্ন করে দেখা হবে তারপর।

লিলি বলে, ধরতে পারলে ফাঁসিতে লটকে দেবেন। সেই উচিত শাস্তি।

উঠে দাঁড়ালাম, আর নয়। মনে মনে বলি, বিলাতি পারকিউমারির বীভৎস বিজ্ঞাপন বই তো নও—তোমরা একথা বলবে বই কি! দুর্বের চেয়ে বাটির উত্তাপ বেশি। তোমাদের পরম উপাস্য বিদেশি দেবতারাও বিদ্রোহীর ঘর পোড়াবার দায়ে ফাঁসির হুকুম দিতে চাইত না।

বঙ্কিম পিছনে ডাকতে লাগল, আমি কানে নিলাম না।

কামরার ঢুকে নিজের জায়গায় যাচ্ছি, হুড়োহুড়ি পা হড়কে গেল। পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ব্যাপার কি? চট জেলে দেখি, কলার খোসা। আর দেখি, কেক আর কাটলেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে আমার সতরঞ্চি-কম্বলের উপর।

কি করে এ সব এখানে আসে? একটা কথা ঝলক করে মনে উঠল। কিন্তু না—এত জায়গা থাকতে লিলি বেছে বেছে এই পার্টিশনের কামরায় জলযোগ করতে আসবে কি জন্য? সরকারি গাড়ি—যার ইচ্ছে খেয়ে গেছে। তবে আমার বিছানায় ছড়িয়ে না গেলে কলার কিছু থাকত না।

ভয়ে পড়লাম বেড়ে মুড়ে নিয়ে। ···সেই স্বপ্ন আবার। নিঃশব্দ গতিতে ঢুকল, পাখীর মতো উড়ে গেল। ঘুমোই নি, এক মুহূর্তে নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম।

ফিসফিস করে লিলি ডাকছে, ও অজিত-দা ঘুমিয়ে পড়লে আবার?

ডাকতে ডাকতে বেড়িং ও বস্তার নীচ থেকে সব বেরুল, উঁ?

খেয়েছ?

তুমি খাইয়ে দিয়ে গেলে না তো?

খাওনি তাই বলে নাকি?

খেয়ে নিয়েছি, রাশি করে ছড়িয়ে দিয়েছি সব—

বিস্ময়-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওকে বাহুতে জড়াই। ঘুমে ঢুলু ঢুলু লগনের সঙ্গে আলতার মেশানো একটি মিষ্টি

চলেছে, ফাঁক মতো এসে এসে প্রেম করছে আর বড়ির ব্যবস্থা ওদিকে পাখার ঘরে সে-ই তোমাদের !

লিলি অনুনয়ের সুরে বলে, কি করব ? একটা তো পিছনে কেউ লেগেই আছে। আবার দু-নম্বর জুটেছে—বড়িরেরই কোন্ বাউণ্ডুলে দাদা। সেদিনকে ঘাড়ে পাকতে ভরসা হয় না। মিছে তুমি রাগ করছ।

খুব চুপি-চুপি বলছে, তবু শুনতে পাচ্ছি প্রতিটি কথা।

এবার কৌতুক স্বরে ছেলেটি জবাব দিল, না গো, রাগ করব কেন ? ঠাট্টা করে বললাম। ঘুমুর পাখি খেয়েছি। হাত দিয়ে তুলে পাবার তো আছে কি ?

জল এনেছি, জল খাও অজিত-দা। হাত-মুখ মুছিয়ে দি তোমার—

আস্তে আস্তে আমি উঠে বসলাম। অজ্ঞান আমিই, এখনো টের পেল না। শুধু হাত ধোওয়ানো নয়—ও কি! মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়, কি করছে যে ! হাতে বাজে অন্য রকম।

টর্চ জ্বাললাম। বাজের উপর ঝুঁকে পড়ে লিলি তার শাড়ির খাঁচলে হাত-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে। বেডিং-বস্তার আড়ালে মানুষটাকে ঠিক দেখতে পেলাম না।

লিলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু। খপ করে আমার হাত ধরিয়ে বলল

ঘাড় নেড়ে আমি বললাম, বলে আমি দেখেছি। সমস্ত ফাঁস করে দেবো।

সহসা বিছানার ওপাশে মানুষটা খাড়া হয়ে বলল, চলুন—আমিই যাচ্ছি।

লিলি বলে উঠল, উঠো না, উঠো না তুমি অজিত-দা—

শুধু ওঠা নয়, ধাক্কিয়ে নেবে পড়বার চেষ্টা করছে ছোকরাটি। হঠাৎ অমন আর্তনাদ করে সে পড়িয়ে পড়ল।

পিউরে উঠে তাকালাম তার দিকে। বাঁয়ের অমন গীতবস ছোরার ফলা। সমস্ত খুচে খেয়ে যা ঘরঘর করছে, বাঁকুনিতে রক্তের ধারা বেরুচ্ছে ফলমুখ দিয়ে। সেই অবস্থায় স্তম্ভিত করতে পারত, ঘুমুর তো কবজা সেই নিয়ে গিয়ে ধরা দেবার। ওদের আকুন বলাই, চাইলে আমি এই সোহাগের নিয়ে পড়ে থাকতে।

লিলি রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, না অজিত-দা,—

দু-জনে ধরাধরি করে নামালাম অজিতকে। আমি তার আগের ঘটনা বলেছি। আজ দেখি—নিজের চোখে না দেখলে কখনো আমি বিশ্বাস করতাম না—সেই ফিক-সিটকানো সৌখিন ছোকরা লিলি, যার কিনা সিল্ক ও উল্কলতার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেদের মুখ মনে পড়ে—আমি সমুখে একখানা কমাল অজিতের বাঁয়ের উপর চেপে ধরেছে। কমাল ভিজে গিয়ে রাবের রবরক্ত ছড়িয়ে পড়ছে

পড়ছে তার পাউডার-বুলানো মুখের উপর দিয়ে, রাঙানো বধওলোর উপর দিয়ে। আর কি আকুলতা দেখলাম তার চোখে-মুখে!

ষ্টেশনের কেরোসিনের আলোর নিচে হঠাৎ বঙ্কিমকে দেখা গেল। ঝুঁকে ঝুঁকে টিকিট দিচ্ছে বোধ অফিসকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি বঙ্কিম?

'আসছি—' বলে কোথায় যে লিলি চলে গেল, অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ি ছাড়বে, ঘণ্টা দিতে যাচ্ছে এবার—

ছেলে বললাম, লিলিকে আমার এখানে টেনে এনেছি। বড়লোকের মেয়ে—ছেড়ে যায় খুব কাদি গাছের গাঙ পোড়া বিড়ির মধ্যে কেমন আনন্দ ভরপুর হয় আমাদের। যাও লিলি, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে—

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলি, মাদুরপুর পৌঁছবার আগেই আমি ব্যবস্থা করে রেখো। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও দিদিভাই—

লিলি নেমে গেল। বঙ্কিমের সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে ঘনঘন দুটি তুলে তাকাল একবার আমার দিকের জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম।

নীলগঞ্জ ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম নেই। জন চারেক কুলিকে দিয়ে অফিসের ইজিচেয়ারটা আনালাম। কলাই আমার ভেবে, ডাক্তারবাবু বলে খাতির খুব, একেবার সম্রাট কাতে পারেন আমাকে এ জায়গায়। সেই ইজিচেয়ারে অফিসকে শুইয়েছি, আমার কালো কম্বল টেকে দিয়েছি আপাদমস্তক। ইচ্ছে করেই বঙ্কিমের গাড়ির সামনে দিয়ে যাই। লিলি খুব গল্প জমিয়েছে, একখানা হাত এলিয়ে দিয়েছে বঙ্কিমের কোলের উপর। আলগা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতেই বঙ্কিম যথাসম্ভব তার টিকিট করছে।

আমায় দেখে বলে, চললেন বাবা?

হ্যাঁ। আর গেরো কেমন ঐ দেখ। রোগী দেখতে গিয়ে রোগীটাও পিছন নিয়েছে। লিঙ্গসাত্রে কেউ নেই, হাসপাতালে ভরতি করে নিতে হবে।

[illegible] উঠে দাঁড়াল।

[illegible] ঘরে আলি দাদাকে—

[illegible] ছেলে এসে কাদা-ভরা গাটকম্বলে আমার পায়ের গোড়ার উপুড় হয়ে প্রণাম করল। মুখ তুলল যখন দেখি, সাবাস দিয়ে দাঁড়ানো চুলে [illegible] ঠোঁটের ছুঁচে কাদা লেগেছে। কুলিরা গাটকম্বল-সমেত রোগিকে গাটকম্বলের গেট পর্যন্ত বয়ে নিয়েছে।

মাটীর দান

শ্রীজ্ঞানলতা সিংহ

[বিজ্ঞান বলে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে বিশ্বচরাচর এমন সংহত হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বের বাইরে, মানুষের সংসারে নারী সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি··· আজ আমাদের দেশে সেই শক্তির অন্তরে এসেছে আলোড়ন···একদিকে তাকে টানছে, পশ্চিমের নব-যৌবন···নারীর স্বাতন্ত্র্য আত্ম-সম্মানের বৈজ্ঞানিক চেতনা...অন্যদিকে তাকে বেঁধে রেখেছে, এই সুপ্রাচীন গতানুগতিক সমাজের অনুষ্ঠান...অন্ধ গতানুগতিকতা···কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক গতানুগতিকতা, একি সত্যই অন্ধ! আর এই যে নব-জাগ্রত আত্মচেতনার বৈজ্ঞানিকতা, একি সত্যই নিশ্ছিদ্র সম্পূর্ণ! আজকের আধুনিকা চলেছে এর উত্তরের অনুসন্ধানে···লেখিকা দিয়েছেন তার পথ-নির্দেশ.....]

(১)

সুচিত্রার ছোট হইতেই মা নাই। মা যখন মারা যান সে তখন শিশু। কিন্তু তাহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহও যেমন করেন নাই, তেমনই সুচিত্রাকে কোন নিকট আত্মীয়া খুড়িমা, জেঠাই ঠাকুমা, পিসীমার নিকটেও মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সমর্পণ করেন নাই। দার্জিলিঙে তাঁহাদের একটি ছোট বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দূরে হিমালয়ের দৃশ্য দেখিয়া জীবনের শুষ্ক, শান্ত মনে নিমজ্জিত করিবার ইচ্ছা আসিত বলিয়া স্ত্রীর সখে বাড়ী খানি করিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এই বাড়ীতে তিনি মেয়েকে লইয়া আশ্রয় খুঁজিতেন। আর একটি ছেলে ছিল, সে কলিকাতায় কলেজে পড়িত। বিত্তের কোন অভাব না থাকায় তাঁহাকে উপার্জনের প্রয়োজনে ঘুরিতে হয় নাই। হিমালয়ের পদমূলে পিতা-পুত্রীর দিন কাটিতেছিল। সুচিত্রা বাড়ীতে পড়িয়া গান শিখিত। তাহার পিতা এককালে কলিকাতার একজন নামজাদা প্রফেসার ছিলেন। নিজের জ্ঞানের সমস্তটুকু সঞ্চয় উজাড় করিয়া দিয়া নিভৃতে একান্ত ভাবে এই পরমস্নেহের পাত্রীটিকে শিক্ষা দিতেছিলেন। ফলে এই হইল যে, সুচিত্রা কলেজে গেল না, নোট মুখস্থ করিল না; কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে পরমাত্মীয় তাহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বুদ্ধিমতের লৌকিক আচার ব্যবহার প্রায় কিছুই সে শিখিল না কিন্তু সরলতা, প্রশান্তি এবং আনন্দের প্রতি অনুরাগে এই মেয়েটির জীবন এমন এক অপূর্ব পুষ্পিত হইয়া উঠিল, যাহা বাহাদী মেয়েদের জীবনে দুর্লভ। বাড়ীতেই পড়িয়া কলিকাতা যুনিভার্সিটির বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া ইংরেজীতে এম-এ দিবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত হইতেছে; এমন সময় হঠাৎ কয়েকদিনের একটু সামান্য অসুস্থতায় সুচিত্রার বাবা মারা গেলেন। এত আকস্মিকভাবে এ

ঘটিয়া গেল যে, কলিকাতায় সুচিত্রার দাদা-বৌদিকে আসিবার জন্য তার করা হইয়াছিল, তাঁহারা আসিয়া আর ব্রজকিশোরবাবুকে দেখিতে পাইলেন না। ইহার পর একা সুচিত্রার পক্ষে দার্জিলিংয়ে থাকা অসম্ভব। বাড়ীটা মোটা টাকায় ভাড়া দিয়া এবং জিনিষপত্র ও আসবাব যথাসম্ভব কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া সুচিত্রা তাহার দাদা সুচারুর সঙ্গে কলিকাতা আসিল। দাদার সংসার সুচিত্রার পক্ষে প্রায় অপরিচিত। একে তো দাদা বয়সে অনেক বড় তাহার উপর বিলাতী খেতাবের জোরে তিনি কলিকাতায় মোটা মাহিনায় চাকুরী লইয়া যথারীতি নিজের নিয়মে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, দার্জিলিংয়ে পিতা এবং কন্যার বিশ্রব্ধ জীবন দৃশ্যের মাঝে যাইবার বড় একটা সময়ই পাইতেন না। তাই প্রথম প্রথম কলিকাতায় আসিয়া সুচিত্রার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল। যে গিরিনন্দিনী তাহার জীবনের আঠারো বৎসর হিমালয়ের কোলে তেমনই নির্জ্জন শুভ্র পিতার স্নেহছায়ায় বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে কলিকাতাটা একটা বিরাট জাঁতাকলের মত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। দাদার সংসার এবং পিতার আশ্রয় এতটুকু বস্তুর মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মনের সমস্ত শিরা উপশিরা গুলা ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া ওঠে উপায়বিহীন বেদনায়।

(২)

নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানার খোলা জানালার গরাদে হাত রাখিয়া সুচিত্রা অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, সুচারু একেবারে অফিসের পোষাক পরিয়া টাইটা আঁটিতে আঁটিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, সুচি, তোর বৌদি বলছিল কাল তুই নাকি কিছুতেই বালিগঞ্জ গেলি নে। সমাজে বাস করতে গেলে সমাজের নিয়ম কানুন গুলো একটু মেনে চলতে হয়। তোরই জন্যে তার ঘরের চৌধুরীরা অত আয়োজন করলেন অথচ…

সুচিত্রা তার দাদার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বলিল, আমার ওসব জায়গায় যেতে ইচ্ছা করে না। আমি যাব না। বৌদি যেন তার জন্যে মাথা না ঘামায়। সুচারু এই সংক্ষিপ্ত জবাবে হাসিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুচিত্রা এইবার এইদিক পানে চাহিয়া দীপ্ত স্বরে কহিল, দাদা, আমি মনে করছি টাকাটা জুলাই থেকে য়ুনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হব। এম-এটা আমার ভালো করে দেওয়াই চাই। তা ছাড়া বাড়ীতে একলা এ-বাড়ীতে আমার সময়ও কাটছে না। সময়টা কেটে যাবে কোন রকমে।

বাড়ীতে অবশ্য অনেক লোকজন। একা বাড়ী বলিলে বাড়ীর অপবাদ দেওয়া হয়। সুচারুর চার ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেরা এবং মেয়েরা স্কুল পড়ে, আয়াদের বড়, বাবুর্চি, বহুনী বিয়ারার [illegible] আছে, হৈচৈ করিতেছে, সুচারু এবং তাঁর স্ত্রী কলপ্রভার বন্ধু বান্ধবীরা [illegible] নামেই উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষে আসা-যাওয়া করেন। বয়, বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, [illegible], ঠাকুর—সমস্ত [illegible] বাড়ী সরগরম। কে বলিবে এই জনকোলাহল মুখরিত বাড়ীতে একটি মেয়ে এমন একা বোধ করে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে দ্বিতীয় সঙ্গী নাই।

সুচারু কহিল, য়ুনিভার্সিটিতে নাম লিখিয়ে আবার ঘটা করে এ-এ দেবার কী দরকার। সে তো দু'বছরের ধাক্কা প্রায়। এদিকে কি একটা বলিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না পড়েও তাই তো পাশেই। যে কোন এম-এর ছাত্রকে পড়িয়ে দিতে পারি। বাবার লাইব্রেরিতে এখনও তো মুখ গুঁজে পড়ে থাক। স্ত্রীর এমন কী দরকার পড়লো শুনি?

সুচিত্রা কহিল, হ্যাঁ, আমার দরকার আছে। খুব ভালো করে এম-এটা পাশ কোরতে চাই, একটা চাকরী জুটিয়ে তা হলে আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব।

ভগিনীর এই অচিন্তনীয় রূঢ় বাক্যে আহত হইয়া সুচারু বলিল, কেন, এখানে থাকতে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? চাকরী কি তোমার না জোটালেই নয়? তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে, আমাকে যদি বলো, সাধ্য থাকলে আমি তার প্রতিকার করবার চেষ্টা করি। সুচিত্রা কোনো উত্তর দিবার পূর্বেই একটি দুলালী, গৌরবর্ণা মহিলা চোখমুখ লাল করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, তুমি আবার কি প্রতিকার করবে? এই যে কাল সভার মাঝে আমি অপমানিত হলুম। মিসেস চৌধুরী আমাকে বলেন, আপনাদের কথার ঠিক নেই, সুচিত্রা আসবে বলেই আমি এত আয়োজন করেছিলুম কিন্তু সেই এলো না। একটু আগে যদি খবর পাঠাতেন তা হলে আমি পার্টির দিন পিছিয়ে দিতুম। তাঁর কথা শুনে সাথে অপমানে আমার মনটা যেন পুড়ে গেল। তোমার বোন যে কোন ভদ্র সমাজে মিশবার অযোগ্য।

সুচিত্রা তাঁর দাদার দিকে চাহিয়া কহিল, দাদা, তোমাদের সভ্য সমাজের চেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। সেজন্যেই আরো আমি পালাতে চাই। তার বরং চৌধুরীর পার্টি নিয়ে তোমাদের এত উদ্বেগ এত মাথাব্যথা, কিন্তু এর মধ্যে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?

সুচিত্রার বর্ষীয়সী একটা বাহু জানালার লোহার গরাদের উপর রাখা, তাঁর কাঁধের সকল বাতাস তাহার সোনালী চুলে একটা ঢেউ দিয়েছে, সেই দিকে ঈর্ষাদগ্ধ নয়নে চাহিয়া মহিলা কহিলেন, ন্যাকামি দেখলে রাগ হয়। কেন মাথাব্যথা জানেন না যেন! তাও আবার ওঁকে জানিয়ে দিতে হবে।

সুচিত্রা বলিল, জানতে পেরেছি ব'লেই অবশ্য ন্যাকামি করতে চাই নি। আর সে জন্যেই আমি কাল রাত্রিতে ওঁদের পার্টিতে যাই নি। বৌদি, যদি সভাই ন্যাকামি দেখলে তোমার রাগ হয় তা হলে আমি কাল ওখানে যাই নি বলে তো তোমার খুশী হবারই কথা। কারণ গেলেই আমাকে অবশ্য ঐ কাজটি ক'রতে হোত। ও সব আমি ক'রতে পারব না। ভালো লাগে না আমার।

সুচারু চাইটা শেষ করিয়া বাঁধিয়া নিকটের একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কথাটা পরিষ্কার করেই হয়ে যাক। যখন উঠেছে কথা তখন ঢাকা রাখা কিছু নয়। অফিস যেতে হয় তো আমার একটু দেরী হয়ে যাবে, তা হোক। সুচি, কলেজে এসে তুমি হঠাৎ হলে এম-এ পরীক্ষা দিতে চাইলে। চাকরি নিয়ে সে আমাদের এখান থেকে চলে যাবে, কেমন এই তো?

সুচিত্রা সন্দিহানচক্ষে সতর্ক সকলন করিল। ভগ্নীপতি অধিবর্ষী মুখে আমার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত রাগত স্বরে কি একটা বলিতেও যাইতেছিল কিন্তু স্ত্রীকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া সুচারু কহিল,

আগে আমার কথাটা শেষ করে নিই। চাকরি না করেও যদি অন্য কোন অধিকতর সম্মানজনক উপায়ে অতুল সংসার চলে যেতে পারে, তাতে তোমার আপত্তি আছে কি সুচি?

সুচিত্রা কহিল, আছে। কারণ যে উপায়ের কথা তোমার ও বৌদির মনে আসছে সেটা আমি জানি। লেডি চৌধুরী তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। এ উপায়ে আমার একটুও মত নেই।

কণপ্রভা কহিল, ভদ্রসমাজের কোন মেয়েই তোমার মত এমন অভদ্র ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি, লেডি চৌধুরীর বাড়ীর বৌ হওয়া, যে কোন মেয়ের পক্ষে সেটা অভাবিত সৌভাগ্য তাতে তোমার আপত্তি কিসের?

সুচিত্রা শান্ত স্বরে কহিল, এতেও তুমি তা বুঝতে পারবে না বৌদি। কি করেই বা বুঝবে বলো। তোমাদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট থাকতে হ'লেই আমি হাঁপিয়ে উঠি। তুমি যদি ঠিক আমার মত করে ছোটটি থেকে আমার বাবার কাছে মানুষ হ'তে তা হলে বুঝতে পারতে আমার কথা। টাকা জিনিষটা ভালো, কিন্তু সেটা উপকরণ। উপকরণকে বেশি বাড়ালে অবশেষে তা মানুষটার অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলবার যো করে। বাবাকে কি একবারও দেখ নি? আমাদের বাড়িলিংয়ের বাড়ীতে বেলিল মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ যেদিন অমল করে সেদিন হিমালয়ের রূপ কেমন করে চোখে পড়ে তাও কি জীবনে একবারও চোখ মেলে দেখ নি? তুমি না দেখে থাকতে পার, কিন্তু আমি দেখেছি। তারপর কি আমি লেডি চৌধুরীর বাড়ীর বৌ হবার জন্যে লালায়িত হতে পারি, ভয় হয়েছে আমার!

(৩)

কণপ্রভার বিরাট ভ্রূকুটি এবং শাসন সত্ত্বেও তাঁহারই ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সুচিত্রার চারিদিকে ঘিরিয়া একটি নূতন আনন্দলোক সৃজন করিয়া তুলিয়াছে। গানে গল্পে খেলায় পড়ায় শিশীমাকে না হইলে তাহাদের একদণ্ড চলে না। সুচিত্রা ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়িতে সুরু করিয়াছে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইয়া। কিন্তু সংস্কৃতেও তাহার যেমন প্রগাঢ় জ্ঞান অর্থনীতিতেও তাই, দর্শনশাস্ত্রেও তাই। তাই সুচিত্রা একদিন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, তুমি ইচ্ছা করলে পাঁচবার এম-এ দিতে পারো, আমো শিশীমা! কোন্ বিষয়টা যে তুমি জান না, শুধু তাই ভাবি আমি।

তাহার শিশীমা কহিল, আমার কিন্তু একবারও যেবার ইচ্ছে ছিল না সুচি, পাঁচবার দূরের কথা। তবে কিনা, অনেকটা দূর পড়ায়। ডিগ্রী না থাকলে লোকে চাকরি দেয় না। এইটুকু দুঃখ। সবাই তো আর আমাদের মুনি নয়।

সুচিত্রার নীল চোখ ও মর্মর শুভ্রতার উপর যে ছটি কোমলশ্রী ঈষৎ শ্যাম বাঁধুলের কাঁপিতেছিল সেই দিকে চাহিয়া সুচিত্রা মৃদু স্বরে কহিল, তুমি চাকরি করবে কি শিশীমা? আমার তাবতে ভালো লাগে না। কি যে অদ্ভুত ঘুম।

কেন যে? সবাইকেই কিছু কিছু না কাজ করলে চলবে কেমন করে? বাঁচাটা ঘুমের ভাবে কাটাতে যেয়ে কাজ করা চাই বইকি। শুধু শুধু খেলে যাওয়া!

সুচিত্রা আর কথা না বাড়াইয়া বলিল, সে হবে হবে। আজ কিন্তু আমাকে এপ্রোজে সেই গানটা তুলতে একটু দেখিয়ে দাও না। সেই যে সেদিন সন্ধ্যেয় তুমি গাইছিলে : 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।'

এপ্রোজটা পাড়িয়া শুচিত্রা সুর দিতে লাগিল। সেই ফিতে, কিছু কাল চাহিয়া সুমিত্রা বলিল, সুর, চাকরি করবে মনে হলেই এমন হাসি পাচ্ছে পিসীমা। আমাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস আর সুবর্ণরেখার মত মেয়েই তা বলে তুমি নও। সে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি।

সুচিত্রা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তোর মাথার দোষটি সেই একই কথা ঘুরছে তখন থেকে। গান শুনতে বসে যারা অন্য কথা ভাবে, সুরের মধ্যে ডুবে না যায়, তারা কিন্তু গান শেখে না সুনি। নোস এখানটা ভালো করে। সুচিত্রা গাহিতে লাগিল :

'এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি,
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।'

ইতিমধ্যে জমাট আসরের ভিতর সুচারুর বড়ছেলে সুব্রত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল, পিসীমা, আজও কিন্তু আমাকে ইংরিজী রচনাটা লিখে দিতে হবে। কাল তুমি যেটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে সেটা আমি মুখস্থ করে ছিলাম, আর খানিকটা খানিকটা লিখেও দিয়েছিলাম। পড়ে তো আমাদের প্রফেসরের মাথা ঘুরে গেছে। বলেছেন, এ রকম আইডিয়াও লিখতে পারি নে। উঃ, সমস্ত ছেলের সামনে একথা শুনে আমার যা গর্ব হচ্ছিল, সে আর তোমায় কী বলব!

সুব্রত এইবার ম্যাট্রিক পাস করিয়া সবে মাত্র প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়াছে। ছেলে-মেয়ের এই মুখ পুড়ার ভার অপ্রভার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছে ক্রমশঃ। নিজের পেটের ছেলে-মেয়ের কাছে যে শ্রদ্ধা যে গৌরব আরতি নিজে তিনি জীবনে কখনো পান নাই তাহা সুচিত্রা তাঁহাকেই যেন বঞ্চিত করিয়া গ্রহণ করিতেছে। সে দিন রাত্রিতে তাই শুইতে আসিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া স্বামীর কাছে ভূমিকা পাড়িলেন, দেখ তোমার ঐ বোনের বৃত্তান্ত দেখে দেখে সুমিত্রা, ছুনি এরা যে ঘরে আসে-শেষ অবধি কল কিন্তু তোমাকে ভুগতে হবে। তখন আমাকে দোষ দিতে এলো না। আমি প্রথমে করে ওদের ভূমিকা দিচ্ছিলেম, কিন্তু এখন আর ওরা আমাকে মানতেই চায় না। শেষে ঐ সুচিত্রার মত সমাজের কাছে লোকজনের কাছে আমার মাথা হেঁট করবে। তোমার মুখও তাতে খুব উজ্জ্বল হবে না।

সুচারু বলিল, আমাকে কি করতে বলো? তুমি তো জানো বাবা উইল করে তাঁর যা কিছু আছে অর্ধেক সুচিত্রাকে দিয়ে গেছেন। তাকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি নে। সুচিত্রা উইলের কথা জানে। সে কিছু বলে না। কিন্তু দেখো এই [illegible] এই বাগান এই আরাম এবং বিলাসের সব উপকরণে তোমার যেমন অধিকার সুচিত্রারও তাই। এক চু[illegible] নয়। ভুলো না এ কথাটা।

এই একান্ত অপ্রীতিকর কথাটা অপ্রভাও হাড়ে হাড়ে জানিত। তাই আর কিছু না বলিতে পাইয়া ভীষণের চাকের মত মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

(৩)

কিন্তু সমস্যার সমাধান করিয়া দিল সুচিত্রা নিজেই। সে নিজেই দাদাকে আসিয়া বলিল, এবাড়ীতে আমার পড়াশোনার অসুবিধা হয়, আমি মনে করছি আসছে মাস থেকে ভালোমেয়েদের একটা হোস্টেলে উঠে যাব। আশা করি তুমি অমত কোরবে না।

ঋণপ্রভা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সুচারু একবার ক্ষীণস্বরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুচিত্রা তাহার তুষারমোহিনী হাসি হাসিয়া কহিল, দাদা, তোমার কিছু দোষ নেই। আমি নিজে ইচ্ছা করেই যাচ্ছি। তোমাদের এ বাড়ীতে আমি কী করবো? আমি এখানে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। সুচিত্রা যাহা ভাবে তাহাই বলিয়া দেয়। তাহাদের সমাজে এ বস্তুটি একেবারে নতুন। কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে সুচারু টাই বাঁধিয়া আফিস যাইবার উদ্যোগ করেন। কেবল ছেলে-মেয়েদের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। কোথা হইতে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সোনার একটি কিরণলেখা তাহাদের জীবন আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার সরিয়া গেল। তাহারা ধরিয়া বসিল, পিসীমা, তুমি না গেলে, আমরা যাবো মধ্যে মধ্যে তোমার হোস্টেলে। তোমাকে দেখব, তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

সুচিত্রা হাসিয়া বলিল, না রে বাসু নে, তোদের যে সমাজ আর যেখানে তোরা আজীবন কাটাবি সেখানের পক্ষে আমার সঙ্গ নিরাপদ নয়। এই এতবড় একটা বাংলাদেশে তোরা কি একরকম কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে কাটাচ্ছিস। আমার বাপু দু'দিনে হাঁফ ধরে গেছে। তোরা আমার সঙ্গে বেশি মিশিস নে, এ হুকে থেকে আমার সঙ্গই এর মধ্যে থাকতে পারবি নে, কষ্ট পাবি। আচ্ছা, আসি তা হলে।

হোস্টেলে সুচিত্রার সঙ্গে সিস্টার ইরাবতে পড়ে ইন্দু, সে ধরিয়া বসিল, এই ক্রীস্‌মাসের ছুটিতে আমার সঙ্গে তোমাকে আমাদের দেশে যেতে হবে ভাই সুচি। কি সারাক্ষণ একা একা থাকো। কলকাতার বাড়ী; তবু একটানা কোন ছুটিতে বাড়ী যাও না। চল এবার, পিঠে পার্বণের সময় তবু তবু ক্রীস্‌মাস কেক খেয়ে কাটাতে হবে না কতরকম পিঠে খাওয়াব তোমাকে।

সুচিত্রা রাজী হইয়া করিল, চল না। বাংলাদেশের প্রতিকোণ আমাকে টানে। কি এক আকুল, নিবিড় আকর্ষণ। ছোট থেকে হিমালয় হিমালয়ের কোলে একেবারে পুব উদয়ে। ভগবান টান দিয়ে পাঠিয়েছেন এক আঘাতে নামিয়ে দিলেন। প্রথমটায় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম কিন্তু এখন ভাবি, ভাগ্যে নামিয়েছিলেন নইলে তোমাদের জানতুম কেমন করে? নিজের চারদিকের আবিলতা কাটতো কেমন করে?

ইন্দু বলিল, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার কি মনে হয় ভাই জান? মনে হয়, তুমি রাজরাণী হয়ে জন্মাবার। কিন্তু রাজরাণী তুমি হলে কি—

সুচিত্রা একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, ও কথা বোলো না ইন্দু। রাজরাণী মানে কি এক গা গয়না পরে হিংসোপের পর্দার-ভিতরে ঢুকে থাকা? আমি রাজরাণী হই কি। জোৎস্না রাতে আমি যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাই, তখন আমি রাজরাণী।

প্রথম আষাঢ়ে বৃষ্টির জলে যখন মাটি থেকে সুগন্ধ ওঠে, আর বহুদিন পরের জলধারায় সেই ভিজে মাটির সর্বাঙ্গ থেকে কী সুরভিত শ্বাস বয়, আমি আমার সর্ব-মন প্রাণ দিয়ে তাই যখন অনুভব করি তখন আমি রাজরাণী। নই কি, বল? বাবা আমাকে ছোট থেকে শিখিয়ে দেছেন অনুভবের গভীরতাই মানুষের জীবনের অমৃত। এই মাপকাঠিকে কোন উপকরণের লোভে, সস্তা আরামের কোন দুর্বল প্রলোভনে যেন নষ্ট না করি। মানবাত্মার এই চরম এবং পরম ঐশ্বর্য। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন সব জানার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গিয়েছে, যেটুকুর অভাবে কোন কিছুই ঠিক করে ধরতে পারছি না!

ইন্দু অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বলে, যখন লোকে আজকালকার মেয়েদের গালাগালি দেয়, তখন মনে হয় তোকে তুলে ধরে দেখাই।

সুচিত্রা হাসিয়া বলে, ভুল করবি, তারা তা হলে আরো বেশী করে গালাগালি দেবার অবকাশ পাবে। তবে, পাহাড় আমাকে এমন জিনিস শিখিয়েছে, যা দেখছি, তোদের সমতল দেশে নেই। কিন্তু ভাবি, এই সমতল মাটী, এর কি কোন দান নেই? দুঃখের বিষয় তাই, কারুর মুখে এখনো তার কোন ছাপ দেখতে পেলাম না!

ইন্দু বলে, সমতল হলেও, আমি বলছি, আমাদের দেশ তোর ভাল লাগবে। হিমালয়ের নির্জন নীরব গাম্ভীর্য দেখেছিস ছোট থেকে। এবার পদ্মার প্রবহমান স্রোতের চারদিকে জীবনের কত চপলতা, কত হাসি-কান্না দেখবি চল। তবুও এর তীরের সমস্ত দৈনন্দিন কাজ কর্মের মধ্যে একটা অচপল মহিমা আছে, যা তুই নিশ্চয় অনুভব করতে পারবি। যা উপলব্ধি করে কবি বলেছিলেন, 'হে পদ্মা আমার, তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।'

সুচিত্রা বহুদিন পর কলিকাতায় যাইতেছে। দুই বন্ধু একসঙ্গে আনন্দিত মনে যাইবার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। দুই জনেরই মন খুশীতে ভরা।

নদীর ধারের সেকালের আমলের ইন্দুদের প্রকাণ্ড বাড়ী, দেখিয়া সুচিত্রার খুব ভালো লাগিল। আর সকলের চেয়ে ভালো লাগিল তার ইন্দুর মাকে। দেখিয়াই যেন তাহার মনে হইল, তোমাকেই কি খুঁজিতেছিলাম এতদিন? এই প্রকাণ্ড বাড়ী এবং প্রকাণ্ড পরিবারের তিনিই গৃহিণী। তার সাতটি ছেলে-মেয়ে। বাংলাদেশের বাইরে এবং বাংলার ভিতরে কতস্থানে ছড়াইয়া আছে তাহারা একজন রাজবন্দী হইয়া দেউলীর জেলে আছে। তবুও তিনি প্রতিনিয়ত যেন সর্বক্ষণই নিজের মধ্যে ছেলে-মেয়েগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহের মাঝে তাহারা বিশ্বজগতে ছড়াইয়া থাকিলেও সংহত হইয়া আছে। সকালে উঠিয়া আর তার ছোটভাইবোনরা, সকলে একত্রে চা ও খাবার খাইতে বসিয়া হাসিতে গল্পে বাড়ী ভরিয়া তুলে। সুচিত্রা একসময় বলে, আমরা সকলেই খেতে বসেছি, কিন্তু মোটিমা কি সকালে চা কিংবা কিছু খাবেন না? তাঁকে কই একদিনও আমাদের সঙ্গে বসতে দেখি না ইন্দু।

বিস্মিত হইয়া ইন্দু কহিল, তুই কার কথা বলছিস? মা? তিনি সমস্ত কাজ-কর্ম সেরে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে স্নান আহ্নিক সেরে তবে হয় তো এক গ্লাস সরবত খাবেন। তাও সবদিন নয়। মাসের মধ্যে তাঁর কত যে অমাবস্যা পূর্ণিমা ধরি আছে কে তার হিসেব রাখে ভাই।

সুচিত্রার আধুনিক মন সংশয়-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে, নদীর জলে আলো পড়িয়া ঝলমল করিতেছে, ইন্দুর মা সুচিত্রাদের ডাকিলেন, এসো তোমরা। পূর্ণিমার ব্রত করেছি, কথা শুনবে না? কথা শুনে প্রসাদ নেবে এস।

চাঁদের আলো শুভ্র আল্পনার উপর পড়িয়া চমৎকার দেখাইতেছে, ধূপের চন্দনের এবং ফুলের মিশ্রিত সুগন্ধে দীনটাকে যেন ঘিরিয়া আছে। সংকোচের বাধা কাটাইয়া সংশয়-আকুল সুচিত্রা বলিয়া উঠে, জ্যেঠাইমা, আপনার প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে এত শিক্ষিত অথচ আপনি তাদের মা হয়ে অথথা এত-লৌকিক আচার ব্রত-নিয়ম এসব মানেন কেন? বাইরের এসব অনুষ্ঠানে যথার্থই কি আমাদের হৃদয়ের কোন উপকার হয়? না, এগুলো পড়া-মুখস্থ-করার মত কেবল পদ্ধতি মুখস্থ করে তার পুনরাবৃত্তি করা?

ইন্দুর মা একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, অনেকের অনেক শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ধারা যেখানে এসে মিলেছে সেখানে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েই রয়েছে মা। কেন রবীন্দ্রনাথ যে গোরার তার এঁকেছেন ছবি—সুচরিতার মাসীমা হরিমোহিনীর ঠাকুর পূজো সবাই বিদ্রূপ করলেও সুচরিতা বলেছিল, যেখানে মনের ভক্তি বহুযুগ হতে প্রবাহিত হয়ে একটা প্রতীক অবলম্বন করেছে সেখানে সে জিনিষটার কি দাম, তার বিচার চলে না। বহুমনের সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধার পরিমাণে তখন তার মূল্য নির্দিষ্ট হয়। তা ছাড়া কি জানো মেয়ের মনের ইচ্ছা করলেই তো আমরা ভালো করতে পারি নে, এইটুকু কেবল পারি, অহর্নিশি তাদের মঙ্গল কামনা করা। নিজের নিজের ভাবে তাই শুধু করি। এই বলিয়া ইন্দুর মা ব্রজেশ্বরী দেবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে নিঃশেষ স্নেহের এমন একটি কোমল ছায়া পড়িয়াছিল যে সুচিত্রা অনুভব করিল, হঠাৎ সেই মুহূর্তে যেন একটা মহান জিনিষের মুখোমুখী আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে। বুঝিল, প্রথম দেখিয়াই কেন তাহার মন উন্মেল হইয়া উঠিয়াছিল। এই তো চিরন্তন কোমল মাটীর দান!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ব্রজেশ্বরী দেবী আবার কহিলেন, সুখ জিনিষটার একটা রূপ আছে মা, অপ্রমত্ত হয়ে সেই রূপ খোঁজ না করে দিয়ে আমরা যদি কেবল ভোগ করেই যাই, তা হলে দেউলে হতে তার বড় বাকী থাকে না। যদি তুমি বল, ইন্দু মাঝে মাঝে বলতে ছাড়ে না, এত সব উপোস-ভিয়েস, ব্রত-নিয়ম করবার দরকার কি? কিন্তু আমি তো তোমাদের মত শিক্ষিতা নই, আমার কেবল মনে হয়, সংসারের মধ্যে যাদের পেয়েছি আমার স্নেহছায়ায়, তাদের রেখে সুখী দেখে যেন চলে যেতে পারি। এই ব্যাকুলতা থেকেই বোধ আমাকে এসব করায় মা।

সুচিত্রা বলিল, আমাকে ক্ষমা করুন জ্যেঠাইমা, আমি যে কখনো মনে মনেও আপনাকে সমালোচনা করি নি। বরঞ্চ আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল আপনি তপস্যা করছেন, তাই তো গভীর

মেয়েমানুষকেই এই তপস্যা করে তবে তাহার সুখ এবং সৌভাগ্যের ধন শোধ করতে হয়। আপনি তো আমাদের মা, তবু আপনাকে দেখে কতদিন আগেকার কুমারসম্ভবে পড়া সেই উমার তপস্যার সংকল্পের কথা আমার মনে পড়ে যায়, সেই যে কোথায় রয়েছে—

"ইয়েষ সা কর্তুমনন্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা খলু
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশম্।"

সেই উমার তপস্যার মধ্যেই আপনার কথার ইঙ্গিত রয়েছে, তাই নয় কি জ্যাঠাইমা?

ব্রজেশ্বরী দেবী হাসিয়া তাহাদের কপালে পূজার চন্দন এবং সিন্দুরের টিপ দিতে দিতে বলিলেন, আজকালকার মেয়ে হয়েও যে, তুমি, ইন্দু আর তোমাদের মত মেয়েরা এটা বুঝতে পার আমার খুব আনন্দ হয় মা। আজকাল এই তপস্যার পালাকে কেউ স্বীকার করতে চায় না। তাই তো দেখছ না, সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে কোথাও কোন বড় জিনিষের আবির্ভাব সম্ভব হচ্ছে না। সবই ভেঙে পড়ছে। তোমরা হ'লে মেয়েজাতি, তোমরা যেন একদিন এই অবস্থার মোড় ফিরিয়ে দিতে পার। তোমাদের জীবন দিয়ে মহৎসৃষ্টি সম্ভব কর। নইলে শুধু লেখাপড়া খুব শিখে গেলাম, তার মূল্য কতটুকু মা!

সুচিত্রা ও ইন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুচিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনার এই আশীর্বাদের যেন যোগ্য হতে পারি জ্যেঠাইমা!

সুচিত্রার নিজের মনে হয় নাই, শৈশবের কোন অস্ফুট দিনে তিনি বিস্মৃতির পারে চলিয়া গিয়াছেন। পিতার কাছে অনেক শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াছিল তথাপি কোথায় যেন একটু পূর্ণতার অভাব ছিল। সমস্ত মন তাহাতে ভরিয়া উঠে নাই। আজ পূর্ণিমার আলোকোজ্জ্বল এই রাত্রিতে জীবনের সেই অপূর্ণ দিক যেন তাহার এই মাতৃআশীর্বাদে পরম তৃপ্তি এবং সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। পাহাড় তাহার জীবনের সূচনায় নিবিড় অন্ধকারের যে ধ্যানলোক সৃজন করিয়াছিল, সমতল মাটী আজ তাহার মনে জ্যোতির প্রাণশিখা জ্বালাইয়া তুলিল।

আমরা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

[একটি পুরুষ আর একটী নারী···যুগ যুগান্তর ধরে, কত কবি, কত লেখক, কতভাবে যে সেই দুটী প্রাণীকে দেখলেন তার ইয়ত্তা নেই···তবুও যেন মনে হয়, যেদিন সেই প্রথম দেখা সুরু হয়েছিল, আজও তাদের লেখনী ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে···কত নামে, কত দেশে, কত বিভিন্নকালে, যে তাদের দুজনার দেখাশোনা হলো, তবু তারা দুজন দুজনাকে আজও চিনলো না? সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে এইটিই কি চরম রহস্য নয়? এক আর একে যে দুই হয়, সবাই জানে, তবু এই সামান্য অঙ্কটুকুর শেষ উত্তর এতদিন পরেও মানুষ বলতে পারলো না, নির্ভুল···? বর্ত্তমান গল্প-লেখক আবার সেই আদিম অঙ্কটী কষেছেন...তাঁর উত্তরে হয়ে গিয়েছে, এক আর একে তিন...কি বিভ্রাট।]

সন্ধ্যার আগেই আমাকে আজ বাড়ী ফিরতে দেখে দোতলার সিঁড়ির উপর থেকেই বিস্মিত আনন্দে বলে উঠলো—একি! আজ এর মধ্যেই যে! পরক্ষণেই শৈলবাহিনী ঝর্ণাধারার মতো তর তর বেগে সিঁড়ির বাঁক কটা বেয়ে নেমে এসে আমার হাত দুটো সাগ্রহে টেনে নিয়ে বললে—না জানি আজ দেখেছি কার মুখ!

শিপ্রা হলেন আমার মধ্যাহ্ন যৌবনের তপোলব্ধা প্রথম প্রিয়তমা!

সহজলভ্যা হয়ে তিনি আমার কাছে আসেন নি। বহুআয়াসে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে তবে তাঁর দুর্লভ বরমাল্য লাভ করতে পেরেছি। নিজের গুণে নয়, ব্যাঙ্কব্যালান্সের জোরে নয়, কেবলমাত্র প্রেমাভিনয়ের কয়েকটি অভিনব মৌলিক কৌশলেই, বাজী মাত করেছি।

মেঘদূতের নায়িকার মতো ঠিক এতটা 'তন্বীশ্যামাশিখরীদশনা' না হলেও শিপ্রা আমার 'তনু-মকলবিম্বোষ্ঠিরতি তনুকান্তি'। পার্টিতে সে সুদর্শনার যোগ্য সমাদর পায়। ড্রয়িংরুমে তার বিদুষী বলে খ্যাতি রটে গেছে। সাজে পোষাকে প্রসাধনে সে আলট্রামডার্ণ।

দুহাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে—এরমধ্যেই আজ এসে হাজির। আমার দিনমণি ত প্রতিদিন দিনান্তেই উদয় হন।

কলহান্তরিতা নায়িকার মতো শিপ্রার এই সুমধুর অভিমানটুকু আমার মিষ্টি লাগলো। হাসি-মুখে বললুম—আচ্ছা, সত্যি করে বলো ত আমাকে—প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় এই পথচেয়ে থাকার মধ্যে কি একটা আনন্দের তীব্র অনুভূতি নেই?

—ওসব মনোবিকলনের গূঢ়তত্ত্ব ছেড়ে সোজা কথায় আমার একটা সোজা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি?

শিপ্রার চোখের কোণে চকিতে বিদ্যুৎ-ঝুলিক ঠিকরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে সে—সত্যিকার যদি অভিসেই আসতে স্থির করেছিলে, তবে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এলে কেন?

—আমার ঘরের বাতায়নে—আমারই ফিরে-আসার অপেক্ষায়—একজন পথ-চেয়ে বসে আছে—তা যে আমাদের কতবড় আকাঙ্ক্ষার ধন সে তুমি বুঝবে না শিপ্রা—

—শুধু কি ওই পঞ্চটুকু চরিতার্থ করবার জন্যই তোমরা আমাদের বিবাহের ফাঁসিতে লটকে নিয়ে এসে বন্দিনী করে রাখো—এই সংসারের জেলখানায়?

—এযুগের আমরা আর তোমাদের বন্দিনী করতে পারি কই? সে পারতো সেই আদি যুগের গিরিগুহা বাসী মানুষেরা। যার বলিষ্ঠ পৌরুষের পদতলে নারী চিত্ত নিজেকে অঞ্জলি ভরে উৎসর্গ করে। কিন্তু আজ তোমরা দেখা দিয়েছো একেবারে বিশ্ববিজয়িনী মূর্তি ধরে। তাই তোমাদের নিয়ে এসে আমরা গৃহদেউলের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের একঘা শূন্যতার আজ আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে—তোমাদের কলকণ্ঠের বীণাঝঙ্কারে—তোমাদের চারু-চরণের মঞ্জীর-নিক্কণে।

বাধা দিয়ে শিপ্রা বলে—তোমরা পুরুষ মানুষেরা যখন মেয়েদের তোষামোদ সুরু করো, তখন আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না। চরণ তো আমাদের সম্পূর্ণ নিরাভরণ এখন। হাতীদাঁত, ঝুটো অথবা সাচ্চাসোনাকে যেমন কোনও 'উজ্জয়িনী-নীলমণি'র মোহাই দিয়েও অলঙ্কারের পর্য্যায় ফেলা যায় না, তেমনি তার যৎসামান্য চটানাড়ি অংশকেও কোনো ভাষাতেই 'বহু আভরণ' বলা চলে না।

উত্তরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হল—এ যুগের হতভাগ্য পুরুষেরা ঐ একটা পরম উপভোগ্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

শিপ্রা মৃদু হেসে বলে—তোমার উচিত ছিল কালিদাসের কালে জন্ম নেওয়া। সেকালে মালবিকা, চতুরিকা, কাননিকারা তোমার মনের মতো হতে পারতো হয়ত! আমাকে নিয়ে এসে তুমি ভারি ভুল করেছো। আমি একেবারেই একেলে।

আদরে শিপ্রার কটি বেষ্টন করে তাকে উপরে টেনে নিতে নিতে তার কানে কানে বলি—এযুগ যেন আমার জন্ম জন্ম ধরে শিপ্রা! তোমার ঐ অবন্তী। ঘাতি বিজড়িত নামটির মধ্যে যে উজ্জয়িনীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উজ্জল হয়ে রয়েছে!

• • • •

রাতের পর রাতগুলি যেন বিদ্যুৎগতিতে মনে পড়ে গেল—আর আমাদের শুভ মিলন-তিথির তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের।

সত্যকথা বলতে কি—আজকের এই বিশেষ দিনটির কথা আমার একেবারেই স্মরণ ছিল না। অনেক-

দিনের একটা গুরুতর ব্যাপারের কিনারা হয়ে যাওয়ার লঘুতায় মনের আনন্দে আমি আজ সকাল সকাল অফিস থেকে বাড়ী পালিয়ে এসেছি। সে-কথা অবশ্য শিপ্রার কাছে বলি নি এখনও। সরলা শিপ্রা ভেবেছে, আজকের অবিস্মরণীয় দিনটিকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করেই বুঝি আমি সকাল সকাল বাড়ী এসেছি। তাই বেচারীর খুশির আর অন্ত নেই! আমার ললাট স্বহস্তে চন্দনাক্ত করবার জন্ত ড্রেসিংরুমের মধ্যে ঢোকে এসে বললে—জানি তুই, তুমি। আমি কোথায় তোমাকে একটা 'সারপ্রাইজ' দেবো ভেবেছিলুম—সব ভেস্তে গেল! আমার যে এখনও সব গোছগাছ হয়ে ওঠে নি। দক্ষিণের ঘরে ফুল সাজানো এখনও বাকি···ঘুপচিগুলো সব মেলে দিতে হবে···তোমার 'ফেভারিট-ডিশ' দু'একটা রেঁধে রেখেছি বটে কিন্তু সে অতিকষ্টে। বাচ্চা ঠাকুরটা কুচ কামকা নেই! মঙ্গলা ঝীকে বার বার করে বলে দিয়েছিলুম যে আজ একটু সকাল-সকাল আসিস, সে এলো বেলা তিনটের পর। খুব বকাবকি করলুম। তখন বলে যে, গোবরার বাপের শরীরটা ভাল নেই মা, আজ সে কাজে বেরোয় নি। বললে মাথাটা বড় ধপ ধপ করছে বৌ, একটু টিপে দে। মাথা টিপতে টিপতে—মুখে আগুন আমার—কখন যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি মা, কিছু টের পাই নি।

এইখানে শিপ্রা আমার গা টিপে দিয়ে, চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গীর ইসারায় বুঝিয়ে দিলে—যেমন আমি মাঝে মাঝে অসুখের ছুতোয় অফিস কামাই করে দুপুরে বাড়ীতে শুয়ে থাকতুম, এই বছর খানেক আগেও।

সেই সব অফিস-পালানো দুপুরগুলোর কথা মনে পড়তে লজ্জিত হয়ে বললুম—আর কাকে আজ আসতে বলেছো?

—কাউকে বলি নি। এবার উৎসব করবো কেবল তুমি আর আমি। তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ।

দুবারই দেখলুম বাইরের লোক এসে ফিরে গেছে শুধু ভীড় বাড়ায়। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে তারা আমাকে তোমার কাছ থেকে তফাৎ করে রাখে। কেউ আসে ছুটি ফুল নিয়ে, কেউ আসে দু'খানা বই নিয়ে, কিন্তু তাদের সে-উপহার আমাকে প্রহারের মতো বাজে! শুধু নীরস লৌকিকতার আনে শুধু ক্লান্তি। আমি যেন লক্ষ্য করে দেখেছি—মনু, ওরা তোমার আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে।

—বলো কি মনু? ওরা এসে আমাদের নিয়ে কত আমোদ করে···হেসে খেলে গান গেয়ে ফূর্তি করে যায়!

বাধা দিয়ে শিপ্রা বললে—সে হাসি বাঁধানো-দাঁতের নকল হাসি···সে গান রেকর্ডে বাজানো কলের গান!

বললুম—থাকগে মনু, ছেড়ে দাও ওদের কথা। কাউকে এবার না বলে খুব ভালই করেছো। এস আজ—

"তোমাতে আমীতে শুধু দু'জনা—
নীপশাখে বাঁধি ঝুলনা!"

• • • • •

প্রতিবৎসর এই দিনটিতে আমাদের দুজনের হ'ত নূতনকরে মালাবদল ও শুভদৃষ্টি—মনু-বাউরীদের

ঘনঘন হলুধ্বনি ও উল্লসিত কল-কোলাহলের মধ্যে! এবার শুধু দু'জনের অধরোষ্ঠের অধীর চুম্বকণনের মধ্যে, নীরবে নির্জনে সমাধা হ'ল সেই প্রথম পরিণয় রজনীর পুনরভিনয়।

ডাইনিং-রুমে আমরা যখন মুখোমুখী দু'জনে খেতে বসেছি, জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার আজকের প্রোগ্রাম কি শিপ্রা? পরিপাটি আহারের পর সুখশয়নে সমাপ্তি, না আঁচলের মধ্যে আরও কিছু বস্তু লুকানো আছে?

শিপ্রা এদিনে তার সেই বিবাহের লাল বেনারসী শাড়ীখানি পরে কপালে চন্দন দিয়ে বৃত্ত করে নববধূর বেশে দেখা দেয়। কবরীতে বেষ্টিত করেছে তার চম্পক-রজনীগন্ধার বিরীট, বুকে রাখে যুঁথি-বেলিকার বরণ-মালিকা। রিক্ত গৌর চরণ দুটি অলক্তক-রাগে রঞ্জিত।

মনে পড়ে গেল—অতি সুস্পষ্টরূপে তিনবৎসর পূর্বের সেই বিবাহ-রাত্রের কথা। মনে পড়ে গেল—সেই প্রথম মিলন রজনীর উদ্দাম বিহ্বলতা—সেই আদ্যের আবেশের আনন্দাতিশয্য!

শিপ্রার দুই চোখ চাপা-আনন্দে উজ্জ্বল! কণ্ঠে মধু ঢেলে দিয়ে বলতে—বা রে! এরমধ্যেই কি তুমি আমাদের উৎসব শেষ করে দিতে চাও? সে হবে না। আমি ফোন করে 'রঙভবনে' একখানা বক্স রিজার্ভ করিয়ে রেখেছি। খেয়ে উঠে আমরা সেখানে যাবো। ড্রাইভারকে আটকে রেখেছি। বাড়ী যেতে দিই নি।

—রঙভবনে যাবে? কী বই আছে আজ? ওরা প্লে করে কেমন? ভালো আর্টিষ্ট কেউ আছে কি?

প্রশ্নগুলো বোধহয় বেশ একটু নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জকই হয়ে পড়েছিল, কারণ সত্যকথা বলতে কি, সেই থিয়েটারে গিয়ে অকারণ রাতজাগার সাধ আমার একটুও ছিল না।

শিপ্রা সেটা বুঝতে পেরে বললে—বেশ ত' তুমি না যেতে চাও, তোমার যা নিত্য নৈমিত্তিক বাঁধা কাজ আছে তাই কর গে। অফিসের ফাইল নিয়ে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ঢোকো, আমি দক্ষিণের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ি গে।

তরুণী পত্নীর মুখ থেকে এহেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সুস্পষ্ট ঘোষণা শোনবার পর আমার মনে হল কুম্ভকর্ণ-শ্রেণীর নিদ্রালু স্বামীরাও অতন্দ্র-নিশি-যাপনের দুরূহ ব্রতে দীক্ষিত হতে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করবে না। অগত্যা আমিও এই পারিবারিক অসহযোগের অর্থ 'রঙভবন' কেন 'শমনভবনে'ও যেতে প্রস্তুত আছি জানালুম। কারণ, বাইরে থেকে এই ঘরোয়া অসহযোগ যতই নিরুপদ্রব বলে মনে হোক না, ভিতরে কিন্তু অসহায় স্বামী কোয়াসের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা একেবারে দুর্বহ হয়ে ওঠে। সমস্ত সংসারের চাবীকাঠি যে ঐ আঁচলের একটি খুঁটে বাঁধা!

• • • • •

দ্বিরুক্তি না করে শ্রীমতীর পিছু পিছু সোজা গিয়ে বসলুম রঙভবনের রিজার্ভকরা বক্সখানিতে।

পিছন থেকে একজন অন্ধকারে নাকি সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"আজ্ঞে, আপনাদের প্রোগ্রাম লাগবে কি?

প্রথমটা চমকে উঠেছিলুম। অলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকলেও, অন্ধকারে নাকি সুরে কথা শুনলে ছোটবেলার কুসংস্কার বশতঃ এখনও একটা হঠাৎ ত্রাস করে ওঠে বৈকি।

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—একটি আধাবুড়ো লোক থিয়েটারের পাশ্রাম বেচতে এসেছে। তার নাকটা নেই।

হাত বাড়াতেই একখানা গুঁজে দিয়ে বললে, আজে দু আনা! দু'আনা পয়সা দিয়ে তাকে বিদেয় করে প্রোগ্রামখানা শিপ্রার হাতে তুলে দিতেই শিপ্রা বললে—মিছে কেন দু'আনা পয়সা বাজে খরচ করলে? বাংলা থিয়েটার দেখতে কি প্রোগ্রাম দরকার হয়! প্রথম অঙ্ক দেখলেই বোঝা যায় পরবাস কি হবে! এই দু'আনা থাকলে একটা সেন্সেজ খেয়ে বাঁচতুম।

বুকলুম শ্রেয়সী পিপাসার্তা। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে সিলেবিচির মতো চকচকে কালো, আঁট-সাঁট একটি কৃষ্ণবর্ণ ছেলে ঘরের দ্বারে এসে বিনত বন্ধুর মতো জিজ্ঞাসা করলে—সোডা, লেমনেড, সিটপান, চা সিগারেট কিছু লাগবে কি?

বক্স দিয়ে একটা লাইমেড আনতে বলে দিলুম। শিপ্রা বললে—তুমি খাবে না?

—না, আমার তৃষ্ণা পায় নি—আমি একবার প্রেক্ষাগৃহের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। লোকে লোকারণ্য ...নায়কের ঘবনিকা পানা প্রায় দেড়শ কোম্পানীর ছোট বড় বিজ্ঞাপন নিয়ে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রোগীর মত চোখকে পীড়া দিচ্ছে। যে যা খুসি বিজ্ঞাপন দিয়েছে—সে এক বীভৎস ব্যাপার! শিপ্রা যখন লাইমেডের গ্লাসটি নিয়ে সযত্নে তার লিপষ্টিক চর্চ্চিত অধরে স্পর্শ করেছে, আমি সেই ফাঁকে একবার প্রোগ্রামখানা উল্টে দেখে নিলুম। সত্যি কথা বলতে কি—আজও প্রোগ্রাম একখানা হাতে না পেলে আমি অভিনয়ে দিশেহারা হয়ে যাই! পাত্র-পাত্রী আর স্থান-কাল নিয়ে এমন গোলমাল বাধে! বাংলা নাটককে মহারাষ্ট্রীয় বা রাজপুতের মধ্যে যেমন কোনও তফাৎ খুঁজে পাই নি, মোগল পাঠানের মধ্যেও তেমনি কোনও পার্থক্য নেই! স্থানটা জয়পুর—উদয়পুর? না—দিল্লী—আগ্রা? প্রোগ্রামের লেখা ছাড়া বোঝবার কোনও উপায়ই থাকে না, কারণ সব নায়কই যেন একমাত্র সর্ব্বভারতীয় একতা অতিমিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে।

• • • • •

প্রোগ্রামে চোখ বুলিয়ে এই প্রথম জানতে পারলুম আমরা যে নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছি তার নাম 'ভালোবাসা'। নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রণয় গুপ্ত। নায়কের নাম—রোমেন্দ্র। নায়িকার নাম—প্রিয়তমা।

বুকলুম আজকের এই বিশেষ দিনটিতে শিপ্রা কেন এই নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য রমরমে একখানি বক্স রিজার্ভ করেছে। চং চং করে ঘণ্টা বাজল। আমি একটু উদগ্রীব ভাবে আমার আসনে সোজা হয়ে বসলুম। বিজ্ঞাপনের নামাবলী সমৃদ্ধ বিরাট যবনিকাখানি মন্থরগতিতে উঠলো। কার্টেনখানিও যথা-সময়ে অবলীলিত হ'ল। দৃশ্য—রাজপথ এ-আর-পি সেন্টার। পাশে ব্যাকল ওয়াল দেখা যাচ্ছে। রাজপথ দিয়ে নানান রকম লোক যাতায়াত করছে। ফেরিওয়ালা, রিকশ, সাইকেল—বেলা প্রায় সাড়ে বারটা। অকস্মাৎ

থেমে উঠলো। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে অনেকক্ষণ বাসের জন্য হ্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল। ছাত্র ছাত্রী বলে মনে হয়। সাইরেন শুনে ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে নিকটবর্তী রিট্রেঞ্চে গিয়ে ঢুকলো। মেয়েটি সন্তর্পণে সেই ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বাঁশী বাজাতে বাজাতে ছেলেটি পথ এ-আর-পির দল বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় একচক্র ঘিরে ঘুরে গেল।

দেখতে দেখতে রাস্তা নির্জন।

ছেলেটি এইবার রিট্রেঞ্চ থেকে মুখ বাড়িয়ে মেয়েটিকে ডেকে বললে—ও, দয়া করে শীগ্‌গীর চলে আসুন। ওখানটা নিরাপদ নয়।

মেয়েটি কোনও উত্তর দিলে না। ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পিছনে আরও একটু ঘিনসে চুকে

ছেলেটি বললে—এ ট্রেঞ্চের মধ্যে আর কেউ নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।

মেয়েটি কোন সাড়া শব্দ দিলে না। একবার শুধু উঁকি মেরেই আবার ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পিছনে অদৃশ্য হলো। ছেলেটি এবার রিট্রেঞ্চ থেকে চটকরে বেরিয়ে চারিদিকে চেয়ে সন্তর্পণে ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের দিকে ছুটে গেল।

ঘূর্ণাকাশ থেকে এরোপ্লেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কারণ মানে এ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট গানের 'দোদমা' আওয়াজ কাণে আসছে।

ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরে ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের পাশ থেকে টেনে বার ক'রে আনতে আনতে বলছে—'না, এ আমি কিছুতেই হ'তে দিতে পারি নে। এ যে সুইসাইডের সমান! আমাকে মাপ করবেন। চলুন রিট্রেঞ্চে!

মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলছে—না; ছাড়ুন। আপনাকে বিশ্বাস কি? আপনারা তো ইংলেণ্ডিয়ানি রক্ত চেহারায় ভয়ানক!

ছেলেটী বললে—আমি যে আমার নিজের জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে যেতে এসেছি—আমাকে বিশ্বাস করার পক্ষে এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়?

—অপরিচিত একটি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য অকস্মাৎ আপনার এই অতি-ব্যাকুলতা—

—মনে আপনার সংশয় এনে দিয়েছে, না? বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনি শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন যে আপনাকে আমার একটুও অপরিচিত লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে যেন আপনি আমার বহু কালের আপন জন।

• •

পাশ্চাত্যের আলাপ যখন বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে হঠাৎ কানে আসে পাশের ঘরের চাবী খুলে যাবার শব্দ এবং সেই সঙ্গে পিয়ানোর সুরের মতো মেয়েলি মধুর কণ্ঠের প্রশ্ন—কাট' সীনটা কি হ'য়ে গেল বাবা?

একটা সম্ভবতঃ রবাদ্রের যে কর্মচারীটী বাক্সের চাবী খুলে ভিতরে ঢুকে আসন ও মুখে বিছিল তাকেই উদ্দেশ করে বলা, কিন্তু আমি কেমন না বুঝে হঠাৎ উত্তর দিয়ে ফেলুম—না! এই তো সবে শুরু হ'ল।"

মাঝারীর মতো সুগঠিত শুভ্র গ্রীবা হেলিয়ে তিনি একবার চকিতে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে। কমলাক্ষ-পুটে চকিতে ফুটে উঠল বিস্ময়ের বিদ্যুৎ-প্রেক্ষণা!

মহিলাটিকে দেখেই মনে হ'ল তাঁর কোন প্রশ্নই এ মর্ত্যলোকে নিরুত্তর থাকতে পারে না। ইনি একজন সেই শ্রেণীর অসামান্যা সুন্দরী নারী যাঁর আশ্চর্য্য রূপের দিব্যবিভা দেবতা ও মানুষ উভয়কেই সমভাবে মুগ্ধ ও মোহাভিভূত করে!

দুটি বিশাল চক্ষে সে কি গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! লঘু কটাক্ষের এতটুকু চিহ্ন তার মধ্যে নেই। সেই অসাধারণ প্রতিভ চাহনির প্রখর রশ্মি যেন একসঙ্গে ছটার মতো মানুষের অন্তর ভেদ করে। মনের কোনও গোপনতা রক্ষা করা যেন সম্ভব নয় সে দৃষ্টির সামনে।

আমার চাহনিতে বোধকরি রূপ-লোভাতুরের নির্লজ্জ লালসা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুভ্র-পুরুষের গায়ে দিশি ব্যবহারের সংযত আবরণটুকু কখন যে খসে পড়েছিল নিজের অজ্ঞাতসারে কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে খসে যে পড়েছিল এতে আর কোনও ভুল নেই! কারণ, সেই যে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন, আমি বহু চেষ্টাতেও সে মুখের সবটা আর দেখতে পেলুম না।

একটা সংশয় আমার মনে উঁকি মারছিল। শিপ্রা তাঁকে দেখেছে। তিনিও শিপ্রাকে দেখেছেন। উভয়ের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়ে ঘটেছে। শিপ্রা আমার কে উনি হয় তো বুঝতে পেরেছেন।

সেই মুহূর্তে, কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল শিপ্রা আজ আমার সঙ্গে না থাকলেই ভাল হ'ত! মাথায় একটা খেয়াল এলো—ওঁর ধারণা উল্টে দিতে হবে। শিপ্রা যে আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, একজন বান্ধবী মাত্র—এই বিশ্বাস ওঁর মনে জন্মিয়ে দিতে হবে!

আমাদের বক্স থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম শুধু ওঁর মুখের একটি পাশ। যেন কোনও গ্রীক ভাস্করের আধাই করা ভেনাসের প্রতিমূর্তির 'প্রোফাইল'। আর দেখা যাচ্ছিল ওঁর নবীন হাতে বাঁধা শকুন্তলা ঘড়ী। ফুলবসান্ত-বিজড়িত সে বিনোদ-বেণী থেকে একটা মধুর সুরভি ভেসে এসে আমার নিশ্বাস বায়ুকে পরিশীল-সিক্তিত ক'রে তুলছিল। মন আমার হয়ে উঠছিল অকারণ উন্মনা। অভিনয় দেখায় আর কিছুতেই চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারছিলুম না।

কিভাবে যুদ্ধ যে কখন আরম্ভ হয়ে গেছে কিছুই জানি নি। হঠাৎ শিপ্রার আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে উঠলুম। শিপ্রা বলছে—এই মেয়েটির অভিনয় আমার বড্ড ভালো লাগছে—

ঠিকই ধরেছ [illegible] আমার অজ্ঞানকৃত ধরা পড়ে যায়, তাই কারণটা বলে বললুম—ওর ওপরটা ভাল লাগছে না কই সন্ধ্যার অপেক্ষাকৃত সল্পাবৃত স্ত্রী-ড্রাগ-চাইল্ডের মেয়েটিকে ভাল লাগছে? মেয়েটি অবশ্যের না আর্টিস্টের?

শিপ্রা বললে—ওর দুটো মিনিটই আমাকে 'এ্যাপিল' করেছে খুব।

আমি পাশের বক্সের মেয়েটিকে শোনাবার জন্য যেন একটু উঁচু গলাতেই বললুম—ওর বিষয় আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। আপনি যাই বলুন শিপ্রা দেবী, ওরূপ নারী-চরিত্র নিশ্চয় অস্বাভাবিক!

শিপ্রা বলে—কেন? কী যুক্তি থেকে তুমি একে অস্বাভাবিক বল? একটু থেমে গলাটা নেড়ে বসে পাশের বক্সের দিকে নিমেষের জন্য একবার চেয়ে নিয়ে বললুম—Well! does not she appear to be almost a He-woman!

শিপ্রা বলে—সেইটেই ত হয়েছে ওর পক্ষে most natural! There is a She in every man and there is a He too in every woman! যার মধ্যে যে-প্রবৃত্তিটা প্রবলতর সেইটেই হয়ে ওঠে তার বিশিষ্ট বিশেষত্ব! নাটকারের সঙ্গে দেখা হলে আমি তাকে compliments দিব।

আমি পাশের বক্সের অধিষ্ঠাত্রীকে শোনবার জন্য উত্তেজিত ভাবে বললুম—আমি তাকে পেলে shoot করে ফেলতুম! He is a traitor—a betrayer of his own sex! a Quisling among men!

কিন্তু কথাগুলোর একটাও শিপ্রার কানে গেল না। সে তখন নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে অভিনয় দেখছিল। দেখছিল বললে ভুল বলা হয়—গিলছিল। বেমন করে আমি পাশের বক্সের ঐ নারীদ্বেষ-উৎসারিত অপূর্ব ভূপ্রাণি গিলছিলুম।

মহিলাটির সঙ্গে ছিল একটিমাত্র দাসী বা পরিচারিকা শ্রেণীর স্ত্রীলোক। পুরুষ-অভিভাবক কাউকে সঙ্গে না দেখে প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল হয়ত ইনি কোনও প্রধানা নগ্ন-নায়িকা বা চিত্র-তারকা। কিন্তু যে মুখের দিকে যত বার চেয়ে দেখেছি—দেখেছি তা নির্মল নিষ্পাপ। সে মুখে কোথা কৃত্রিমতা—নিজের ছায়া যার নেই।

• • • •

নাটকের কোন্ দৃশ্য তখন অভিনয় হচ্ছে জানি নি। হঠাৎ কানে এল নায়ক প্রেমের গান—তোমাকে আমি অপমান করতে চাই নি বন্ধু! আমাকে যেন ভুল বুঝো না যদি আমি বলি বিবাহের সব কিছু sanctity ও ভাবগম্ভীর ceremony সত্ত্বেও যে দুটি নরনারী পতিপত্নীর তথাকথিত পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তার মধ্যে সেই আদিমযুগের স্ত্রী-পুরুষের মিলনঘটিত সৃষ্টির প্রেরণাই প্রধান! প্রেম বা ভালবাসা এই মিলনের vehicle অর্থাৎ বাহক মাত্র। আমাদের শুভপরিণয়ের মূল ভিত্তিই হচ্ছে প্রজোৎপাদনের সুপ্রাচীন বিধি। রূপ যৌবন তার উপকরণমাত্র।

এই মুহূর্তে পাশের প্রেমিকার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হ'ল আমার। What a stupid! ছি ছি ছিছি! পাশের ঘরের মেয়েটি যদি ওর এই কথা গুলোকে পুরুষ জাতের সম্বন্ধে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করে! How silly!

চেয়ে দেখলুম মেয়েটির দিকে। এর আগেও নিপ্রার দৃষ্টি এড়িয়ে বার কয়েক চেয়ে দেখেছি। আমাদের চোখে চোখে একটা পরিচয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এবারও আমার চোখে চোখে মিল হ'ল। উনি কি তবে অচিনের কিছু দেখছেন না? বার বার আমার দিকে এমন অসীম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে দেখছেন কেন?

নিপ্রাকে ডেকে বললুম—আপনার অভিজ্ঞতটা এ সম্বন্ধে শুনতে পারি কি নিপ্রা দেবী? আপনি কি এই নির্লজ্জ নায়কের নির্বোধ উক্তিগুলো বিশ্বাস করেন?

—সত্যকে অস্বীকার করবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু তবু বলবো মনু, আমি একথা কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে তোমার প্রতি যে ভালোবাসার টানে আমি সমাজ ও সংসারের বিদ্রোহী হয়ে তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছি—সে শুধু—ওই—

এই মাটি করেছে! একে এখন থামানো যায় কি করে? প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করে দেখছি নেহাৎ বোকামী করে ফেলেছি! পাশের ঘরের ঐ রহস্যময়ীর কানে যদি নিপ্রার কথাগুলো পৌঁছে থাকে—আর ও গেছি!

তাড়াতাড়ি ব্যাপারটাকে সামলে নেবার জন্য বললুম—আপনি যাকে পতিত্বে বরণ করেছেন আশা করি তাঁর কোনও ব্যবহারে আপনাকে এ পর্যন্ত অনুতপ্ত হতে হয় নি।

নিপ্রা সন্দেহসূচক ঘাড় নেড়ে বললে—পরে যে হতে হবে না তার ত কোনও গ্যারান্টি নেই মনু! তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে আমার এই ত সবে তিনবছর—

এই দেখেছে! আমাকে তোবালে দেখছি নিপ্রা। চট করে একবার পাশের ঘরের দিকে চেয়ে—সর্বনাশ! সেই হরীণ আঁখির মতো চোখ দুটি নির্নিমেষে আমাদের উপরই নিবদ্ধ।

নিপ্রা বলে চলেছে—এখনও সমস্ত জীবন আমাদের বাকি পড়ে রয়েছে। কে জানে—তুমি একদিন পুরুষ-সুলভ দুর্বলতার আকর্ষণে পত্নীর একনিষ্ঠ প্রেমে ফাঁকি বোধ করে অপর কোনও নারীর মধ্যে তোমার হারানো পূর্ণতা খুঁজতে যাবে কিনা?...তখন ত তোমাদেরই জাতের একজন অকপটে স্বীকার করছে—প্রেম ক্ষণস্থায়ী! বাঞ্ছিতাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়। পরিণীতা পত্নীর মধ্যে তোমরা নাকি খুঁজে পাও না।

—বাঃ, আর হুঁশ নেই যে উঠেছিলুম আমি! নিপ্রাও আজি কিছুই বলতে বাকি রাখলো না দেখছি। ওর কাছে যেটা অবশ্যের সম্পূর্ণ expose হয়ে গেলুম! বিরক্ত হয়ে বললুম—এইবার উঠলে হয় না?

১২টা বাজে। আর ভালো লাগছে না এই—শিপ্রার মন্তব্য। Most absurd and abnormal picture of Love and Life!

শিপ্রা স্মিতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে—আর একটু অপেক্ষা [illegible] ছবিটি! এই দেখ না—এর পরেই 'লাষ্ট সীন'।

—কী বুদ্ধিমতীই পড়লুম আজ আপনাকে এখানে নিয়ে এসে শিপ্রা দেবী, টিকিটের দামটা পুরোপুরি উশুল না ক'রে আপনি নড়বেন না দেখছি! 'লাষ্ট সীন' না হবে [illegible] এ ছবির আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও আটকাতে পারবেন না! আপনি কি সেই দু মিনিটের উচ্ছল দৃশ্য না দেখে এবং সব শেষের সেই মেদুর গান—

চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বাঁশে
চাঁদবদনী কিলো ভালো—

না শুনে আজ আর বাড়ী ফিরবেন না? আপনার ধৈর্য্যকে ধন্যি ধন্যি যাই!

পাশের কক্ষের মহিলাটী এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এটা যে অভদ্রতা-বিরুদ্ধ হ'য়ে গেল বুঝতে পেরে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

কিন্তু সেই কারুকার্য্য-করা রুমালখানি থেকে এমন একটা মদির সুরভি ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের হাওয়ায় ভেসে এলো—আমি ত একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লুম। মনে হ'ল এ ত কোনও বশীকরণের প্রভাবশালী বিলাতী মন্ত্রপূত সুবাস নয়? সেদিন কি যেন একখানা বাংলা খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম—একরকম 'পারফিউম' তারা বিক্রয় করছে, যার টানে বাঞ্ছিত ও আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনকে বশীভূত করা যায়। তাদের ঠিকানাটা টুকে রাখলে ভালো হ'ত। আপশোষ হ'তে লাগল।

পরক্ষণেই মনে হ'ল—আমি কি পাগল? এমন ভুবনবিজয়িনী রূপ যার, তার বশীকরণের উপকরণ ও প্রতি চরণপাতেই ছড়িয়ে পড়ছে নিখিল পুরুষের চিত্তলোকে!

•

শেষ-দৃশ্য হয়ে গেল। যবনিকা এসে নামলো মিলনের আশ্লেষকে আড়াল করতে নয়—বিরহের অশ্রুজল মুছিয়ে দিতে। এ যেন অনেকটা 'শেষের কবিতা'র সেই লাবণ্য-অমিত রায়ের ব্যাপার।

শিপ্রার হাত ধরে ঘরের বাইরে বেরুবার সময় বললুম—এ কি হলো? এ ঠিক হ'ল না। এ যেন গায়ের জোরে 'কমেডি'র গলা টিপে 'ট্র্যাজেডি' করা হ'ল।

গম্ভীরভাবে শিপ্রা বললে—এইটেই হ'ল আসল 'কমেডি'। ওরা ঠিক পথই বেছে নিয়েছে মনু! কিন্তু তুমি আমাকে প্রথমে [illegible] বার বার 'আপনি-মশাই'—'শিপ্রা দেবী' বলে কথা বলছিলে কেন বল ত?

মাথার আমার আকাশ ভেঙে পড়ল! কী উত্তর দিই? চটুকরে প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে জবাব দিলুম—আজকের দিনটির কথা কি কিছু মধ্যেই ভুলে গেলে বন্ধু? তিনবছর আগে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল আজ যে তারই পুনরভিনয়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিপ্রা বললে—তিনবছর আগে যদি এই নাটক দেখতুম! এই আজ সন্ধ্যের মধ্যে তুমি যে কত বদলে গেছ—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে পাশের বেঞ্চের মহিলাটিকে দেখিয়ে বলুম—শিপ্রার কানের কাছে মুখটি নিয়ে গিয়ে—জিজ্ঞাসা কর না উনি যাবেন কোথা? তা হ'লে ওঁকে আমরা নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে মহিলাটির সঙ্গে পরিচয় করা আর ঠিকানাটা জেনে নেওয়া।

কিন্তু হ'ল না! শিপ্রা ভ্রূকুটি করে বললে—কেন বলো ত? সহসা পরোপকার-প্রবৃত্তি উথলে উঠলো যে। তোমরা পুরুষরা দেখছি সবাই অল্প-বিস্তর একটু উচ্ছৃঙ্খল! কেউ সেটা অভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আবরণে ঢেকে চলো, কারুর বা সেটা নির্লজ্জ নগ্নতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে! ও সব ভূমতলব ছাড়ো—চলো গাড়ী ফিরি। আজ আর আমাদের মধ্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সমাগম সইতে পারবো না। বরং ড্রাইভারকে বলে যাও একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ট্র্যাণ্ড ঘুরে যায় যেন।

—রতনবাবু! গঙ্গার ধারে?

—হ্যাঁ, তোমার আজ হ'ল কি? কত রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছি দুজনে ছিলুম পর হনিমুনে যে মনে নেই! কী যে গল্প করতুম কে জানে? কথা যেন আর ফুরতে চায় না! নিঝুমে বসে থেকেছি দুজনে হাতে হাত রেখে এমন কতক্ষণ! উত্তরের কাছে উত্তরের সান্নিধ্যলাভই ছিল সেদিন জীবনের একটা কাম্য···আজ সে-দিন গুলো কোথায় হারিয়ে গেছে!

নিজেকে নতমুখে অপরাধীর মতো গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। আমাদের গাড়ী খুঁজে বার করতে একটু দেরী হয়েছিল। সেই অবকাশে চোখে পড়ে গেল প্রকাণ্ড এক শ্বেত-হস্তীর মতো সাদারঙের রোলস রয়েস লাইমোজিন চড়ে পাশের ঘরের সেই আশ্চর্য রূপবতী মহিলাটি চলে যাচ্ছেন!

নিজের অজ্ঞাতসারে হাতজোড় করে হঠাৎ তাঁকে একটা বিদায়-নমস্কার জানিয়ে ফেলনুম!

আশ্চর্যের বিষয় যে তিনিও আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে প্রতিনমস্কার জানালেন।

ছোটো সার্থকতার অনুভূতিতে সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠলো। পাশে শিপ্রা এখনও কি ভাবছে একমাত্র ভগবান জানেন।

তাঁতীর টানে

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার

[প্রতিদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, আশে-পাশের চলমান জনতার এই-একজনের মুখের দিকে চেয়ে, মনে মনে ভাবি, এরা মানুষ নয়···এরা যেন সব এক একটা ছোট গল্প···কোন গল্পের শেষ অধ্যায় লেখা হয়ে গিয়েছে···তবু যে চলেছে, সে শুধু পুনরাবৃত্তি···কারুর শেষ অধ্যায় এখনো লেখা হয় নি···তবে শেষ-অধ্যায়ে হাসি না কান্না কি লেখা হবে, তার যেন স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠেছে···পড়তে দেরী লাগে না···ভুল হয় না···কারুর পড়তে পারছে না···গল্পগুলি সব এক···শুধু নায়ক-নায়িকার নাম আলাদা···আরম্ভ তাদের, যখন কল্পনার রঙ-বিরঙে···শেষ···ঠিক যেখানে এই কাহিনীটি হয়েছে শেষ···জানা কি, পড়লেই দেখতে পাবেন]

গ্রামের অনাদি-পুড়ো সংবাদ পাঠাইয়া আসিয়াছিলেন সহানুভূতি জানাইতে। কিন্তু এত বড় অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য যাহাকে আঘাত করিয়াছে সেই শঙ্করের নিজের বক্তব্য বা সান্ত্বনার কোন চিহ্ন না-দেখিয়া তিনি যন্ত্রচালিতের মত চলিয়া গেলেন।

"হাঁ খুড়ো, বাড়িখানা ছেড়েই দিলাম। তবে কোলাম সব দিক দিয়ে এক হুণ্ডিতে আর দিবে না।"

শঙ্কর এমনভাবে কথাগুলি বলিল, যেন কারবারে একটি মোটা রকমের লাভের হস্তগত হইয়াছে।

"তুমি বল কি, শঙ্কর, পৈত্রিক বসতবাটী, বাপ-পিতেমোর ভিটে, সেইটে নিজে করে বিক্রি করে দুসিবে বল।"

মুহূর্তের জন্য শঙ্করের মুখের উপর একটা বিষাদের ছায়া পড়িল।

"আজ্ঞে হাঁ···তা···পৈত্রিক ভিটেটা হাতছাড়া করা···সেটা···অবশ্যি···" পরক্ষণেই সেকেলে তাঁতিদের উত্তরাধিকার-প্রতিষ্ঠা ফুটে বলিল, "তা বেশী দিনের জন্যে তো নয়। মহাজন-চৌধুরী মশায় কথা দিয়েছেন···"

"কে ওই তুবন না? চৌধুরীটার কাছ থেকে যখন দেনা করতে সুরু করেছ তখনই জানি যে সর্বনাশের চূড়ান্ত হোয় আগে আর নিস্তার নেই। তা, কি বলেছে তুবন সা?"

"বলেছেন যে বাড়ি আমার যেমন তেমনিই থাকবে। চাওটিও ছোঁয়াবেন না উনি। শুধু সোইমোটারবাবু চার থাকবেন। যেদিন আমি ওঁর টাকা সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারব, সেই দিনই উনি আমার বাড়ি আবার আমাকেই ফিরিয়ে দেবেন।"

"ক' বছরের মেয়াদ? আর ওঁর টাকাটা তুমি শোধ করবে কি করে তা কি কিছু ভেবে নেছ?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা ভেবেছি বই কি। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, আর নতুন যে-কাজটায় হাত দিয়েছি, তাতে যদি লাভ হয়, তবে ঐ টাকা শোধ করতে আর ক'দিন।"

এই সবশেষ সান্ত্বনা ও উৎসাহের কথা বলিবেন বলিয়াই অনাদি মনে মনে মহড়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শঙ্কর মুষড়িয়া পড়িবে এবং নানা রূপ আশাভরসার কথা বলিয়া তিনি তাহার দুর্ভাগ্যের বোঝা সহনীয় করিয়া তুলিবেন এইরূপই তিনি ভাবিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই সকল কথা যখন শঙ্করের মুখ দিয়া বাহির হইল, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ইহার বিপরীত সুর ধরিতে হইল।

"টাকা রোজগার করা যদি অতই সহজ হত বাবাজি!···সে যাক, তা ওই ভুবন সা-ই বোধ হয় তোমাকে বুঝিয়েছে যে এতে তোমারই খুব সুবিধে?"

"উনিও বললেন, আর আমিও বুঝে দেখলাম, মাসে মাসে সুদ বেড়ে চলেছিল; দেনাটা শোধ করে শেষ অন্তত সেটা থেকে তো রেহাই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া নগদেও ৩০০৲ টাকা দিয়েছেন।"

"দেবারই—আরও না হয় কিছুদিন থাকত। এর মধ্যে চেষ্টাচরিত্র করে···"

"কিন্তু সাহা মশায় যে আর সবুর করতে রাজি হলেন না। উনি বলেন, দেনার একটা ব্যবস্থা না করলে উনি বাধ্য হয়ে নালিশ করবেন।"

"আর অমনি তুমি ঘাবড়ে গেলে। নালিশ করলেই হল। তার ডিক্রি, আপীল, নীলাম, দখল করতে করতে অন্তত ছটি বছর। আর তারি মধ্যে জেলা কোর্ট, হাইকোর্ট ঘেঁষিয়ে ওকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়তে পারতে না?"

"তা বললেও দেখুন, শেষ পর্যন্ত বাড়িখানা ছাড়তেই তো হত। শুধু শুধু কতকগুলো বাড়তি খরচার দায় ঘাড়ে নিয়ে কি আর লাভ হত বলুন দেখি?"

"তাই বল নিজের ভিটে বাড়িখানা অমনি করে কি কেউ ছেড়ে দেয় বাবাজি। এ তো আর কিছু নয়, পৈতৃক ভিটে।···যাক গে যার যেমন বুঝ।···তা বাবাজি, বাড়িখানা তো গেল, এখন থাকবে কোথায়?"

"সে একরকম করে হয়েই যাবে। চৌধুরীমশায় একমাসের সময় দিয়েছেন। এর মধ্যে যেখানে হয় একটা জায়গা দেখে নেব। আমাদের এই আড়াইটে মানুষের মাথা গুঁজবার মত একটা জায়গা কি আর এই গাঁয়ে মিলবে না?"

আসল কথা, তাহার বৈভবহীনতার জন্য কেহ সহানুভূতি জানাইতে আসিলেও তাহাতে শঙ্করের

আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে। তাহার পিতা ধনী না হইলেও খুব সুখে ছিলেন. শৈশব হইতেই শঙ্কর স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দারিদ্র্যের পাঁকতিলক ললাটে ধারণ করা তাহার পক্ষে শুধু পীড়াদায়ক তাহা নহে, চরম লজ্জার বস্তু।

নদীপ্রবাহের তাড়নায় জীর্ণ শিথিল মৃত্তিকা যেমন্ত রসাতলে তলাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তৃণ-গুল্মের শ্যামলিমা বিস্তার করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া শঙ্কর প্রফুল্লতার আবরণে তাহার মনোদুঃখকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার প্রয়াস পাইত।

ইহা ছাড়া কল্পনার দিবাস্বপ্নে মগ্ন হইয়া থাকিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শঙ্করের। অদূর ভবিষ্যতে সুদৃঢ় সুখসৌভাগ্যের মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়া যে তাহাতে মশগুল হইয়া থাকিতে পারে বর্তমানের দুঃখকষ্ট তাহাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে?

পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার কোনদিন খাওয়াপরার অভাব ছিল না—কখনও যে হইতে পারে তাহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তাই সে একবার ম্যাট্রিক ফেল করিয়া পুনরায় তিন মাইল দূরবর্তী গ্রামের স্কুলে ভর্তি হওয়া অনাবশ্যক বোধ করিল এবং তাস খেলিয়া ও বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতে লাগিল। যথাকালে পিতা তাহার বিবাহ দিলেন এবং পৌত্রমুখ দর্শন করিবার পূর্বেই দমি কারবারের ঋণ ও জোতজমার হিসাব শঙ্করকে বুঝাইয়া দিয়া পরলোকযাত্রা করিলেন।

দমি কারবার সাফল্যের সহিত চালাইবার মত মনোবৃত্তি শঙ্করের ছিল না। সেই কারণে এবং নূতন নূতন আইনের প্যাঁচে পড়িয়া অচিরেই কারবারের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বাকি রহিল জোতজমা। ইতিমধ্যে জীবনযাত্রা উত্তরোত্তর দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। সংসার অচল হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, সে ব্যবসা করিবে।

স্ত্রী সরলী ভারি খুশি। চিরদিন সে শুনিয়া আসিয়াছে, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। অমুক অমুক বাড়ি দৈন্যদশা হইতে ব্যবসা করিয়া এখন রাজার ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

উৎসাহের আতিশয্যে সে-রাত্রে কাহারও ঘুম হইল না। ব্যবসায়ে টাকা হইলে কি কি করা হইবে তাহারই মোহময় চিত্র শঙ্কর একটির পর একটি আঁকিয়া যাইতে লাগিল আর সরলী মুগ্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল। শঙ্করের বর্ণনার ক্ষমতা আছে। শুনিতে শুনিতে সরলীরও কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠে। সেও শঙ্করের চিত্রের উপর তুলিকা চালনা করে।

ইহা লইয়া দুইজনে একটি ছোটখাট মিষ্ট কলহও জমিয়া গেল। সরলী বলে বাড়ির খিড়কির আঙিনার একপাশে একটি লেবুগাছ থাকিবে। তাহার মোকা বড় হইলে সেই লেবুর গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইবে। (মোকার বয়স এখন সাত মাস)। শঙ্কর আবার পেয়ারা পছন্দ করেনা। সে বলে পেয়ারা নয়—খোসাপজামের গাছ লাগাইতে হইবে।

সরলী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলে, ও বাবা, তাও কি হয়! খোসাপজামের ডাল যে নড়বড়ে!

"আমার খোকা ভাল হোক্ পড়ে যাক্-না, ভাঙুক আর কি!" এই বলিয়া খোকার কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কা মুছিয়া ফেলিবার জন্য পার্শ্বে শায়িত নিদ্রিত খোকার মুখচুম্বন করে।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল যে বাড়ির ভিতরে পেয়ারাগাছই থাকিবে; আর গোলাপজামের গাছ থাকিবে বাহিরের বাগানে। কিন্তু সেটির চারিপার্শ্বে সাবধানে বেড়া দিয়া রাখা হইবে যাহাতে খোকা সে গাছে উঠিতে না পারে।

ব্যবসায় আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ গুড়ের কারবার। কিন্তু ঝরনার পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়া গিলেই ব্যবসায়ের রথ চলে না। শঙ্করের অনভিজ্ঞতার সুযোগে পাইকারদের দৃষ্টতা, বর্ষাকালের উঠতি-পড়তি, নৈমিত্তিক উৎপাত ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়া অল্পদিনেই গুড়ের মিষ্টতাকে তিক্তরসে পরিণত করিল। শঙ্করের ব্যবসা তো ডুবিলই, তাহার সহিত ২৫০ বিঘা পামার জমিও গেল লোকসান পূরণ করিতে।

সরলীকে শঙ্কর বুঝাইল ব্যবসায়ে লাভ লোকসান দুইই আছে। এবারে যাহা লোকসান হইল পরে তাহা বিগুণ হইয়া ঘরে আসিবে। এমন-কি প্রথমটা যে লোকসান হইয়াছে তাহা ভালই—ব্যবসায়ের শিক্ষাটা তাহাতে পাকা হইবে। দুঃখ পরোয়া নেহি—আবার লাগিয়া যাও দ্বিগুণ উৎসাহে।

এবার সে ধরিল তামাক। অর্থাৎ হুঁকা-কলিকা সহযোগে নহে—শুকনা পাতার বাঁধাই কারবারে। আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া লাভের অঙ্কটি কিরূপ স্ফীতাকার ধারণ করিবে শঙ্কর মুখে মুখে তাহার একটি হিসাব দিয়া গেল। তারপর সুরু হইল উভয়ে মিলিয়া নূতন বাড়ি তৈরীর কল্পনা। দালান, খিড়কির পুকুর, ঢেঁকিঘর, রান্নাঘর, গরুগোলের খাঁচা, কোনটি কোথায় বসিবে সমস্ত স্থির হইল। এমন কি সেই পেয়ারা-গাছ ও গোলাপজাম গাছ দুটিও বাদ গেল না।

কারবার চলে। কিন্তু বাজারের তেজি-মন্দার ছুতাখেলায় শঙ্করের হাতে কেবল উটা ধান পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তামাকের কারবার তামাকেরই মত ধোঁয়া হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

এ পর্যন্ত তাহার স্বামীর যোগ্যতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ হয় নাই। প্রথম যখন সে শঙ্করকে স্বামীরূপে লাভ করিয়াছিল, মুড়া পল্লীবালার নিকট সে ছিল এক অভিনব সম্পদ। গ্রামের লোকের বিপদে আপদে বুক দিয়া করিত বলিয়া সকলের মুখেই শঙ্করের প্রশংসা। স্বামী বাবাইতে জমির ভুড়ি তোলে নাই। আবার গ্রামের যুবকদের সঙ্গে যাত্রা অভিনয়ে কোন না কোন প্রধান ভূমিকায়—শঙ্করকে না হইলে চলিত না। তখন সরলী জানিত না যে একদিন শঙ্করকেও কঠোর জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে, এবং সেখানে এই সকল গুণ তাহার কোনই কাজে আসিবে না।

জমিজমার ব্যবসাও যখন জলের পথে গেল, তখন হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন, ঢের হইয়াছে, এইবার একটা চাকরির চেষ্টা দেখ। কিন্তু গ্রামে যে সামান্য চাকরি পাওয়া যায় তাহাতে তাহার মন ওঠে না। বাড়িঘর ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার কথাও সে ভাবিতে পারে না। তাহার চাকরীর দৌড় মাসিক বেতনে কোনরূপে তাহার ক্ষুদ্র সংসারের খাওয়াপরা চলিতে পারে—কিন্তু ঘন-ঘোলস, ঘাসান-ছোঁয়া,

যাহার কল্পনা সে এতকাল পোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহা যে সোনরকের হইবার নহে। শঙ্কর বুক বাঁধিয়া আবার ব্যবসায়ে নামিল।

এইরূপে একটির পর একটি ব্যবসায়ে লোকসান দিতে দিতে অবশেষে ছিটাবাড়ী বিক্রয় করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর রহিল না।

সাহাচৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যে একমাসের সময় দিয়াছিলেন তাহা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই শঙ্কর একটি আশ্রয় ঠিক করিয়া লইয়াছে। তাহার দূরসম্পর্কের পিসতুতো বড়ভাই নিকুঞ্জ। গ্রামের হাট-খোলায় উপরেই তাহার দোকান। চাল, ডাল, বেনে-মশলা, মনোহারি জিনিস, মাটির বাসন, দোকানে যে কি নাই বলা শক্ত। দোকানের পিছন দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা আঙিনা, তার বাঁয়ে একখানি ঘর তাহার বাসস্থান। স্ত্রী কামিনীসুন্দরী ও পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া তাহার সংসার। সে শঙ্করকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিতে সম্মত হইল।

কামিনী প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিল। একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলে তাহার সংসারের জিনিসপত্র রাখিবার অসুবিধা। কিন্তু নিকুঞ্জ তাহাকে বুঝাইল, "বাড়ির মধ্যে একজন লোকের থাকিলে তোমারই সুবিধে, একবেলার রান্নাটা অন্ততঃ ছোটবৌকে দিয়ে চলবে তো। তা ছাড়া, তোমার শরীর ভাল নয়, মাঝে মাঝে দোকান ফেলে এসে আমাকে রাঁধতে হয়। সে দায় থেকে তো বাঁচব।"

মাথা গুঁজিবার স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া শঙ্কর তাহার শেষ সম্বল ৩৫০৲ টাকা লইয়া আবার ব্যবসা সুরু করিল।

তাহার কল্পনার ঝোঁক এখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। তাহার বাড়িখানি উদ্ধারের চিন্তাই এখন তাহার কাছে বড়। কয়েকদিনে আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ হইবে এবং আবার সে তাহার পৈত্রিক বসতবাটী ফিরিয়া পাইবে এখন ইহাই সে সরসীর সহিত কল্পনা করে।

কাল্পনিক চিত্রের খুঁটিনাটিতে সরসী শঙ্করকেও ছাড়াইয়া যায়। সে বাড়ি ছাড়িবার পূর্বেই উঠানের এককোণে একটি পেয়ারার চারা লাগাইয়া আসিয়াছে। খোকা আর চারাগাছটি আড়াআড়ি করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। গাছে যখন ফল ধরিবে খোকাও তখন গাছে চড়িতে শিখিবে। সরসী গাছতলায় গিয়া ডাকিবে, "খোকন, আমাকে একটা পেয়ারা দিবি?"

"এই যে মা, অত ব্যস্ত হও না—দাঁড়াও, তোমাকে খুব ভাল ভাল দেখে পেড়ে দিচ্ছি।"

খোকন গাছ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই নিটোল পেয়ারা কয়েকটি টুসটাস করিয়া বাছিয়া বাছিয়া নীচে ফেলিয়া দিবে।

"বেশ হয়েছে মাণ্ড, এইবার নেমে আয়।"

অমনি খোকন তর তর করিয়া নামিয়া আসিয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

কিন্তু শঙ্করের যে স্বপ্ন এমনিতে ভাঙিয়া যায় নাই, তাহা ভাঙিল অন্য পথে। রাত্রে নিকুঞ্জ

লোকসানও আছে। বৎসর খানেক পরে শঙ্কর একদিন খতাইয়া দেখিল, তাহার মূলধন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া ঘরের ঘরে কয়েকটি অঙ্ক পড়িয়াছে।

সরসীর প্রতি কাদিনীর দুর্ব্যবহারও শঙ্করের অর্থাভাবের সহিত সমান তালে বাড়িয়া চলিয়াছে। খাইখরচ বাবদ শঙ্করের নিকট হইতে নগদ কিছু লইতে নিকুঞ্জের চক্ষুলজ্জায় বাধিত। কিন্তু শঙ্কর সর্ব্বদাই এটা সেটা কিনিয়া আনিয়া দাদার সংসারে দিত বলিয়া নিকুঞ্জের লাভ বই লোকসান হইত না। যত দিন শঙ্করের শক্তি ছিল এইরূপই চলিতেছিল। কাদিনী দুটি তিনটি কচি-ছেলে মেয়ে লইয়া পারিয়া উঠিত না—সরসী তাহাদের ধর-আরি করে, এটা সেটা কাজের সাহায্য করে। কাদিনীও খুসি ছিল। কোন দিন হয় তো কাদিনীর শরীর খারাপ করিয়াছে—সরসী দুবেলাই রান্না করিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইল—কাদিনীকে পথ্য দিল, নিকুঞ্জের ভাত ঘরে আনিয়া ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল। যখন এমন হইল যে শঙ্কর আর দাদার সংসারে সাহায্য করিতে পারে না, তখন প্রায়ই কাদিনীর শরীর অসুস্থ হইতে লাগিল। সরসী আর কি করে, যাহাদের আশ্রয়ে আছে তাহাদের মন জুগাইয়া চলিতেই হইবে। এইরূপে ক্রমে যখন শঙ্করের নিজের উপার্জ্জন বলিতে আর কিছু থাকিল না ততদিনে কাদিনীর রন্ধনশালার হাতাবেড়িও পাকাপাকি ভাবে সরসীর হাতের বেড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুবেলা রান্না, সংসারের কাজ, আর তাহার সহিত পদে পদে কাদিনীর বাক্যযন্ত্রণা। এত কষ্টও সরসী গায়ে মাখিত না, কিন্তু তাহার ছেলেটি যে অযত্নে ও অনাহারে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল, ইহাতেই সরসীর বুক ফাটিয়া যাইত।

সরসী বুঝ বুঝিয়া সমস্তই শুনিয়া যায়—কোন কথার প্রতিবাদ করে না। নিরঙ্কুশ পরিচালনার ফলে কাদিনীর তীক্ষ্ণধার জিহ্বা যখন-তখন সরসীর মর্ম্মচ্ছেদ করে।

যখন সে কোনদিকে আশার ক্ষীণরেখাটুকুও দেখিতে পায় না, তখন শঙ্কর তাহাকে সান্ত্বনা দেয়—প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল চিত্র তাহার সম্মুখে ধরে। সরসী বুক বাঁধিয়া তাহাদের সাময়িক দুর্ভাগ্যের দিন হাসি-মুখে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুটির এত অনাদর সহিল না। কিছুদিন রোগভোগ করিয়া সে মার কোল খালি করিয়া চলিয়া গেল।

সরসী কয়েক দিন অচেতনের মত পড়িয়া রহিল। কিন্তু যাহারা যাইতে গিয়াছে তাহারা ফিরিবে কেন? কাদিনী কয়দিন রান্নাঘরে গেল, তারপর সরসীকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল যে তাহার এই কাদিন ঘরের দুবেলা আগুন তাত যোগিলে সে মরিয়াই যাইবে। তাহাতেও যখন ফল হইল না তখন বলিল, "লোক আর কার না হয় বাপু। তাই বলে সংসার কি তো কেউ ছেড়ে বসে থাকে না। ওত আমি পারিনে।"

ইহার পর না জানি আরও কি শুনিতে হইবে এই ভয়ে শঙ্কর উঠিল এবং ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার উদ্যোগ করিয়া অনর্গল শোর করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নিকুঞ্জ একদিন শঙ্করকে বলিল—"জান তো ভাই, আমারই বা কি অবস্থা, এ ঘরে কয়ে কতদিন আর চালাতে পারি। তুমি যদি কর, দোকানের হিসেবটা দেখার ভার নাও, তা হলে বুহরীটাকে ছাড়িয়ে দিতে পারি, আমারও খরচা কমে যায়; বইলে আমি তো আর পেরে উঠি নে।"

পরদিন হইতে শঙ্কর নিকুঞ্জের দোকানে মুহরীর কাজ করিতে লাগিল। স্বামী-স্ত্রী উপরে বাড়ির ভিতরে নিকুঞ্জের অন্ন-ব্যঞ্জনে বাঁধা ছিল।

এইরূপই চলিতেছিল, এমন সময় একদিন শঙ্কর উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া সরযূকে আসিয়া কহিল, আর ভয় নাই, সন্ধ্যাসীঠাকুর নিশ্চিত পথের সন্ধান সে এবার পাইয়াছে। উহাদের আনন্দের তাহার মুখ দিয়া ভাল করিয়া কথা বাহির হইতেছিল না।

বিষয়টা সংক্ষেপে এই। তাহাদের গ্রামের নিখিল কলিকাতায় কাটাকাপড়ের দোকান করে। সে আজ কি একটা কাজে দেশে আসিয়াছে। তাহার নিকট শঙ্কর শুনিয়াছে যে কলিকাতার পথে পয়সা ছড়ানো আছে—কুড়াইয়া লইলেই হইল। সেখানে গেলে তাহাদের খাওয়া-পরার কোন অভাব হইবে না, নিশ্চয়। আর অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয় তবে তো কথাই নাই। হাঁ, ব্যবসা করিতে হয় তো কলিকাতায়, সেখানে ব্যবসায়ে এক বৎসরের মধ্যে লক্ষপতি হইবার কয়েকটি ঘুটায় যাহা সে একটু আগেই নিখিলের নিকট শুনিয়াছে তাহা শঙ্কর খুব ফলাও করিয়া বর্ণনা করিল।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া উভয়ে আর একবার তাহাদের কল্পনালোকের কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইল। গ্রামের লোক একদিন অবাক হইয়া দেখিবে তাহাদের বাড়ির সামনে গাড়ি গাড়ি ইট পড়িয়াছে, দলে দলে মিস্ত্রিরা খাটিতেছে। দেখিতে দেখিতে সুদৃশ্য দালান-বাড়ি সম্পূর্ণ হইল। গৃহ প্রবেশের দিন গ্রাম-শুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ। সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছে, যেখানে বেটি দিয়া ঠাকুরটিকে বসানো হইবে। চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী। গোয়ালে গরু, আঙিনায় এক পাশে ধানের গোলা, আর একপাশে সেই কৃষ্ণচূড়া-গাছ, আর সেই গাছের উপর—এই পর্য্যন্ত আসিয়া সরযূর কল্পনা শুরু হয়, কাজেই সেখানে সে অত কথা চিন্তা করে না।

ইহার কয়দিন পরেই একটি শুভদিন দেখিয়া শঙ্কর সরযূকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল। নিখিল পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। কথা আছে সে ইহাদের জন্য একটি থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া রাখিবে। পথের ও কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিবার পরচ বাবদ ২৫৲ সরযূর কাপড়ের জুল বেচিয়া সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রাম হইতে গাড়ি যাইল ঘুরে রেল ষ্টেশন। বিকালের ট্রেন ধরিবার জন্য—বেলা দশটার মধ্যেই রওনা হইতে হইবে। সরযূ সকাল সকাল রান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজেও খাইয়া লইল। আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই। ছেলেবেলার কত চাওয়া-পাওয়া তাহার আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। চির পরিচিত গ্রামখানি ছাড়িয়া অজানা দূরদেশে চলিয়াছে বলিয়া সরযূর মনে চিন্তার লেশমাত্র নাই। নিকুঞ্জের বাড়িতে

দুই বৎসর ব্যাপী অশান্তি ও বিভীষিকাময় রাত্যাপনের যে অবসান হইল তাহাই তাহার ভাগ্যদেবতার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া সে মনে করিল।

তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র একটি ছোট তোষক ও একটি বিছানায় বাঁধিয়া করিয়া গরুর গাড়িতে উঠান হইল।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সরলী বড়-জাকে প্রণাম করিতে গেলে এখন হইতে আবার সেই হুকো ইাড়ি ঠেলিতে হইবে মনে করিয়া কামিনীর মন অপ্রসন্ন হইয়াই ছিল। একটু ঝাঁজের সহিত বলিল,

"ঠাকুরপোর যত সব আজগুবি খেয়াল। কথায় বলে 'সুখে থাকতে ভূতে বিলোয়।' আরে বাপু, এখানে সুখে-ভোগে ছিলি, বেশ থাক। তা নয় চল্ কলকত্তায়। কলকত্তায় গেলেই একেবারে চতুর্ভুজ হবেন আর কি!"

সরলী এতকাল যেরূপ মুখ বুঁজিয়া বড়-জায়ের সব মন্তব্য পরিপাক করিয়াছে, আজও তাহাই করিল। এখানে যে তাহারা কিরূপ "সুখেভোগে" ছিল, তাহার সম্বন্ধে দু'একটি বিদ্রূপের আসিলেও সে তাহা হজম করিয়া সহজ স্বরে কহিল, "এখানে তো কিছুতেই কিছু হল না দিদি। একবার দেখাই যাক না কলকত্তায় গেলে যদি বরাত ফেরে।"

অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে কামিনী বলিল, "আচ্ছা, যাচ্ছিস্ যা। যদি কখনো দুঃখ কষ্টে পড়িস্ চলে আসিস্ এখানে। আমরা তো রইলামই।"

শুনিয়া সরলীর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেখান হইতে তুলসী তলায় গিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া আকুল-প্রাণে ইষ্ট দেবতাকে ডাকিয়া বলিল।

"সেখানেও যদি না যাও ঠাকুর, তবে না-ই দিলে। কিন্তু এইটি করো প্রভু যেন এই বাড়িতে এজন্মের অভিশাপ হয়ে আর ফিরে আসতে না হয়।"

তারপর স্বামীর সহিত গাড়িতে গিয়া উঠিল।

তাহাদের সাবেক বাড়ির সম্মুখ দিয়া পথ। সেইখানে গাড়ি থামাইয়া দুজনে চোখ ভরিয়া বাড়িখানি দেখিয়া লইল।

সরলী কহিল, "চল না গো, একবার ভেতরে গিয়ে বাড়িখানা ঘুরে ফিরে দেখে যাই।"

নবীন বোঝে যে ও দেখায় সুখ নাই। কহিল, "না থাক সরলী। বাড়ির লোকেরা কি মনে করবে। তা ছাড়া, এখন রান্না খাওয়ার সময়, এখন গেলে তাদের হয় তো অসুবিধে হবে।"

বাড়ির বর্তমান ভাড়াটিয়া পোষ্টমাষ্টার-বাবুর একটি ৬।৭ বৎসরের ছেলে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া আঙুল চুষিতেছিল। সরলী তাহাকে কাছে ডাকিল। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। সেখানে পেয়ারাগুলি টিক আছে কি না, কুয়ার জল, কয়খানি, সেয়ারা গাছটি কত বড় হইয়াছে ইত্যাদি।

ছেলেটি সব কথা ঠিক বোঝে না। তাহারও মনে পড়ে মা যে দুএকটি কথা বলে তাহাতে সরলী তৃপ্তি না হইয়া পারুক বা নাহিবার আসে না। কত বার গিয়া মরণ হইল, এবার যাওয়া যাক তা ভুলে। অনেক-খানি পথ যেতে হবে, আর যেমন করে ঠিক হবে না। আবার তীর্থ মাঝে কোনো বুড়িয়া বুড়িয়া বলিল, আড়াও বাবু আর কটা দিন। ঠাকুর ঘরে মুখ তুলে তবে পূজার আগেই বাড়িখানা বিক্রি করে নিতে পারবে।"

সরলী উৎসাহিত হইয়া বলে, "হাঁগো, পূজার আগেই যাতে হয় তাই করো। পূজার সময়টা আর বিদেশে থাকব না। তখন এসে যেন একেবারে নিজের বাড়িতে উঠতে পারি।"

আকা বাঁকা গ্রামের পথে কিছুদূর যাইতেই বাঙ্গালের পাড়ালে বাড়িখানি অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল বাড়ির পশ্চিমের নারিকেল গাছ তিনটি অনেকদূর পর্যন্ত দেখা গেল, এবং সর্বশেষে ছাদে দাঁড়াইয়া সরলী নিরাশার দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরলী ভাবিতে লাগিল, আবার কবে এই বাড়িতে আসিবে, কি ভাবে আসিবে, তখন তাহার যদি সুখ ফুরাইয়া যায়, আবার সবই হইবে, কেবল তাহার খোকা আর ফিরিয়া আসিবে না। কত বড় অনাদর পাইয়া তাহার বুকের ধন চলিয়া গিয়াছে সেই কথা আজ তীব্র বেদনার মূলে তাহার মন স্থির করিতে পারিল।

একা ঘরে পড়িয়া তাহার বাছা রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া ডাকিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহিনা তাহার যাইবার উপায় নাই। হাতের কাজ সারিয়া কতক্ষণ পরে গিয়া দেখিয়াছে যে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কোন ও দিন যদি একটু বেশী জোরে কাঁদিয়াছে, ও ঘর হইতে বড়দিদি ধমক দিয়াছেন—

"চুপ কর্ চুপ কর্, চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ি মাথায় করেছে। অমন যেন আর কারো হয়না। খোকা সভয়ে চুপ করিয়া লুকাইয়া কাঁদিলে মুখ গুঁজিয়া কাহার যেন দোষ করিবার চেষ্টা করে। আহা, ছোট্ট-তো পাঁচবছরের ছেলে। ঐ বয়সেই সেও তাহার মায়ের দুঃখ বিলক্ষণ বুঝিত।

"মা আমার যে কষ্ট হয়, থাকতে পারি নে—সেইজন্যে কাঁদি। কিন্তু আমি কাঁদলেও তুমি কেন রান্না ফেলে চলে এসো না। কেঁদেছিলে বকবে।"

সরলীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত, খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিত—

"খোকন মানিক, তুমি বড় হবে, আমাকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যাবে। আর কেউ বকতে পারবে না।"

ছেলে কিন্তু সে আশ্বাসের অপেক্ষায় মায়ের হাত এড়াইয়া অনেক দূরে চলিয়াছে, কিন্তু খোকন তাহা দেখিতে পাইতেছে না।

ছেলেবেলায় সরলী একবার তাহার বাবার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা ছয়

কিন্তু দুইদিনের ঐ নূতন [illegible] দেখিলেই সে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে আর ভাবে, আমা [illegible] কত খুশি হইত!

ইতিমধ্যে তাহার মঙ্গল ঘটি ঝিনুকায় ঝিনুকার সহ ঘুমনে উঠিয়া বসিল। হাওড়া পোলের উপর সরসীর দেখিয়া পার আটগাছি কলের সলাটে স্পর্শ করিল। স্বামীকে কহিল, "আমাকে একদিন [illegible] নিয়ে যাবে?"

শঙ্কর কহিল, "হাঁ তা তো যাবই। এখন তো কতদিন এখানে থাকতে হবে। তার পরে যত বার ইচ্ছে এসো।"

নিখিল তাহার ঠিকানার কথা খুঁটিনাটি সমস্ত বলিয়া দিয়াছিল খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। সে তালাচাবি বন্ধ একখানি ঘর ও একটি রান্নাঘর দৈনিক ।৵০ ভাড়ায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। ঝিনুকপত্র সহ একেবারে সেইখানে গিয়াই ঘুমনে উঠিল।

সরসী বাক্স বিছানা খুলিয়া দেখিতে দেখিতে ঐ ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে তাহার সংসার পাতিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইল। কতকাল যে সে এরূপ স্বাধীনভাবে ঘরকন্না করে নাই। ইহার জন্য যেন কত যুগ ধরিয়া তাহার অন্তরাত্মা তৃষিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় গলি—তাহার এককোণে অত্যধিক অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর। কিন্তু সরসীর নিকট তাহাই সুখের স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। স্বামীকে এটা ওটা আনিতে হুকুম করে, তাড়া দিয়া স্নানের মত করিয়া তাড়া করে। স্বামী পরম পরিতৃপ্তির সহিত খায়—দেখিয়া সরসীর বুক ভরিয়া ওঠে।

নিখিলের সহিত পরামর্শ করিয়া শঙ্কর স্থির করিল যে প্রথমেই কোন ব্যবসাতে নামা ঠিক হইবে না। যে কোন ব্যবসাই হউক, কিছু মূলধন চাই। কিন্তু শঙ্করে তাহা নাই। তা ছাড়া, কলিকাতার ব্যাপারের হালচাল বুঝিতেও কিছু সময় যাইবে। তাই প্রথমে যে কোন চাকরি করিয়া কিছু টাকা জমাইয়া লইবে। তার পর সুযোগ বুঝিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিতে আর কতক্ষণ! শঙ্কর চাকরি খুঁজিতে লাগিল।

প্রত্যহ দুপুরে খাওয়া খাওয়া করিয়া বাহির হয়, আর সন্ধ্যার সময় ফেরে। যোগাড় করিবার মত চাকরি যেখানে থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় সেখানেই সে একবার ঢুঁ মারে। সর্বত্রই এক কথা, কোথাও কোন চাকরি খালি নাই। নিখিলও বন্ধুদের নিকট হইতে দুইদিন অন্তর খবর করিয়া ছুটিয়া শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল—কিন্তু কোথাও কোন সুবিধা হইল না। অনেক ঘোরাঘুরির পর যদি কেহ চাকরি দিতে চায়, বেতন ১৫।২০ টাকার বেশী বলে না। তাহাতে কলিকাতার বাসাভাড়া দিয়া দুইটি প্রাণীর খাওয়া-পরা কিরূপে চলিতে পারে? তাই শঙ্করের সে চাকরি করা হয় না।

প্রতিদিন সরসী উদ্‌গ্রীব আগ্রহ লইয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলা স্বামী আসিবে, আজ নিশ্চয়ই ভাল খবর শুনিতে পাইবে। কিন্তু প্রতিদিনই তাহাকে হতাশ হইতে হয়। এইরূপে ১৫।১৬ দিন কাটিয়া গেল। তাহার কাণের দুল বিক্রয়ের টাকার মধ্যে যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ফুরাইয়া আসিতেছে। সরসীর [illegible] সেদিন যখন স্বামী বাহির হইয়া যাইতেছে তখন সে বলিল—

"হ্যাঁ গো, আর কতদিন এমনি করে ঘোরাঘুরি করবে? যা হোক কিছু ঠিক করে ফেলো।"

"চেষ্টা তো করছি সরলা, কিন্তু পাই নে যে। এ পর্যন্ত কোন বাইনে বলছে না।"

"কেন না কুড়ি টাকা। ঐ মাইনেতেই কাজ আরম্ভ করতে দোষ কি?"

"তা করে কি না খেয়ে মরি? সেদিন যে চজনে ছিলেব করে দেখলাম, অন্তত ৩০ টাকার কমে আমাদের দুটি লোকের এখানে চলতে পারে না।

একটুখানি ইতস্তত: করিয়া সরলী বলিল, "দেখ আমি একটা কথা বলি। তুমি রাগ করো না যেন।...তুমি কত খেটে করে চাকরি করবে, আর আমি কি শুধু বসে বসে খাব? আমিও যেন একটা কিছু চাকরি করি না?"

"তুমি? তুমি কি চাকরি করবে? তোমাকে চাকরি দেবেই বা কে?"

"কেন?...আর কিছু না হোক, যদি কারো বাড়িতে...এই...রাঁধাবাড়ার কাজ

শঙ্কর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর বেদনাপূর্ণ স্বরে কহিল—"তুমি আজ এমন কথা বলতে পারলে সরলী! আজ না হয় আমার দুঃসময় পড়েছে, তাই বলে আমি কি এমনি হতভাগা যে বৌকে দিয়ে রাঁধুনির কাজ করিয়ে তার রোজগার খাব?"

"এতে তুমি অত রাগ করছ কেন? এখন তোমার একার রোজগারে তো কুলোবে না। আমিও যদি কিছু কিছু করে আনতে পারি, তাহলে ক্ষতি কি..."

বাধা দিয়া শঙ্কর কহিল, "ও কথা আর মুখেও এনো না সরলী। এই গরীব, তার উপর যদি মান সম্ভ্রমটা এমনি করে ডুবিয়ে দেব! তার আগে যে আমার মরাও ভাল।"

সে কথা কি আর সরলী জানে না। সে-যে কত দুঃখে এই প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা সে অন্তর্যামীই জানেন। পাছে আবার তাহাকে সেই কামিনী সুন্দরীর সংসারে গিয়া বাস করিতে হয় সেই ভয়ে সে সর্বপ্রকার কষ্ট, সব দারিদ্র্য সহ্য করিতে প্রস্তুত।

আরও একবার সে কুণ্ঠস্বরে বলিল, "দেখ, ভদ্রলোক যেখানেও তো সেই রাঁধুনির কাজই করতাম।...সেই কাজই যদি এখানে করি, তাতে তো..."

"সে কথা আলাদা। ভদ্রলোক হলেও তারা হলেন আত্মীয়, আপনার জন। সে বাড়িতে যা-ই করা যাক না কেন, তাতে তো কেউ দোষ ধরে না। কিন্তু যদি জানাজানি হয় যে, কলকাতায় এসে তুমি মাইনে নিয়ে রাঁধুনিগিরি করছ, তা হলে জীবনে আর আমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না।...তুমি কিছু ভেবো না। আর দিন কারুর সমান যায় না। এর চেয়ে ঢের ঢের ভাল ভাল চাকরি ছেড়ে

সে দশদিন কাটিয়া গেল, তথাপি বহু চেষ্টাতেও তাহার এই আশাবাদী

[illegible] শেষ হইয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালার তাগাদায় অস্থির হইয়া
[illegible] সোনার পাতে মোড়া তামার চুড়ি বিক্রয় করিতে হইয়াছে।
আশাবিলাসী শঙ্করকেও হার মানিতে হইল। একদিন সন্ধ্যায় [illegible]
কে বলিল যে আর উপায় নাই, আগামী কালই [illegible] লইয়া ফিরিতে
সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত পাথেয়ও অবশিষ্ট আছে।
হইতে এই আপত্তিই করিতেছিল। কোন কথা না বলিয়া সে [illegible] হইয়া

গিয়া যাইতে পারিবে। লোকের কথায় নাচিয়া সে কি ভুলই করিয়াছে। না-হক
[illegible]য়া গেল। যাক, ভালোই সেলামী পাইয়া দিবার দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে আর
করিবে না। এখন ভরসার কথা এই যে দেশে তাহার নিকুঞ্জদা আছেন।
[illegible]লীনের সেই কাজটা আবার পাওয়া যাইবে। এখনকার মত তো নিশ্চিন্ত।
উপার্জনের কথা চিন্তা করা যাইবে। তাহারা পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাদের
কলিকাতার সহরকে সেলাম ঠুকিয়া কাল সন্ধ্যার ট্রেনে ঘরের ছেলে ঘরে

সহর বাহির হইয়া গেল। দু-এক জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কয়েকটি
[illegible]

[illegible]রিয়া যাত্রার জন্য নিশ্চিন্তমনে গুছাইতে লাগিল। ঘরের এককোণে দেওয়ালে
[illegible] টাঙানো হইয়াছিল—তাহাই ছিল তাহাদের কাপড় রাখিবার আলনা। সরলা
কাপড়গুলি ভাঁজ করিয়া বাক্সে তুলিল। দেওয়ালের গায়ে একটি কুলুঙ্গিতে বাতি,
[illegible] সাজানো ছিল। সেগুলি সরাইয়া লওয়াতে কুলুঙ্গিটি খালি পড়িয়া রহিল।
[illegible] চাহিয়া চাহিয়া সরলার চোখে জল আসিতে লাগিল। এই কয়দিনেই
[illegible]য়া পড়িয়া গিয়াছিল। কতকাল পরে এই ঘরে তাহার ছদিনের পাতানো
[illegible] পাইয়াছিল তাহাই [illegible]য়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল।
[illegible]খানেকের মধ্যেই ফিরিবে। কিন্তু সে যখন ফিরিল তখন বেলা একটা বাজিয়া
[illegible]য় প্রবল উৎসাহের উদ্দীপনা। এবার সে অর্থাগমের এক [illegible]
এ ব্যবসায়ের জন্য কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই—দেশের বাড়িতে
[illegible] অসুবিধা—শঙ্কর লক্ষ্য করিল না যে সরলা বিমনা—সে তাহার কোন
[illegible]

আজ নিখিলের দোকানে একজন বড় ব্যবসায়ীর সহিত শঙ্করের আলাপ হইয়াছে [illegible] চলিয়া যাইতেছিল শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন, "ছি, ছি, মশায়, চাকরিতে আছে কি? [illegible] দোষ, ইচ্ছামতো খাটে, যে কুড়িয়ে নিতে জানে, তারই ধন।"

তিনি বিশেষভাবে যে স্বর্ণের কথা বলিলেন, তাহা হইতেছে বিহার-কুমার প্রান্তের মাঠে পথে অজস্র পড়িয়া আছে। সেগুলি কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া যদি শঙ্কর চালান দিতে পারে, তিনি তাহার জন্য কোন [illegible] প্রস্তুত আছেন।

"এ ব্যবসায়ে আর কোন বার নেই, বুঝলে সরো। আমি তাঁর কাছে বিধিনিষ্ঠার সমস্ত গান করে শুনে এসেছি। চল যেতে যেতে তোমাকে সব বলব এখন।"

সরলা-বৌ-ও বলিল না, না-ও বলিল না। নিঃশব্দে ভাত বাড়িয়া আনিয়া শঙ্করের সম্মুখে দিল।

উভয়ের খাওয়া শেষ হইলে শঙ্কর বলিল, "চল, এবার দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি। ট্রেনের [illegible] দেরী আছে—তা আমাদের পক্ষে এ ঘর যা, হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মও তাই। সেখানে গিয়েই না হয় বাকি সময়টা কাটা যাবে।"

আবার একটি রিক্সায় তাঁহাদের সেই ছোট বিছানাটি ও অত্যধিক ছোট ভোরঙ্গটি চাপাইয়া দুইজনে রওনা হইল।

সেদিন ছিল ছুটি। বেলা তিনটার সময় সিনেমা ঘরের সামনে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। মৌরসীপট্টা রাজপথ মুখরিত করিয়া লাউড-স্পীকার সকলোগে রেকর্ডের গান বাজিতেছে। গানের একটি কলি সরলার কানে আসিল—

"নামিবে মুখ, চুকিবে সুখ [illegible] যাবার দুখ যায় যাবে,
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়।
তাদের পানে তাঁটার টানে [illegible] যাব রে ভাসি তরণীটি
সন্ধ্যা আসে, দিন যে চলে যায়।"

গানের কথাগুলি সরলার মর্মস্থলে আঘাত করিল। এই তো কয়দিন আগে উৎসাহের ঢেউয়ের বুকে লইয়া তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাঁর ইহারই জন্যে তাঁটার টান ধরিয়াছে। সেই টানে তাহাদিগকে আবার সেই পুরাতন ছন্নছাড়া [illegible] ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। সে জোয়ার মিথ্যা তাই তাহা স্থায়ী হইল না।

তাহার জীবনের সত্য জোয়ার কি আসিবে না? শঙ্করের দুকূলপ্লাবী প্রেম কি কোন তাঁটার টানেই ফুরাইয়া যাইবে?

না কখনো, ইহার কি শেষ নাই। চিরদিন কি এইভাবেই চলিবে? [illegible] ঘর গৃহস্থালি পরিত্যক্ত, একমাত্র সন্তান সবই গিয়াছে। আরও কত কি যাইবে কে জানে। সন্ধ্যা আসিবে—তাঁটার টানে চলিতে চলিতে কোন অতলে তরী কে জানে।

সুখের প্রবল উৎসাহের সহিত তাহার নূতন যাত্রার কথা বলিবে, তাহাদের মুখরি কত, প্রতিদিন কত মণ তুলা সংগৃহীত হইবে, তাহার কত, মুনাফাই বা কত থাকিবে, ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার একবর্ণও সরলার কানে প্রবেশ করিল না।

যখন হাওড়া স্টেশনের উপর উঠিতে যাইতেছে, তখন একটি ঘটনা ঘটিল। সরলা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে নবীন—অপরাধীর মত কম্পিত করিতেছে।

ধাঃ, একটা দারি ভুল হয়ে গেছে গো। তুমি যে গঙ্গায় তা ষ্টেশের হে, এখানে ঢের দেরী আছে। কাছেই ঘাট, যাই। কি বল?

না। শুধু মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

য়া ঘাটে লইয়া গেল। ফিরাওয়ালা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করি য় করিতে হইল। সে কিছুতেই কম লইবে না, হাওড়া ষ্টে া তবে গেল। শঙ্কর মহা রাগ করিয়া বলিতে লাগিল যে ি গয়ের বার যখন সে কলিকাতায় আসিবে, তখন আর রিব সে ট্যাক্সিই চড়িবে।

ট দোকানে তাহাদের ভোরঙ্গ ও বিছানা দেখিবার জিনিষ দিকের জন্য নির্দিষ্ট অংশে তখন অবেলার যাত্রীর অভ

জোয়ারের পর ভাঁটার টান চলিতেছে। বৈশাখের ভরা-নদী- স্রোত তীব্র। ঘাটের দুইপাশে অসংখ্য নৌকা—ছোট, বড়, বজ রোতের বেগ কাছিতে টান পড়িয়াছে। ষ্টেশনের ঢালে নীরে কিনারায় যেখানে কয়েকখানি নৌকায় রাস্তা পাইয়া জ া-হাতর গামছা লইয়া গা রগড়াইবার উদ্যোগ করিল। লইয়া সে ও কয়েক হাত জল পাইয়া গিয়াছে। সেখানে জল তাহার কোমর বিস্তার করিল, "অত জলে যেও না সরলা। ভাঁটার টান লেগেছে ধরা আরও কয়েক পা আগাইয়া গেল।

অতদূরে যেও না বলছি। তুমি তো সাঁতার জান না। ফি না। অত্যন্ত বিকৃত কণ্ঠে শুধু বলিল, "না।"

সখাইবা ভুল কেমন যায়। সামলাতে পারবে না, এইখানটা ফিরিয়া এস। সে গত বহিয়া অঞ্জলের ধারা নামিয়াছে।

চক্ষুর স্থির দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে সকাতরে কাহার ঘরে আর সেখানে ফিরে যায় না গো। পরক্ষণেই স্বামী [illegible] শেষ তাহাকে

ঘরে বিহ্বল বিস্ময় দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সরযূ আর ডুবিল সেই স্থানটায় জলে একটি সামান্য আবর্ত রচিত হইয়া সেখানে ফেনাইতে [illegible] গেল প্রায় দশ হাত তফাতে সেখানে একটি ভারী মানুষের ঠিক তাহার [illegible] একবার, দুবার, তিনবার, কোন্ অতলের একখানি উপরে একবার ভাসিয়া উঠিয়াই আবার তলায় চলিয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়া [illegible] চীৎকারের সুরে, "এ কি সর্বনাশ করলে সরযূ!" বলিয়া শঙ্কর ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল। বাঁপের বেগে ও জলের ঢেউয়ে মুহূর্তমধ্যে শঙ্কর সেই পৌঁছিল, এবং বাঁ হাতে চুলিতে গিয়া নৌকার তলায় প্রচণ্ড ঘা খাইয়া জলের মধ্যে

সরযূকে কেহ ডুবিতে দেখে নাই। কিন্তু, শঙ্করের চীৎকার শব্দে সকলে সেইদিকেই ফিরিল।

"গেল, গেল, বাঁচাও বাঁচাও" এইরূপ একটা রব উঠিল।

মুহূর্ত মধ্যে আশপাশের নৌকা হইতে চারি পাঁচজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শঙ্কর তখনও জ্ঞান হারিয়া পাইয়াছে। সে পাগলের মত তাহাদিগকে বলিতে "ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।...যেখানে ও গেছে আমিও সেইখানে যাব ছাড়াইবার জন্য জোর করিতে লাগিল। কিন্তু সে একা [illegible] একখানা ডিঙি নৌকার সাহায্যে তাহারা ধরাধরি করিয়া [illegible] তীরে আনিয়া

দেখিতে দেখিতে তাহার চারিপাশে ভিড় জমিয়া গেল। সকলেই জানিত ঘাটের উপর একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুক বসিয়া মুড়ি চিবাইতেছিল সে ঘটনার পর সে সকলকে বলিয়াছিল যে রাত্রিটা বড় জলে ডুবিয়া মরিয়াছে—সেই লোক, যা শুনিয়া কেহ মনোযোগ প্রকাশ করিল, কেহ কর্তব্যের মহিমা কীর্তন করে ভাসিয়া উঠা সম্ভব [illegible] যাইল ঘুরে সেটিকে [illegible] নিল [illegible]

একে একে লোকের ভিড় কমিতে কমিতে ঘাট প্রায় জনশূন্য হইল। সি দিকে চাহিয়া শঙ্কর বসিয়া রহিল।

নদীর জলে গলিত স্বর্ণ ঢালিয়া দিয়া ওপারের গাছপালার আড়ালে [illegible] শঙ্কর তথাপি বসিয়া রহিল। জীবনের সহস্র দুর্ভাগ্যের কল্পনা তাহাকে [illegible] বাসী বানাইয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহার কোন আশাই তাহার মনের আকাশকুসুম কল্পনার সম্ভাব্যতায় যে এতটুকু সুখদুঃখের সহচরীর এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার কল্পনা

ঐরে দস্যু

প্রেমাঙ্কুর বেরা

[এত বড় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল ...আমরা কলকাতাবাসী ছেলেরা, ওটকতক শেলএ্যান্ড বোমা···তারও মধ্যে কতকগুলি যে-কোন কারণে হোক, না ফেটেই খালি-চাপা হয়ে গেছেন কিন্তু উত্তেজনার অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রাচ্য-জগতের এই প্রথম নগরী, বোম-বিধ্বস্ত যে-কোন রাজধানীর চেয়ে কোন অংশে কম যায় নি···বাইরের লোকেরা দেখে নি, এইটুকু সৌভাগ্য, নইলে আমাদের অতীত ইতিহাসের বীরত্ব গৌরবের সমস্ত লোমহর্ষণকারী গবেষণা সত্ত্বেও, আমরা, সাধারণভাবে এই মহাযুদ্ধের আহ্বানে যে-ভাবে সেদিন সাড়া দিয়েছিলাম, তা থেকে ভবিষ্যৎ গল্প লেখকেরা একটু চেষ্টা করলেই বহু জীবন্ত গল্প খুঁজে বার করতে পারবেন—যে গল্প গল্প দেখতে মনে হয় কমিক, কিন্তু আসলে হলো, ট্রাজিক···বর্তমান গল্পটী হলো তার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ···আপনারাই পড়ে বিচার করে দেখুন, এ-কে কমিক, না ট্রাজিক, কি বলা ঠিক হবে !]

আমরা মধ্যবিত্ত কয় পুরুষ ধরিয়া ইতিহাসের পাতায় যুদ্ধ কথাটা পড়িয়া আসিতেছি। পরীক্ষার সময় আমাদের পাণিপথের যুদ্ধ ও পলাশির যুদ্ধের তারিখ মুখস্থ করিতে হয়, অধ্যায় করিবার সময় থার্মপিলির যুদ্ধের স্মরণ লই। কিন্তু আমাদের এই রক্তমাংসের শরীর যেঁসিয়া যে যুদ্ধদানবের লেলিহান জিহ্বা অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে একথা আমরা কখনো করিতে পারি নাই। ভাবিতাম যদি বর্তমান যুদ্ধে নিতান্তই হয় তাহা হইলে তাহা হয়ত জলে জাপে হইবে, না হয় জার্মানি বা ইংলণ্ডে যাইবে। আমরা বড় জোর সকালবেলা চায়ের পেয়ালার চেয়ে খবরের কাগজটার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিব এবং কোন আড়িওলির কোনও একটার পক্ষ লইয়া তাহাদের সপিণ্ডকরণ করিব, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। যুদ্ধদেবতার রথচক্র এবার জল স্থল ও অন্তরীক্ষের বাধা মানিল না, মহাসাগর ও মহাদেশের ভেদাভেদ ঘুচাইয়া দিল। সে এবার বেডরুমে প্রবেশ করিবেই, আমাদের ও বাড়ীতে সরি জায়গায় করিয়া দিয়া

১৯৪১এর [illegible] মুখের সকালে ডেলিং গাউন পরিয়া চায়ের টেবিলে বসিয়া [illegible]বাবুর প্রথম [illegible] খবরের কাগজই এবারে করায়ত্ত করা। বিষবার্তার কোনও কণা [illegible] পরিবেশন করা হইবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। [illegible] অন্তের তাহাতে হাত দিবার অধিকার ছিল। খবরের কাগজে

চোখ বুলাইয়া লইয়া তিনি প্রত্যহ সকালেই বলিতেন, "ইংরেজের মুখে আগুন লাগুক, যাহা ভাবি তাহা হয় না। এ টীনে পাও নি, বাবা! ভয়েই শেষ পর্য্যন্ত একটা বিলাতী [illegible]

কিন্তু সেই ডিসেম্বর দুর্ভটিবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ হইয়া গেল। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। সারা কলিকাতায় মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে যত জাপানী ছিল ছোট-বড় [illegible] ধরিয়া জেলে পোরা হইতেছে। এ একটা তিন রকম [illegible] দুই-এক দিন শুনিয়া ও দেখিতে মন্দ লাগে না। তার পরে বাড়ির বন্ধ জানালা দরজার [illegible] কাটিতে লাগিল। কলিকাতার এক সহরতলীতে পোড়ো জমি আর ঝাউবনের মধ্যে [illegible] খাঁচা টেক কাটাইয়া সহরের মত কনট্রাক্টার রাতারাতি লক্ষপতি হইবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে কাঁচের জানালার গায়ে কাগজ আর কাপড়ঁাটা এবং বিজলী বাতির মুখে মুখে নোনতা টানা পর্য্যন্তও এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু ঘরে ঘরে গৃহস্থের বুক কাঁপিয়া উঠিল সেদিন—যেদিন শোনা গেল সমস্ত জাপানীদের পুষ্পক রথ রেঙ্গুনে যে আগুনের ফুল বর্ষণ করিয়া গিয়াছে তাহাতে ৬০০ মানুষ এক নিমেষে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছে। তবে ত কলিকাতায় ভাগ্য পরীক্ষা হইতে আর দেরি নাই! কচি কচি ছেলেমেয়েগুলো শেষে কি এই দানবলীলার ইন্ধন হইয়া প্রাণ দিবে? বাঁচিয়াও যদি থাকে ত একটার পা থাকিবে না, আর একটার হাত কাটা যাইবে, অথবা চোখ কানের উপরও এই শয়তানের নজর লাগিতে পারে। বোমার আওয়াজে ছেলে-পিলে নাকি বাবা বোবা হইয়া যায়! বাপ-মায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—ভগবান, রক্ষার উপায় বলিয়া দাও।

রেঙ্গুন হইতে কত বিচিত্র সত্য মিথ্যা খবর কলিকাতার বুকে প্রত্যহ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। জাপানীদের আকাশ যুদ্ধের অধিবর্ষণে কাহার কাহার কাঠের বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে। প্রাণভয়ে পথে ছুটিতে ছুটিতে পলাতক কত মানুষ পথেই জীবনলীলা শেষ করিয়াছে। রক্তস্রোত ও মৃতদেহের উপর দিয়া বাঁচিয়া যাইবার কোন কোন মানুষ—বিধাতার কৃপায় কৃতান্তের করালগ্রাস হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

খবরের কাগজ বহুক্ষণ ছাড়াইয়া মানুষের উদ্ভ্রান্ত রসনা ঘরে ঘরে বিভীষিকা বিতরণ সুরু করিল। আজ রেঙ্গুন ধ্বংস হইল, কাল কলিকাতার পালা। মাড়বাড়ের মরুভূমি হইতে আসিয়া বাংলার উর্বর ভূমিতে যাহারা লক্ষপতি হইয়াছিল সকলের আগে শিহরণ জেগে ছিল তাহাদের অন্তরে। [illegible] সোনা দানা ছিল টীন ট্রাঙ্ক ও হোল্ডঅলে পুরিয়া ট্যাক্সি, ঘোড়ার-গাড়ী, রিক্সা ও গরুর-গাড়ী ভাড়া সকলে ধাবা করিল হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। কুরুক্ষেত্রের যা প্রয়াগের মনোরথ আজরা দেখিয়াছেন তাঁহারাই কল্পনা করিতে পারিবেন সেই সময়ের হাওড়া ব্রীজ ও ষ্টেশনের দৃশ্য।

কিন্তু অবাঙ্গালীদের পলায়নেই ব্যাপারটা শেষ পড়িল না। সুরু হইল বাঙ্গালীদের পালা। [illegible] বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মেজদার মামার কল্পনায় যে নামটি বড় হইয়া [illegible] যাহার অন্তরে ছুটিবার ক্ষমতা নাই সে অন্ততঃ করিল সহরের সীমান্ত [illegible] কোনও বাগানে আশ্রয় লইলেই আপাতঃ উদ্ধার

ঘর, খোলা বাড়ী, কলের জল, টামসাড়ী, বিজলিবাতি, রেডিও, attached bathroomএর মোহ [illegible] মন হইতে মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। ভাওতার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদা ষ্টেশনও অনাকীর্ণ হইয়া আসে। বাঙালীদের সংসারের মেস অকর্তাদীদের চেয়ে বেশী, তার উপর তাহাদের আশ্রয়ের ভিটা এই ষ্টেশন, সুতরাং ইহার জন্য সমস্ত দুশ্চিন্তাই তাহাদের এইখানে। সর্বস্ব কেলিয়া যাইতে প্রাণ চায় না, [illegible] ষ্টেশন ছেড়ে তাহাদের লটবহরের পালাই হইয়া উঠিল বড়। প্রতি মানুষের পিছনে অন্ততঃ একটি করে একটি পরিবার পরিজন। তাহাতে না আছে কি? বাঁশ বিছানার উপর মাথা নীচু করিয়া আছে চেয়ার টেবিল আলনা, সেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, খাটের রড, মিটসেফ ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি। আত্মীয়রা নিতান্ত কমে সাহিতে চায় তাহারাও লইয়াছে বেডাল আলনা, তোলা উনুন, কটল, ডেক চেয়ার, মোড়া, বালতি, টর্চ।

বৃদ্ধটিবার আসিলে যান আর শুনিয়া আসেন আজ কেহউন পরিবার পাঠালেন বর্ধমানে কাল রামভারণ পাঠালেন মধুপুরে। ভদ্রলোক মরিয়া হইয়া বলিলেন, "গিন্নি, আর নয়। আমি তোমাদের প্রাণের গ্যারিটি নিতে পারব না, আসছে হপ্তাহেই যেতে হবে যেখানে হোক সেখানে।"

গিন্নি বলিলেন, "আমি শুধু একলা এতগুলো ছানা পোনা নিয়ে চোরের হাতে মরতে পারব না। তার চেয়ে বোমা পড়ে ভাল। তুমি মরো, সবাই একসঙ্গে মরব। কেউ কারুর জন্যে কাঁদতে বসে থাকবে না।" কর্তা বলিলেন, "বলা ত খুব সোজা, কিন্তু ওই তোমার ছিনটে ছেলে আর চার বছরের মেয়েটা তাদের সামনে হাত পা ছিঁড়ে ছত্রিশ টুকরো হয়ে মরলে সহ্য করতে পারবে?"

গিন্নি ফিরিয়া উঠিলেন, "বালাই ষাট। তোমার মুখে কিছু বাধছে না। ভগবান কি আর কোথাও নেই যে সবার আগে বোমা এসে আমার বাছাদের মাথাতেই পড়বে?"

বৃদ্ধটি চটিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, আর ভগবান মেখাতে হবে না। যাদের কচি কচি ছেলেগুলো আধাজল ডুবে একসঙ্গে এক হাজার মরে গেল তারাও ভগবানকে ডেকেছিল। বাড়ী চাপা পড়ে ইস্কুল শুদ্ধ ছেলেমেয়ের গুঁড়ো হয়ে গেল তাও ভগবান দেখেছিলেন। তুমি এত বেশী পুণ্যি করনি যে তোমার জন্যে ভগবান ডানা দিয়ে আগলে রাখবেন।"

বৃদ্ধিনী কি আর বলেন? ৩০৲ টাকা ভাড়ার আসানসোলের নিকটস্থ একটি ষ্টেশনের একটা পুরানো [illegible] ঘর ভাড়া করার পরামর্শে রাজি হইয়া গেলেন। ভদ্রলোক সরকারী গলির সঙ্গে সে [illegible] ঘরের উচ্চতার সমান, মানের ঘর বলিয়া কোন পদার্থ বাড়ীতে নাই, সমাজন মতে কুয়াতলাতেই [illegible] হইয়া স্নান করিতে হয় এবং দুখানি ঘরের মধ্যে একখানির ছাদ পাকা ছাত, অন্যখানির টিনের [illegible]। পুরিনীর গায়ের জলা হইতে মার্কেলের মেঝে মেন ঘামিয়া যাইতে লাগিল, কলিকাতার সিলিং হইতে [illegible] পাখা বেন ঘুরে মিলাইয়া গেল। তিনি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বহুদিনের অব্যবহৃত মাচা হইতে নামাইবার আয়োজনে লাগিয়া গেলেন। বাড়ীতে মাত্র [illegible] সংসার ঘরে কি করিয়া? মাথা কাটা বাঁচাইবার জন্য যখন

ঘর ছাড়িয়া যাইতেই হইবে তখন সারাজীবনের সঞ্চয় গহনা কাপড়গুলা ও আর আপনিয়ের বোঝার মত হইবার জন্য ফেলিয়া যাওয়া যায় না। বৃদ্ধটি বলিলেন, "গহনার বাক্সর সঙ্গে আর-খানিক চিনে মাটির ও কাঁসাই ব্যাগে রেখে দিতে পারব। তাদের মাটির তলায় ঘর আছে। তোমার জন্য হাবিজি-সাবজিগুলোর ব্যবস্থা কর: তোমাদের মেয়ে জামাইয়ের প্রাণের চেয়ে শাড়ীর মূল্য বেশী।"

শুধু শাড়ীই হইল তিন ট্রাঙ্ক। তার উপর রূপার বাসন, থাল গোপাল, গরম-কাপড় এ সবের গোটাদুই করিয়া ট্রাঙ্ক হইতে। সবাই বলে, তেল সাবান, ছুঁচ সুতো, ওষুধ বিষুধ, লণ্ঠন, মাদুর এসব আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু কিছু সংগ্রহ করিয়া যদি না রাখা যায় ? যুদ্ধের বৎসর ভরা ত বেনারসী শাড়ী আর থাল গোপালেই কাটিবে না। বাজার উজাড় করিয়া সরষে, বার্লি, তেঁতুল, তেল, ৪০১ নং সাবান, ছোট বড় ছুঁচ, সুতো, খাতা, কালি, কলম, পেনসিল ভরা কি আসিল। তিন-চার মাসের মধ্যে বাজার হইতে সবই নাকি অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ভাবিয়ে আশ্চর্য লাগে। চিনি আর চালও নাকি আবার্য তালিকা হইতে শীঘ্রই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং চালের দাম হইবে ৪০৲ টাকা মণ। গৃহিণী মহাশ্বেতা সেটমোটা মাটির কলসী ভর্ত্তি করিয়া করিয়া চিনি আর নুন দুইজনা যে তরফের তাগো আছে খাইবের বলিয়া। বৃদ্ধটি বলিলেন, "কয়লাও যে পাওয়া যাবে না বলছ গো! এক ওয়াগন নেবে নাকি সঙ্গে?"

কর্ত্তা রসিকতা করিতেছেন কি সত্যই বলিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া মহাশ্বেতা ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "রঙ্গ রেখ। মানুষ যাবার গাড়ী দেবে না শুনছি, কয়লা নিয়ে নিতে। তোমার ত রেল আপিসে অনেক বন্ধু আছে, বলে দেখ না। আমি না হয় বিছানার সঙ্গে বেঁধে দুই-এক মণ লুকিয়ে নিতে পারি, বেশী ত আর পারব না।"

বৃদ্ধটি বলিলেন, "ঠাট্টাও বোঝ না দিদি! যা হোক তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বিশেষ কিছুই-এর ব্যাপার, কিছু ত বলা যায় না। ঘর বন্ধই কাঠ কয়লা না পাওয়া যায় দিন-কতক। মাস-খানেক ওঁকে টুঁসে নাও, আমি না হয় একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স জোগাড় করে আনি।"

এক টিন খই, দুই টিন মরিষার তেল, এমন কি একটা কেরাসিনের টিন আর বস লেয় আনুও সঙ্গে লওয়া ঠিক হইল। শিলনোড়া, বটি, লণ্ঠন ও স্নানের ঘরের আসবাব প্রভৃতি অপরিহার্য্য সংসারে মহাশ্বেতার মার্কেলমণ্ডিত শয়ন কক্ষ বোঝাই হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ মহাশ্বেতা চক্ষু সজল করিয়া বলিলেন, "আপিসের নাম করে তুমি ও কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। তার পর, ভগবান না করুন, যদিই ধর বোমা টোমা পড়ে, রেলগাড়ীও বন্ধ হয়ে যায়, তখন ত তোমার একটা খবরও আর পাবার উপায় থাকবে না।"

বৃদ্ধটি হাসিয়া বলিলেন, "তার জন্যে ভাবছ কেন? ওই মনে করেই ত আসানসোলে একটা না হলে সন্দেশ আলা কি আর পাঠাতে পারতাম না। আসানসোলে ঐব থাক না থাক পায়ে হেঁটে গিয়ে হাজির হতে পারব এতটা শক্তি এখনও আছে। তবে, কিছুদিন পরে [illegible]

"যাবে হবে? তা হলে অন্য কোথাও যাই যাক, আমাদের এখানে থাকতেই হবে। তেমন সম্ভাবনাও যে নেই তা নয়। সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল। তোমরা সেখানে ভাল থেকো, আমি না হয় চাইনিজের সঙ্গে সহবাসে যাব।"

বড় ছেলে যখন স্কুলে যায় তখন হইতে কয়েকটা হাতাবেড়ি কিনিয়া আনিয়া দাড়াইয়াছিল। সে পিছন হইতে বলিল, "আসানসোলেই যে বোমা পড়বে না এমন কথা কে বলল? এক্ষুণি ট্রাউজার আর শোর্টকোর্ট মজবুত রকম সব পকেট লাগাও, আর গেঞ্জির মত বেটি তৈরি করাও। যদি কোথাও থেকেও ঝেঁপে পড়া দরকার হয়, টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি সব খেলেতে পুরে দৌড় দিতে হবে। তোমার আবার ত ওঠা পরলেই পায়ে ফোস্কা পড়ে, বাহাদুরের চটি পরে রাস্তায় ছুটতে পারবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "বাপো এই মোটা শরীর নিয়ে রাস্তায় দৌড়ব! গয়না-গাঁটি বেচে ও কোন রকমে একটা অন্তত গরুর-গাড়ী তোদের আমার জন্য জোগাড় করে দিতে হবে। তুই এত বড় ছেলে, তোর এটুকু যোগ্যতাও কি নেই?"

রঞ্জন বলিল, "হ্যাঃ, পানিকের মধ্যে আমি গয়না বেচতে যাই আর কি! সবাই তখন তোমার জন্যে দোকান বন্ধ করে বসে থাকবে কি না! যে পারবে গলাটি টিপে কেড়ে নেবে, গাড়ী চড়ার সখ জন্মের মত মিটে যাবে।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "আচ্ছা বাপু কপালে যদি স্ত্রীতার দৌড়নোই থাকে চটি জোড়াও ফেলে না হয় যাব পারেই যাব।" বেশীদূর আমায় হেঁটে হবে না, দুদিন পথেই নিউমোনিয়া হয়ে কাল হালকা হতে পারে।"

মিনিবাস ত জোটানো হইল। কিন্তু ট্রেনে যাইবার নামেই মহাশ্বেতার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। মনের মাধুরী সব সংগ্রহ করিতে অধিতীয়। কার ঘাড়ে কাহার ছেলে গাড়ীর চাকার তলায় পড়িয়া গিয়াছে, আর কাহার হাতখানা টানাটানিতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে কোন অন্ধ মহিলার দশহাজার টাকার গয়না সমেত বাক্সটি কুলির মাথায় চড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কাহার কন্যাকে গুণ্ডায় ট্যাক্সিতে তুলিয়া অপহরণ করিয়াছে শুনিতে শুনিতে মহাশ্বেতার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গেল।

ভোর হইলেই বৃদ্ধটি বলেন, "আজ তোমাদের মনে চাক্কি বাজনা করতে হবেই হবে, সকাল সকাল উঠে পড়।"

মহাশ্বেতা চাবি লাগাইয়া উনান নিবাইয়া ভোর বেলা উঠিয়া যেন, তাহার দিন দুটা মিথ্যা করিয়া বাঁধিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায় ত তিনি [illegible] কিন্তু উনুন নেবানো, চা-খাওয়া, পেটভাতা [illegible] এত ছুটো আর কতদিন চলে? আজীবন ঘরের ঘরিণী হইয়া এই ঘর আর সংসার তিনি [illegible] করিয়া গড়িয়াছেন, জীবনের কত সুখ ও সার্থকতার স্মৃতি ইহার ধূলিকণারও সহিত জড়িত। [illegible] নিকট হইতে দূরে বিদায়ই [illegible] শেষ বিদায়। বিদায়ের পর জামবাগানের ছোটাটে বাড়ীতে

মহাশ্বেতা উঠিয়াছিলেন। তাহার সিঁড়ির তলায় বাথরুম, টিনঘেরা কাতলা, সদর দরজার সামনেই পায়খানা, পাট তাড়াটের পানের পিক ও আবর্জনায় সুচিত্রিত উঠান এবং পচিল নক্ষমা তাঁহার সৌখীন ও আর্দ্রিত মনকে পীড়া দিত। মূর্ত্তিটির যেদিন বুদ্ধির পর যখন এই বাড়ীর স্নান করা হয় তখন মহাশ্বেতা বলিয়াছিলেন, "বাঙালীর বাড়ীতে রান্নাঘর, স্নানের ঘর, উঠান কতটা সুন্দর করা যায় আমি দেখাব।" আজ তাঁহার রান্নাঘরের গ্যাসের উনান, স্নানের ঘরের আয়না আর বিজলি পাখা, উঠানের মার্বেলের সিঁড়ির পাশে রঙীন টবে পাতাবাহারের গাছগুলি, বাগানের পথে ঢালা সাদা নুড়িগুলি, দোতলার বারান্দার ঝুলান অর্কিড ফুল সকলেই যেন করুণ চোখে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, "আমাদের ফেলে কোথায় যাও? তোমার মমতা মাখা হাতের স্পর্শে যে আমরা প্রতিদিন হেসে উঠতাম। সে আদর আর কি আমাদের ভাগ্যে কোন দিন হবে?"

নয়নকে তাঁহার পিতার তৈলচিত্রটির দিকে আজ চোখ তুলিয়া চাওয়া যায় না। ছবিতে পাছে দাগ পড়ে এই ভয়ে নিজের পরিহিত কমলাডাঙ্গার শাড়ীর আঁচল দিয়া তিনি এই ছবিখানি মুছিতেন। আজ সেখানে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিতেই মনে হইল পিতার চির বিদায়ের কথা ভুলিয়া ছিলাম এই মুখের দিকে চাহিয়াই। কোন্ মানবলীলার এ মুখের চিহ্ন মুছিয়া যাইবে কে জানে? মৃত্যু দিয়া ইহাকে ত কোন্ হইতেও ধরিয়া আনিতে পারিব না। মায়ের ত ছবি নাই। মা নিজের গয়না পাওয়ার কালো বাসনগুলি মেয়েকে দিয়া গিয়াছিলেন, ইহার মূল্য তুচ্ছ, কিন্তু কন্যা তাহাকে অমূল্য মনে করিয়া রাখিবে আশা করিয়াছিলেন। পূজার ঘরের ওই পাথর গুলি, পালারন পিতলের ঐ ঘড়াটি মার বড় আদরের ছিল। পাছে তাহাতে কলঙ্কের দাগ পড়ে বলিয়া তেঁতুল দিয়া নিজে মহাশ্বেতা সেটিকে মাজিতেন। ইহাদের ছাড়িয়া যাইতে পা কি করিয়া উঠিবে? শকুন্তলা কণ্ব মুনির আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে এত বেদনা কি পাইয়াছিলেন? মনে হয় না। কিন্তু সে ছিল আশ্রম, হরিণ শিশু, বনজোৎস্নী আর এ অতি আধুনিক সহরে সংসার! তাই মহাশ্বেতার দুঃখ কবির কাব্যে কোনদিন স্থান পাইবে না বটে, তবে মহাশ্বেতার এ বেদনা বাস্তবিক তাহার চেয়েও বড়। শকুন্তলা যাহাদের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের আর কোনও একদিন আসিয়া দেখিবার ক্ষীণ আশা অন্তত তাঁহার মনে ছিল। যদি নাও বা দেখিতেন, তবু মনে ছিল ইহারা অন্তত ওই দিব্য শান্তির আবেষ্টনে নির্বিঘ্নে দিনগুলি কাটাইয়া যাইবে। কিন্তু মহাশ্বেতার মনে কি সে আশা আছে? এ সংসারে সবই ক্ষণভঙ্গুর বটে, তবু আমার জীবনে যা গড়িয়াছি, পুত্র-কন্যার হাতে সেই বহুবস্তুবিজড়িত নীড়টি তুলিয়া দিয়া যাইব, অন্তত তাহাদের জীবনকালটুকু তাহারা ইহার মধ্যে আমাদের স্মরণ করিবে, ইহাও ত মরণকে কিছু পিছাইয়া রাখা! মহাশ্বেতার সে আশা কই? হয় ত একদিন যাহা সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া মনে কত আশা জাগাইয়া ছিল কালই তাহা মাথা মরীচিকার মত মুছিতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইবে। সন্তান-সন্ততিকে পথে দাঁড় করাইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবে।

প্রায় মাসখানেক ইতস্তত করিয়া জানুয়ারী মাসের গোড়াতে মহাশ্বেতা চন্দ্রিমা পল্লীর কন্যাকে লইয়া একদিন শুভ যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে বার পাঁচেক দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে আজ রবিবার দেখিয়া

দুইটি রাত থাকিতে উঠিয়া গোটা দুই ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। চাকরদের সঙ্গে কিছু জিনিষ বাসেও যাইবে।

এখন আর পথে তেমন ডাকাতের ভয় নাই। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে মেয়ের সমস্তাতে কাহারও আগ্রহ ছিল না বলিয়া কষ্ট করিয়া ইণ্টার ক্লাশে যাওয়াই মহাশ্বেতা ঠিক করিয়াছিলেন।

আসানসোলের কাছেই ছোট ষ্টেশনটি। প্লাটফরম এত নিচু যে ট্রেণ হইতে নামিতে সিঁড়ি লাগাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে সময় কর্তৃপক্ষের কাহারও নাই। ইণ্টার ক্লাশের যাত্রীকে গাড়ীতে বসিতে দিয়াই যেন কোম্পানী কৃতার্থ করিয়াছেন মনে করেন; নামাইবার ব্যবস্থা করিবার কোন আলাদা পয়সা ত তাঁহারা পান নাই, তবে সে সব চিন্তায় মাথা খাটাইবেন কেন?

ষ্টেশন ছোট হইলেও যাত্রী কিছু কম নামিল না। ষ্টেশনের বাহিরে একখানা মাত্র ট্যাক্সি এবং পাঁচ ছয়টা জীর্ণ পঙ্গু সাইকল রিক্স যাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক ভদ্রলোক অই ট্যাক্সির পরিহিতা শুটি পাঁচেক মেয়েকে লইয়া প্রায় দৌড়াইয়া ট্যাক্সিখানা দখল করিয়া লইলেন। পশ্চাতে দুর্ঘটনায় আর এক বাহিনীকে ট্যাক্সিচালক হাত নাড়িয়া কি যেন বলিয়া গেল বোঝা গেল না। মহাশ্বেতা বলে ষ্টেশনের গেট পার হইতেই দেখিলেন জোড়া জোড়া আরোহী এবং তাহাদের পায়ের উপর স্তূপীকৃত চারিটি বাক্স ও বিছানা লইয়া দুই তিনটি সাইকল রিক্সও অদৃশ্য হইয়া গেল। রঞ্জন পিছনের খালি রিক্সগুলিকে গিয়া ধরিল। চালকেরা বলিল, বাবু, বায়না করা আছে। এই খেপটা দিয়ে আসি, তারপর আপনাদের নেব।"

উপায় নাই! গাছের ধারে অশ্বত্থ তলে জিনিষ পত্রের স্তূপের উপর বসিয়া বিশ্রাম করার ভাণ করিতে হইবে। অদূরে একটি চায়ের দোকান একমাসেই গজাইয়া উঠিয়াছে দেখা গেল। টিনের চালের তলায় কেরোসিন কাঠের বাক্স ও গোটা কয়েক ভাঙ্গা মোড়া পাতিয়া সকালে দুপুরে বিকালে চা বিক্রি হয়। খরিদ্দার দেখিয়া একটা বুড়া তাকাডাকি করিতে লাগিল। মহাশ্বেতা বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, জেঠেন-বাবুর বাড়ী কত দূর বলতে পার?"

চাওয়ালা বলিল, "জেঠেনবাবু? তেনু গোয়ালার বাড়ী কোশ খানিক দূরে হবে। হাঁ মা, কলকাতার বাবুরা ও সব পালিয়ে আইছেন দেখছি। জাপানীরা কি হাওড়ার পোল অবধি এসে পড়েছে?" মহাশ্বেতা বলিলেন, "আসে না আসুক, দু চার দিন পরেই আসবে বাছা।" রিক্সাওয়ালা ফিরিয়া আসা পর্যন্ত মহাশ্বেতাকে জাপানীদের অস্ত্রের পরাক্রম বিষয়ে চাওয়ালার বক্তৃতা শুনিতে হইল।

ঘণ্টা খানিক পরে তিন-চার খানি রিক্স জুটিল। ঘটনার তাহাতে তুলিয়া সকলে রওনা হইলেন। প্রায় মাতা জলাগত লরি চলিয়া চলিয়া প্রায় আগাগোড়াই ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহার উপরকার ধুলোয় মানুষের শরীরের হাড়গোড়েরও কথা ঘুলিয়া যাইবার জোগাড়।

রাস্তার দুই ধারে বনের মধ্যে অতি সাধারণ একখানি গ্রাম। মাটির ঘরে খড়ের চাল। ঘরের একটা করিয়া আছে, তবে জানালায় বালাই নাই। পাশে পাশে দুই একখানা পাকা ঘর।

অধিবাসিনীদের পরনে চুকাই শাড়ী ও সোনার গহনা; প্রায় সকলেরই গায়ে ছুঁচা। প্রতি দরজায় এত মানুষ দাঁড়াইয়াছে যে মনে হয় যেন যথ যাত্রা কি ঠাকুর ভাসানের বিরাট মেলা দেখিতে দেশ ভাঙিয়া লোক আসিয়াছে। পরস্পরকে পরস্পরের দুর্গতি দেখিয়াই যেন কিছু সান্ত্বনা পাইতেছেন।

মাইল দুই পরে একটি কলাবাগানের মধ্যে ছোট গোয়ালার বাড়ী। একপাশে গোবরগাদা ও অন্যদিকে ছাই ফেলার আঁস্তাকুড়। টিনের চাল দেওয়া ভাঙা ঘরের মত কুল-পৃষ্ঠ একখানি ঘর, মাঝখানে উঠান, ওপারে-দুয়ারার পাশে পাকা ছাদ দেওয়া ছোট একটি রান্নাঘর। মাস কয়েক আগে টিনের ঘরখানি এক কয়লাওয়ালা ভাড়া লইয়া কয়লার দোকান করিত। মাসে ভাড়া ছিল ৫৲ টাকা। পাকা রান্নাঘরখানিতে ছিল ছোট গোয়ালার খোল ভুষি এবং তাহার নিজের স্নান আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা। দুধে জল মিশাইয়া ৫৲ টাকার দুধ সে কখনও ৩০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে পারে নাই। আজ যুদ্ধ দানবের কৃপায় সে সুযোগ আসিতে দেখিয়া সে কয়লাওয়ালাকে সাত দিনের নোটিশ দিয়া এবং তালায় উপর তালা লাগাইয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়াছে, নিজেও কয়লার বাড়ীর দরোয়ানের দেউড়ীর ঘরে একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়াছে। জমিদারবাবুর সাহায্যেই সে দুর্গতির নিকট একসঙ্গে তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া নব্বই টাকা লইয়া কিছু সোনা কিনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। কি জানি ইংরেজ সরকারের রাজা যদি না টেঁকে, সোনাটুকুও অন্তত থাকিবে।

রিক্সওয়ালারা ভাড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি জিনিষ পত্র নামাইয়া দিল। সন্ধ্যা হ'ব হ'ব। তেজেনের গোলার পর্যন্ত ঘিরিয়া মশকগুঞ্জন সুরু হইয়াছে। উঠানের রন্ধনকক্ষের সদ্য বন্ধনে ছুটির ঘুণ ধরবার ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। কুলপৃষ্ঠ টিনের ঘরে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। মহাশ্বেতা বলিলেন, "মানুষটার দয়ামায়া আছে। উনুন ধরিয়ে আলো জেলে যত্নের করে রেখেছে।"

রঞ্জন দরজাটা ঠেলিয়া খুলিতে গেল। ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। সে বলিল, "ধনাই, দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন কেন? আমরা কি বাড়ী ঢুকব না।"

ভিতর থেকে কে যেন কাংস্যকণ্ঠে বলিল, "যম ছোঁড়া, মরণ কপালে আর জায়গা পাস নি?"

রঞ্জন দরজায় সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল, "তেজেনবাবু কোথায়?"

খোলা হুঁকা হাতে করিয়া এক শুষ্ক শোভিত ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "তেনু কোথায় দুধের জোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমি কি জানি?"

রঞ্জন ও মহাশ্বেতা সমস্বরে বলিলেন, "তা জানবার দরকার নেই। আমরা শ্রান্ত হয়ে এসেছি। আমাদের ঘরে ঢুকতে দিন।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "এখানে কেন? আমার বাড়ীতে ত আর জায়গা নেই। আগে থেকে বাড়ী ঠিক করে আসতে হয়।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "তিন মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে বাড়ী নিয়ে রেখেছি, আবার কি রকম করে বাড়ী ঠিক করব। আপনাকে এবাড়ীতে কে রেখেছে ?"

ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন, "ঘুক আবার বাধবে। চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়ে তেজুর কাছ থেকে বাড়ী নিয়েছি।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "যার কাছ থেকেই নিন, আমরা এই বারান্দায় বসলুম, আপনি তেজেনকে ডেকে আনুন গিয়ে।"

পাঁচ ছয় হাত লম্বা সরু বারান্দায় পর্ব্বত প্রমাণ জিনিষ রাখিয়া মহাশ্বেতা একটা বাক্সের উপর বসিয়া পড়িলেন। চার বছরের খুকী বেণু বলিল, "মা, ঘুম পেয়েছে, বাড়ী চল।"

ভিতর হইতে কাশেকষ্টি বলিলেন, "যাও না গা, তেজুকে ডেকে এনে একটা হেস্ত নেস্ত কর। এখনও ইংরেজ রাজত্ব রসাতলে যায় নি। যার খুসি এসে বাড়ি চড়াও হবে, আর মুখ বুজে তাই সইতে হবে।"

•

তেজেনকে খুঁজিয়া আনিতে ঘণ্টা দুই লাগিল। তিনি আসিয়া করজোড়ে বলিলেন, "দেখুন, ভদ্রলোক বাড়ীর অভাবে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। কচি-কচি ছেলে নিয়ে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। বাড়ীটা খালি পড়ে ছিল, আপনারা পাঁচবার টেলিগ্রাম করেও এলেন না। তাই আমি এদের দিনকতক থাকতে দিয়েছি। এতদিন পরে যদি এলেন ত আর একটা টেলিগ্রাম করেও ত জানাতে পারতেন।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "ভরা ত হয়েছে পরশু।"

তেজেন বলিলেন, "পোষ্ট অফিস মাইল দুই দূরে, তাতে আবার আজ রবিবার। কাল সকালে হয় ত টেলিগ্রামটা দিয়ে যাবে।"

পুনর্ভব

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

[সত্যযুগে হোক ..কিম্বা এই বিংশ শতাব্দীতেই হোক্···সময়ে কিছু যায় আসে না—রাজকুমার অথবা রাজকুমারীই হোক্, কিম্বা দরিদ্র কৃষাণ-কৃষাণীই হোক্—পাত্র-পাত্রীতে কিছু যায় আসে না...কোশলেই হোক্ কিম্বা কলকাতাতেই হোক্—স্থানে কিছু যায় আসে না প্রেমের সমস্যা সব সময়, সব দেশে, সকলের মধ্যে এক·····তার ভাষা বিভিন্ন হলেও, তার ব্যাকরণ এক : সখ্য, বাৎসল্য, দাম্পত্য, দাস্য সব রূপের মধ্য দিয়াই একই তৃপ্তিহীন অতৃপ্তি অনির্ব্বান চলে আসছে...পাত্রই শুধু বদলাচ্ছে···পাত্রের পাণীয় কিন্তু একই থেকে যাচ্ছে··· সেই কথাই নতুন করে এই কাহিনীতে নবরূপ নিয়েছে...]

কোশলরাজের দুঃখের সীমা নাই। সুনন্দা তাঁহার একমাত্র সন্তান, তাঁহার নয়নের তারকা। সেই সুনন্দা বিবাহের পাঁচ বৎসর পরেই বিধবা হইল। কোশল রাজপ্রাসাদে এত বড় শোকের ঘটনা আর ঘটে নাই।

মহারাণী সেই যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন আর উঠেন নাই। রাজবাড়ী নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে হাসি নাই। মহারাজা বারিয়ে দিবারাত্র হা হুতাশ করেন।

আর সুনন্দার তো কথাই নাই। সকলের আশঙ্কা পতিশোকে হয়তো সে পাগলই হইয়া যাইবে। তাহার সুবর্ণপত্তিকার মতো তনুদেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

তাহার জন্য মহারাজা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মহামাত্য বলিলেন, মহারাজ, একমাত্র ধর্ম্মই শোকে প্রকৃত সান্ত্বনা দিতে সমর্থ। অনুমতি করিলে মহাস্থবির শুভঙ্করকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিতে পারি।

শোকগ্রস্ত রাজা অনুমতি দিলেন।

শুভঙ্কর আসিলেন। মুণ্ডিতশীর্ষ বৃদ্ধ ভিক্ষুর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে ও বিনয়াবনত আচরণে, তাঁহার শুভ্র নির্মল হাস্যে ও নয়নের অরুণাভ জ্যোতিঃতে কি ছিল জানিনা, মহারাজা শ্রোক ভুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। মহারাণী ও রাজকন্যা সুনন্দা সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদ্ম ও সমাধিত মুখের দিকে চাহিলেন।

বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে শুদ্ধোদন কহিলেন :

—বৎসে, ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, "জন্ম দুঃখ, দেহের বৃদ্ধি দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ। যাহা অকাম্য তাহার সহিত মিলিত হওয়া দুঃখ। প্রিয় বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ গভীরতর দুঃখ। যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষাও দুঃখ।" তথাগত আরও কহিয়াছেন, "দুঃখের কারণ লালসা। অনুভূতি চতুষ্পার্শ্ব জগৎ হইতে তাপান্বিত হইয়া তৃষ্ণার সৃষ্টি করে। উৎপত্তিমাত্র তৃষ্ণা তৃপ্তির প্রার্থী হয়। আত্মাভিমানে মোহ উৎপন্ন হইয়া বস্তুতে আসক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ভোগসুখের লালসায় প্রাণধারণের বাসনা মানুষকে দুঃখের বন্ধনে বদ্ধ করে। ভোগের প্রলোভন, উহাই দুঃখের জনক।"

রাজকন্যা কহিলেন, প্রভু প্রাণধারণের বাসনা আর নাই। ভোগসুখের লালসাও ত্যাগ করিয়াছি। কৃপা করিয়া আমাকে আপনি দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।

শুদ্ধোদন হাস্য করিলেন। সেই অপূর্ব্ব নির্মল হাস্যে গৃহমধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল।

কহিলেন, প্রভু বলিয়াছেন : "সত্যের সম্মুখে যিনি আত্মাভিমানকে বলি দিতে পারেন, যাঁহার ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তব্যে প্রযোজিত হয়, যাঁহার একমাত্র বাসনা কর্ত্তব্য পালন, তিনি মুক্ত হইবেন। জ্ঞানী এই মার্গ অবলম্বন করিয়া দুঃখের বিনাশ সাধন করিবেন।" তুমি কি তদ্দূর যাইতে প্রস্তুত বৎসে ?

—প্রস্তুত পিতা। দুঃখের এই উত্তপ্ত অগ্নিপ্রবাহের মধ্যে আর কিছুকাল থাকিলে আমি উন্মাদ হইয়া যাইব।

শুদ্ধোদন মহারাণী ও মহারাণীর দিকে চাহিলেন। কহিলেন, তোমাদের এই শোকাভিভূতা মহীয়সী কন্যাকে ভগবান তথাগতের চরণে দান করিয়া দাও। তাঁহার আশীর্ব্বাদে ইনিও শান্তিলাভ করিবেন, তোমরাও শান্তি পাইবে।

রাজা ও রাণীর বক্ষবিদীর্ণকরা ভাবনায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তবু কন্যার মুখ চাহিয়া বাঁধা দিতে পারিলেন না। শান্তভাবে বিদায় দিলেন।

সুনন্দা দেববালার মতো ওঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইল। যাইবার সময় তাহার শৈশব কালের লীলাভূমি মণিমাণিক্যখচিত এই মর্ম্মর প্রাসাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

সুনন্দা মহাস্থবির শুদ্ধোদনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল এবং ভিক্ষুণীরূপে বিহারে বাস করিতে লাগিল।

তাহার শিক্ষার জন্য মহাস্থবির ভিক্ষু শীলভদ্রকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাহাকে ধর্ম্ম ও বিনয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রথমে অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সেই নির্জ্জনতার মধ্যে ক্রমে তাহার

সায়ন্তনিক বিশ্রাম অনিবার্য করা এবং সর্বশেষে পূর্ণ পবিত্রতা ও শান্তির অবস্থা আনিবার জন্য ধ্যানে নিযুক্ত করা হইবে।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ঘটনা ঘটিল।

সুনন্দা সেদিন সকালে যথারীতি তিনটা বাজিয়া উঠিয়াছিল।

শরৎকালের প্রভাত।

গাছের পাতায়, বীথিকার জলে, সারাপথে সোনার আলো হাসিতেছে। নব নব বিচিত্র বস্ত্র পরিয়া শিশুরা পথপার্শ্বে বৃক্ষবাটিকায় খেলা করিতেছে।

তাহাদের মাঝ দিয়া সুনন্দা চলিল। তাহার মনে শিশুর মমতা অনাবিল আবেগ। তথাপি তাহার দেহ কৃশ ও মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে। তথাপি তাহারই জন্য হইতে যেন একটা অনাবিল জ্যোতিঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে।

দুইটি লোক পথে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল এবং একজন আর একজনকে চুপি চুপি বলিল, ইঁহাকে জান? কোন্ রাজকন্যা। স্বামীশোকে প্রব্রজ্যা লইয়াছেন।

সে-কথা সুনন্দার কর্ণে গেল। মনে মনে কহিল, হায়! সর্বস্ব ছাড়িয়াও এখনও আমি রাজকন্যার ছাড়িতে পারিলাম না!

সুনন্দা চলে।

সম্মুখে হাটখোলা। বহু লোকের ভিড় জমিয়াছে। ভিড় সুনন্দার ভালো লাগে না। পাশ কাটাইয়া দক্ষিণের সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় একটি শিশুর কলকণ্ঠে সে ফিরিয়া চাহিল।

—এবং চাহিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইটি লোকের মুখেও এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য কখনও হইতে পারে? শিশুর মুখ-চোখ অবিকল তাহার মৃত স্বামীর মতো!

সুনন্দা যখন এই কথা ভাবিতেছে, কবিতাকাঙ্ক্ষিত শিশু দুই হাত বাড়াইয়া টলিতে টলিতে তখন তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আর একটু পরেই তাহাকে স্পর্শ করিবে, এই কথা ভাবিতেই তাহার সর্বশরীর এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে বেতস-পত্রের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল।

কি যে ঘটিত বলা যায় না, এমন সময় এক তরুণী বধূ দ্রুত ধারপথে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। এবং কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে চাহিয়া বলিল, কিছু মনে করিবেন না, যদি আমাদের ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

তাহার কণ্ঠস্বরে ইলা আবার ফিরিয়া পাইল। অনুমান করিল, এই বধূ শিশুর জননী হইবে। কিন্তু ভিক্ষার আগ্রহ তাহার চলিয়া গিয়াছিল।

সাহসকে বলিল, তত্রে, আজ নয়। একদিন ইচ্ছা হইলে যাব একদিন আসিব।

সুনন্দা প্রণাম করিয়া বিদায় দিয়া চলিয়া গেলে সেদিন আর তাহার ভিক্ষা করা হইল না। শিশুটি তাহার মনের আনন্দ ও প্রশান্তি বিলিত করিয়া দিয়াছে।

সমস্ত দিন সুনন্দা একবিন্দু জল পর্যন্ত গ্রহণ করিল না। ষষ্ঠীর ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিল।

অপরাহ্নের শেষে শ্রীনন্দ আসিলে তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু, সেদিন আপনি দুই প্রকার অভিজ্ঞার কথা বলিতেছিলেন। পুরুষজ্ঞের জ্ঞান কি সহজেই মানুষে লাভ করিতে পারে?

শ্রীনন্দ কহিলেন, কেন পারিবে না মা? এখান হইতে বহু দূরবর্তী তোমার পিতৃপ্রাসাদ কি কল্পনেত্রে তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পার না? যে-শক্তি-বলে তুমি এরূপ করিতে পার, তাহাই আরও বৃদ্ধি করিলে তুমি পুরুষজ্ঞের ঘটনা কেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না?

সুনন্দা জিজ্ঞাসিল, আপনি পারেন প্রভু?

—না মা। তাহা সকলে পারে না। যিনি বহুবিধ অভিজ্ঞা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, মাত্র তিনিই পারেন।

—সে-জ্ঞান কেহ লাভ করিয়াছেন বলিয়া আপনি জানেন?

বিতথাস্যে শ্রীনন্দ বলিলেন, জানি বই কি মা। আমাদের মহাধিবির ওতথক সে-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

সুনন্দা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করিয়া করিল, তাঁহাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন?

শ্রীনন্দ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার আবার কি কথা মা?

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল:

—প্রভু, আজ সকালে আমি ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া একটি শিশুকে দেখিলাম। অধিকন্তু আমার [illegible] স্বামীর মত। তাহাকে দেখিবার পর হইতে আমার মনের ধৈর্য নষ্ট হইয়াছে। কেন এমন হইল, [illegible] প্রভু, তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাইবেন?

শ্রীনন্দ জিজ্ঞাসিলেন, এ কথা জানিতে চাও কেন? আমার বিশ্বাস, এ কথা না জানিলেই [illegible]

সবিনয়ে সুনন্দা বলিল, কিন্তু প্রভু, আমি কিছুতেই মনের ধৈর্য ফিরিয়া পাইতেছি না। ভিক্ষা [illegible] করিয়াই আজ ফিরিয়া আসিয়াছি। সমস্ত দিন একবিন্দু জল না করিয়া ধ্যানে মনঃসংযোগ [illegible] করিয়াছি, তাহা নহি। সেই জন্যই কেন এমন হইতেছে তাহা জানিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। [illegible] জানিলে আমার সেই আগ্রহ মিটিতে পারে।

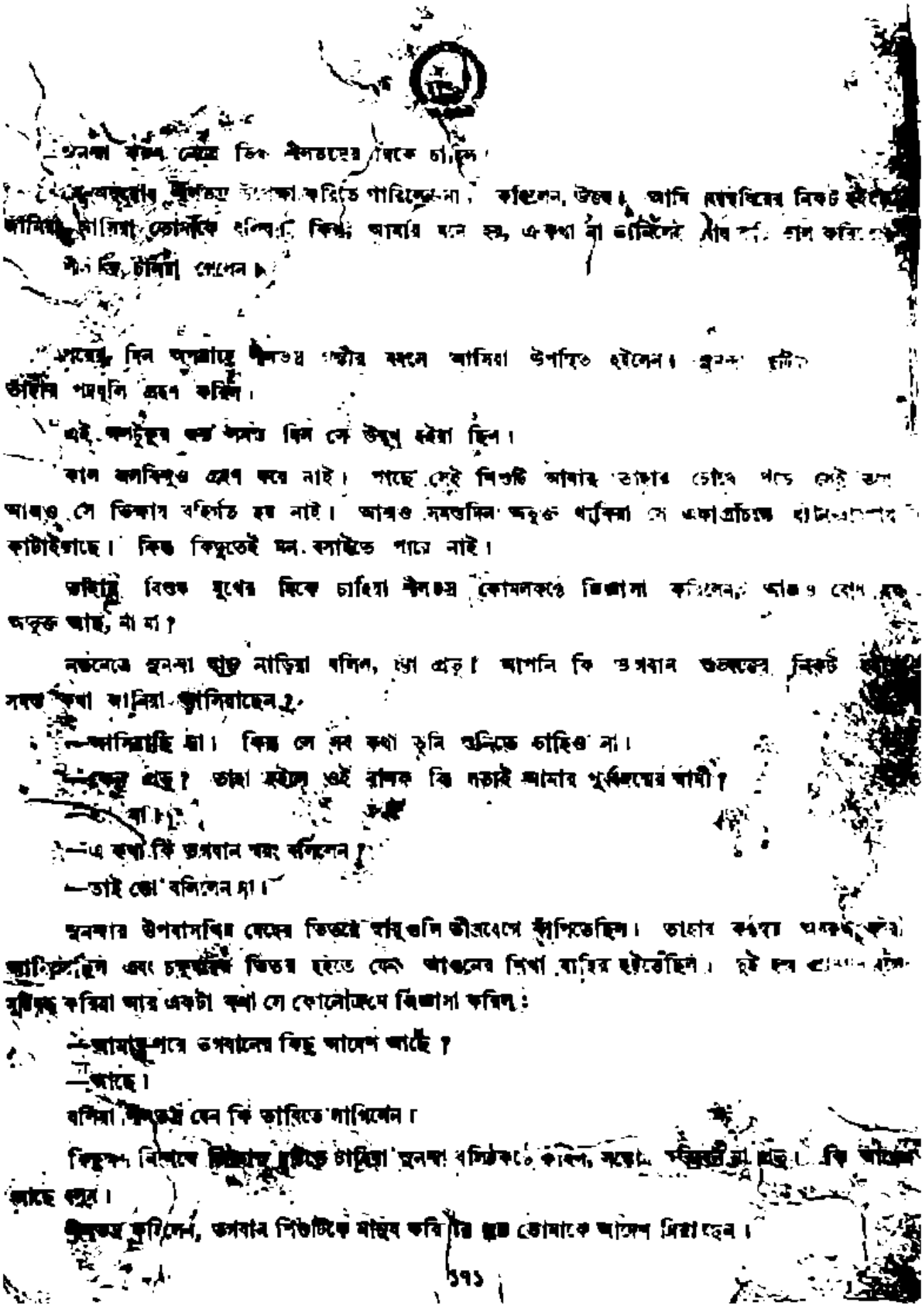

অনন্তা কাতর নেত্রে কি শ্রীনাথের দিকে চাহিল।

শ্রীনাথবাবু ইতস্তত করিতে লাগিলেন না, কহিলেন, উত্তর। আমি মহাবিষের নিকট হইতে জানিয়া আসিয়া তোমাকে বলিতে কিন্তু আমার মনে হয়, এ কথা না জানিলেই বোধ হয় ভাল করিতে পারি, চাহিয়া দেখেন।

এমন সময় শ্রীনাথ গম্ভীর বদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুনন্দা ইহাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল।

এই কয়টি দিনের মধ্যে শ্রীনাথ কি হইয়া গিয়াছেন।

কাল অনাবিল হাস্য করে নাই। পাছে সেই শিশুটি আবার তাহার চোখে পড়ে সেই ভয়ে আজও সে ভিক্ষায় বহির্গত হয় নাই। আজও সমস্তদিন অভুক্ত থাকিয়া সে একাগ্রচিত্তে ধ্যান-আরাধনায় কাটাইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই মন বসাইতে পারে নাই।

তাহার বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীনাথ কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজও বোধ হয় অসুখ আছে, না মা?

নতনেত্রে সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ প্রভু! আপনি কি ভগবান শুভ্রের নিকট হইতে সমস্ত কথা জানিয়া আসিয়াছেন?

—জানিয়াছি মা। কিন্তু সে সব কথা তুমি শুনিতে চাহিও না।

—কেন প্রভু? তাহা হইলে ওই বালক কি সত্যই আমার পূর্বজন্মের স্বামী?

—না।

—এ কথা কি ভগবান স্বয়ং বলিলেন?

—তাই তো বলিলেন মা।

সুনন্দার উপবাসক্লিষ্ট দেহের ভিতরে বায়ুগুলি তীব্রবেগে হাঁপিতেছিল। তাহার কথা অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং চক্ষুর্দ্বয়ের ভিতর হইতে যেন আগুনের শিখা বাহির হইতেছিল। দুই হস্ত প্রাণপণে বক্ষ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আর একটা কথা সে কোনোক্রমে জিজ্ঞাসা করিল:

—আমার পরে ভগবানের কিছু আদেশ আছে?

—আছে।

বলিয়া শ্রীনাথ যেন কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া সুনন্দা বলিবার কহিল, বলুন প্রভু! কি আদেশ আছে বলুন।

শ্রীনাথ কহিলেন, ভগবান শিশুটিকে মানুষ করিবার ভার তোমাকে আদেশ দিয়াছেন।

কথাটা শোনা মাত্র সুনন্দা শিহরিয়া উঠিল। কহিল, আমি যে ভিক্ষুণী প্রভু। তাঁহার ত এই কথার আদেশ তিনি করিয়াছেন?

—তাহাকে ত বলিয়াছেন মা।

দেখিতে দেখিতে সুনন্দার বড় বড় চোখ ছাপাইয়া ঘর ঘর অশ্রুধারা নিমীলিত গণ্ডের উপর বহিয়া গেল। একটু পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে শীলভদ্রের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

তারপরে অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, তাঁহার ইচ্ছায় জয় হউক। বলিবেন, অপরাধিনী তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইল।

শীলভদ্র চলিয়া যাইবার পর সুনন্দা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার মাথার ভেতর যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। উপাধানের উপর সেই রিক্ত বেদীর লুটাইয়া পড়িয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিল। ভিক্ষুণী-জীবনের এত বড় শাস্তি সে কখনও কাহাকেও পাইতে দেখে নাই।

পরের দিন প্রভাতেই শিশুর জনক-জননী শিশুটিকে তাহার কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া ছিন্নমূলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুনন্দা লজ্জিত-মুখ তাহাদের দিকে তুলিতে পারিল না। তাহারই লোভের শাস্তি এই নিষ্পাপ শিশুটিকে পাইতে হইতেছে।

বৃদ্ধটি কহিল, সকলে যখন আমার সন্তান-সম্ভাবনার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, পুত্র-পুরুষের অনুরোধে এই শিশুটিকে তখন কোলে পাইয়াছিলাম। ভালোই হইল, তিনিই আবার ইহাকে তাঁহার চরণে টানিয়া লইলেন। যে দিতেছি সে শুধু মায়ের মন বোঝে না বলিয়াই। অনুমতি করিলে আমরা ফিরিয়া যাইতে পারি।

সুনন্দা নিঃশব্দে অনুমতি দিল। এবং উহারা চলিয়া যাইতেই শিশুটিকে কাছে টানিয়া লইল। শিশুটি বাধা দিল না। নিতান্ত পরিচিতের মতো সুনন্দার কোলের উপর দাঁড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া অকারণ হাসিতে লাগিল।

সেই মুখ। সেই ললাট, সেই চোখ, সেই ওষ্ঠ, এমন কি চিবুকের নিটোল গড়নটি পর্যন্ত রহিয়াছে। এমনও কখনও হয়?

সুনন্দার বিস্ময়ের আর সীমা নাই। এমনও হয়? এমনও কখনও হয়? গভীর আবেগে শিশুটির মুখটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াই হাসিয়া উঠিল।

তবে কী তাহার কোনো জন্মের ছায়াভাসও কি ইহার স্মৃতিতে আছে? প্রথম বিবাহের পরে দুইজনে তীর্থের কুণ্ডে যে দেখিয়াছে সে কি ইহার মনে আছে? আকাশে দেখিয়া যে কহিয়া চাঁদ উঠিত, তখন তাহার কানে কানে যে-কথা সে বলিয়াছিল, তাহার কিছুই কি ইহার মনে নাই? শিশুর মুখে ইহার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জন্ম মৃত্যু ঘটে কেন ? [illegible]

[illegible] হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

সুনন্দা তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহাকে [illegible] করাইয়া, [illegible] করাইয়া, বেশ বিন্যাস করিয়া কপালে টিপ কাটিয়া নয়নে অঞ্জন পরাইয়া দিল। এবং অনেক দিন পরে নিজের কথা [illegible] বসিল।

ভগবান তাহাকে লইয়া এ কি পরিহাস আরম্ভ করিলেন! যাহাকে দেখিলে স্বভাবতঃ মনে বাৎসল্য জাগে, সে তাহার স্বামী! ত্রিকালজ্ঞা মহাঋষি ওতথ্য স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই।

কিন্তু ইহাকে লইয়া সে কি করিবে ?

মনে পড়ে, কত রাত্রি স্বামীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ভগবানের সে সাধিয়াছে। তাহার প্রার্থনা ভগবান শেষ পর্যন্ত শুনিয়াছেন। স্বামীকে তাহার কাছে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল হইতে সকাতরে যাহাকে সে কিরিয়া চাহিয়াছে, সে কি এই শিশু ? তাহার মন বলে না, না, না,।

তবু এই শিশু যে একদিন তাহার স্বামী এবং স্বামী ছাড়া আর কেহই নয়, মহাঋষির [illegible] তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? দুইটি মুখের এমন অধিকল সাদৃশ্য [illegible] করিবার নয়। বিশেষতঃ সুনন্দার অন্তরের অতি নিভৃত প্রদেশ হইতে একটি ক্ষীণ সুর ধ্বনিত হইতেছে, এতদিনে তাহাকে পাইলাম, পাইলাম পাইলাম।

[illegible] আদেশ দিয়াছেন, ইহাকে রাজপুত্রের মতো করিয়া মানুষ করিতে হইবে।

বিহারের বাহিরে, বিহার হইতে দূরে, কুটজপূর্ণ পাহাড়ের চূড়ায় একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ [illegible] পড়িয়া ছিল। সেইটির সংস্কার করিয়া সেইখানে সুনন্দার আবাস নির্দিষ্ট হইল। অবশ্য রাজধানী এবং [illegible] রাজকীয় সমারোহের মধ্যে কিন্তপী সুনন্দা চীনের পরিধান করিয়া তাহাকে বাসে করিতে লাগিল।

শীলভদ্র আসে, এক বেলা আসিয়া দেখিয়া যান, সুনন্দা কি অবিশ্রান্ত একখানি গানের বাহন হইয়া থাকে। নিম্ন অধিত্যকায় বসে শীলভদ্র এবং বিহার হইতে শীলভদ্র বিবিধ গান ও তত্ত্বকথা আলোচনা করে,—খুব জোরে জোরে, যেন ওই শিশুটিকে শোনানো [illegible] বোধ করি সেই কথা শুনিতে শুনিতেই রাহুল কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

সুনন্দার [illegible] শীলভদ্রের [illegible] হইল।

মহাঋষির তপোবনের গানের কাছে বসিয়া একদিন তিনি সারনাথের মৃগ [illegible] এ কি করিলেন ?

...ংস। তাহার কি কোনো অসুবিধা হইতেছে?

...কথা বলিতেছি না। কিন্তু তাহার পবিত্র ভিক্ষুণী-জীবনের সূচনাতেই কেন যে এমন ছেদ টানিয়া দিলেন, ...ঝিতে না পারিয়া মনে বড় ক্লেশ বোধ করিতেছি।

শুভদত্ত হাসিলেন। সেই হাসি, যে-হাসিতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়।

বালকের মোহ দূরিত ক...ংস। ওই শিশুটিই তাহার সিদ্ধিপথের চরম পাথেয়। সুনন্দার প্রণয়রসের ধারা উহারই মধ্যে বাৎসল্য রসের সহিত মিলিয়া পরমা নিবৃত্তির পথে ধাবিত হইবে,—যেখানে সকল রসের উৎস এবং যেখানে সকল রসের নির্বাণ, সেইখানে। একবার রাহুল, একবার সুনন্দা এবং একবার উহাদের উভয়ের দিকে চাহিয়া তাহা কি এখনও টের পাইতেছ না? আমি তো এইখান হইতেই সমস্ত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি।

শীলভদ্রের বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় উদ্ভাসিত নির্মল মুখের দিকে চাহিয়া মহাস্থবির শুভদত্ত আবার সেই বিদ্যুৎপ্রবাহী হাসি হাসিলেন।

কিন্তু তাহাতে শীলভদ্রের মনের কুয়াশা সম্পূর্ণরূপে কাটিল কি না ঠিক বোঝা গেল না।

সাবিত্রী

শ্রীমতী বকুলা দেবী

[সেসন কোর্টে বিচার বসেছে...ডাকাতির মামলা...জুরীরা মন দিয়ে শুনছেন...রবিবার বাড়ীতে ডাকাতি...লোক খুন...সেই বাড়ীর এক পুরানো পিস্তল পাওয়া গিয়েছে...এক তরুণ বাঙালীর কাছে...সরকারী উকিল অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন, সেই বাড়ীতে তরুণ অপরাধীর যাতায়াত ছিল...অতএব রীতিমত স্বদেশী ডাকাতি...সাক্ষী সাবুদ সব হয়ে গিয়েছে...আসামী দোষী...তার সামনে ফাঁসীর দড়িটা ঝুলছে...ক্রমশ এগিয়ে আসছে...কিন্তু হঠাৎ... ফাঁসির দড়ির মধ্যে এলো সেই বাড়ীরই এক তরুণী...কুমারী...কিন্তু আজ তার মাথায় সিঁদুর...

কি ব্যাপার?

আদালত উঠলো চমকে...

বিচারক নতুন করে লিখতে আরম্ভ করলেন রায়...

ইতিমধ্যে আপনারা, শুনে নিন্ মামলাটা—]

১৯৩০ সহরের সেসন কোর্টে একটা খুনী মামলার বিচার চলিতেছিল। মামলাটা শুধু খুনের নয়, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ছিল একটী বেশ বড় রকমের স্বদেশী ডাকাতি। যদিও ইহাই এটা অবশ্য ডাকাতির যুগ নয়, সে সব দিন এখন তার অতি-নিকট বর্ত্তমানতা হইতে একটুখানি দূর অতীতের দিকে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিতে গিয়াছে, তথাপি নাকি সরকারের বহু অনুসন্ধানের ও ওয়াকিবহালের ফলে দেশের পুলিস কর্ম্মচারীরা এই সব অতর্কিত মনুষ্যমূর্ত্তির মধ্যে একটা অতীত দিনের খুনের সম্পর্কের সূত্রপাতের সন্ধান পাইয়াছে। ঘটনাটা ঘটিয়াছিল ঐ দেশের ভিতরেই অবস্থিত নিমাইবাগের মহিষার বাড়ীতে, শিব-চতুর্দ্দশী বা তার পূর্ব্ব রাত্রে একদল ডাকাতের অকস্মাৎ পড়িয়া যাওয়াতে। ডাকাতরা নাকি বলে বেশ ভারিই ছিল এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। বাঙালী, কোলী, এমন কি দু'একজন সাহেব ছদ্মবেশ পরের পোষাকী পর্য্যন্ত ঢাকা-দেওয়া বিশেষ ভ্যাসনের পাগড়ীপরা দেশোয়ালীকেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তবে এই সামুলী ডাকাতিকে স্বদেশী ডাকাতি রূপে সনাক্ত করা হইল কেন? এর উত্তরে সরকার বাহাদুর যতগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধানতম ঐটি, কুড়ি উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম কথা এই যে, ডাকাতেরা বাড়ীর দরওয়ানদের পায়ের প্রতি কথা বলিবার

মন্ত্রের ভাষিতে ও ভাব বোঝা করিয়া দিয়া সবের কইতের যায়, উপভোগ অনায়াসে পৌঁছিলে সাধু "জয় মা কালী" না বলিয়া, "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল। এই "বন্দে মাতরম্" নিশ্চয় কখন কালেও দেশোদ্ধার ডাকাতদের ওয়াচ্চোর্ড বা বিজয়ধ্বনি ছিল না; আধুনিক কালে ধরিয়াই নাকি তাহা সন্ত্রাসবাদীর ই সব, তার সাক্ষী প্রমাণে দেখিতে, আজও বহু দেশ দেশান্তরে, ছেলে মেয়ে ও অর্ধ শিক্ষিতদিগের মেজেণ্ট, তাদের উপাসিত মা কালীর আত্ত ও তাহা মূর্তি ডাকাতে কালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। ডাকাতেরা তাঁদের ত্যাগ করিয়াছে, গ্রামের লোকে চাঁদা করিয়া কোথাও বা পূজা দেয়, কোথাও বা দেয় না; কিন্তু দেয়, খবর লইলে জানা যাইবে, প্রাচীন প্রথা মত "জয় মা কালী" বলিয়াই দেয়। "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চিৎকার করে না; ও প্রথা কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। আর বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কেনই বা তাহা থাকিবে। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি নিতান্তই আধুনিক, মধ্যে কোন প্রাচীন প্রথাই নয়। এই শব্দে যাঁহাকে বন্দনা করা হয় তিনি কালী নহেন, এমন কি দশমহাবিদ্যার অন্তর্বর্তিনী কেহই নহেন। তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, ভৈরবী, মাতঙ্গী তো নহেনই, ছিন্নমস্তাও নন। তা যে কেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বদেশী যুগে যে সব স্বদেশী গান গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের বন্দনীয়ার বহু প্রতিকৃতি দেওয়া আছে, কোনখানেই তাদের সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচিতাদের অবয়বসাদৃশ্য দেখা যায় না, আদৌ মিল খায় না। ঐ সব সঙ্গীতের কোন কোনটিতে দেবী যাহা বলা হইয়াছে:

"বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি,
এই অপরূপ রূপে বেথা দিলেন জননী।"

মহাবিদ্যাগণ বাংলা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণপত্র তাঁদের কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে নাই, তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ফিরিতেছেন, শুধু বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীনিবদ্ধা নহেন। এঁদের মধ্যের অন্যতমা ছিন্নমস্তা দেবীর বিখ্যাত মন্দির ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রামগড় প্রদেশের প্রান্তভাগে "রাজরপ্পা" নামক মহাপ্রপাতের সান্নিধ্যে দামোদর এবং ভেড়া নামক নদী-দ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। যদিও শত্রুস্তম্ভনের জন্য বগলামুখীর ও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ এবং দস্যু-তস্করের সাযুজ্য লাভের জন্য কালিকা দেবীর উদ্দেশ্যে পুষ্পোপাসনাদির বিধি বঙ্গদেশেও প্রবর্তিত ছিল এবং আছে, তথাপি এমন দর্পে কথা চলে না যে বাংলাই একমাত্র দেশ যেখানে এই তান্ত্রিক পূজা প্রচলিত আছে। আমি জোর করিয়া বলিতে চাই যে, "বন্দে মাতরম্" শব্দ যাহাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাঁরা কেহই বাংলার দেবী নহেন। ইহা বঙ্গদেশের লেখকের একচেটিয়া স্বত্ব সূত্রের জন্য নূতন সৃষ্টি। শোনা যায় পুলিশকমিশনার স্বয়ং লেখক তাঁর গ্রন্থে সর্ব্ব প্রথম ঐ মন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছিলেন। যাহারপীঠ প্রতিষ্ঠিত প্রত্নীভূত মহা-ভারতের পরিকল্পনা তিনিই তাঁর শিক্ষিত শিষ্যবর্গের উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করান, তিনিই বীজ বপন করিয়াছেন। ঐ "বন্দে মাতরম্" রূপ মহাবীজের পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক "অধিষ্ঠাত্রী দেবী" বাহির করিয়া ত্রিশ কোটির উপর লম্ফঝম্ফ করিয়া বসিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, যে সব ত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠিবাদে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিয়াছে, সেখানে একাধিক দেবী

[illegible] মনসা [illegible] সবাই যা পংক্তি-ভোজনে আসন-ও পাইয়াছেন, ইনিই বা [illegible] কিসে? "মোদার উপর খাঁড়ার ঘা" বিশেষ ভাষাক্রান্ত না করাই সম্ভব। [illegible] আপনারা অবশ্যই [illegible] জানিয়া রাখুন, কথা ও [illegible] এই 'বলে মাতরম্' শব্দটি শুধু বঙ্গ মাতাই [illegible] ইহা একটি শব্দভেদী বাণ! এই শব্দ মেধাবী ছাত্র স্কুল ছাড়িয়াছে, কলেজ ছাড়িয়াছে, লোক-সাহিত্যের [illegible] সর্বলম্পুলিত চাকুরী ছাড়িয়াছে, চাকরীজীবী চাকরীতে ইস্তফা দিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, [illegible] কারাবরণ করিয়াছে, বিপক্ষপক্ষ সমর্থনকারী ইণ্ডিয়ান ব্যারিষ্টার সভা [illegible] বাঁশ কি ছাড়িয়াছে, কোন বরফ বিধা স্বাধীন রাজা রাজা ছাড়িয়াছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না, এ ছাড়া আর কে আর কি ছাড়ে নাই! অতএব ঐ নূতন নারী-দেবতার পূজাপদ্ধতি নিশ্চিত জন-সাধারণের পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিমন্ত্র, এ মন্ত্রের সাধনে ইহলাভ ঘুরে থাক, অনভিষ্ট অনভিপ্রেত বিপদ-পাতই ঘটিয়া থাকে। এই দেবী-মূর্তি কোন বর্ণনোজ্জ্বল করেন বলিয়া ইহার মন্ত্রসাধনের কোনরূপ ফলশ্রুতি শোনা যায় না। বরং ঐ মন্ত্র পরলোকের পথে কণ্টকারোপণপূর্বক পরলোক-বিহারী [illegible] প্রাণ বাঙ্গালীকে তথা বাঙ্গালীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত ভারতবাসীকে পারলৌকিক দুষ্টি বিশ্লেষ করিয়া ইহলৌকিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। এই দুষ্টি বিপদের দেবী, বিপ্লবের অগ্রদূতী, আমরা দেখিতে পাই—

"ডান হাতে তাঁর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।"

কেমন করিয়া করিতে পারে? খড়্গ যা খাঁড়া যদিমানের হাতে, সে যার হাতে তিনি [illegible] রহিন না করিয়া হরণ করিবেন কিরূপে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, ঐ পূর্বকথিত ডাকাতদের ভিতর অধিকাংশেরই বাঙ্গালীত্ব, তথা বাঙ্গালী ছাত্র-সমাজের সঙ্গে হাব-ভাব সাজ-সজ্জার চৌ-গাপটে কিনা চেনিতে পাওয়া যায়। যে-ডাকাতটা উক্ত বিয়াল্লিশের জমিদারের ম্যানেজার পঞ্চপতি রায়ের বন্দুকের গুলিতে কি করে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে, সে ঐ কজন বাঙ্গালী। বেহারী, উড়িয়া, পেশোয়ারি এসব কিছুই সে নয়, খাঁটি বাঙ্গালী, এবং কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত যুবক অর্থাৎ আজকাল যারা নিজেদের নূতন নামকরণ করিয়াছে, তখন অবশ্য একদা সকলেই ছিল, আমাদের মত শুদ্রকেশ অধিকার বিনে ঐ নূতন প্রবীণদের পর্যায়ে যারা হইয়াছিল। কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, আপনাদের সম্মুখবর্তী খুনীর মামলা আসামীদের [illegible] ঐ ডাকাত ঐ ডাকাতটির সহিত সেদিনকার ওরুণ আপনাদের কাহারও কি কোনরূপ সাদৃশ্য আছে? আপনাদের মস্তকের পশ্চাৎভাগকে আপনারা কি ঐপ্রকারে 'ডিম' নামক বহুযোগে [illegible] সম্মুখভাগে [illegible] কেশ রক্ষা করিতেন? এবং সেই কেশরাশিকে বামদিকে ললাট হইতে পশ্চাতের দিকে সুচিক্কণভাবে টানিয়া পশ্চাতের দিকে সযত্নে প্রেরণ (যাহাকে ব্যাকব্রাশ করা বলে) করিতেন? অবশ্য উক্ত সেদিনের মত কেশভার না থাকায় এ কেশ সম্মুখ দিকে ফুঁকিয়া [illegible] পুনঃপ্রত্যাগত হইতেছিল নাই, হয় ত ফিরোজ কাপানের আঘাতের প্রভূতের [illegible] অবতীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা না চলিলে অধিকন্তু, তাহাও ইহারা নিজেদের এক [illegible] করিতে পারিতেন কি, না, ইহারা

অনায়াসেই পারে। শালরিফের মত ক্যাসানে ইহারা ধুতীকে লঙ্গীয়ারে পরিণত করিতে হয় না যে অঙ্গনাদের সাক্ষাতেই দর্শন করুন। হাঁটুর কলিতে মোজার মত একটী অলঙ্কার ইহারা ধারণ করিতে না পাইলে বাঁচে না, পুরো পুরুষে ফেন পাশাইয়া ঘড়ি পরিত। এখনকার নূতন যুগ তরুণেরা বাসা না পাইয়া পিতৃ-আত্মীয়-বন্ধু যাহার সম্মুখে করতলবদ্ধন ব্যাদিত করিয়াছে, তেমন সময়েও এই সকল আবশ্যক অটিবে ব্যবহারাদির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে নাই, আপনারা স্বচক্ষেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। যে উৎকট বে-পরোয়াভাব, 'কে কয় কড়ি ধারে' অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ঋণ যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা।
অর্থময়ী ভাগ্যদেবীর নয় কো তারা ক্রীতদাস।"

এই ভাবটীর আদত স্বাদেশিকতা। এদের গুরুদের ঐ অবিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতের জগাখিচুড়ি ঐ সর্বনেশে কবি "বন্দে মাতরম্" আমি ভুলের চরিতে পড়িয়াছি, তিনি জন্ এই মন্ত্রকে খাঁটী সংস্কৃতে লিখিয়া ইহাকে সার্বজনীন করিতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। "মাতর্বন্দামি সততং সর্বসৌখ্যপ্রদাং" ইত্যাদি কল্পনারই কর্ণগোচর হইয়াছিল? আজকাল টোল, টিকি ফ্যাসান বহির্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে যে জন্ম কালে পৌঁছিলেই বা "মাতর্বন্দামি বসুধাজলপূণাতীর্থাং" প্রভৃতির অর্থবোধ করিয়াছিল করজনে? কিন্তু এই বাংলা মন্ত্রে অল্পকাল মাত্র বিগত অতীতে একদিন গগন পবন মুখরিত হয় নাই কি? সাম্রাজ্যতরি টলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা? আমার বলিবার কথা এই যে, সেই দারুণ দুর্যোগকে বহু গবেষণা ও অনুপ্রেরণার ইদানিং কথঞ্চিৎ আয়ত্তাধীন করা হইয়া আপাততঃ দেশবাসীর ধনপ্রাণকে কিঞ্চিৎ মাত্রায় নিরাপদ করা হইয়াছে; এদিকে পশ্চিমাকাশ ভয়াল কাল মেঘাচ্ছন্ন, পূর্বাকাশেও মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক এমন সময়ে আবার ইতিহাসের পুনরাবর্তন আমরা কোন মতেই ঘটিতে দিতে পারি না। বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরোদ্গমেই সমূলে উৎপাটিত করা অত্যাবশ্যক। বিরামবাগের জমিদারপুত্রের ডাকাতেরা উচ্চনাদে "বন্দে মাতরম্" বলিয়াছে। বিরামবাগের ডাকাতদের মধ্যের মৃত দস্যুর কেশ পারিপাট্য ও বস্ত্র পরিধানের কায়দা ঠিক আমাদের সমুখস্থ কাঠগড়ার আসামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপেই এক, মায় হিপ্ বাণ্ড এবং পায়ের কাবুলী চপ্পল জোড়া পর্যন্ত। "স্বদেশী" এবং হাল-ডাকাত ব্যতীত তাহাদের আর কোন আখ্যা দেওয়া কোন মতেই চলিতে পারেনা।

[illegible] পক্ষের প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ উকিল এই মকর্দ্দমায় আসামীর বিরুদ্ধাচরণ করা হইতে ক্ষান্তবাক্ ভাষায় ও ভাবে বিচারাসনে উপবিষ্ট জজ এবং তাঁহার পার্শ্ববর্তী জুরি অষ্টজনকে বুঝাইয়া দিলেন, কেবল করিয়া ঐ রাত্রের ঘোর ডাকাতির অভিনয়ের মধ্যে বিরামবাগের জমিদার এমন প্রচণ্ডাগ্নিতে [illegible] কল হয় এই আসামীই তার প্রধান বন্দুকীয়ের চোরাই টোটার গুলিতে আহত হন, এই আসামীর সহিত তাঁহার কি সূত্রে কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল এবং এই আসামী কিরূপে কলিকাতায় তাঁহার বাসায় বসিয়া কোন্ কোন্ গোপন-বার্তা তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিল এবং সেই সকল কথা [illegible] কাহার কার্য্যে কর্ণগোচর হইয়াছে। তাহার [illegible] চাকর কবে তার

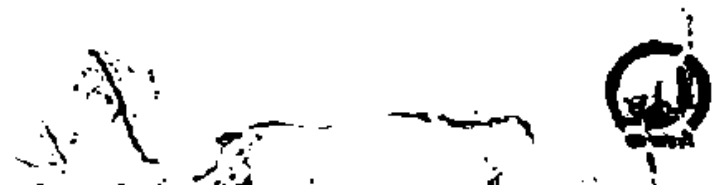

[illegible] কাবুলিওয়ালাকে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে দেখিয়াছিল। নিতান্ত কৈফিয়ৎ দিতে হইলে অনাবশ্যক বাহুল্যে বিরক্তিকর হইয়া উঠে বলিয়াই বোধকরি উক্ত ঘটনার কয়েকদিন মাত্র পূর্বে এই আসামীর প্রাণ সংহারকারী ছুরি খানাকে সে খাতাখানা, এমন বহু সম্পত্তি-বিক্রয় সম্পর্কে তাহার কলমিনী তাহার দীর্ঘ বক্ষপট ফুঁড়িয়া চলিয়াছিল কথা যায় না। কারণ কাঠগড়ার কাঠাসনে আসামী সহযোগে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তুলিতুল্য একজন শিক্ষিত সভ্য ভদ্র ব্যক্তির অপর একজন শিক্ষিত এবং বয়স হিসাবে মোহিয়ের যেমন যুবকের জীবনকে ফাঁসীর দড়িতে তার সমস্ত আশা আকাঙ্খা বিসর্জন দিয়া অকালে পতিত হইবার জন্য প্রাণপণ বাক্‌চাতুর্য্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় কৌশল মাত্র না করিয়া গভীর অভিনিবেশে বিবাদের সংযোগ করিয়া বহু চিন্তিত একটী অতীত কথা ভাবিতে ছিল।

বিরাজবাগের পূর্বপুরুষ জমিদার শশধর চক্রবর্তী তাঁর পুরাতন ও অতি বিশ্বস্ত কর্মচারীর কুটচক্রের ফলে যেদিন তাঁর সমস্ত জমিদারী সূর্য্যাস্ত নীলামের ফলে হারিয়ে পথের ফকির হইয়াছিলেন, সেদিন না হোক সেও প্রায় ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেকার কথা। কি উপায়ে কেমন করিয়া তাহার চির-আবর্ত্তিত চক্র ঘুরিয়া গেল, দলিলের বিষয় হাত ঘুরিয়া কৃত্যেশ হইল, সে সব কথার সঠিক খবর মেলে না। অনেকে অনেক রকমই বলিয়া থাকে, আর এরকম কাণ্ড এই একটি অথবা প্রথম নয়। যতদিন সূর্য্যাস্ত আইনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, বহু বারই এ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে, লোভকে উদ্রেক করিবার যে সমস্ত সহজ পথ আছে, এইটি তাদের অন্যতম।

শশধর অত্যুচ্চ স্থলভূমি হইতে একেবারে গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া নিজের দেশে আর বাস করেননাই। ছোট বড় দেনার দায়ে দেশের গায়ের অলঙ্কারপত্র ও জমিদার-প্রাসাদ সমস্তই বিক্রি করিয়া অবশ্য হইলেও তিনি অপ্রবাসী হইবার আগ্রহ না রাখিয়াই পত্নী-পুত্র-কন্যাদের লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। তারপরের অনেক কথাই অস্পষ্ট, শুধু স্পষ্ট করিয়া বন্দী যুবা আসামীর মনে পড়িল, তার শৈশবের সুখময় শান্তিময় চিত্রগুলি উজ্জ্বল সমুজ্জ্বল হইয়া আজও সেগুলি তার মনের ধারায় সাজানো রহিয়াছে।

বালি উত্তরপাড়ার এক প্রান্তে একটি দোতলা ছোট বাড়ীতে মা বাবা ও একটি মাত্র বড় বোনের সঙ্গে সে বাস করিত। দিদি তার চাইতে মাত্র দুটি বৎসরের বড়, তথাপি জ্যেষ্ঠত্বের গরিমা সে ভাবে যার সঙ্গেই স্নেহ-শাসনে ছোট ভাইটির সম্পূর্ণ অধিকার দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দিদি তার একান্তরূপে দিদিই ছিল। একত্র শয়ন, ভোজন, পঠন, ক্রীড়ন, কেহ কাহাকেও যেন চোখের আড়াল করিতে প্রস্তুত নয়। তার বাবা গিরিজা চক্রবর্তী ঠিক উচ্চ শিক্ষিত যাহাকে বলে তাহা ছিলেন না, আই-এ পাশ কিংবা ফেল, শুনিয়াও নয়, সে সঠিক জানে না, সামান্য একটি সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরি চাকরী করিয়া কোনমতে সংসার প্রতিপালন করিতেন। মা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, গুণও ছিল তাঁর যথেষ্ট, ক্ষুদ্র অভাবগ্রস্ত সংসারে তাঁকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি

াছে হাসিমুখে বসিয়া খাওয়াইতেন, ছেলে-মেয়ের প্রতিও কোনদিন [illegible] রাগিতে পড়ে না। ঘর-সংসারের কর্তব্য সম্বন্ধে কোনদিন তাঁর কখন সময়ান্তর ঘটে না। রান্নাঘরে কাজ-কর্মের মধ্যেই তাদের লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। মায়ের পড়াশুনা কাছে শিখিয়াই তারা দুই ভাই বোনে একসঙ্গে একই ক্লাসে একেবারে [illegible] ভর্তি হইয়াছে। অঙ্কে আটকা না পড়িলে আরও কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর [illegible] মেয়ের জামা-সেমিজটা যে অত কেন বুনিতেন, অনেক পরেই সে জানিয়াছিল, সেলাই [illegible] সাহায্যে তিনি বিক্রি করিয়া কিছু কিছু আয় বাড়াইতেন। একটি মেশিনের [illegible] তাহারই সাহায্যে ফ্রক ব্লাউজ সেলাই করিয়াও দু'পয়সা আমদানী [illegible] এমন [illegible] নারী-চরিত্র সংসারে অল্পই দেখা যায়। এই রকমই ছিলেন তাঁর মা। তাহার জ্ঞানের উষর হওয়া পর্যন্ত সন্তান দুটিকে নীতি শিক্ষা দেওয়া, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভীরু প্রধানতম কার্য ছিল। লোকের কাছে হাতপাতা দুঃখের কথা বাপের কাছে [illegible] আদায় করিতে পারা যায়, এ বিশ্বাসই তাদের জন্মিতে পারে নাই। শুধু একটি [illegible] ফিরিয়া আসিয়া বাপের সাক্ষাতে মাকে বলিয়াছিল, "ঐ রকম একটি সাড়ী পরতে [illegible] মুখখানা কি এক রকম হইয়া গিয়াছিল, আর মা দিদিকে কাছে টানিয়া [illegible] কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ছিঃ মা, পরের দেখে এই রকম করতে নেই।"

[illegible] প্রশংসা পর্যন্ত কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দিদি ও তার সুন্দরী [illegible] তার বিবাহ হইয়া গেল। বর একটু বয়স্ক, ভাল চাকরী করে, কলিকাতাতে [illegible] মাত্র পনের বৎসর বয়সে তার দিদি সলিলা তাঁর ঘর করিতে চলিয়া গেল। চিঠি [illegible] আসে, ভাই-ফোঁটার প্রতি বৎসর ভাইয়ের জন্য উপঢৌকন প্রতি বৎসরই আসে, [illegible] হয় না। দেখা এই দীর্ঘ দিনে মাত্র একটি বারের জন্য ঘটিয়াছিল। কাশীবাসিনী [illegible] দুজনেই আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভাইয়ের সঙ্গে এবং শ্রাদ্ধ শেষ হইলে ফেরার [illegible] মেয়েকে দেখাইতে এবং দেখিতে আসিয়াছিল। সুখে ও সৌভাগ্যে দিদিকে কি সুন্দর [illegible] মেয়েরাও খুব সুখী হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর পোষাকেআলোয় সুসজ্জিত হইয়া [illegible] করিয়া যায় দুচোখ দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিতে লাগিল। খুবই [illegible] সাংসারিক, দেখাইয়া একটু আনন্দ দান করিতে পারিলেন না। গভীর দুঃখের মধ্যেও এই অসীম [illegible] করিয়াছিল। আমার আই, এস-সি, পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর আমাকে

...ের বড়দিদি তার দিদিমার কি নামই পাইয়াছিল! প্রথমে হাসি তামাসার ইয়া তারপরে দিদির বড় বেশী ভিজে বেড়িয়া আসল কথাটা তাকে ভাসিয়ে দইল, বলিল, "না দিদি, তা না, তিন দিনে আমি নোব না। মানুষের প্রথম থেকে স্বাবলম্বী হ'বার চেষ্টা করা উচিত। পরের দিতে অভ্যস্ত হলে নিজের উপর নির্ভর করার জোর থাকে না।"

দিদি রাগিয়া বলিল, "আবার তোর পর? দেখ মা, তোমার আদুরে ছেলে কি বলছে।"

মা এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া জামাইএর জন্য ফলাপাতার সাহায্যে নিজের হাতে পাক-করা লুচি গড়িতে ছিলেন, শান্ত উদাসীনতার সহিত উত্তর দিলেন, "ভাল কথাই ত বলেছে। নিজের কষ্টে পরের উপর জোর খাটানো কি ভাল?"

দিদির বোধকরি সেই ছোটাই সাড়ী পরিবার কথিক ইচ্ছা প্রকাশের পরিবারটা বন্ধ পড়িয়া গেল। ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়াছে বেশী খুসী গেল। তথাপি ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মা, তোমার জামাই এখনই হাজার টাকা করে মাইনে পাচ্ছেন, আর ও এতটা কষ্ট কর্ব্বে? আমি তাতে শান্তি পাবো?"

মা কহিলেন, "এই মনে করে, মনকে শান্ত করো তোমার ভাই বিরামবাগের স্বনামধন্য জমিদার শশধর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। উঁহারা বরাবর হাত উপুড় করে এসেছেন চিৎ কখনও করেন নি। ওর শরীরে সেই রক্তই বইছে।"

আমাদের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বাবার মৃত্যুর পর সে যার মুখে শুনিয়াছিল, সম্প্রতি মণিমাও সে কথা শুনিয়াছে সে ক্ষুব্ধিত ও কুণ্ঠিত ভাবে নীরব হইল, কিন্তু মন হইতে হয় ত ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। ইহার পর তাহার স্বামী তাহাকে ডাকিয়া খুব স্নেহের সহিত এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, "তোমার আজ মর্য্যাদা জ্ঞান দেখে খুব খুসী হয়েছি অপর্ণা, আমি জানি তুমি উঠ্‌বে, নিশ্চয় উঠ্‌বে।"

তাহার পরমপ্রার্থনীয় ওষ্ঠাধরের একটী পাশে একফোঁটা হাস্যাভাস মুহূর্ত্তের জন্য চকিত হইয়াই স্থির প্রশান্ত মুখভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি যখন জানিবেন—

ছেলেরা ছুকটার টিউশনি, বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়া পড়া, তা সত্ত্বেও সে বি, এস্-সিতে সসম্মানে হইয়া মেডেল ও স্কলারশিপ লাভ করিল। এর পর তাকে এম্, এস্-সি পড়িতে ও'ল' কলেজে যোগদান করিতে দেখিয়া তার স্বামীর সর্ব্বাভিলাষী জননী দেবী মনস্থাপে ধারা করিলেন। শিহরাগ্র হইয়া সে শোকাকুল হইয়াছিল, পাঁচে [illegible] হইল।

মণিমা অন্তর হইতে সমীর স্বভাবে আসিতে পারিল না। তার জামাইবাবু বহু সাধনা ও উপরোধ দিয়া তাহাই সঙ্গে মাতৃশ্রাদ্ধের লৌকিকতার নামে দুইশত টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আজকালে এ দিদির বিবাহ কালে

বন্ধুর সেজদা বাড়ী নাই বলিয়া বিপুলভাবে সে তাদের মহাজনকে ধরিয়া দিয়া কলিকাতার মেসে [illegible] করিল। [illegible]কে এসব কিছুই জানিতে দিল না।

এফ্. এস্-সি পরীক্ষার ফল খুব ভাল হয় নাই, কিন্তু প্রথম বিভাগেই সে স্থান লাভ করিল। [illegible] তে বছর মাত্র আইনের শেষ পরীক্ষার বাকি, এমন সময় সে তার ল'কলেজের বন্ধু অরুণ রায়ের [illegible] তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় গৃহে একটু মোটা মাহিনায় প্রাইভেট টিউটার হইয়া প্রবেশ করিল।

অরুণের সঙ্গে যদি তার পরিচয় না হইত! বিজ্ঞানের ছাত্র সে, অনর্থক কিসের খেয়ালে কোন দুই গ্রহের দুরু-আকর্ষণে আইন পড়িবার মত দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়াছিল, ভগবানই জানেন। না থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাকে এমন ধামখেয়ালিপনা করিতে দিতেন না।

অরুণ সত্য করিয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তার [illegible] নির্মল স্নেহবিভা ও [illegible] নিষ্পত্তর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে, এই কথা সে বারবার করিয়াই বলিয়াছে। [illegible] স্থলে নানা অছিলায় তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সে সেকার্য্যে বিরত হইতে পারে নাই। অবশেষে তার পিসেমশাইএর বাড়ীতে এই পঞ্চাশ টাকা বেতনের মাষ্টারীটা জোগাড় করিয়া দিয়া যেন কতকটা দায় ছাড়িয়া সে বাঁচিল। সকালে ল' কলেজ, দুপুরে ইউনিভারসিটি ঘুরিয়া দু-দুটো কম টাকার টিউসনি করিতে করিতে তখন যে শুধু দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, সে কথা অরুণ না বলিলেও নিজেও সে জানিত, গ্রাহ্য করিবার অবসর বা সুযোগ ছিল না।

কিন্তু অরুণের এই ভালবাসা তার পক্ষে রাহুর প্রেমের মতই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল! তার জীবনকে সে পূর্ণগ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিছুদিন খুবই নাচিতে কাটিয়াছে। দিদি চলিয়া যাইবার পর হইতে সেদিনটি যে জীবন তার কাটিয়াছিল, তার সঙ্গে যেন তুলনাই হয় না। বিকালে সে অরুণের পিসতুতো দুই ভাইকে পড়াইতে [illegible] একটাকেই পড়াইবার কথা, সময়ের হিসাব না রাখিয়া সে প্রয়োজনমত কোন কোন দিন তিন [illegible] তাদের সঙ্গে খাটিয়া চলিয়াছে। বাড়ীর ছিলেন হইতে [illegible] জলখাবার আসিত, মধ্যে মধ্যে [illegible] নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন পরেই বাড়ীর মেয়েরাও তার সাক্ষাতে বাহির হইতে কথা [illegible] তাহিলেন। সে যেন তাঁদের ঘরের লোক হইয়া গেল। বাড়ীর ছোট বড় ছেলেমেয়ে ছাড়া [illegible] আর একজন তরুণী। সেই বি. এ. ক্লাসের ছাত্রীটির নাম অনিমা। সে অরুণের পিসিমার [illegible] কলেজে পড়ার জন্য কলিকাতায় ওঁর বাড়ীতে বাস করিতেছে। তাদের বাড়ী [illegible] কোথায় সেকথা সে কোনদিন জানিতে চেষ্টাও করে নাই। এমন অযাচক [illegible] ছিল না। দেখিতে দেখিতে এই অনিমাও অরুণের সহযোগে [illegible] হইয়া [illegible] হাস-উৎসবে সে [illegible]

[illegible] লইয়াছে। অরুণকে ছিন্না এড়াই করিল, তখন যদি তাহাকে একঘণ্টা পড়ায় এবং [illegible] টাকা পারিশ্রমিক বরুণ ধার্য করে তবে তার পক্ষে খুবই সুবিধা হয়। অন্য মাষ্টার রাখার [illegible] ছাড়া নাই। সে অরুণকে এবং পরিশেষে অজিতাকেও বলিয়াছিল, তার সময় অল্প থাকে, ছেলেরা [illegible] নয়, একসঙ্গে পড়ান খুবই চলে এবং এক আধ ঘণ্টা সময় অজিতার জন্য খরচ করিলে সে মারা যাইবে না। [illegible] নির্বন্ধসহকারে তাহাকে পড়ানোর পারিশ্রমিক ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিছুতেই [illegible] করিতে না পারিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "তোমার যেন মোষের গোঁ, না বললে আর চলবে না।" সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "নেহাত মোষকা না বলে 'হাতিকা দাঁত' বলতে পার। অরুণ তার পিঠে সজোরে একটা চড় মারিয়া সস্নেহে বলিয়াছিল, "ওই একরোকামীতে তোমায় হয় আকাশে তুলবে না হয় পাতালে ফেলে দেবে। একটা জিনিষ কিন্তু ভাল নয়।"

"সেটা দর্প, দুর্যোধন রাবণ তারাও অতি দর্পে হত হয়েছিল সে ঠিক। আমার মত গরীব কেরাণীর কিসের দর্প থাকবে ভাই? এ শুধু আত্মরক্ষার একটা মাত্র পথ। নইলে ভিক্ষায় বা করুণায় দেহ এতদিনে পুষ্ট হয়ে আত্মমর্য্যাদাটুকুকেও হজম করে ফেলতো। যাঁরা এত যত্ন করছেন, মেয়েদের বিয়ে ভাইফোঁটা দেওয়া কেন, না হয় এমনিই আশির্বাদী দিবেন, আমার পক্ষ থেকে আমি থাকবো সর্ব্ববিষয়েই তাঁদের বেতনভুক ভৃত্য?"

অরুণ হয়ত তার মনোভাবটা অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু অজিতা হয়ত ঠিক বোঝে নাই, মুখ খানি ম্লান করিয়া নিঃশব্দ পদে ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল, সে তার আগমন কি জানি কেমন করিয়াই বুঝিয়াছিল, হাসিমুখেই ফিরিয়াছিল, "আসুন, সেক্সপিয়ারের দিন ছিল না আর।" অজিতা শান্ত অথচ [illegible] কণ্ঠে বলে, সে আর থেকে থাকলে কি হবে, আপনি ত আমায় পড়াবেন না বলেই দিয়েছেন।"

"বলে দিয়েছি? ওটা ত ভারি মিথ্যুক! বলেছি আমি আপনার ভৃত্য হতে পারবো না, গুরু হবো; এটাকি এত অন্যায় দাবী?"

এ কথায় অজিতার সেই সাদা গোলাপের মত শুভ্র মুখ রক্তাম্বরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে এক মুহূর্ত্তের জন্য নতদৃষ্টি তুলিতেই তার ঘন কালো তারার ভিতর কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব হৃদয়বত্তকে সে সেই মুহূর্ত্তে অতি সুন্দর পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পাইয়াছিল। একটুক্ষণ পরেই সে যখন কথা কহিল, তার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট হইলেও কম্পিত হইতেছিল, যেন বোঝা গেল, সে কহিল, সুস্পষ্টভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াই বলিল, "যদি গুরুদক্ষিণা নিতে এরপরও জোর আপত্তি না দেখান, তা হলে আপনার দুয়ার দান নিয়ে আপনার শিষ্যা হতে আমার আপত্তি নেই।"

"গুরুদক্ষিণা নিতে আমার আপত্তি, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে! বলছেন কি আপনি?"—"কেন ব্রাহ্মণকে

ছাড়ছি নাকি? তা হবে, সে হয় ত খুব অতীতের কথা নয়, আমি এখন সেই প্রাচীন ইতিহাসের কথা ভাবছি, সেই ভাগীরথি, উদালক, শ্বেতকেতু……আর এমন অনেকেই ছিলেন, তাঁরা যে-ভাষায় কথা-বিনিময় গ্রহণ করেছেন।"

এবার অজিতার পাণ্ডীর্যে মুখোশবিনির্মিত মুখোশটি হাস্যভাবে উদ্ভাসিত হইল, মুহূর্তের মধ্যে হৌতুকিনী চকিত হইয়া উঠিল যেন, বলিল, "ঠাট্টা গল্প চরিয়ে, আর, বাড়িয়ে উপন্যাস করিয়ে, সেক্সপীয়র-টেনিসন পড়িয়ে নয়! আপনিও ত হলে আজ থেকে আপনার বাঁধুনী ছাড়িয়ে দিন—চাকরটাকে দিন জবাব।"

সে সম্পূর্ণ উদাসীনের ভাব দেখাইবার প্রচেষ্টা করিয়া বাধা দিল, "সেজন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন না, সে সব কাজ আমার সারা হয়েই আছে। আজ বরঞ্চ একটু পড়ে নিন, বিদ্যা যদিও ব্রহ্মবিদ্যা নয়, তথাপি রাজবিদ্যা বটে, হয় ত তার বিনিময়ে ভবিষ্যতে কখনো আপনাকে ভবিষ্যতে ফরমায়েস দিয়ে বসি, সে তখন দেখা যাবে।"

অজিতা মুচকি হাসিয়া "শ্রবণ-কুণ্ডল পরার শ্রবণ কুণ্ডল আগে—" তারপর আর শোনা গেল না, কি মন্ত্রে সে অন্তর্ধান করিল।

সেই মুহূর্তেই সে বুঝিয়াছিল, তার সমস্ত পৃথিবীর সৌরকান্তি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, বিষাদ বিরস জীবন অকস্মাৎ গতির হাওয়ায় সরস মুখরিত হইয়া উঠিল।

অরুণ-অতনু দুজনকারই আইনের শেষ পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। একদিন তার মেসের বাসায় আসিয়া অরুণ বলিল, কালই বিরামবাগ যাচ্ছি তুমিও চলো না, বেশ-কদিন ঘুরে হবে, একঘেয়ে কলকাত্তিয়া হয়ে গেছ, চলো একটু গ্রাম্যজীবন উপভোগ করবে চলো।"

"বিরামবাগ! সেখানে কি?"—"বাঃ তুমি জানো না কি! বিরামবাগেই ত আমার বাড়ী।" ঈষৎ অপত্তি বোধ করিতে করিতে সে বলিয়া বসিল, "কই তুমি ত কখন বলো নি।"—"বলি নি! হবে, কখন তুমি জানতে চাও নি, আশ্চর্য হচ্ছো যে, তুমি কি বিরামবাগ চেন?" তার অস্বস্তি বোধটা বাড়িতে লাগিল, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি, না, হ্যাঁ নাম শুনেছি, দেখি নি কখনও।"

"নাম শুনেছ? আশ্চর্য! বিরামবাগে ত তাজমহল নেই, তাজমহল হোটেলও নেই, পোনবার উপযোগীও কিছু সামান্য একটা গ্রাম বলেই হয়, থাকার মধ্যে দেড়শো বছরের পুরণো জমিদার বাড়ী এইটুকুই ত আমাদের গর্ব, অবশ্য সম্প্রতি আমরা ডাক্তারখানা বসিয়ে, লাইট ও টিউবওয়েল-ট্যাপ পাইপের ব্যবস্থা করে তাকে কিঞ্চিৎ কলকাত্তা বানিয়ে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি করি নি।"

অরুণ গভীর উত্তেজনায় প্রায়-রুদ্ধশ্বাস তাদের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিল, তার বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "ঠাকুরদাদা, কেন?"

"কেন? জিজ্ঞেস করছো কেন? কেন তুমি আমায় তোমার পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে অরুণ? কেন আমি আমার জানতে দাও নি যে তুমি বিশ্বাসঘাতক প্রভু-প্রাণ-হন্তা বরুণ রায়ের বংশধর! উঃ যার আমার বৈকুণ্ঠ পিতামহ সর্বহারা হয়ে লজ্জায় ঘৃণায় দেশত্যাগী দরিদ্র ভিক্ষুক হয়ে অকালে প্রাণ হারালেন, আমার বাপ অসময়ে লেখাপড়া শেষ করতে বাধ্য হয়ে নিতান্ত নিশ্চীহিত জীবন দুঃখবরণেই যাদের করেছেন, তুমি সেই পিতামহের পৌত্র, তারই রক্ত তোমার শরীরে বইছে, আর আমি তোমাদেরই অন্নে বিষ আমার পুষে থাকার!"

"তখন, এসব কি তুমি বলছো? আমি জানি আমার ঠাকুরদা তাঁর পূর্ব প্রভুর সম্পত্তি তাঁর পতনের পর কিনে নিয়েছিলেন, সেটা কি খুবই একটা অপরাধ! তিনি না নিলে আর একজন নিত।"

সে বলিয়াছিল, "অপরাধের মাত্রাজ্ঞান তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ আশা করবো না। খাজনার টাকা হাতে নিয়ে যেদিন যে কর্মচারী ষড়যন্ত্র করে অন্যকে দিয়ে টাকা লুট হয়েছে বলে সেই টাকাতেই নিজের নামে জমিদারী জলের দরে নীলেমে ডেকে নেন এবং পরে মহাজনদের উপর দিয়ে সুদের সুদের বাকী সর্বস্ব, মায় বসত বাড়ী শুদ্ধ নিজে কিনে নিয়ে প্রভুর সিংহাসনে রাজা হতে বসে, তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু বলবার মতন ভাষা আমার অভিধানে লেখা নেই। যাক অতি বিশ্বাস করে পরের হাতের তলায় গলা বাড়িয়ে দিলে ঐরকমই হয়, তবে দয়া করে এঁদের কলে দিও আমি আর ওখানে পড়াতে যাবো না।"

অরুণের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তেজিত ভাবে সে অনেক কিছুই বলিয়াছিল, কি কি হয়তো সে সব মনে রাখিবারও দরকার নয় এবং সে সব যুক্তির সারবত্তা কিছুই নাই, যাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রবৃত্তি আসিয়া উঠে। নিম পক্ষের দোকানদারের মত মামুলী ভাবে অপমানিত ভুরুটা কি যে রকম মন্দ হয়ে ভাই। পরিশেষে অরুণ বলিল, "তিন পুরুষ যাবে বর্বর জাতির মত প্রতিহিংসার বিষবাষ্প পুষে বেড়াবো, তুমি না শিক্ষিত লোক!"

মনে আছে এই কথা বলিয়া সে জবাব দিয়াছিল, "পিতৃ-পিতামহের নির্যাতনকারীর বংশের রক্ত দিয়ে তাঁদের তর্পণ করে যারা আমি বলবো, সত্যকার শিক্ষা তারাই পেয়েছে। পিতৃপুরুষের রক্তের দোষগুণ যে বয়ে বেড়াচ্ছে সে নিজেকে শিক্ষিত বলবার কোন অধিকারই তার নেই।"

রাগে রাঙা হইয়া অরুণ তার হাতের মুঠি সজোরে করিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "তোমাকেও আমি এ কথা ফিরিয়ে বলতে পারি যদি হাতে একটা রিভলবার থাকতো!" তার কথা হাসিয়া-ঘর বাসিয়া গেল। তার বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ হাসিয়া সে বলিয়াছিল, "ঠিক ঐ কথাটাই একমনে আমারও মনে হচ্ছে, তবে যাও অরুণ এরপর আর আমাদের দেখা কখন হবে দেখাদেখি হয় না।"

ঘরের বাহিরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর যে কয়জনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা সাক্ষী দিয়াছে) বলিয়াছে ওপর 'শোণিত তর্পণের কথা' বলিয়াছিল। তার শেষ কথাটাও বলিতে ইতস্ততঃ করে নাই, এবে পূর্বের পীড়ন

বরং একটু বেশী বলা চলে ত কম করা চলে না! অবশ্য তপনকে ছেলের সকলেই ভালবাসিত কিন্তু [illegible] ও বিশেষ পক্ষের কৌতূহলীদের জেরার কাছে তার দফা আছে। অরুণ এই কয়দিনে কি [illegible] সে একবারও তার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত কথাই বলিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনি সোজা সামনে চাহিয়াই চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে, জেরায় বলিয়াছে, তপন তার শিক্ষয়িত্রী ছিল। সে বিষয়ে অবশ্য নিঃসন্দিগ্ধ নয়, তবে ডাকাতের দলের সঙ্গে তপনের মত ভদ্র উচ্চ শিক্ষিতের সম্পর্ক সে কল্পনা করিতে পারে না। তিন বৎসর সে তপনকে দেখিতেছে, অন্তত এক বৎসর যাবৎ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছিল। এ ত্রিসীমানা তার কাছে রহস্যের নডই বোধ হইয়াছে। মনে হয় অরুণ তাহাকে ফাঁসিতে লটকাইবার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত নয়। আশ্চর্য, বরুণ রায়ের পৌত্র অথচ সে!

তার মনে পড়িল অরুণের সঙ্গে বিবাদ ঘটার পর এবং তারপর তিন অভিভাবক নিকট হইতে দুইখানা পত্রে ছাড়া তার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য অনুরোধ এমন কি অনুনয় জানানো হইয়াছিল, সে যায় নাই। তৃতীয় বারে সে গভীর কৌতূহলে গোপনে বিরাদবাগের জমিদার বাড়ীটা বারেকের মত আড়াল হইতে দেখিয়া আসিবার কি জানি কাহার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। আর কাহার? নিয়তির। সেখানে অরুণের চাকরের [illegible] বাড়ীর পিছন দিকের রাস্তায় সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুরিবার সময় হঠাৎ দেখা হয়। চিনিতে পারিয়া সে সাগ্রহে চেঁচাইয়া ওঠে, "মাষ্টারবাবু না? আইসেন, আইসেন, এখাকে কুথায় বাপটি মাইরা রুইছেন, বাড়ী থেক আইসেন।"

কত কষ্টেই যে তার হাত ছাড়াইয়াছিল, কাহাকে না বলিবার জন্য দুইটাকা, তার অবশিষ্ট সম্বলের আট টাকার মধ্যে দুইটাকা, খুব গাওয়াইয়াছিল, তখন কি স্বপ্নেও জানিত নিজেরই ফাঁসির দড়িতে সে স্বহস্তে ফাঁসি লাগাইতেছে।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের বাড়ীর নিরাড়ম্বর রান্না খাওয়া সমাপ্ত, নিজের ঘরের বিছানায় পড়িয়া সে কত কি ভাবিতেছিল, অরুণের প্রতি নিজের ব্যবহারটা সঙ্গত হইয়াছে না অসঙ্গত এই ভাবনাটাই তার মধ্যে প্রধান। এমন সময় তেতালার ঘর খুলিয়া কেহ গৃহ প্রবেশ করিল, ঘরে আলো ছিল না, হারিকেন লণ্ঠন নিবাইয়া শুইয়াছে। পড়াশোনার ইচ্ছা ছিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

যে আসিয়াছিল, আন্দাজে অগ্রসর হইয়া টর্চ জ্বালিল, অতি বিস্ময়ে তপন বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিল, "অজিতা!"

উত্তর হইল, "চুপ।" তারপরই বলিল, "পাগলী মেয়ে অতটার পরে ঘুম মোটা করে এত অসুখ, তবু [illegible]"

কি [illegible] তপন বলিল, এই চিনিবার জন্য এই কয়দিনেই তার কাছেই উহিম হইয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য আত্মসংযম পূর্বক কহিল, "এর মানে?"

"মানে অতি সোজা, তাকাতাকি করে সাড়া পেলুম না, আমি বাড়ী ঘরে কম দড়িগাছা ছিল দেখেছি, আপনি আমাকে পড়াতে রাজী হন।"

তার অভিভূত ভাবেই সে উত্তর দিয়াছিল, "না।" অজিতা বলিয়াছিল, "বেশ তাই পড়ানোর জন্য এক বছরের ফাঁকি পুষিয়ে নেবার মত আমার জন্য এই দড়িগাছা নিয়েই আমি এসেছি।"

ভূপেন চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "কি বলছেন? ছি ছি, আপনি—"

অজিতা আরও কাছে আসিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আমার দিক থেকে 'ছিছি'র কিছুই নেই, আমি বরঞ্চ তাদের কেউ হই না এবং কেউ হবো না বলেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ঈশ্বর বংশের বিখ্যাতকীর্তিদের আমি জানি, আমার মা পঞ্চধর চক্রবর্তীর উকিল মন্মথ ঘোষালের মেয়ে। এঁদের কাছ আমার কিছু কিছু জানা ছিল, তারপর অন্নদার কাছে বাকিটাও জানলুম। আমার বাবা অল্পের মধ্যে আমার বিয়ে স্থির করেছেন, প্রথম কাজেই বিয়ে হওয়া দিন স্থির হয়েছে, মাঝে তিন পনের রাত বাকি আছে। আমি ওকে বিয়ে করবো না, কিছুতেই করবো না, অথচ আমার বাবা কিছুতেই আমার আপত্তি শুনতে রাজী নন।"

ভূপেনের প্রথম বিস্ময়ের ঘোর না কাটিয়া তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, সে অজিতার মুখের উপর বোকার মত ড্যাল ড্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তেমনই ভাবে উচ্চারণ করিল, "তা, আমি কি করতে পারি?"

অজিতা ঈষৎ রাগতভাবে টর্চের আলোটা তার মুখের উপর পূর্ণভাবে ফেলিয়া ধরিল অসহিষ্ণুভাবে চকিত হইয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল, "এরপরেও আবার পুরুষমানুষকে আরও স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে আমি আপনাকে স্বামীরূপে পেতে চাই, যদি আপনি আমায় বিয়ে না করেন, এই এমনি করে মরবে —কেউ রাখতে পারবে না।"

— এই যেমন কাকাবাবুর পিস্তল চুরি করেছি এবং তা তলাই আছে। ভয় নেই, আপনাকে কিছুতে জড়াবো ওঁর বাড়িতে; ফিরে গিয়েই মরবো।" এই বলিয়া অজিতা সত্যসত্যই তার গায়ে পরা পুরুষের লম্বা ওভার কোটের পকেট হইতে ছোট এবং সুন্দর গঠনের একটা পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল।

তখন পরাজিত নিরাশ ফেলিয়া উঠিয়া আসিল, আবেগভরে পিস্তলসুদ্ধ হাত ধরিয়া বলিল, "অস্ত্রটা নিরাধারে আমার কাছে সমর্পণ করো, আমি রাজী আছি। আমার মোহন চিত্তের বিকার থেকে সত্যই তোমায় আকর্ষণ করে থাকে, আশা করি তুমি আমায় অবিশ্বাস করো না।"

"করবো না।" বলিয়া অজিতা পিস্তলটা তার হাতে নিশ্চিন্তচিত্তে ছাড়িয়া দিল।

অজিতা চলিয়া যাইবার পর যখন তার পাশের ঘরের বাসিন্দা অমর আসিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "এরমধ্যে একটা কাণ্ডকারখানা হোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে? তার কাছে টাকা ধার করে রয়েছ বুঝি? তবে তোমার হয়েছে।"

ভূপেনের নেশা খাওয়ার বিহ্বলতা তখনও ঠিক না কাটিলেও সে তাই ফিকে ঈষৎ হাস্য করিয়া জবাব দিয়াছিল, "উঁহুঁ, ও কিছু চেয়েছিল।"

অমর ভুরু চিটকাইয়া মন্তব্য করিল, "বাপে কথা।"

চুরি-কাহিনী কাহিনী সত্যের বিরুদ্ধে একটা বড় প্রমাণ এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক প্রমাণ সাহেবের বাড়ীর হারানো পিস্তল তার গৃহ শিক্ষকের ঘরে পাওয়া যাওয়া। এর পরে ফাঁসি যাওয়ার কথা না ভাবিয়া আইনের দিক দিয়া ভালভাবে দেখা যাবের কথা ও ওর কাছে নেওয়া ভগবানের ন্যায় বিচারের কথা ভাবে বিশ্বাসের এই আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে ফাঁসির দড়িকে আমল তার অন্তরের ভিতরও স্থান পায় নাই। আজ এখন কান ছুঁচি মাথার চতুর্দিক আর কতটুকুই বা বাকী। ওরা এইবার উঠি উঠি করিতেছে বেশ বোঝা যায়।

আসামী পক্ষের উকিল প্রথম হতেই এক রকম হালছাড়া ভাবেই আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টার কোন জোর ছিল না। ফলাফল তাঁর জানাই ছিল। হরিপদ কে কি জিজ্ঞাসা তিনি করিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে কিছু উৎসাহিত ভাবে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন, কি বলিলেন, পরিষ্কার উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ত, তখন সে সব কথায় কাণ দেয় নাই, অজিতার মাসিমার বাড়ী শিবচতুর্দশীর পূর্ব্ব রাত্রে মাঘ মাসের শেষে তার হাতের উপর অজিতার হাতের তপ্ত স্পর্শের এবং গভীর আবেগে সংশয় আশঙ্কায় সম্মিলিত তার অপ্রত্যাশিত আদরের উল্লাস উচ্ছ্বসিত কম্পিত হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের স্মৃতিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই তিন রাত্রি মেসের বাসায় ছিল না, এ সাক্ষ্য যাহারা দিয়াছে মিথ্যাই বলিয়াছে। কিন্তু কেন ছিল না, সে কথা ও বলিবার জন্য কেহ দেখা দেয় নাই! কিন্তু সে নিজেও ত বলিতে পারিত, কেন বলে নাই? বলিতে অজিতার যে নিষেধ ছিল। সে নিজের জানাইবে এই কথাই সে তাহাকে বলিয়াছিল। তাই সে তার রহস্যময় নিষ্কলঙ্কতার কাহিনী এই আসন্ন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পূর্ব্বক্ষণে অপ্রকাশ রাখিয়াছে; হিন্দুর মেয়ে কি তার স্বেচ্ছাবিবাহের নিন্দাচিত্ত পঙ্কিকে সব জানিয়া শুনিয়াও মরণের মুখে ঠেলিয়া দিবে।

সে শুনিল, সরকারী উকিল তাঁর শেষ বক্তব্য প্রবল পরাক্রান্ত যুক্তির ও ছন্দের সিংহগর্জ্জনে [illegible] বর্ণনা সমাপ্ত রাখিয়া অধৈর্য্যে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "জিতা! জিতা! ওঠি!

সাক্ষ্যমঞ্চের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল, টকটকে সিঁদুর মাখার চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরা অজিতা এবং তাদের বিবাহের সহায়তাকারীর দল, যথা অজিতার মাসিমা, তাঁর পুত্র নরেন, অজিতার সংপাঠিনী মহুলী ও বিবাহ প্রথার [illegible] পুরোহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া। অজিতা তার পিতাকে মুক্ত করে প্রণাম জানাইয়া নিজের ও স্বামীদের দিকে ফিরিয়া কহিল—

"ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাদের এই খুনী আসামীর বিবাহিতা পত্নী, শিবচতুর্দশীর পূর্ব্বরাত্রে আমার মাসিমা স্বর্গতা সুলোচনা দেবীর বাটিতে আমরা বিবাহিত হয়েছি। ঐ পিস্তল আমার কাকাবাবু রায় সাহেব নিত্যানন্দ ঘোষালের পোষার ঘর থেকে আমি চুরি করেছি, আর ছদ্মবেশে মেসে গিয়ে ঐ নির্য্যাতিত অসহায় লোকটিকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে আমাকে অকাল বৈধব্য থেকে রক্ষা করতে রাজী করেছিলাম। পিস্তলটা তিনি সেই মর্ম্মে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। কাজটা আমি সাজি মিঞা সেজে মোটা পাগড়ী ও জলকীর পরেছিলুম। প্রথমে আমার মাসিকেও ঠিক এই উপায়ে আমাদের বিয়ে দিতে রাজী করি। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি যে আমার ও খেয়ালে আমার স্বামীকে [illegible] সহ্য করতে হবে। আমার সখী ঐ মাসিমার মেয়ের প্রেমে, যাকে মনে মনে বরণ করেছি, তাঁকে ছাড়া অন্যপুরুষকে গ্রহণ করা [illegible] অসম্ভব। তাই আমার কন্যাবৎসল পিতার সম্মতি পাবো না জেনেই আমি এ রকম লুকোচুরি [illegible] এদের সাক্ষীদিগ, তিন মাসিমার বাসীর [illegible] আরও একপাঁচজনের সাক্ষী নিয়ে দেখুন [illegible] পরের তিন দিন আসামী তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন কি ছিলেন না। আপনি আমায় [illegible] যা আমি করেছি আপনার ও দায় নিজেরই করেছি।

মোহমুক্তি

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

[শ্যাম বড় কি শ্যামা বড়···এই বিষয় নিয়ে একদিন কবি-ওয়ালারা আসর জমাতো...কারণ আসরেই যে এই ঝগড়া সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়...শ্যাম আর শ্যামার ভক্তদের মধ্যে বহু লড়াই হয়ে গিয়েছে এই গঙ্গা মৃত্তিকার দেশে...এবং সে-লড়াইয়ে ইন্ধন জুগিয়েছেন সব বড় বড় জেনারেল...ধর্মের জেনারেল, গুরু যাঁদের নাম···উপনিষদের গুরু ধাপে ধাপে নামতে নামতে হয়ে আসেন ব্যবসায়ী গুরু···এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরও বাংলা দেশ থেকে এই স্বঘোষিত গুরু বাদের অভিশাপ যে আজও চলে যায় নি, মুলেখিকা সুনিপুণভাবে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই কাহিনীতে...]

—গুরুদেব আসিয়াছেন!

—কানাই মহারাজ! কানাই মহারাজ! সারা বাড়ীতে ভয়ংকর উৎসবের সাড়া। [illegible] অনাচারলিপ্ত মোহান্ধ বন্ধুবান্ধবকে উদ্ধার করিতে যে নরদেহধারী নারায়ণ স্বয়ং আসিয়াছেন এ খবর যেন [illegible] জমিদার বাড়ীর বেওয়ালে বেওয়ালে, মেঝের খিলানে, প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি ধ্বনিত হইতেছে।

বংশানুক্রমিক উদ্ধার কর্তা কুলগুরু নয়, ভাবী গুরু। ভবিষ্য স্বর্গের সোনার সিঁড়ি [illegible] গাঁথিয়া আনিয়াছেন। 'সংসার' নামক ঘোর নরকের কীটগুলিকে পায়ের পদ্ম হইতে টানিয়া টানিয়া একবার সিঁড়ির ধাপে চড়াইয়া দেওয়ার ওয়াস্তা।

ছেলে বুড়া কর্তা গিন্নী কাহারও উপর তাঁহার কৃপার তারতম্য নাই, ইতর বিশেষ নাই। বাড়ীর দাসদাসীগুলিকে পর্যন্ত দীক্ষিত করিয়া ছাড়িবেন। তা ছাড়া—না করিলেই বা চলিবে কেন? 'কর্তৃসভার' হাতের জল কখন কার! বোসজামশায় তো আর মহারৌরবের পথ পরিষ্কার করিতে পারেন

হাতের জল শুদ্ধ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধিরও প্রয়োজন। অবশ্য উহাদের নিতান্ত [illegible] নাই। এই যজ্ঞে—[illegible] নূতন কাপড় উঠিয়াছে···এবং এমন একটা আবহাওয়া পাওয়া যাইতেছে শুরুকরণার পথ ধরিয়া আধ্যাত্মিকতার [illegible] সহিত ব্রাহ্মমুহূর্ত যাপন হইবে।

অবশ্য নিয়মের [illegible] লোভা নয়, কিন্তু কেই পাওয়াই কি সোজা? কষ্ট না করিলে?...

সুবাস বাসী বংশী চৌকাকে সেই কথাই বোঝায়…বলে—"তেমনি কীর খাবি, মালপো খাবি, মকলা কিনা? মাছ মাংস পাওয়া মানেই তো জীবহত্যের পাপ বাড়ানো?"

বংশী সুবাসকে 'মাসী' বলে। সুবাসের কথায় বিরক্ত কণ্ঠে বলে—"তুই থাম্ মাসী, নিরিমিষি ভাত চাল্লেলো নাকি গিলতে পারে মানুষ?"

—পারে না তো বাবুদের বেবরারা কি করে গেলে?

—গিলুক গে, আমি তো আর বাবুদের বেহ্লা নই? চাকরীর নিকুচি করেছে, আমি ওসব 'মন্তর কন্তর' নিতে পারবো না বাবা, কালই ভেগে পড়বো।

সুবাস তাহার লিভাকাঙ্খিনী, তাই তাড়াতাড়ি মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলে—"এই চুপ খবরদার, বাবু শুনলে রক্ষে রাখবে না। ভেগে পড়লেই হ'ল কিনা? তোর মতন তামাক সাজতে কে পারবে শুনি? চৌরাস্তে থাকবি, টেনে এনে তবে ছাড়বে। তামাক-সাজা পছন্দ না হলে—বাবু তাকে—"

—"মরণ্ডা। তামাক খেলে তো? গুরুদেব যে বলেছে পাপ তামাকেও নেশার অপরাধ লাগে—" পাপের ভারার সুবাসের চমকানিটা বুঝিবার মত।…পাপও ছাড়িতে হইবে? এত মুহ বড়ও গুরুদেবের চক্ষু এড়ায় না? তবেই তো মুস্কিল। মাছের কথা থাক্ বরং ভাত না খাইলেও চলে, কিন্তু পাপি তোরা?"

তাপিয়া চিড়িয়া চুপিচুপি বলে—"লুকিয়ে খেলে তর্কির বাবু—চুপিচুপি খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেললেই হবে। কি বলিস রে বংশী?"

বংশী বিরক্তমাত্রও উত্তর করে—"সে তো তোর? বলে, নিজের কোল আঁটিস্ নি। আমি বাবা কচুর ঘণ্ট খেয়ে জীবন কাটাতে পারবো না—তা বলে দিচ্ছি, সগ্‌গো মাথায় থাক আমার।"

ওদিকে রান্নাঘরের মহলে আলোচনা উদ্যম হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রিতা ও অনাশ্রিতা দাসদাসী সিংহদুয়ার বন্ধ, যাহারা বিভাগের কর্তা গিন্নীর তাড়নায় ফুলপাতার ইউনাম লিখিয়া জলে ভাসাইয়া নূতন মন্ত্র লইতে বাকায় পাইয়াছেন, তাঁহাদের সভা।

—"ভারী গরু, খাই মরলো, কারুরও, কিছুই আর থাকবে না তমহি, সব ভুলে যেবে।"…"গোরাম পর্যন্ত খাবে—শিবঘাটিনীর দোকান থেকে মহাপাতুক, মন্দিরে পূজো গোরাম তো দূরের কথা ছুঁচো মারানো চলবে না"…"বাপ মা শ্বশুর শাশুড়িকে পর্যন্ত প্রণাম করতে পাবে না"…"ওর নাকি বলছে—'একবার গোবিন্দর চরণে যে মাথা হেঁট হয়েছে সে মাথা আর কোথাও হেঁট হবে না'—ছিষ্টিছাড়া কথা!" "আবার শুনছি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে করতে হবে—শিবরাত্রি পর্যন্ত ছাড়ান নেই। এ কি অলুক্ষুণে কথা—এ্যাঁ? গোরাঙ্গীর ঘটকালি হবে না?"

—"আহা সোহাগী!" যিনি সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সেই জাতি ভাবে বৌদি মুখ বাঁকাইয়া বলে—"স্বামী আর স্বামী থাকবে না 'ওকভাই' হবে। বাড়ীর গিন্নীর ব্যবস্থা শুনেছ তো? স্বামী স্ত্রী একত্র থাকতে পাবে না—যত ব্যাটাছেলে বার বাড়ীতে শোবে আর সব মেয়েমানুষ ভেতর বাড়ীতে, তা নইলে শাসন শুঙ্খলার ব্যাঘাত হবে! পারবো না বাবু, তার কথা নেই। এ বাড়ীর অন্ন এবার উঠলো দেখছি।"

কিন্তু এ বাড়ীর অন্নে যাহাদের দাবী আছে ষোলো আনা, তাহারা শুধু "অন্ন উঠিল" বলিয়া মুক্তির ব্যবস্থা করিবে কোন হিসাবে? তাই চিন্তা তাহাদের আরো বেশী। মেজবৌ কলিকাতার ক্যাদারাওয়ালা ঘরের মেয়ে কটি গলায় দিয়া বাপের বাড়ী মুখ দেখানো অপেক্ষা গলায় দড়ি পরা তাহার পক্ষে সোজা। সে একবস্ত্রে বসিয়াছে।.....শ্বশুরের কাছে তর্জন গর্জন করিবার সাহস নাই তাই শ্বশুর পুত্রের কাছে কহে।.....

—জোর করে ধর্ম হয় না বুঝলে? আমার মন যদি সায় না দেয়, গায়ের জোরে তোমরা আমাকে মন্ত্র দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠাতে পারবে? কক্‌খনো আমি ওসব ছাই ভিনিষে মত দেব না তা বলে রাখছি তোমায়, এই বেলা কিছু ব্যবস্থা করো।

তারানাথ বিব্রত ভঙ্গিতে বলে—এই এক ফ্যাসাদে ফেলছো তুমি আমায়, নিজেই বল না মাকে? বল যে তোমার ইচ্ছে নেই এখন—

দায় পড়েছে আমার নিজে গিয়ে বলতে, কে তোমার মার মুখনাড়া খাবে শুনি? শুনেছ তো রোটিশ "যে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হতে না চাইবে সে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে—আমার হুকুম—"

—দেখছো তো? এখন কি করি বলো?

—ও সব জানি না। আপত্তি জানাতে না পারো বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও আমায়। কাঁহা করে বোষ্টমী হওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা আমার পক্ষে সোজা। পারবো না—করবো না ব্যস্।

বড়বৌ রাগী নয়, বরং অতিমাত্রায় কৌতুকপ্রিয়া সে হাসিয়া ননদের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলে—ও ঠাকুরঝি, তোর দাদাদের বল যার যা মনোবাঞ্ছা আছে এইবেলা মিটিয়ে নিক, এর পরে তো কুঁড়ে না আমিও তা, ওকভাই।

—মরণ আর কি—

ননদ ঠ্যালা মারিয়া বলে—তোমার সব তাতেই মস্করা, ও কথা তোমায় যে বলেছে শুনি?

—বলে নি? বলিস কি না? দুপুরবেলা ঘুমিয়ে স্বপ্নে শুনলুম তবে বলি। স্বপ্নে বাবা রোজ হাজরে খাতায় নাম কাটা হয়ে আসি। কত মজার কথা শুনি, হাসি চেপে রাখতে বুক ফেটে যায়। শোন তবে বলি—কাল দুপুরে স্বপ্নে শুনলুম—মহারাজাধীর তো মুখের দিন দিয়েছিলেন ওঁকে—সবাই হবে বাজনা—বাবা বলে, না বেজে সস্তায় যদি আর কি। হঠাৎ মুকুন্দিয়ে এক কট কট্টা—"ঠ্যা বাবা,

বৌ ছেলে সব বেহদ্দী হবে—তো এত বড় বোসবংশের গতি কি হবে? জ্যেঠাশ্বশাড়ির বংশটা লোপ পাবে শেষটা—"

—ঠাকা মাসী!

নলব অবাক হইয়া ওঠে—"মাসী বলল এই কথা সভার মধ্যে?"

—তা বলবে না?

বড়বৌ টানা চোখ টানিয়া কপালে তুলিয়া বলে—বলবে না কেন শুনি? সভার মধ্যে আরো কত কথা হচ্ছে—এ যে ধন্ম কথা! বলে "ধর্ম লজ্জা ভয়—তিন থাকতে নয়"। ধর্মের নামে যা খুসি করো, যা প্রাণ চায় বলো কোনো দোষ নেই, ও সব হরিকথা। দীনবন্ধু পার করো হে।

—দীনবন্ধুর মরণ নেই, তাই তোমাকে পার করবে। বরং তুমিই তাঁকে ভবসাগর পার করিয়ে দিতে পারো বাবা, সাধ যেয়ে তুমি। তা ফুসফিসির দুশ্চিন্তায় কিছু উপায় হ'ল?

—ফুস ফৈ কি! শাস্ত্রে না আছে কি? মোহং দামোদরের নামটা বজায় রাখতেই—সৈবে সৈবে [illegible] দেখে—গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে—

হাসির চোটে বাকী কথাটা আটকাইয়া যায় বড়বৌয়ের, হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

মেজ বৌদি ঘরের সামনে দিয়া যাইতে থমকিয়া দাঁড়ান, বিরক্তিব্যঞ্জক অনুযোগের সহিত বলেন—কিসের অত হুড়ি রে তোরা?

তারা কষ্টে হাসি চাপিয়া বলে—বৌদির সব তাতেই হাসি, জিগ্যেস করো না ওকেই—

—কি জানি বাবা এত হাসিই যে তোদ্রাদের কিসে আসে। মহারাজকী বলেন—"রথা হাস্য মুখ আলাপ" বৈষ্ণব অপরাধের মধ্যে গণ্য। ওই জন্যেই তো সকলকে দীক্ষা দেওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। আসল মনুষ্যজন্ম বাদ করে ঘষি গরু গাধার মতন মুখু আবার কিসের নিয়েই কাল কাটাবে তবে আর মানুষ জন্মের সার্থকতা কি? তোমাদের তো দেখি কাজের মধ্যে কেবল বাজে গল্প আর অনর্গত হাসি, খামো দিকিন, দেখলে গা জ্বলে যায়।

বড়বৌ অনেক কষ্টে নিজেকে নিরস্ত করিয়া বলে—হাসছিলাম কেন জানেন না? ঠাকুরঝিকে বলছি—[illegible] তোমার নোস উচ্চারণে অপরাধক হবে—তা তোকে কি বলে ডাকবে সবাই, বৌদি?

—নিশ্চয়ই, বৌদি ছাড়া আবার কি ডাকবে এই বেটী।

মেজবৌ ভ্রূকুঞ্চন করিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, যেন সত্যই মহাভাবনায় পড়িয়াছে।

তবিনা ঝিরও মহাচিন্তা দেখাই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যান। গ্রহণের ছলে বড়বৌমা যেন একটা ভুলাবিহ্বল অন্ধকারে আছাড় খেলিয়া পড়িয়াছে। চিরদিনের শক্তি উপাসক ভদ্রপরিবার, ত্রৈলোক্যেশ্বরের ঘরে চাহিবার

বিজ্ঞাপন দাঁটা আছে।···কর্ত্তা কৈবর্ত্তীপ্রসাদের চার ছেলে—কালীনাথ, তারানাথ, শক্তিনাথ আর কামাখ্যানাথ, দুই মেয়ে—শ্যামা ও শঙ্করী। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে ডাকিবেন? হরিনাম মৌত পথিক মুহূর্ত্তে কি মুহূর্ত্তে শক্তিনাম উচ্চারণে পতিত হইবে না?···অনাদি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পক্ষিরাজে পা ভাসাইয়া কোথায় দ্রুতগতিতে পরলোকের পথে অগ্রসর হইবেন, তা নয়—প্রতিনিয়ত এই শঙ্করপাদিনী শঙ্করী দেবীর নাম উচ্চারণ করিয়া নরকের গভীর গর্ত্তে নামিতে থাকা!

আনাজ তরকারি না হয় কোটার পরিবর্ত্তে 'বানানো' বলা চলে—কিন্তু এই বরফ-দুর্গতির প্রতিকারের উপায় কি? হায়। যদি যৌবনের প্রারম্ভেই মহারাজজীর দর্শন মিলিত!

যিনি এই সমস্যা সৃজন করিয়াছেন সমাধানও তাঁহার কাছেই মিলিবে। তিনি ভিন্ন আর কে আছে জগতে? এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতে? বসুন্ধরিনী ক্ষমতাশ্রু ফেলিয়া বলেন, প্রথমে স্বামীর ও তৎপরে পরম স্বামীর নিকট উপদেশ লইতে।

আর বড়বৌ হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া বলে···ঠাকুরঝি শোন শোন—তোদের ভাই বোনের নাম-করণ করি—শ্যামী, কান্না, ভক্তি, কামা, কামাখ্যা, শঙ্করী। কেমন বেশ না? শক্তিনাম উচ্চারণ করে আর নরকে ডুবতে হবে না।

অসন্তোষের বিষবাষ্প ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইতে থাকে অনেকেরই, কেহ বাহ্য পরিহাসে নিজেকে কতকটা লঘু করিয়া লয়, কেহ বজ্রগর্ভ মেঘের মত উগ্র বিদ্রোহে উদ্যত হইয়া থাকে ফাটিয়া পড়িবার অপেক্ষায়।

কিন্তু বসুন্ধরপতি মৃদুলংকর।

ওজর আপত্তির ধার তাঁহারা ধারেন না। কারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যুক্তি স্বীকার করাইবার আসল চাবি "ভাত-কাপড়" যে তাঁহাদের হাতে। পুত্র যদি দুর্বিনীত মাত্রিক হয় তাহাকে দুধিল জন্তুর মত ত্যাগ করাই উচিত, এবং সেটুকু মনের জোরের অভাব তাঁহাদের নাই।

"যার না পোষাবে সে এবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে"—এই তাঁহাদের শেষ কথা। এই কথাই নরকের কৃমিকীটের মত অন্ধ স্নেহের কন্দরবর্তী ছিলেন তখনকার হর্ব, যজ্ঞ। তখন ছেলেরা একদিন ছুটিতে বাড়ী না আসিলে বা ছুদিন দেরী করিলে পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন, এখন শুরুকপাল ফিরিয়াছে, সংসার সয়ন দূর হইয়াছে, এখন ধর্ম্মপথে বিমুখ সন্তানকে ত্যাগ করিতে কাতর হইবেন এমন আশঙ্কা নাই।

শক্তিনাথ পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে।

আসিয়া পর্য্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই। অন্য অন্যবারে ছুটিতে বাড়ী আসিলে সংসার যন্ত্রের

চক্ষুখানি যেন তাহাকে আবর্জিত করিয়াই ঘোরে। শক্তির খাওয়া শোয়ার সুবিধা বিধানে সকলেই তৎপর থাকে, কারণ বাড়ীর মধ্যে অথবা বংশের মধ্যে একমাত্র শক্তিই তিনতিনটে পাশ করিয়া চারটে পাসের পড়া পড়িতেছে।

শক্তি এ বাড়ীর জামাইছেলে।

আবার, আচারে ব্যবহারে হাস্যে পরিহাসে কলিকাতার হাওয়া বহিয়া আনে বলিয়া দিদি বৌদিদের চক্ষে বিষপাত্র—সেই শক্তি এবার অনাদৃত অবহেলিত কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া আছে।

সপার্ষদ কানাই মহারাজের সেবায় পোষ কর্তাগিন্নী হইতে পিঁপড়েটী পর্যন্ত তটস্থ। শেষরাত্রি হইতে রাতরাত্রি পর্যন্ত বিগলিতচিত্ত ভক্তবৃন্দ 'নিরাহারী বাবাদের' আহারের উপকরণ বহিয়া বহিয়া সদর হলঘর এক করিয়া ফেলিতেছেন।

আগামী রাসপূর্ণিমায় এক বিরাট মহোৎসবের দিন স্থির হইয়াছে।

অতএব শক্তিনাথের কোনো আশা ভরসা নাই। গুরুদেবের লীলা ফুরাইবার আগেই তাহার ছুটি ফুরাইবে। বিরক্ত লাগিতেছে···তার উপর অসময়ে অকথ্য কথা পূজার দালান শূন্য পড়িয়া আছে—মায়ের পূজা নাই।

এ কি অনাসৃষ্টি অনাচার!

বসুবংশের চিরকল্যাণী কুলদেবী মহাদুর্গার পূজা বন্ধ? দুইদিন আগেও এতবড় অবিশ্বাস্য কথা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত? লোকজন নিজেই পারিতেন? মায়ের পূজার অনুষ্ঠানে একবিন্দু ত্রুটি হইলে যিনি পৃথিবী তোলপাড় দিয়া ছাড়িতেন। ভক্তিমতী বসুগৃহিনীর আন্তরিক আকুলতায় 'মা' ডাক যে এখনো ঠাকুরদালানের ভিতর গমগম্ করিতেছে!

সেই পূজার কোন আয়োজন নাই।

কথাটা উঠিয়াছিল অজয়ের আবির্ভাবের সঙ্গেই, কিন্তু আসলে কেহই বিশ্বাস করে নাই। সকলে জানিতেন যে সারাবৎসর এই অছিলায় বাড়ীর পূজার জন্য হা করিয়া থাকে।···তাহার পরই কালীপূজা ও অন্নকূটোৎসব।

অষ্টাচলের সারাবৎসরের সংস্থান হয় এই জিন্নী পূজা হইতে।

সংবাদ শুনিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছেন। তবু মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে, গুরুদেবের এই শরীরটা যেমন করিয়াই হোক, দিন দেড়েকের জন্য হঠাৎ প্রবল উৎসাহে জেগে উঠিয়া বসিবে··· কারিগরকে দিবারাত্রি খাটিয়া প্রতিমা গড়িয়া তুলিবে—মণ্ডপে 'গোল' পড়িবে···চারিদিক হইতে ঢাকে ডাকে

কিনিব আসিয়া হাজির হইবে, বোধনবাদ্য ঠিক সময় বাজিয়া উঠিয়া গ্রামসুদ্ধ লোককে জাগাইয়া তুলিবে, মাতাইয়া তুলিবে, অমল দেহে মনে চেতনার সাড়া পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু কিছুই হইল না।

কুলাচারভ্রষ্ট বোসজার উপর দশপ্রহরণধারিণীর একটা প্রহরণও ভাঙিয়া পড়িল না। এমন কি একটা স্বপ্নাদেশ একটা দৈববাণী পর্যন্ত না। নিত্যানন্দপ্রস্রবিণী কানাই মহাগ্রামের নিত্যদেবার বছর পূর্বের মতই পূর্ণতেজে চলিতেছে···অথচ মহালয়া আসিয়া পড়িল।

গোবিন্দের কৃপায় যাহারা ভূত ভবিষ্যত সব ভুলিয়াছেন—তাঁহারা যাবে আজ মহাসুখে লোকাচারের মত অবসাদগ্রস্ত দেহ মন লইয়া শূন্য মণ্ডপ ও ধূলিধূসরিত 'কাঠরা'খানার পানে চাহিয়া চাহিয়া অলক্ষ্যে চোখ মুছিতেছিল···হায় কর্তার এমন দুর্গতি কেন হইল!

আহা! আজও যদি সুমতি ফিরিয়া আসে!

শক্তিনাথ সারা সকাল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বিষম বিরক্ত চিত্তে দালানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।·····

দেখিল···কে একজন দালানের মাঝখানে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া প্রণাম করিতেছে।

তবু ভালো যে এ সংসারে এখনো একজনেরও কৃষ্ণ পাইতে বাকী আছে। কিন্তু মানুষটাকে চিনিতে পারে না···আশ্রিতা অনাথা অনেকেই আছে বটে কিন্তু তরুণী বিধবা কে আছে?

চিনিবার অলক্ষ্যে সিঁড়ির একধারে বসিয়া পড়ে শক্তিনাথ।

কিন্তু কে এ? মাতৃর কাছে কোন কেনার বোঝা নামাইতে আসিয়াছে যে এই সুদীর্ঘ প্রণামের সে নিবেদন শেষ হয় না?···দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে অধৈর্য্য শক্তিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতে সোজাসুজি হইয়া গেল। ও এ সংসারের কেহ নয়, ভট্টাচার্য্যের মেয়ে শিবানী·····

নামের মহিমা ব্যর্থ করিয়া যে বিবাহের বছরেই বিধবা হইয়া বসিয়া আছে।

মৃদু অথচ স্পষ্টভাষে ঘোষণা করিয়া শিবানী, যাবধানে কহিল—প্রতিমা যে মাতৃর দালানে তোমাদের গোবিন্দর কাছে স্থানীয় হতুম হয়ে থাকে না?

অনেকদিন পরে শিবানীর সঙ্গে দেখা, পক্ষিনাথ একটু উতলা খাইয়া বলে—কে—শিবানী? কবে এলি?

—এলাম মানে? ছিলাম কোথায়?

—মানে—ইয়ে—শ্বশুরবাড়ী।

—থাক হয়েছে—আর আলাদা টিল বেঁধাতে হবে না, খবর তো রাখো কত? শ্বশুরবাড়ী যোগাম করে?

—ও তারপরে আর যাও নি বুঝি?

অপ্রতিভ পক্ষিনাথ আবার বসিয়া পড়িয়া বলে—চলে যাচ্ছো না কি?

—বলতেই বা কাছে কে?

পক্ষিনাথ একটু অবাক হইয়া তাকায়···কই বিশেষ কিছুই তো পরিবর্তন হয় নাই শিবানীর? হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় যেন কত দূরের মানুষ। উনিশ বছর বয়সেই শিবানী ধান ধরিয়াছে প্রাণে?

ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলে—বলতে কবার সাহস হচ্ছে কই? মনে হচ্ছে যেন আমাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছো!—এ রকম কাপড় এনুনি না পরলেই নয়?

শিবানী একপাশ নীচের সিঁড়িটায় পা ঝুলাইয়া বসে, হাসিয়া বলে—নয়ই তো, নইলে নাগালের বাইরে চলে যাবো কিসের জোরে? লোকে স্বর্গের দেবী ভাববে কি করে?

—শুধু লোকের ভাবার জন্যে?

শিবানী হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলে—তা নয় তো কি পতিশোকে উন্মাদিনী হবো? আমরা তো তোমাদের মতন 'কেউ' পাই নি যে লোকলজ্জা দূর হয়ে গেছে?

পক্ষিনাথ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলে—আমাকে ও বলে চালাবার কচ্ছো কেন শিবানী? এসেছি পর্যন্ত [illegible] আমি অধীর হয়ে যাচ্ছি, আর তুমি—এমন হয় কি করে?···ভক্তিমুক্তির বালাই [illegible] কোনো কালেই নেই···শুধু এ আমার ভালো লাগছে। এই দীর্ঘ দিনের সংস্কার, ঐকান্তিক [illegible] নিষ্ঠা, জিনাকাঙ্ক্ষা যার একতিল এদিক ওদিক হবার জো ছিল না তা এত অনায়াসে [illegible] করা যায়?···একদিনের এত প্রবল সত্য এত সহজে মিথ্যা হয়ে যাবে?

পক্ষিনাথ ওই কথাই জানতে এসেছিলো শিবানী। বাবার অবিশ্বাসী মন ঘরে আর টিকতে

পারি নে। ভাবলাম—যার কাছেই নালিশ করে যাই। যদি—সত্যিই যদি তোমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকে তো একটা উপায় করো, তা নয় তো বুঝবো, বোকাই যাদের পুতুল তুমি। খেলা করে অরুচি হয়ে গেছে তাই ফেলে দিয়ে করালীকাকা একটা পাথরের পুতুল কিনেছেন।

—নালিশের কি উত্তর পেলি?

—মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা উপায় হবে, নইলে উঠেই তোমায় দেখলাম কেন? তারা লেখাপড়া শিখেছ—যুক্তি তর্কের খোঁচায় তোমাদের মহারাজজীর আসনটা একটু টলাতে পারো না? হাঁন যে বামন অবতারের মতন মাত্র তিনপা ভূমি চাইতে এসে তোমার বাবার মাথার ওপর মুক্ত একখানি বিরাট পা চাপিয়ে রেখেছেন। ওঁর তাড়ার গ্রাস থেকে আর কিছু কি উদ্ধার হবে? আর একবার ঘুরে এসে হয়তো দেখবে—এই বাড়ীটা একটা শ্রীগোবিন্দ মঠে পরিণত হয়েছে—আর বাড়ীশুদ্ধ সকলে মহারাজজীর চেলা চামুণ্ডের দাসবৃত্তি করছে।

—এবারেই তো প্রায় তিন মাস। অসহ্য লাগছে, একটু আগেই ভাবছিলাম কলকাতায় ফিরে যাই; কিন্তু তা যাবো না, আসিই করবো দুর্গা পুজো।

—তুমি! তোমার কি ক্ষমতা?

শিবানী অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

—দেখি, শক্তিনাথ নামটা সার্থক করতে পারি কি না! তবুও যোগাকে ফলে যা যৌবন বসাবার ব্যবস্থা তিনি করলে, পুজো হবে।

নিয়মিত দিবানিদ্রার পর কানাই মহারাজ সেই মাত্র ডাবের জল ও দিজকর কলমুল সেবা করিয়া উপদেশামৃত দানের জন্য গুছাইয়া বসিয়াছেন।...এ সেই সভা, যেখানে কড়ায়ো নিয়া 'গাওয়ে খাওয়ে নাম সই' করিতে আসে। আজকাল একা কড়ায়ো নয়, কর্তাগৃহিনীর শাসনে দিবানিদ্রার অমল আরাম ত্যাগ করিয়া বাড়ীশুদ্ধ যৌ-ঝি, বাঁদুনী-চাকরাণী সকলেই একজনে দান করিতে আসিয়া বসে।

শুধু মেজবৌয়ের বাপের নাকি শক্তটাপন্ন পীড়া, 'তার' পাইয়া হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইয়াছে তাহাকে।...ছুটি পড়িয়াছে—কালীনাথ তারানাথ কামাখ্যানাথ সকলেই উপস্থিত ছিল, ছিল না শুধু শক্তিনাথ।

কোনদিনই থাকে না।...এবং আশ্চর্য এই তাহার উপর কেউ কোন দিন শাসন চালাইতে আসে না। করালীকাকা একদিন মৃদু অনুযোগ করিয়াছিলেন—সারাদিন টো টো করে ঘুরে, রাত্রে নাটক নভেল পড়ে বৃথা কালক্ষয় না করে ওপরে মহারাজজীর কাছে একটু বসলেই পারো? শরীর মন দুইই উন্নতি হয়।

ওই পর্যন্তই। শরীর মন উজ্জীবিত করার প্রলোভনের শক্তিকে এ আগে দেখা যায় নাই। সাধু হঠাৎ তাহাকে আসিতে দেখিয়া বহুদর্শিতা প্রথমটায় আনন্দিত হওয়ার চাইতে বিস্মিত হইলেন বেশী।

কিন্তু বস্তুতঃ বিস্ময়ের আছেই বা কি? যাঁহার কৃপায় মূকও বাচাল হইতে পারে তাঁহার কৃপায় বাচালই বা মূক হইবে না কেন?

এত করুণা ব্যর্থ যাইবে? বিমুখ চিত্ত ঊর্ধ্বমুখী হইবে না? তা কি সম্ভব? শক্তিনাথ যে এই প্রেমভক্তি রসের আস্বাদন করিতে আসিয়াছে ইহাতে আনন্দের কারণ থাকিতে পারে, বিস্ময়ের নাই।

—আয় বাবা!

স্নেহে তাকে সন্তানকে আহ্বান করিয়া বিগলিত প্রার্থনার কাতর স্বরে বহুদর্শিনী বলেন—এই আমার ছোটছেলে বাবা, এর কথাই বলছিলাম আপনাকে—এরদিকে একটু কৃপাচক্ষে চাইতেই হবে।

তাথাদের দৃষ্টি মেলিয়া একমুহূর্ত শক্তিনাথের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া কানাই মহারাজ সোজা হইয়া বসেন, তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন—তোমাকে তো কোনোদিন এখানে দেখি না?

—কারণ আমি এখানে আসি না।

—হুঁ! আসো না তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন আসো না?

—এসব ভালো লাগে না আমার।...বাবা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

কালীপ্রসাদ বিরক্ত কণ্ঠে বলেন—তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা থাকতে পারে না, এটা আছে গল্প করবার বৈঠকখানা নয়।

গুরুদেবের সঙ্গে শক্তির কথা বলার ভঙ্গী তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে এটা অসম্ভব নয়।

—কিন্তু বাবা, গল্পটল্প করতেও আসি নি, বাজে কথাও কইতে চাই না, শুধু জানতে চাই-ছিলাম, পূজোর হিসেবের খাতাপত্তরগুলো কি আপনার কাছে আছে? না সরকারমশাইয়ের কাছে পাবো?

—পূজো? কী পূজো?

কালীপ্রসাদ চশমা খুলিয়া মুছিতে থাকেন।...ছেলেটা বলে কি?

—এ সময় আর কি পূজোর আয়োজন হবে বাবা? দুর্গাপূজো।

শক্তিনাথের কথার সুরে দৃঢ়তার আভাস।

—এবারে আষাঢ় মাসে পূজো এবার থেকে বন্ধ হয়ে গেছে এ কি তুমি শোন নি?

—শুনেছি বৈকি বাবা, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। আপনি মায়ের পূজো ছেড়ে দেবেন এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

এটা যে কানাই মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধির অভাব মহারাজের নাই, তাই উপর পড়া হইয়া নিজেই বলেন—জগতে কত অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনাই ঘটছে বাবা, কে তার হিসেব রাখে? আর, অবিশ্বাসের কি আছে? তোমার বাবা এবার বড়গাছে নৌকো বেঁধেছেন। কি বল হে প্রসাদ? বলিয়া মুহুহাস্য করেন মহারাজ।

—সেই জন্যেই তো আপনাকে বিরক্ত করতে চাইছি না বাবা, আমরা নিজেরাই যা পারবো করবো।

—পাগলামী কোরো না শক্তি।

করালীপ্রসাদ বিরক্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—পাগলামী কোরো না শক্তি, বৈষম্য উৎসব ছাড়া আর কোন পূজার্চনা এ ভিটেয় হবে না।

—তা হলে নেবোত্তর বিষয়ের কি হবে বাবা? ঠাকুর্দারা যা ব্যবস্থা করে গেছেন?

—তুমি কি আমার সঙ্গে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করতে এলে শক্তি?

—মাপ করবেন বাবা, যদি আমার বোঝাবার ভুল হয়। আমি শুধু বলছি—চিরদিনের রীতিনীতি উঠিয়ে দিলে লাভ কি? গ্রামসুদ্ধ লোককে একটা এত বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে—

—মাতালকে মদ খাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করাও তো তা হলে মস্ত অপরাধ বাবাজী?

কানাই মহারাজের তুলীয় যাদে ঘরভর্তি সকলে চকিত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে উদ্ধত ছাবনীত শক্তিনাথ কি সেটা মহারাজের সঙ্গেও বেয়াদবি করিবে না কি?

আকাশ হইতে বজ্র ভাঙিয়া পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে না তো? বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, তিনি অজ্ঞাতসারে মনে মনে ইষ্টনামই জপ করিতে থাকেন।

করালীপ্রসাদের ক্ষমতায় আমার করাল ছায়ার ধমকিয়া আছে—নিতান্ত আত্মসম্মানের সন্ধান রক্ষার্থেই। তাঁহার সামনে তো আর মেয়াদের ওজন হারাইয়া চেঁচামেচি করিতে পারেন না?

শক্তিনাথ মৃদু হাসিয়া মহারাজের অজ্ঞাতে হইবার কপালে ঠেকাইয়া বলে—মহারাজ নিজেই এক

দাঁড়াচ্ছেন, তখন একটা আপনার সঙ্গেই হোক, অপরাধ নেবেন না। বাবার এই অদ্ভুত খেয়াল, ও খোকরি আপনারই মুখ ও মুখপাত্র বল?

—আমি কৈ?.....মহারাজের ওষ্ঠে মৃদু রহস্যময় হাসি···আমি তো নিমিত্ত মাত্র। অনেক পুণ্যের ফলে প্রসাদের উপর গোবিন্দের কৃপা হয়েছে।

শক্তিনাথ অল্প হাসিয়া বলে—হয়েছে—সে তো আনন্দের কথা, কিন্তু তারজন্য কুলপ্রথা ছাড়তে হবে কেন? আপনাদের বৈকুণ্ঠেও কি সেই পাকিস্থানের দ্বন্দ্ব? একজনের এলাকায় আর একজনের পা বাড়ানো নিষেধ?

উত্তেজিত হয়ো না বাবাজী, উত্তেজিত হয়ো না। কথায় আছে "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল দেবতার সার, তাঁর শরণ নিলে আর অসার মোড়াছড়ি ইট কাঠের কাছে মাথা ঠুকে মরবে কোন দুঃখে?

—কিন্তু দেবতার সার অসারের বিচার করতে বসবে কে বলতে পারেন?

—তার আবার বিচারের কি আছে রে বাবা? ও যে স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী।

শক্তিনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলে—স্বয়ং ভগবান যে কার কানে কানে বলে গেছেন সে খবর আপনারাই—জানেন, কিন্তু মাথা ঠোকবার সময় বুদ্ধিটাই তো বড় কথা নয়? মাথা ঠোকার ঐকান্তিকতাটাই বড়। যার হবার তার ইট কাঠের ভেতর দিয়েই হয়, কিন্তু যার হবার নয়—তার সারাজীবন আপনার গোবিন্দ মন্দিরে গড়াগড়ি খেলে আর সৈনিক দল বাস করলেই কি কিছু হবে?

—হয় রে বাবা, হয়। লাট সাহেবের দপ্তরে চাকরী করলে উন্নতি হতেই হবে। পেন্সন তার যাবে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমাদের ভাইসরয়, বুঝলি সে ক্যাপা ছেলে।

মহারাজের অধরে মৃদুরহস্যময় হাসি।

—মাপ করবেন, বুঝলাম না ঠিক। 'এতে হবে' বলেই যে 'ওতে হবে না' এর কিছু অর্থ আছে?—ধরুন, বাঙ্গলার এঁদের তা হলে—কিছুই হয় নি?

—হয়তো তোদের খারাপ লাগবে বাবা, কিন্তু আমরা বলবো—কিছুই হয় নি। পিশাচসিদ্ধ ভাইসরয়-প্রোপিসিদ্ধ—ওসৈছিস এ সব কথা? তারা অনেক কিছু ভেটা'পুটকী দেখিয়ে লোকের 'তাক' লাগিয়ে যায়···এ একরকম তাই আর কি।

অন্য কোনে শক্তিনাথের আপাদমস্তক জ্বলিয়া ওঠে।···অবাক লাগে তার মাতাপিতার ব্যবহারে। এত দৌড়াদৌড়ও সহ্য হয়? এটি অন্ধভক্তি? না যাদুবিদ্যার প্রভাব? দেখা যে ইঁহারাই চালাইতেছেন। বিবেক বুদ্ধি বিচার সত্তাই কি নাই ইঁহাদের? না সাম্প্রদায়িকতার মূলকাঠে বলি দিয়াছেন তাহাদের?

সভার কণ্ঠে বলে—কোন একটা বিশেষ মূর্তি অবলম্বন না করলে ঈশ্বরলাভ হয় না এ আমি মানতে প্রস্তুত নই।

ভাবাবেশে কানাই মহারাজের দুই চোখ বুজিয়া আসে···কণ্ঠ যায় হইয়া নিশাসে নাসে—তুই প্রস্তুত নয় বলে কি আর তাঁর কিছু এসে যাবে? মূর্তি? মূর্তিটা একবার তাব দিকিন? বিভুজ মুরলীধারী··· আর বঙ্কিমঠাম···অধরে মৃদুমধুর হাসি···রুনু ঝুনু নূপুরধ্বনিতে যমুনার জল উতলা···আহা হা···

হঠাৎ দুই চোখে ঘরবিগলিত ধারা—মহারাজজী ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন।·····

বয়স্থবিরীও মহিলা কাঁদিয়া কেলিয়া উত্তেজিত চাপাগলায় কহিলেন—চেয়ে দেখ্ হতভাগা অবিশ্বাসী, চেয়ে দেখ্।

উত্তেজিত শক্তিনাথও কম হয় নাই।

একটা লোক যে এতগুলা লোকের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে এ দৃশ্য তাহার পক্ষে অসহ্য; রুক্ষকণ্ঠে বলে—তোমরাই দেখ মা, আমার দেখার দরকার নেই। আমি শুধু ভাবছি তোমাদের সহজ বুদ্ধি-গুলো এমন গুলিয়ে গেল কি করে? এই যে এতগুলো লোককে শুধু শাসনের জোরে এখানে আটকে রেখেছো, সত্যি কথা বলবার সংসাহস যদি ওদের থাকে বলুক দিকিনি ক'জন ওরে এসেছে—ক'জন ভক্তিতে? তোমরা কর্তা, তোমাদের হাতে অন্নবস্ত্রের ভার তাই প্রত্যেকের ইচ্ছে অনিচ্ছের গলাটিপে তোমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করবে। যখন যে ছাঁচে ঢালাই করতে চাইবে সেই ছাঁচে ঢালাই না হলে রক্ষে নেই—তা নইলেই দূর হয়ে যাক তোমার বাড়ী থেকে, কেমন? ···মনে পড়ে মা একটা কথা? বেহুঁস কলকাতার মেয়ে·····কালীপুজোর বলি দেখে ভয় খেয়ে দালান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল·····সে দিন তোমার গালাগালির স্রোত্ দালানের রক্তস্রোতের চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছিল···সেই রাত্রে বিছানা থেকে উঠে এসে তোমাকে দিয়ে বলির পাঁঠার কাটামুণ্ড কুলিয়েছিলে···পাপক্ষালন করতে। সে বাকি তার মরচেটা ধরে। আজ তোমাদের অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচছে—তাই তাদের ইষ্ট নাম জলে ভাসিয়ে দিয়ে কালী পরিয়ে মালা ঘুরিয়ে ছাড়বে, কালীনাম উচ্চারণে মাতা।·····এও বোধ করি তাঁদের মঙ্গলের জন্যেই, আবার এ মোহও যদি একদিন ভেঙে পড়ে; স্বয়ং শঙ্করাচার্যের তাড়াও এসে কানের গোড়ায়—স্বয়ং ব্রহ্ম যদি বলেন, তখন তোমাদের এই বৃদ্ধ সাধের শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধারীকেও বোধ করি নদীর জলে আছড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করবে না।··· আর মলাই ছাঁচ তৈরিতে গেলা পরিয়ে ছাড়বে?

—নারায়ণ! নারায়ণ!

মহারাজের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, তিনি মেয়েদের মধ্যে উচ্চারণ করেন—তোর এই ছেলেটা তো চমৎকার লেকচার দিতে পারে এখন! দিব্য ছেলে একটা কেষ্ট কেষ্টা হয়ে আমি আশীর্বাদ করছি।

সহসা শক্তিনাথও একটু চমৎকার হাসির সঙ্গে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—আপনার আশীর্বাদের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বাবা আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, গাড়োয়ান প্রতিমা এসে গেছে, অথচ গোটাপাঁচেক সময় বাকী···বড়যৌতুকটা তো, তুমি না হলে বরণ করবে কে? আসা চল, সাথে থাকিয়ে বিবি—ঐ ছুটো কাজ আমাদের দ্বারা হবার জো নেই। ও, ছুচার দিন চাকরটোলের বাড়িতে তোমাদের সামান্য অসুবিধা কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হতে পারে, কিন্তু কী করবো বল? হতভাগা ব্যাটারা কুমোর বাড়ী থেকে ঠাকুর আসতে দেখেই নেত্য সুরু করেছে।

শক্তিনাথ দ্রুত রাস্তাটাতে বাহির হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের কথা এই···বড়যৌতুকের পিছনে আসা, তার পিছনে বুক পিসী, অনুসরণার্থে সুবাস কবিরাজ ও বামুনদিদি···তার পিছনে পিসতুতো মাসী আর মাসতুতো পিসীর দল যেন ভোজবাজীর মত মুহূর্তে মিলাইয়া যায়।···কামাখ্যানাথ আগেই কাটিয়া পড়িয়াছিল, শুধু কর্ত্তা গৃহিণী ও বড় দুই ছেলে সপরিবার মহারাজজীর সামনে গুরু অপরাধের ভারে স্তব্ধ নতমস্তকে বসিয়া থাকেন।

মিনিটখানেক পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কানাই মহারাজ গভীর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহেন—আমার তো মনে হয় আর এ ভিটের জলগ্রহণ করা চলে না প্রসাদ? হওনা হওয়ার ব্যবস্থাটা করে দাও?

শুনিবামাত্র বসুগৃহিণী হাউহাউ শব্দে কাঁদিয়া উঠেন, আর বসুকর্ত্তা দুই হাতে মহারাজের পা জড়াইয়া ধরিয়া অনবরত মাথা ঠুকিতে থাকেন।·····

কিন্তু পাথরে মাথা ঠুকিলে ক্ষতিটা কার? পাথরের না মাথার?

মহারাজজীকে টলানো যায় না।

শুভিক্ষুণার হাওয়া লাগিলে নাকি তাঁহাদের সাধন ভজনের বিঘ্ন হয়। তা ছাড়া জলগ্রহণের শাস্ত্রীয় নিষেধ তো আছেই।

প্রসাদীপ্রসাদ আর গুরুদেবের সামনে বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া চমকে না···কুদ্ধ চীৎকারে বলেন—ও নিষেধ আমি ভাঙ্গাচ্ছি তুমি ভাঙ্গাচ্ছ না কেন? ঘুষ করে দেব বাড়ী থেকে, এই মজা টের পাবে। ইয়ে ছেলে মানুষের অন্তরায় সে তো পরম শত্রু। দয়া করুন প্রভু, ওর ঔদ্ধত্য, ছন্নছাড়ামি নিজের অপরাধের ফলে নিজের মাথায় পড়াবার করুন।

কিন্তু পড়াবার প্রয়োজন কি?

দুর্বিনীত সন্তানকে বরং মার্জ্জনা করা যাইতে পারে, কিন্তু দেবী প্রতিমার উপর তো মার্জ্জনা চলে না? সে যে নেতান্তই কাঁচা মাটির ব্যাপার।

প্রতিমার নির্বাসন না ঘটা পর্যন্ত এ ছিটার আরিমার কথা ভাবিতেই পারেন না কাহারই সহধর্মিণী। অমিদা গোঁসাই চোখে [illegible] পা ভিজাইয়াও নয়।

চারুক [illegible] ঠাকুর মোক্তার কাছে বাইবার মত বার ফিরিয়ে করালীপ্রসাদ [illegible] এবং পত্নিমন্দীর উদ্দেশে ঠাকুরদালানের দিকে অগ্রসর হন। কালীনাথ এবং তারানাথও যেন করি [illegible] এবিলার উদ্দেশেই পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে···কেবলমাত্র বসুন্ধরিণী মহারাজ্ঞীর দুই পায়ের উপর মাথা উপুড় করিয়া পড়িয়া থাকেন···রাহুগ্রাস বিমুক্তির মত।

কিন্তু নির্বাসন দিবেন করালীপ্রসাদ কাহাকে?

এই জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তিকে?

অপমান ঘটাইবেন কাহার?

এই বিরাট মহিমার?···দশহাতে দশপ্রহরণ বহিয়া যে বিশাল প্রতিমা আপন যোগবলের আসনে বসিয়া চিরন্তনে বরাভয় প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন তাঁহাকে সে আসন হইতে টানিয়া নামাইবে কে?

এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস কাহার আছে? করালীপ্রসাদের?

সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়!···

···ওরে, গোবিন্দ, 'শ্রীভক্তিবিলাস', 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' নূতন বর্ষের নবীন ঢেউ সব যেন মেলিয়া পুঁছিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে···সারাগ্রামের লোক উঠানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে কেন? তারা···বকুলবালা রাঙ্গির শাড়ী পরনে, শ্রীবরণডালা মাথায় লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে কি? মেলীর আমন্ত্রণ বরণ? বরাবরই এইরকম করিত না?···কিন্তু করালীপ্রসাদ এতদিন ঘুমাইতেছিলেন নাকি? কানও পুর [illegible] পড়িয়াছিল না? হঠাৎ এত আলোড়ন এত উপচার ইহারা পাইল কোথায়? মা নিজেই কি বহিয়া আনিয়াছেন নাকি মর্ত্য হাতে ধরিয়া?

[illegible] দেখিয়াই চাকীদুলির দল প্রবল উৎসাহে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য সুরু করিয়া দেয়···বর্ষশেষে পুরিবার আশা তারাও ছাড়িবে কেন? নৃত্য যত বেশী উদ্দাম হয়, কর্তার কাছে বখশিস তত বেশী মেলে···এ যে চাহিবার আগা কথা।

—গায়ের পুজোটা [illegible]···করালী? কাজটা ভাল হল? বলিয়া [illegible] আলোড়নের ফলে ওপাশে যে কালো মুখ [illegible] ঐ চালান হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন উঠোনে, তাঁর মুখ এখন আর নাই তাঁহার। প্রলয়ঝড়ে [illegible] ছারখার করিতেছেন।···কার ধর্ম, সারাগ্রামের লোক তাহাদের

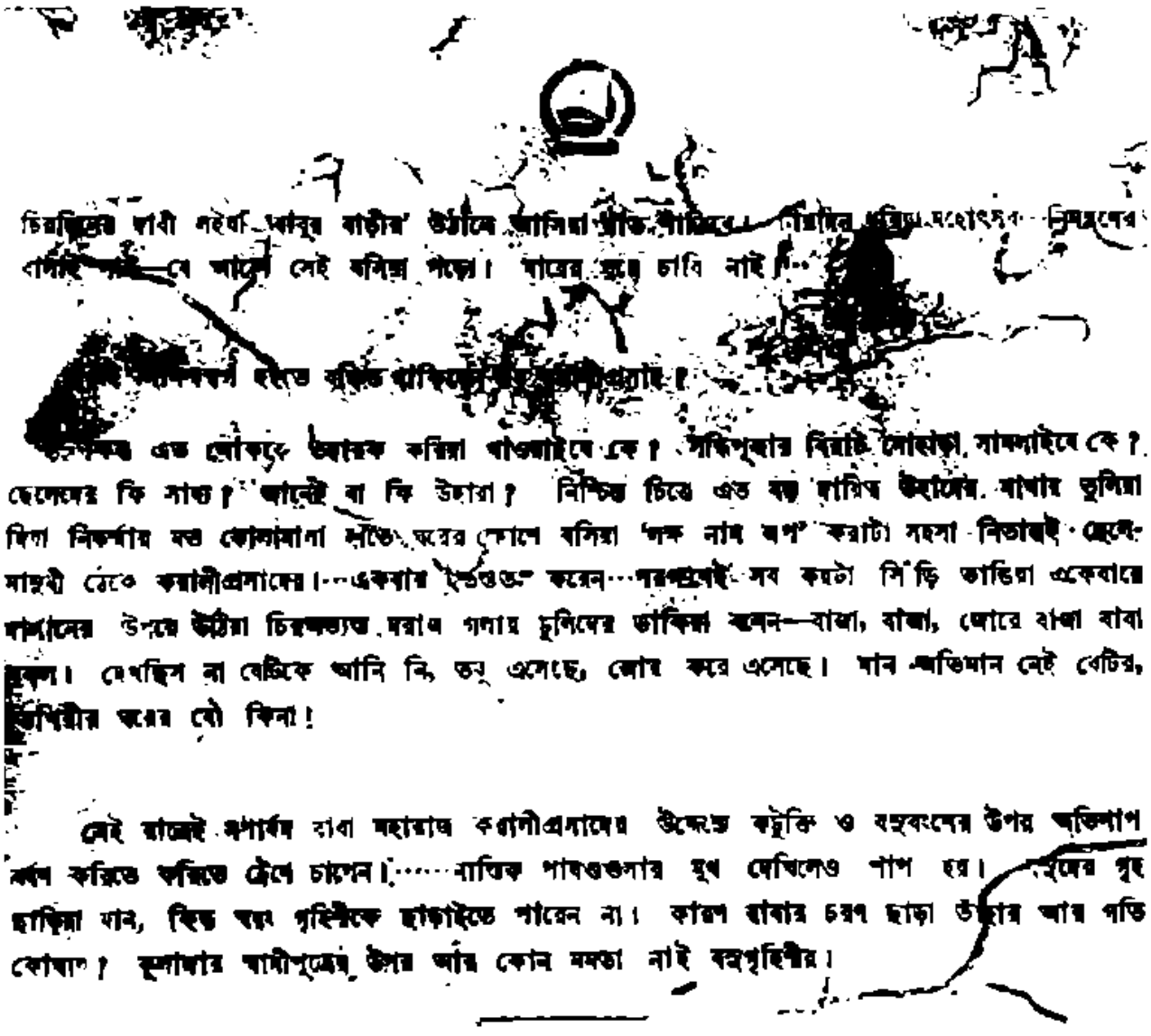

চিরদিনের দাবী লইয়া [illegible] বাড়ীর উঠানে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইবে। [illegible] বাপের বাড়ি যাবে সেই বলিয়া পড়ো। যাবের স্নেহ চাবি নাই।...

[illegible] বহিত থাকিবে [illegible]?

[illegible] এত লোকের আহার করিয়া যাওয়াইবে কে? সন্ধিপূজার বিরাট সোহাগ সামলাইবে কে? ছেলেদের কি সাধ? আহ্লাদ বা কি উহারা? নিশ্চিন্ত চিত্তে এত বড় দায়িত্ব উহাদের মাথায় তুলিয়া দিয়া নিকর্মার মত কোলাবাগান মঠের ঘরের কোণে বসিয়া 'জয় নাম জপ' করাটা সহসা নিতান্তই ছেলে-মানুষী ঠেকে কালীপ্রসাদের।...একবার ইতস্তত করেন...পরক্ষণেই সব কয়টা সিঁড়ি ডাঙিয়া একেবারে বাগানের উপরে উঠিয়া চিরঅভ্যস্ত দরাজ গলায় চুনিদের ডাকিয়া বলেন—বাবা, বাবা, জোরে বাবা বাবা বলুন। দেখছিস না বেঁচিকে আনি নি, তবু এসেছে, জোর করে এসেছে। মার অভিমান নেই বেটির, ছাপিরীর ঘরের বৌ কিনা!

সেই রাত্রেই অপার্থিব বাবা মহারাজ কালীপ্রসাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি ও বহুবচনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ঠেলে চাপেন।.....নাস্তিক পাষণ্ডগুলার মুখ দেখিলেও পাপ হয়। [illegible] গৃহ ছাড়িয়া যান, কিন্তু কখন গৃহিণীকে ছাড়াইতে পারেন না। কারণ বাবার চরণ ছাড়া উহার আর গতি কোথায়? মুলাধার স্বামীপুত্রের উহার আর কোন মমতা নাই বহুগৃহিণীর।

দুস্তর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

[ধরে নিলাম, আপনি অতি নিরীহ ভদ্রলোক...আজকের আকাশে-বাতাসে যে প্রেম-বীজাণু ছড়ানো, আপনার সৌভাগ্য, আপনার স্বাভাবিক রক্তের চাপ, সে-বীজাণুর আক্রমণ থেকে আপনি এখনো পর্য্যন্ত রেহাই পেয়ে আছেন, এমন সময়, ঝড়ের মুখে আহত পাখীর মত, এলো এক তরুণী নারী আপনার সহায় প্রার্থনা করে...আপনি সরল বিশ্বাসে তাকে আশ্রয় দিলেন...কিছু না তাকে গ্রহণ করলেন...কিন্তু সহসা সেই নারী সম্বন্ধে এমন কিছু জানলেন যাতে আপনার মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত উঠলো শিউরে...চারদিক থেকে কলঙ্কের কালো ছায়া এসে পড়লো আপনারই ওপর...মন বলে উঠলো, বিষধর সাপের মত দৌড়ে পালাও ওর কাছ থেকে

—কিন্তু পুরুষত্ব কি উঠতে পারে না তার ওপর? একদিনের একটি ভুল কি হয়ে থাকবে চির-জীবনের বোঝা?

এই সব সমস্যাই এসেছিল এই গল্পের নায়ক প্রদ্যুম্নের কাছে...আপনার মীমাংসার সঙ্গে তার মীমাংসা মিলিয়ে রেখে যদি মনে করেন সে ভুল করলো, অন্ততঃ এইটুকু প্রার্থনা তার করতে পারেন যে, এই রকম ভুলের দরুণ তার ভগবানের কাছে সুবিচার পাবে একদিন।]

১

টালিগঞ্জ হইতে ভ্যালহাউসি স্কোয়ারে বেলা নটার পর যে সব ট্রাম আসে সে গুলির অবস্থা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গ্রামের কোন বড় নিম্নশ্রেণীর বাড়ির মতো। সেই আকণ্ঠ বোঝাই গাড়িগুলিতে মানুষ লাভের জন্য প্রত্যহ যে কসরৎ করিতে হয়, তাহাতে বীরত্ব ও কাপুরুষত্বের দুয়ের দৃষ্টান্ত প্রচুর। অধিকাংশ জীবন-যুদ্ধে নাস্তিক—তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকা সত্ত্বে—এই মান-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই। আসন-নির্ণয়ের এখনো যে রীতিমত চক্রব্যূহ, তাহা ভেদ করিতে হয় সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সোহাই অথবা বলপ্রয়োগের রীতি জানা থাকিলে, তবে। এমন কত বেরে ওই চাপরুদ্ধ যান ভেদ করিয়া মহিলা আসনে গিয়া বসিতেছে। পুরুষেরাও একটু ভেদ করিয়া আসনে বসিয়া পিছনের লোকের দিকে চাহিয়া। একটু হাসে পিছনের দিকে দাঁড়াইয়াছিল একটি [illegible] রাখিয়া ও মৃদু হাসিয়া মেয়েটিকে আশ্বস্ত করিল।

আর একটি ছেলে এ মোক্ষ ছেলেটির পাশে দাঁড়াইয়া এই সঙ্কেত-লিপি শিখিতেছিল; মেয়েটি আসিয়া হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, ওই মেয়েটি আপনার আত্মীয়া?

প্রথম ছেলেটি বলিল, কেন—বলুন তো?

দ্বিতীয় ছেলেটি বলিল, না—এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

ব্যাপার হাসিতে প্রথম ছেলেটি কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, আপনিও যেন জানেন ওকে?

জানি। তারপর দু'জনে বাড়িতে থাকার আর কোন কথা হইল না।

এদিকে মুন্সিয়ানি ছাড়াইয়া ট্রাম দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল। তারপর ঘীতিমত হাতাহাতি—গালাগালি—ধাক্কাধাক্কি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কণ্ডাক্টার আসিয়া মেয়েটির কাছে টিকিট চাহিতেই—সে পিছনে চেয়াইয়া বলিল, ওই দিকে।

সে দিকে অকূল সমুদ্র। কণ্ডাক্টার বলিল, ভাল করে দেখিয়ে দিন কে?

মেয়েটি ঈষৎ উঁচিয়া পিছনে চাহিয়াই বসিয়া পড়িল। জনতার মধ্যে ছেলেটি হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় সে ঈষৎ উঁচিয়া পিছনে চাহিল। কিন্তু কোথায় ছেলেটি?

কণ্ডাক্টার বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অন্যের দিকে মনোযোগ দিল। মেয়েটি কিন্তু ভাবিয়া—ইহার বসিতে পারিল না। ট্রাম থামে; কত লোক নামিয়া যায়, আবার কত লোক উঠে। ভিড়ের ভীড়টা যেই একবার তরল হইয়া আসে, মেয়েটিও আগ্রহোদ্বেলিত দুই চক্ষু মেলিয়া ছেলেটির সন্ধান করে।

এমনিভাবে ট্রাম অনেকটা খালি হইল—অর্থাৎ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ দাঁড়াইয়া নাই। কণ্ডাক্টার পুনরায় মেয়েটির কাছে আসিয়া টিকিট চাহিতে গিয়া দেখে—তার দু'টি চোখে অশ্রুর প্লাবন। মেয়েটি কাঁদিতেছে।

মেয়েটির পাশে একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা ব্যাগ হাতে বসিয়াছিলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে রহস্যময় বলিয়া বোধ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্গে কেউ ছিলেন?

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি স্বীকার করিল।

কোথায়? কণ্ডাক্টারটি দেখিয়ে দিন।

ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটি বলিল, আমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, বোধ হয় নেমে গেছে।

বর্ষীয়সী কহিলেন, তা হ'লে তোমার ভাড়াটা—

মেয়েটি আরক্তিম মুখ তুলিয়া জানাইল—তাহার কাছে একটিও পয়সা নাই।

বর্ষীয়সী তখন ব্যাগ খুলিয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাবে কোথায়?

মেয়েটি বলিল, কোথায় যাব জানি না।

যাচ্ছিলে কোথায় ?

সেই ছেলেটি আছে।

বর্ষীয়সী বুঝিলেন—ব্যাপারে কিছু আছে। মেয়ের এত প্রশ্ন তুলিয়া এই প্রকাশ্য স্থানে সে সম্বন্ধে কথা করিতে তাঁর প্রবৃত্তি হইল না। আশে-পাশের ভদ্রব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই অনেক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন।

মেয়েটির সম্মান রক্ষার বাসনায় মাসিমা বলিলেন, আসবে পাড়ার সঙ্গে ? আমি হলুম বোর্ডিঙের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ইচ্ছে করলে—আমার সঙ্গে দু' একদিন থাকতে পারবে।

যাব আপনার সঙ্গে। মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ট্রাম তখন ডালহাউসি স্কোয়ার পরিক্রমা সারিতেছে। এদিকের চৌরঙ্গীর মোড়—[illegible] ছিল খানিকটা দূরে আর প্রচুর জনতা—তাহারাও অন্য দিকের তাড়নায় ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। ট্রামের পাশে পাশে চাহিয়া জনতা নিঃশব্দে নামিয়া গেল। সর্ব্বশেষে নামিলেন মহিলা দুইজন।

লালদীঘির ধারে একটা পামকুঞ্জের তলায় দাঁড়াইয়া লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, তোমার বাড়ী ফিরে যেতে পার।

মাথা নাড়িয়া মেয়েটি বলিল, না, পারি না। আজ সকালে আমরা পরামর্শ করে বেরিয়েছিলাম। কাজটা শেষ হলে হয় তো বাড়ী ফিরতে পারতাম।

ব্যাপারটা আবার খুলে বলবে কি ?

বলবে। কিন্তু কেউ নেই আমার যে এ বিপদে সাহায্য করতে পারেন।

বেশ তো—বলা যাক।

দুইজনে ঘাসের উপর বসিলেন। কথা বলিবার পূর্ব্বে মেয়েটি নিজের বেশ-বাস সংযত করিয়া লইল। একবার লালদীঘির নিথর জলের পানে চাহিল; সেখান হইতে দৃষ্টি উঠাইল জেনারেল পোষ্ট-আপিসের গম্বুজের উপর; সেখান হইতে দৃষ্টি নামাইয়া পামকুঞ্জে উপবিষ্ট বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া বলিল, একটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। টালিগঞ্জের যে বাড়ীতে আমি থাকতাম—সেখানে ছেলেটিও থাকতো।

বাড়ীটা বুঝি তোমাদের নয় ?

না। ছেলেটির দূর সম্পর্কের এক মাসিমার।

বুঝেছি, ছেলেটিকে তুমি ভালবাসতে।

মেয়েটি মুখ নামাইয়া বলিল, হাঁ। তারপর কাল সন্ধ্যাবেলায় ঠিক [illegible] হতে ফিরে অসবে বলে—সিনেমা আর্টের আমার [illegible]

হিন্দু মতে বিবাহ অসবর্ণ নেই।

ছেলেটি ব্রাহ্মণ—সাধারণ কায়স্থ।

ঃ—তা ছেলেটির বাবা মা এতে আপত্তি করেন নি?

তার পড়ুয়া মনকে না জানিয়ে বিয়ে দিলে—সে দিন আমাদের হয়তো

তোমার বয়স কত?

বুড়ি।

ছেলেটির?

বাইশ।

আইনে অবশ্য আটকায় না—যাক তারপর?

তারপর ট্রামে আসছিলাম দু'জনে। বলিয়া মেয়েটি চুপ করিল।

বুঝেছি—ছেলেটি সরে পড়েছে। তা এতে এত কান্নাকাটি কেন? যেখানে ছিলে—আপাততঃ। ফিরে যাও—ছেলেটির দেখা পাবে।

না—সেখানে ফিরে যাওয়া চলবে না। এ বিয়ে নীয় না হ'লে আমার মুখ দেখানো ধ

কেন—কেন? লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

মেয়েটির চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ভূমিতে দৃষ্টিতে অন্য দিকে মুখ তুলিল। মুখ তুলিয়াই পুনরায় মুখ নামাইয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, সে কথা বলতে আমা করছে—অথচ না বললেও—

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মনে মনে বিরক্ত হইলেন। এই অহেতুক লজ্জা তাঁহার ভাল লাগিতেছি ব্যাপারটা রোমান্টিক্ সন্দেহ নাই, হয় তো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—যাহার ফলস্বরূপ এই জাতীয় বিবাহ ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু ভালবাসাই যদি ইহাদের জড়িয়াছে তো অতদূর অগ্র ট্রাম হইতে নামিবার অন্তর্ধানের মেতুটা কি?

তিনি বলিলেন, আমার বোধ হয় তুমি মুখ ভুল পেয়েছ—আর সেইজন্যেই ভুল করছো ছেলেটি তোমার জানাশোনা—থাকতে তারই পাশীদের বাড়ি। যেন তো—আমি যে তোমার পাচ্ছ—

সে আর সেখানে আসবে না। সাথি—জানি সে আসবে না। মেয়েটি কষ্টে বো

তা হলে সে যাবে কোথায়? যেখানে? কোথাও তার টাকা করে না।

হাঁ—বলিয়া মেয়েটি ব্যাগের মধ্য হইতে একটা খামের চিঠি বাহির করিয়া লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হাতে দিল।

বেশ তো—এস চল সেখানে খোঁজ করা যাক।

এই কথায় মেয়ে... উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

যাব। কিন্তু তোমার বাড়ি ফিরে যাবার সত্যিই তো কারণ নেই।

মেয়েটি এক মুহূর্ত ভাবিল। তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া কানের কাছে মুখ রাখিয়া চাপা কণ্ঠে কিস্ কিস্ করিয়া কি কহিল।

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ওষ্ঠ কুহকাভ রেখা ফুটিয়া মিলাইয়া গেল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি মেয়েটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অল্প মাথা নাড়িলেন। তাঁহার অনুমানই যথার্থ।

মেয়েটি বলিল, আশা করি এ কথা কাউকে বলবেন না।

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ও কি কথার!

২

আপিসটা জমজমাট। প্রকাণ্ড হলে বহু লোক কাজ করিতেছে। সকলেই কর্মব্যস্ত। টেবিল—চেয়ার—র‍্যাক—ট্রে—ফাইল প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে মানুষকে গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। সবগুলি সাদাসোজা—অথচ মানুষের সুবিন্যস্ত শ্রেণী হইতে মানুষকে খুঁজিয়া লওয়া কত না কঠিন!

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পিতলের রেলিং দেওয়া কাউন্টারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চশমা পরিহিত একজন আধবুড়ো ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন স্যার—প্রদ্যোত রায় বলে এখানে কেউ কাজ করেন?

সম্মুখস্থ খাতাপত্রের ভদ্রলোক দেওয়াল হইতে মুখ তুলিয়া বিব্রত হইয়া উঠিলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কহিলেন, কি নাম বললেন?

প্রদ্যোত রায়।

প্রদ্যোত? অর্ধ মিনিট বিস্ময়ে স্তব্ধবৎ রহিলেন। পরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, একজন আছে—প্রমোদ। তা তিনি তো চাটুজ্জে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, আর একজন আছেন প্রভাস—তিনি তো রায় নন। আর একজন আছেন প্রবীণ, তিনিও তো—

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অধৈর্যকণ্ঠে কহিলেন, প্রদ্যোত রায়। ছোকরা; বয়স বাইশ তেইশ।

ওহো—নিউ রিক্রুটমেণ্ট মাস-কতক হলো এক ঘরের ও'দুয়ারা ঢুকেছে। সে তো ডিপার্টমেণ্ট নয়।

আমরা কোন ডিপার্টমেণ্টই জানি না। দয়া করে যদি সন্ধান করে দেন—

আচ্ছা—আচ্ছা। অনুগ্রহ করে বসুন তো। ওই সেপ্যাট ঘরে বসুন গিয়ে এবো তো নতুন ছোকরা প্রদ্যোত কি তার—হাঁ প্রদ্যোত রায় কে আছে।

না স্যার—বাইশ।

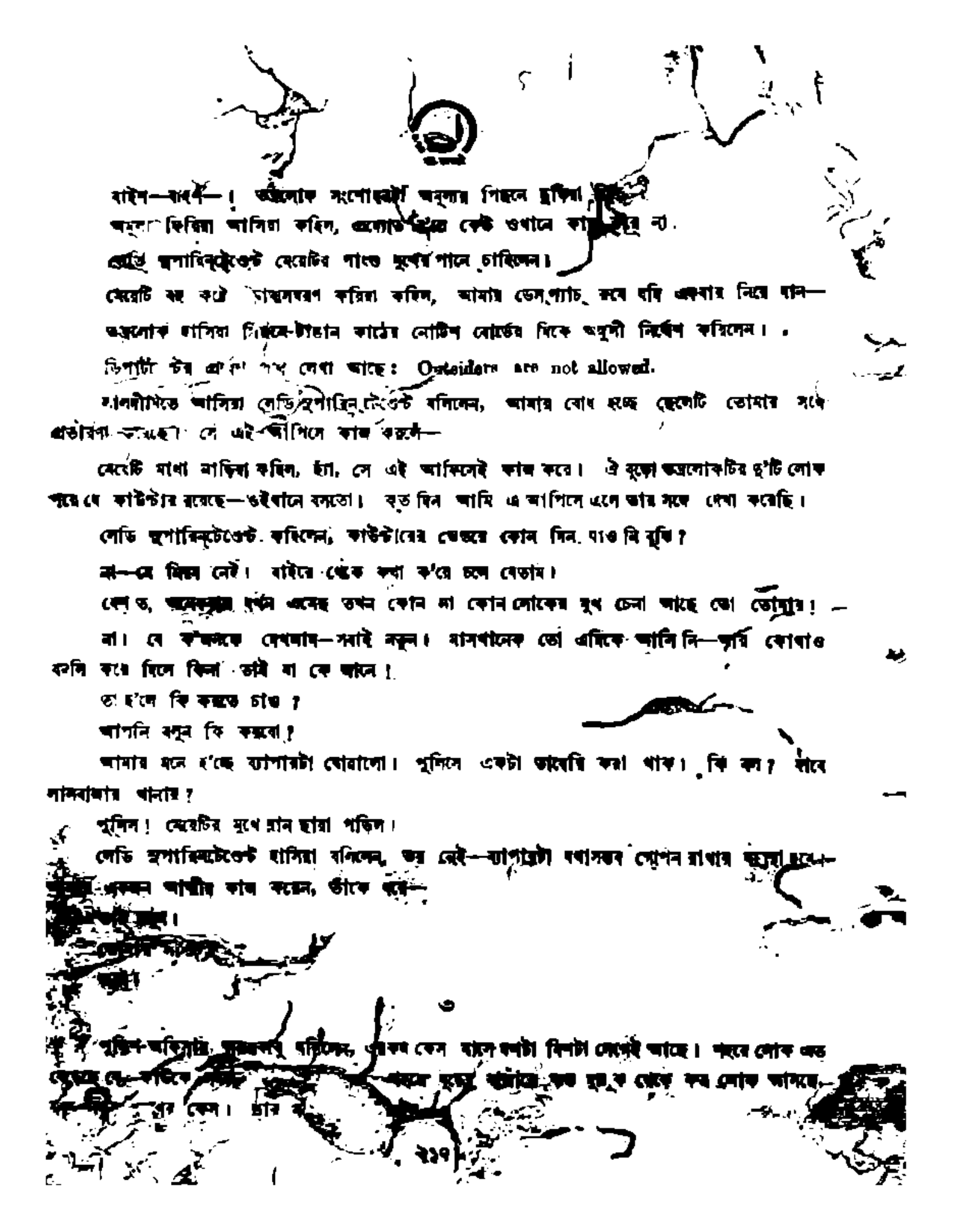

বাইশ—বাবো—। ভদ্রলোক সংখ্যাগুলি অনুচ্চার পিছনে ছুটিয়া চলিল।

অনুচ্চার ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এখানে আর কেউ ওখানে কাজ করে না.

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেয়েটির গায়ে সুখের পানে চাহিলেন।

মেয়েটি বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, আমায় ডেস্‌প্যাচ্‌ করে যদি একবার নিয়ে যান—

ভদ্রলোক হাসিয়া সিঁড়ির-টাঙান কাঠের নোটিশ বোর্ডের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিলেন।

ডিপার্টমেণ্টের প্রবেশ পথে লেখা আছে: Outsiders are not allowed.

মালদীপে আসিয়া লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, আমার বোধ হচ্ছে ছেলেটি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সে এই আপিসে কাজ করে—

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, সে এই আপিসেই কাজ করে। ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটির দু'টি লোক পরে যে কাউণ্টার রয়েছে—ওইখানে বসতো। বহু দিন আমি এ আপিসে এসে তার সঙ্গে দেখা করেছি।

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কহিলেন, কাউণ্টারের ভেতরে কোন দিন যাও নি বুঝি?

না—সে নিয়ম নেই। বাইরে থেকে কথা ক'য়ে চলে যেতাম।

বেশ ত, অন্যেরা যখন এসেছে তখন কোন না কোন লোকের মুখ চেনা আছে তো তোমার!

না। যে ক'জনকে দেখলাম—সবাই নতুন। মাসখানেক তো এদিকে আসি নি—তারি কোথাও বদলি করে দিলে কিনা তাই বা কে জানে!

তা হ'লে কি করতে চাও?

আপনি বলুন কি করবো?

আমার মনে হ'চ্ছে ব্যাপারটা ঘোরালো। পুলিসে একটা ডায়েরি করা যাক। কি বল? যাবে লালবাজার থানায়?

পুলিস! মেয়েটির মুখে ম্লান ছায়া পড়িল।

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই—ব্যাপারটা যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা হবে—

[illegible] কাজ করেন, তাঁকে বলে—

[illegible]

[illegible]

৩

পুলিস-অফিসার অনুচ্চার বলিলেন, এরকম কেস যখন একটা দিনটা দেখেই আছে। নিশ্চয় লোক আছে যেখানে [illegible] ছাড়া [illegible] ছাড়া [illegible] ছাড়া [illegible]

মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, আপনাকে ধন্যবাদ।

তিনি আর [illegible] নমস্কার করিয়া ওত্রাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন।

পরের দিন হাউসহোল্ডিংএর ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল।

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গিয়া ফোন ধরিলেন। হালো—কে? লালবাজার থানা? ও। আচ্ছা। কি বললেন? নামের গোল বাধছে, পদবী? মিলেছে। হাঁ। প্রদ্যুম্ন? হাঁ—হাঁ। আচ্ছা—যাবই? আচ্ছা। ধন্যবাদ।

ফোন রাখিয়া তিনি ওত্রাকে বলিলেন, সংবাদ পাওয়া গেল—মহা ডিফিকাল্টি দূর হয়েছে। নামের একটু গোল বাধছে। লালবাজার থেকে ফোন করে যাতে ছেলেটির সঙ্গে তোমার দেখা হয়, সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুমি গিয়ে সনাক্ত করলেই সব গোল মিটে যাবে। আমার যেতে হবে নাকি?

না—আমি একাই যাব।

কাউণ্টারের সেই আধবুড়ো ভদ্রলোক ওত্রাকে দেখিয়া বলিল, কাকে চান? ও—আপনিই তো কাল—আসুন—আসুন, ভেতরে আসুন।

ওত্রা ভিতরে গিয়া বলিল, আপনাদের সাহেব কোন ঘরে বসেন?

তাঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাব। সাহেব মানে তিনিও বাঙালী। মিঃ ঘোষ।

অফিসারের কামরা খানিকটা নির্জন। কামরার অন্য প্রান্তে একটি এ্যাংলো মেয়ে বসিয়া কতকগুলি ফাইল ঘাঁটিতেছে। সামনে তার ছোট একটি টাইপরাইটিং মেশিন। ফাইল হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া টেবিলে আপনার কাছে রাখিয়া সে খুট্ খুট্ শব্দে টাইপ করিতে লাগিল। শব্দ শুনিয়া মনে হয়, ঘোষসাহেবের সঙ্গে কথোপকথনে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

যথারীতি নাম পরিচয় জানিয়া ঘোষসাহেব বলিলেন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?

ওত্রা বলিল, আপনার এই ডিপার্টমেণ্টে তিনি কাজ করেন। তাঁর নাম—

নামের একটু গোলযোগ ঘটেছে। আপনি তাকে দেখলে নিশ্চয় চিনতে পারবেন।

পারবো।

এই আপিসে আপনি এর আগে কখনও এসেছিলেন?

অনেক বার।

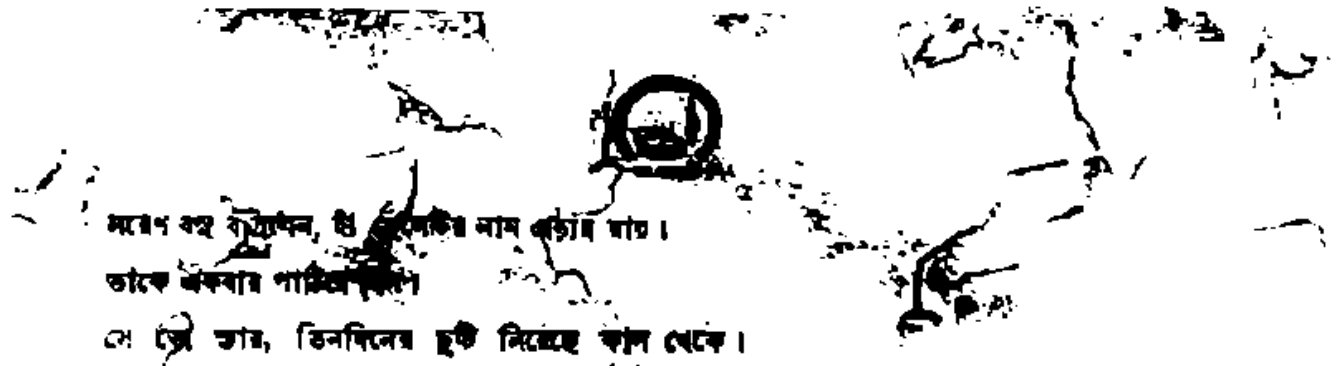

নরেশ বসু বলিলেন, ঐ ছেলেটির নাম ধীরাজ রায়।

তাকে একবার পাঠিয়ে দিবেন।

সে তো আজ, তিনদিনের ছুটি নিয়েছে কাল থেকে।

তিন দিন! আচ্ছা যান।

নরেশ বসু চলিয়া গেলে ঘোষসাহেব বলিলেন, শুনলেন তো—সে ছুটি নিয়েছে তিন দিন। পরশু আসবেন—দেখা হবে। নমস্কার।

৪

সন্ধ্যার সময় লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বলিলেন, কাল মেয়েদের কলেজ খুলবে—আজ থেকেই কিন্তু এদের বোর্ডিঙে আসতে আরম্ভ করেছে। তোমাকে অন্য জায়গায়—মানে দু' একদিনে অবশ্য কিছু হবে না—কিন্তু—পাকাপাকি একটা কিছু।

শুভ্রা বলিল, আপনাকে তো জানিয়েছি আমার থাকবার জায়গা কোথাও নেই।

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বলিলেন, যদি তোমাকে—আর্য-সমাজে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়—দেখেন। সেখানে হোক একটা আশ্রয় পেলে আমি বাঁচি।

সেখানে হোক নয়—ভাল এবং নিরাপদ আশ্রয়ই ব্যবস্থা করেছি। তোমার কোন ভাবনা নেই। মিশনের সেক্রেটারির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়েছেন।

তাহলে আজই ব্যবস্থা করে দিন।

আজ রাতটা থাক, কাল সকালে বরং—

কাল কতদূর?

এই তো তিনখানা বাড়ীর পরে—

তাহলে চলুন—ওখানে যাই। বোর্ডিঙের সুনাম যাতে নষ্ট হয় এমন কাজ করা উচিত নয়।

একটি মেয়ে—তাকে কি এখন ছাড়তে হবে!

আপনি আমার জন্য যা করেছেন, চিরদিন তা মনে রাখবো। আমারও একটা কর্তব্য আছেই তো।

নিজের পায়ে ভর দিয়ে যাতে স্বাধীনভাবে বাঁচতে নিজের আয়না করে নিতে পারেন, সেই সাহায্য আমরা যেটুকু পারি করব।

ভদ্রা বলিল, কিন্তু আপনার ইতিহাস শুনলে—

সেক্রেটারী বলিলেন, শোনবার দরকার নেই। ভুল দুর্বলতা—সাধারণ মানুষের আছেই, তাকে শোধরাবার অবকাশ না দেওয়াটাই পাপ।

ঘোষসাহেব আপিসে আসিয়াই নরেশ বসুকে ডাকিলেন। তিনি আসিতে বলিলেন, আজ প্রয়োজন না থাকায় এসেছে?

এসেছে।

মনে আছে তো—মেয়েটি আজ আসবে। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা আপনারাই করবেন।

নরেশ বসু বলিলেন, দেখুন স্যার, ব্যাপারটা জটিল। এ সব বিষয়ের ওকালতী আপনার সামনে দাঁড়ানো চলে।

ঘোষসাহেব বলিলেন, দেখুন আমার ঘরে বিচারশালা বসালে আপিসের ক্ষতি। কখন ডিরেক্টার বা কোন পার্টনার এসে পড়বেন—কোন একটা রিমার্ক তাঁরা করতে পারেন। তার চেয়ে বরঞ্চ—এ আর এমন শক্ত কেস কি? ছেলেটিকে ডাকিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন—তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আজ্ঞে, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এই দেখুন চিঠি, বোর্ডিঙের লেডি সুপার দিয়েছেন। মেয়েটির অভিযোগ অত্যন্ত সীরিয়াস।

পত্র পড়িয়া ঘোষসাহেবের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। কহিলেন, এমন একটা বিশ্রী-ব্যাপারের কি মিমাংসা আমরা করবো! মেয়েটির মেডিক্যাল সার্টিফিকেট এক আদালত সাব্যস্ত করতে পারে।

আদালতেই হয় তো শেষ পর্যন্ত দিন স্থির হয়ে যায়। নরেশ বসু একটু থামিয়া বলিলেন, যদি আপিসের কর্মী এ-ব্যাপারে জড়িত না থাকতো—

ঘোষসাহেব বলিলেন, তা কর্মচারীদের প্রাইভেট লাইফ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই বা এত মাথা ব্যথা কি?

মাথা ঘামাবার কথা নরেশ বসু বলিলেন, সত্যিই আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না—যদি না পুলিস এসে হাজির হতো। গত তিন দিন থেকে অনবরত কোন আপিস আসবার খোঁজে—ছেলেটির সম্বন্ধে ঠিক জানবার জন্য।

পুলিসের নামে ঘোষসাহেব দমিয়া গেলেন। কহিলেন, তা আমরা কি করতে পারি?

কেসটা যাতে কোর্ট পর্যন্ত না গড়ায় তাই চেষ্টা করতে হবে।

বেশ ভাইপো, আমাকে আর টানবেন না।

নরেনবন্ধু বলিলেন, ব্যাপারটা সোজা নয় কহিলাম এইজন্যে যে, ছেলেটিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে অস্বীকার করছে।

কি! ঘোষসাহেব সোজা হইয়া বসিলেন, মুখের রেখায় তাঁর ভ্রূকুটি।

যখকালে কোন কাজ হবে না সার। কৌশলে সব জেনে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘোষসাহেব উগ্র দৃষ্টিতে নরেন বন্ধুর পানে চাহিয়া বলিলেন, কৌশল কিসের? ছেলেটি যে এ ব্যাপারে জড়িত, তা কি অস্বীকার করতে চায়?

আজ্ঞে—ঠিক অস্বীকার নয়, তবে—

আচ্ছা যদি অস্বীকার করে, পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে। মেয়েদের সঙ্গে গাড়ু করা মানে পথে দাঁড়িয়ে ছেলেখেলা! খেলা শেষ হলো অমনি ধুলো ঝেড়ে হাত পা ধুয়ে ঘরে ওঠা।

নরেন বসু প্রায় দুয়ারের কাছে গিয়াছেন, ঘোষসাহেব ডাকিলেন, শুনুন—আমার শেষ কথা। ছেলেটি স্বীকার করুক না করুক মেয়েটিকে বিয়ে করতে ও বাধ্য। হি ইজ লায়েবল টু—কথা শেষ না করিয়া টেবিলে প্রচণ্ড একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

৬

ঘোষসাহেবের ব্যাপারটি আপিসে একটা করিতে নিজের করিয়া নিয়াছেন।

নরেন বসু তাঁহার সহকারী অমল মিত্রকে কানে কানে সবটা বলিয়া-কহিয়া দিয়াছেন—কথামত ঘোষসাহেব জানতে পারলে—

অমল মিত্রও তাহার এক অন্তরঙ্গ সহকর্মীর কানে তুলিয়া বলিয়াছে, সাবধান, ঘোষসাহেব জানতে পারলে—

কত টুকুই বা সময়! ইতিমধ্যে প্রদ্যুম্নের সমবয়সী এক ছোকরা আসিয়া হঠাৎ তাহার হাতখানি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিয়াছে, সাবাস!

প্রদ্যুম্নের চেয়ে পাঁচ বছর বয়সে বড় মহিম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছে, কনগ্রাচুলেশনস্!

আরও কতদিন—কত বছর হইতে মুকুলকে উদ্দেশ করিয়া যেন বলিল, তুমি তুমি এত খেলে নিজের বাবা চেনে না! ধাঁধাঁ!

শচীন মধ্য বিচারীর কহিল, কলম পিশবি না তো করবি কি? আপিসটি কি প্রেম করবার জায়গা?

শচীনদা তুমি রবীন্দ্রনাথ পড় নি। কবি কি বলেছেন জান? 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে'।

যাও—বাবু হে! আমাদের কালে প্রেম অত সস্তা ছিল না।

সতীশ বলিল, তোমাদের কালে প্রেমই ছিল না শচীনদা—তা সস্তা আর আজা!

না, কত হয়েছে তোমাদের কালে। রাস্তায়, ঘাটে, লেকে, পড়েশাঠে, সিনেমায়। এখন আপিসেও পড়ালো।

ওই ঘোর। তোমাদের কালে অনেক দূর গড়াতো যা—তা প্রেম নয়—আর কিছু।

নরেশ বসু প্রদ্যুম্নকে ডাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। ডেস্প্যাচ টেবিলে ভারি জিনিষ রাখা বা ঘেঁসড়ানোর শব্দ শোনা যায় না—খাতার আলোর পাতাও খড় শব্দও না। বৃদ্ধ হরিপ্রসন্ন প্রত্যেক মিনিটে খুব খুব করিয়া কাসেন এবং ছোকরা প্রুফ পাঁচ মিনিট অন্তর নাকে নস্য টানিয়া রুমাল দিয়া নাকটা ঝাড়িয়া একটা অদ্ভুত শব্দ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মুহূর্তে হরিপ্রসন্নর কাসি ও রমেনের নস্য লওয়ার বেগা দুইটি ঢাল হইয়া গেল।

হেডক্লার্ক নরেশ বসু কিন্তু কড়া প্রকৃতির লোক। হাঁচি—কাসি—নস্য লওয়ার শব্দ—ফিস্‌ফিসানি প্রভৃতিতে বিরক্ত হইয়া বলেন, আপিস ডিসিপ্লিন বলে কোন জিনিষ বাঙ্গালীর নেই। বড় বড় অফিসে ডিউটির সময়। তার মধ্যে সামান্যকারণে অর্থাৎ মিনিট তিন চার যাত্র জন্য নিজের ঘরে—আর কারুর কাছেও হাঁচি-কাসিকে অনুসরণ করিয়া ফিস্‌ফিসানিও নূতন আকারে গজাইয়া উঠে।

এ হেন নরেশ বসুও বলিলেন, সব কাজ ছেড়ে চুপ চাপ বসে কেন?

অতঃপর কলম চলিল বটে— কাজ বিশেষ অগ্রসর হইল না।

নরেশ বসু বলিলেন, যা প্রমাণ পাওয়া গেছে—তাতে তোমার ঘাড়েই সব দায়িত্ব পড়ছে সব খুলে বল।

প্রদ্যুম্ন ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশ। শ্যামবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে গড়ন। মুখখানি বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল বড়, আর পাঁচজন বাঙ্গালী যুবকের মতই। মাথা নিচু করিয়া সে কহিল, আমি কি বলবো আর—আমি নির্দ্দোষ।

নরেশ বসু বুঝিলেন—ছেলেটি ইতিমধ্যে অনেক কিছু প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে হয়তঃ করিয়াছে

নিজের সহকারীকে ডাকিয়া বলিলেন, অমল, এই প্রহ্লাদবাবু কি বলেন শোন তো। আমি ঘোষ সাহেবের ঘর থেকে আসচি। বলিয়া প্রহ্লাদকে চক্ষুলজ্জার হাত হইতে রেহাই দিয়া উঠিয়া গেলেন।

অমল মৃদু হাসিয়া বলিল, বসুন। একালের ছেলে, প্রেম করে অত ঘুবড়ে পড়েছেন কেন? বলুন তো আপনার প্রেম কাহিনী।

প্রহ্লাদ লজ্জিত মুখে বলিল, আপনারা যা ভাবছেন—তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

অমল বলিল, বলুন তো—কি ক'রে মেয়েটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'লো?

প্রহ্লাদ বলিল, মাস তিনেক আগে আপিসের ছুটির পর আমি আর আমার এক বন্ধু লালদীঘির ওপর দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। বা হাতে যেখানে পাম ঝোপ আছে, তার তলায় বসে একটি মেয়ে কাঁদছে দেখলাম। কাঁদছে তো কাঁদছেই। আমি এগিয়ে আসছি—বন্ধু আমার হাত ধরে টেনে বললে, মেয়েটি বোধহয় কোন বিপদে পড়েছে—ওকে ফেলে যাওয়া আমাদের উচিৎ হবে না।

অমল হাসিয়া বলিল, তরুণী মেয়ে দেখলে তরুণ ছেলেদের শিভালরি খানিকটা জেগে ওঠে। তার পর?

আমরা ফিরে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

তার কান্নার আমরা কূল কিনারা হ'লাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? সে বললে—সে খুবই বিপদে পড়েছে। আজ সকালে তার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলো ময়দানে। আত্মীয় তাকে এইখানে বসিয়ে রেখে কোথায় যে গেলেন তার পাত্তা নেই। এখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে—তিনি যদি না ফেরেন—তাই অসহায় ভাবে মেয়েটা কাঁদতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কতক্ষণ বসে আছেন এইখানে?

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আপিসের ঘড়ির পানে চেয়ে সে বললে, পাঁচটা হবে। একটার সময় তিনি গেছেন— এখন ছটা।

স্তম্ভিত কণ্ঠে বললাম, যে কলকাতার রাস্তা—গাড়িঘোড়ার ঢাপা পড়াও আশ্চর্য নয়। যাই হোক আমরা না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন কি? না হাসপাতালে খবর নেবেন?

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ সুরে বললে, যা করবার করুন আপনারা—আমার পা-হাত কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে কলকাতায় আসেন নি?

মাঝে মাঝে বৈকি। বাবার সঙ্গে, দাদার সঙ্গে। পায়ে হেঁটে কখনও তো বেড়াই নি—এর পথ ঘাট চিনি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের বাড়ি কোথায়?

যাওয়া লাইনের কোন একটা ষ্টেশনের নাম বললে মনে নেই।

বললাম, তা আপনাকে যদি ধাওড়া ষ্টেশনে গাড়িতে তুলে দিই, একলা চিনে যেতে পারবেন তো?

প্রশ্নটা শুনে সে বললে, না। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি চার মাইল।

বন্ধুকে বললাম, তোমার বাড়িতে—

বন্ধু বললে, আমি থাকি মেসে। তুমি তো আত্মীয়-বাড়িতে থাক, সেখান বরঞ্চ—

তাই হ'লো। আমার দূর সম্পর্কের এক মাসির বাড়ি টালিগঞ্জে—সেইখানে ওকে নিয়ে গেলাম।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটির যে আত্মীয় নিখোঁজ হয়েছিল, তাঁর সন্ধান পান নি?

না। টালিগঞ্জে আসবার আগে কলকাতার বড় দুটি হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছিলাম। কোনও সন্ধান পাই নি।

অমল বলিল, আপনার কি সন্দেহ হয় নি মেয়েটির কথায়? যাই হোক, তারপর মেয়েটিকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে বলিল, দিতে চেয়েছিলাম। উনি বললেন, ভাইয়ের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে, সেখানে যেতে চান না।

কেন বাবা?

বাপ তিন মাসের জন্য হেডঅফিস না শিবপুরদায় চেঞ্জে গেছেন। তিনি না আসা পর্যন্ত ওই বাড়িতে উনি থাকতে চাইলেন। মাসি ঘর ভাড়া দিতেন, একখানি আলাদা ঘর নিয়ে—

বুঝলাম। মেয়েটির খরচ চালাতো কে? আপনি?

প্রশ্নের উত্তর দিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

অমল বলিল, আর একটি কথা। মেয়েটি যে আত্মীয়ের সঙ্গে এখানে এসেছিল তাঁর নাম আর বয়স আপনাকে বলেছিল?

হ্যাঁ—নামটা তার ঠিক মনে নেই—কি যেন বেন। বয়স পঁচিশ।

অমল বলিল, এই পর্যন্ত যা বললেন তাতে কোন গোল নেই, এইবার আসছে রোমান্সের পালা। আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো—মেয়েটির সঙ্গে আপনি কি ভাবে মিশতেন? আচ্ছা বলবেন না—সত্যি বলুন।

এক মুহূর্ত থামিয়া প্রত্যুত্তর বলিল, যে ভাবে মেয়েদের সঙ্গে মেশেন—

অমল হাসিল, কেন লজ্জা দিচ্ছি—আপনি নিশ্চয় বুঝছেন। মেয়েটি যা বলছে—তা সত্য হ'লে ওপরের against-এ সীরিয়াস চার্জ আসে।

প্রদ্যুম্ন পাংশু মুখে বলিল, কি চার্জ?

অমল বলিল, এ্যাভাল্‌ট্‌। আপনি বোধ হয় জানেন মেয়েটি সন্তানসম্ভবা।

প্রদ্যুম্ন পাংশু মুখে অমলের পানে চাহিয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, না, সত্যি বলছি আমি নির্দোষ। বড়জোর বেশি—

অমল হাসিয়া বলিল, বড়তেই বিপদ বেশি সবক্ষেত্রে। আপনি অস্বীকার করলেই রেহাই পাবেন না—ব্যাপারটা পুলিস পর্য্যন্ত গড়িয়েছে।

পুলিস! প্রদ্যুম্ন আর কোন কথা বলিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারের পিঠে মাথা এলাইয়া দিল।

দূর হইতে অনেকেই ব্যাপারটা জানিবার আগ্রহে কাজ-কর্ম বন্ধ রাখিয়া এইদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিলেন। প্রদ্যুম্ন চেয়ারের পিঠে মাথা রাখিতেই কেহ কেহ ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

অমল উত্তর দিবার পূর্বেই ঘোষসাহেবের চাপরাসী আসিয়া জানাইল, ঘোষসাহেব সেলাম জানাইয়াছেন।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, ঘোই জেনানা হ্যায় উ কামরেমে?

চাপরাসী বলিল, জী হাঁ।

অমল বলিল, আপনারা যে যার সিটে গিয়ে বসুন—বড়বাবু আসছেন।

নরেন বসু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, যাও হে অমল, তোমার এনকোয়ারির কল সাহেবকে জানাও গে।

৮

ঘোষসাহেবের ঘরে তখন মেয়েটি ছিল না।

অমল আসিতেই ঘোষসাহেব বলিলেন, মেয়েটিকে পাশের কামরায় লেডি টাইপিষ্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনার এদিকে কতদূর? ছেলেটি বিয়ে করতে রাজী?

অমল বলিল, বিয়ে তো দূরের কথা—ছেলেটি যা বলে তাতে মেয়েটিও তো সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে হয় না।

মানে? ঘোষসাহেব পাইপ কামড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন।

সংক্ষেপে সবটুকু বলিয়া অমল মন্তব্য করিল, ছেলেটির মতে এ ব্যাপারে আর কারও হাত আছে।

ঘোষসাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, যত সব কিম্ভূত কিমিস, এ সব আপিসে ভিড় করতে হয়। আমি চাই, আজ দু'দিন সময় দিলাম—দু'দিনের মধ্যে প্রদ্যুম্নর কাছ থেকে হাঁ কিংবা না চাই।

অমল চলিয়া আসিতেছে, পাশের ঘরে কৌতূহল ভরে উঁকি মারিয়া দেখিল। শুধু অমল নয়—আপিসের প্রায় প্রত্যেক কেরাণী নানা ছুতায় ওই ঘরে একবার করিয়া উঁকি মারিয়া গিয়াছে। ও-ঘরেও উঁকি মারিতেছে—এবং প্রত্যেকেও আর একবার ঘাস করিয়া দেখিতেছে। এযা দু'জন বইয়ে-পড়া নায়ক-নায়িকার মত আপিস-রাজ্যে বিশেষ বিস্ময় বাধাইয়া দিয়াছে। আকস্মিকের রহস্যজনক রোমাঞ্চটি দুইজনকে রূপকথার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়াই প্রতিদিনের মেয়া প্রত্যহ হইয়াছে অসাধারণ।

উঁকি মারিয়াই অমল কিন্তু বিস্মিত হইল। মেয়েটির মুখ যেন চেনা চেনা। এই সময়ে পর্দাটা ঘুরাইয়া একপাশে সরিয়া যাওয়ায় অমলের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিল।

অমলদা!

স্ত্রীকণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। অমল ফিরিল।

শুভ্রা হাসিয়া বলিল, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি শুভ্রা। আপনি এই আপিসে কাজ করেন বুঝি!

অমল মাথা নাড়িল।

দেখুন—বড় বিপদে পড়ে ক'দিন থেকে এখানে হাঁটাহাঁটি করছি। আপনাদের অফিসার কলেজে—

অমল বলিল, হেডমাস্টার কোথায়।

সিমলতলায়। দাদার সঙ্গে প্রাণীর বনিবনাও নেই বলে বাড়ি ছাড়লাম। আপনাদের আপিসে শুনেই তো লোক নেয়, আমাকে যদি—

তুমি চাকরী করবে? টাইপরাইটিং জান?

জানি। দু'দিন টাইপ দিলে কয়টি শব্দ ঘাড় করাতে পারি।

সিকস্টি না হ'লে এখানকার কাজ চলবে না।

একমাসে সিকস্টি তোলবার আশা রাখি।

আচ্ছা—সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবো, বলিয়া অমল পলাইয়া আসিল।

ঘোরঘোড়ার হরিপদ দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। অমল আসিতেই সে চাপিয়া ধরিল,

কিছু জান না? তোমারই বোন—

অমল বলিল, দেখুন আপনার বয়স হয়েছে, ছ্যাবলামি করবেন না। আমার দূর সম্পর্কের বোন হলেও ওদের খোঁজ খবর বিশেষ জানি না।

হরিপদ দমিল না—হাসিও থামাইল না। শুধু কহিল, তাই বল।

পনেরো মিনিট পরে হরিপদর ছাব্বিশটি চরমতমরূপে প্রকাশ পাইল। আপিসের প্রত্যেক কেরাণী আপিস, প্রত্যেক দলের রোমান্টিক তদ্রাপতি।

৯

পরের দিন লালবাজার হইতে পুলিশ-অফিসার অনন্তবাবু আসিয়া ঘোষসাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। ব্যবস্থা হইল, নায়ক-নায়িকা দুইজনকে পৃথকভাবে জেরা করিয়া প্রকৃত মত উদ্ঘাটন করা হইবে। এবং জেরা চলিবে ঘোষসাহেবের সম্মুখে। প্রথমে প্রদ্যুম্নের ডাক পড়িল।

নাম, ধাম, ঘটনা যথারীতি জানিয়া অনন্তবাবু বলিলেন, আপনার জানমত আপনি বলছেন—মেয়েটির এই বিপদ সম্বন্ধে আপনার কোন দায়িত্ব নেই?

প্রদ্যুম্ন এই কয়দিনের জেরায় ও বিদ্রূপে বরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সৌজন্য নম্র ভাবটি তার নাই। মুখ তুলিয়া—স্পষ্ট করেই কহিল, না।

আপনি ওর সঙ্গে কি ভাবে মিশতেন? আপিস থেকে বাসায় গিয়ে দু'জনে এক সঙ্গে বেড়াতে যেতেন?

যেতাম।

কোথায় যেতেন?

কোন দিন লেকে—কোন দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে।

অনন্তবাবু মৃদু কি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফিরতেন কখন?

রাত ন'টা দশটার মধ্যে।

আপনাদের মধ্যে কি গল্প হ'তো? মানে কি আলোচনা—

সব রকম নেই। খুচরো আলোচনা—চাকরির কথা—

সিনেমার সম্বন্ধে আলোচনা হ'তো না? আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে?

তাও মাঝে মাঝে হ'তো।

অনন্তবাবু পুনরায় মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসেন বুঝি? সপ্তাহে ক'দিন যান সেখানে?

মাসে দু'দিন আমরা সিনেমায় যেতাম।

আপনারা মানে উনিও যেতেন। আর কেউ যেতো সঙ্গে?

না।

গাই শোনে যেতেন বোধ হয় ?

না—হুঁচার খি ছিলে।

অনন্তবাবু আঙুল থামিয়া কি ভাবিয়া নূতন উদ্যমে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা-সভাতে বলেছেন, কোন্ কোন্ লেখকের লেখা আপনাদের ভাল লাগে ? মানে আধুনিক লেখকদের নিশ্চয়ই ভাল।

হাঁ।

বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ বাতিল হ'য়ে গেছেন—এ ধারণা আপনাদের হয় কি ?

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

অনন্তবাবু বলিলেন, আচ্ছা কোন্ আধুনিক লেখকের কোন্ বইখানা আপনাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে—আর তা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছেন ?

তা মনে নেই। যখন যে বই পড়ি—আর সে বই যদি ভাল লাগে—তাই নিয়ে খানিক দেখা হয়।

আচ্ছা এমন কোন বই কি আপনার ভাল লাগে নি—যার নায়িকা ভালবেসে নায়কের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করেছে কিংবা ভালবাসাহীন বিবাহকে সমাজের অভিশাপস্বরূপ মনে হয় নি ?

ক্ষমা করুন—অত মনে করে আমরা বই পড়ি নি, বা আলোচনা করি নি।

একটু থামিয়া অনন্তবাবু বলিলেন, তা হলে আপনি বলতে চান—আপিস থেকে বাড়ি ফিরে ছেলেকে নিয়ে রোজ লেকে বা আর কোনখানে বেড়াতে যেতেন তা সম্পূর্ণ নির্দোষ ? মেয়েটির এই অবস্থার জন্য আপনি দায়ী নন ?

না।

মেয়েটির আর কোন পুরুষ বন্ধু আপনাদের বাড়িতে আসতো ?

না।

অনন্তবাবু একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন, আচ্ছা—আপনি যেতে পারেন।

সে চলিয়া গেলে অনন্তবাবু হাসিয়া বলিলেন, আধুনিক জন্তুজ্ঞানের বড় কঠিন। একটি কথা আপনার লেডি টাইপিষ্টকে দিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করান তো ? অর্থাৎ ছেলেটিকে ও দায়ী করতে চায় কিনা ?

নরেন বহুর মারফৎ লেডি টাইপিষ্টকে প্রশ্নের তাৎপর্য্য জানানো হইল।

ঘোষালসেন বলিলেন, ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো—

অনন্তবাবু হাসিলেন—আপনি তো বোঝা উপায় বাতলে দিলেন। ক্রিমিনোলজি জিনিসটা অত সোজা নয়। আর সত্যিই যদি ছেলেটি নির্দোষ হয়—জোর ক'রে ওর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিলে—দু'জনে কি সুখী হবে ?

তা হলে উপায় কি?

শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটি সম্বন্ধে ডাক্তারী রিপোর্ট চাই। ছেলেটির সঙ্গে আলাপের সময় থেকে ওর মানুষের একটা মোটামুটি হিসেব পেলে জিনিসটার ফয়সালা হবে আশা করি।

ধরুন প্রমাণ হ'লো ছেলেটি নির্দোষ—

আগে প্রমাণ হোক নির্দোষ—তারপর সে ব্যবস্থা। আচ্ছা উঠি।

মেয়েটিকে জেরা করবেন না?

ডাক্তারী রিপোর্ট পেলে পর ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো—নমস্কার।

ঘোষসাহেব সুরেশ বসুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আপিসের মধ্যে এই ব্যাপার—এতে কার্শের সুনামের ক্ষতি হয়। আপনি ছেলেটিকে ডেকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন—বিয়ে করতে রাজী কিনা? ও রাজী হলে মিটমাট দিয়ে ওপরওয়ালাকে ভুলে দেওয়া যাবে। আর এক মাসের বোনাস।

সুরেশ বসু বলিলেন, পার্টনাররা যদি একমত হন—

ঘোষসাহেব পার্টনার প্রেমচাঁদের মত নিয়েছেন, এবং জানিয়েছেন অন্যান্য পার্টনারদের মতও এর সঙ্গে মিলবে।

আচ্ছা। আর না জানিয়ে ডাক্তারী রিপোর্টটার জন্য অপেক্ষা করা যায় নয় কি?

তা যাইই। মোট কথা এই বিশ্রী ব্যাপার থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। যত শীঘ্র হয়—সেই ভাল।

১০

নিষ্কৃতি সেদিন যোড়াসাঁকোর অফিসে ছিল না। ওরা আসিয়া বলিল, আমাকে একটা চাকরি দেবে স্যার? ঘোষসাহেব ভিজিটর স্লিপটি টাইপিস্ট মেয়েদের আস্তানায়।—

চাকরি?

হাঁ—চাকরি পেলে আমি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি।

ঘোষসাহেবের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কী লাভ করিয়া বেড়ায় যে সব মেয়ে—তাহাদের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। প্রথমটা মেয়েটির অসহায় অবস্থা তাঁহার করুণা উদ্রেক করে, যে সমস্ত জানিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নীরস কণ্ঠে কহিলেন, না—চাকরি নেই।

তাহার কণ্ঠস্বরে ওরা আহত হইয়াছে বোঝা গেল। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া সে শুধু বলিল, নমস্কার।

ঘোষসাহেব বুঝিলেন এতখানি আবাঢ় দেওয়া তাঁর উচিত হয় নাই। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া মনোযুদ্ধ ভদ্রাকে বলিলেন, চাকরি আপনাকে দিতে পারবো না—সেজন্য দুঃখিত। তবে ছুকরাকে যাতে পান—সে চেষ্টা করবো।

ধন্যবাদ। ভদ্রা চলিয়া গেল। ঘোষসাহেবের মনে হইল—কণ্ঠে তার প্রচ্ছন্ন পুরিহাস।

কয়েকদিন পরে ডাক্তারী রিপোর্ট লইয়া অনন্তবাবু দেখা দিলেন।

আপনার অভিমতই ঠিক মিঃ ঘোষ। ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া দরকার।

ঘোষসাহেব প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, ডাক্তারী রায় ছেলেটি যদি না মানে!

তা হ'লে আদালতে উঠবে ব্যাপার। ছেলেটি নিষ্কৃতি পাবে বলে বোধ হয় না।

জোর করে ভালবাসা জন্মাবেন?

ভালবাসা না জন্মায়—মেয়েটি খোরপোষের দাবি জানাতে পারে। করবার সময় তাল দেখেছিল আর বিয়ে করবার বেলায় পিছোলে হবে কেন?

তা বলেও মনের সুখ—

অনন্তবাবু হাসিলেন, মনের সুখ—কটা মানুষের হয়? এই যে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ দম্পতি আছেন, সে প্রশ্ন ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিলেন।

তিন দিন পরে আবার আসবো—আপনাদের মতামত জানাবেন। ব্যাপারটা যাতে আদালত পর্যন্ত না গড়ায় সেই চেষ্টা করবেন। নমস্কার।

আঃ—আলাতন। ঘোষসাহেব সজোরে কলিং বেলে ঘা দিলেন। চাপরাসী দ্বার পথে মুখ ঢুকিতে ঢুকিতে গর্জন করিয়া উঠিলেন, বাবুসাহেব।

নরেশ বসু আসিলে বলিলেন, সামান্য একটা কেস মেটাতে আপনাদের কত দিন সময় লাগে বলুন তো!

নরেশ বসু মতামত পাইয়া কহিলেন, কোন্ কেসটা স্যার?

আঃ—সব ভুলে গেছেন! ওই যে প্রদ্যোত না প্রদোষ—

প্রদ্যুম্ন বসু সংশোধন করিলেন।

হাঁ—হাঁ। অমন কটমট নাম হ'লে অবিশ্যি আদিলে চাকরি দেবেন না। কি করলেন প্রদ্যুম্ন?

আজ্ঞে—ডাক্তারী রিপোর্ট না এলে—

রিপোর্ট পাওয়া গেছে। ছেলেটাই দোষী।

বেশ তো—ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যাক—

ও একলোবার ডাকাডাকি বুঝি না—যা হয় কিছু করে ফেলুন আজই।

ওকে যদি ডিস্‌মিস্ করেন—

অসম্ভব! তিন আপনি অত্যন্ত ডাল্ হয়ে পড়ছেন মিঃ বাহু। আপিস থেকে ডিস্‌মিস্ করলেই আপিস ছেড়ে দেবে? আর তি অহ্ আই-তে বিনা দোষে ডিস্‌মিস্ ক'রে ফেলে যাই আর কি!

তবে কি করবো সার?

সেদিন যা বলেছি—ওকে রাজী করান বিয়ের। মোটা কিস্‌ট—বোনাস্—

এতে করে এরা সিনিয়র—

আঃ—সিনিয়রিটির কোচ্চেন এতে আসতেই পারে না। এটা হ'লো একদম্ অর্ডিনারি—

আচ্ছা তাই বলবো। যদি রাজী না হয়?

রাজী হবে না? টেবিলে চাপড় মারিয়া ঘোষসাহেব কহিলেন, নিশ্চয় রাজী হবে। না হয়—

অমনেজার আবিয়া বলিলেন, কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

নরেশ মস্ত আপাতে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা।

বড় বড় অফিসারেরা এই সব সামান্য ব্যাপারে কত যে অসহায়!

১৭

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিশনে আসিয়া দেখেন শুভ্রা তাহার বিছানার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। ঘুমাইতেছে কি জাগিয়া আছে বুঝা দুষ্কর।

দুয়ারটা শব্দ করিয়া ভেজাইয়া দিতেই শুভ্রা মাথা তুলিল, এবং লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বালিশে মাথা গুঁজিয়া নিশ্চল হইয়া গেল। তাহার পিঠের কাছটা ঘনিয়া ঘনিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তিনি বুঝিলেন—শুভ্রা কাঁদিতেছে।

কাঁদিবারই কথা বটে, প্রভাত যদি বিয়ে না-ই করে। আর সমাজীরা সব ঠিক করে ফেলেন। তুমি আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে। শুভ্রার পিঠের কাছে বসিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহার মাথায়-হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ শুভ্রা শান্ত হইল না। বলিল, আমার দুঃখ সে বড় কম পাইয়া। যে হতভাগা আসছে জগতে যে তার যথার্থ অধিকার পাবে না—এ দুঃখ যে আমার যায়ার নয়।

লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কহিলেন, যথার্থ অধিকার কে কাকে দেয় বা। মানুষের কাজই তার সব চেয়ে বড় পরিচয়—জন্মের পরিচয়টা তার কিছু নয়।

শুভ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, তবু জন্মের পরিচয়টা আমরা প্রশ্ন করি। যাঁরা সমাজ মানে—তাঁরা প্রশ্ন করেন, যাঁরা সমাজ মানেন না, তাঁরাও স্বীকার করেন।

প্রহ্লাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি?

না।

দেখা কর। দু'জনের মাঝখানে এত বেশি ঘটনা জমেছে—যা দু'জনকে আলাদা করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার ভালবাসাকে সে স্বীকার করতে পারছে না শুধু ভয়ে।

না মাসিমা।

তবে?

হয় তো ঘৃণা!

ঘৃণা! তোমাকে ঘৃণা করবার কি আছে?

খানিক নীরব থাকিয়া শুভ্রা বলিল, একদিন কথায় কথায় একখানা নভেল নিয়ে আমাদের তর্ক হচ্ছিল। তাতে সে বলে, বহু হবার যোগ্যতা শুধু কুমারী মেয়েদেরই নাকি। এবং তারাই শ্রেষ্ঠ যোগ্য। আরও বলে, মহাভারতের যুগে নাকি এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু কুমারী মেয়ের মাতৃত্ব সমাজ স্বীকার করে নি, আর তার ছেলেদের যোগ্য সম্মান দেয় নি।

লেডি ম্যাকবেথটেও বলিলেন, সে ঘটনা কৌতূহল বশে বা বৈকল্পনে ঘটেছিল। তাতে ভালবাসার নামগন্ধও ছিল না। তোমাদের ভালবাসা যদি প্রকৃত হয়।

শুভ্রা উঠিয়া বসিল। বলিল, যাই হোক, আপনার কথাই শুনবো। আজ প্রহ্লাদের সঙ্গে দেখা করবো। তার মত জানাকে আমার করতেই হবে। সিভিল ম্যারেজ বা হিন্দু মতে ছেলের বাপ্টিজিক সম্মতি আমি চাই। তারপর সে আমায় ত্যাগ করুক—কিম্বা যাই হোক।

সেই ভাল। ভগবান তোমার সহায় হোন।

১২

অমল ছেলেটি যোগাড়ে। সন্ধান করিয়া বাংলা দেশের প্রায় একশো মাইল দূরের ছোট্ট এক অখ্যাত পল্লী হইতে প্রহ্লাদের পিতা হরিসাধনবাবুকে কলিকাতায় আনাইয়াছে। আপিসেরই একটা নির্জন ঘরে তাঁহাকে বসাইয়া নরেশ বসু ও অমল সমস্ত খুলিয়া বলিল।

তিনি আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, ও রকমটা হতে পারে না। কেউ যদি তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে দিব্যি গাললেও আমি বিশ্বাস করবো না। আমার ছেলের মত সুশীল ছেলে—

নরেশ বসু হাসিলেন, সুশীল আর সুবোধ ছেলেদের আদর্শগত কোনও কিছু বলা নয়। যৌবনে—

তিনি মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না—না।

আচ্ছা মেনে নিলাম আপনার কথাই সত্য—কিন্তু প্রহ্লাদও মেনে নিলেই তো আদালত ডাইভোর্স পর্যন্ত আপনার ছেলের বিরুদ্ধে। কাজেই একটু থামিয়া নরেশ বসু বলিলেন, কাউকে জানেন আপনার?

ছ'টি প্রদ্যুম্ন আমার মেজ ছেলে।

আরও ভাল। ছবি সুশীল হন—কুল বজায় রাখতেও ওকে বিশেষ দরকার নেই। ছেলে যদি সুখী হয় দিলেনই বা তার ভালর জন্য—তাকে সংসার থেকে আলাদা করে।

কি করে সুখী হবে সে?

আপনার মত পেলেই সে সুখী হবে। আমাদের জানেজার সাহেব বলেছেন—এই বিয়ে হ'লে তার মাইনে বাড়িয়ে দেবেন, চাকরিতে উন্নতি হবে। তা ছাড়া এক মাসের মাইনে বোনাস পাবে।

তার মত আছে বিয়ের?

আপনার মতেই তার মত। ছেলের আবার আলাদা মত আছে নাকি?

বৃদ্ধ ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, সে যদি সুখী হয়—আমার আপত্তি নেই। তবে সবার আগে তার মা নেই। তাকে ত্যাগ করতে হবে।

অমিয় বলিলেন, তা হোক আর কি ঐসুন—আজ-কালকার ছেলে ক'জনই বা বাবা মাকে নিয়ে সংসার করে। তারা বিয়ে ক'রে গতিকই কি আলাদা হয়ে যায় না?

বৃদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যায়। এ ছেলেদের দোষ নয়—কালের দোষ।

তা হ'লে আপনি রাজী?

আপনারা যখন বলছেন। আপনাদের মেয়েরের সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি দু'দিন থাকুন, থেকে বিয়েটা দিয়ে—

বৃদ্ধ ভাবলেশহীন মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি আজই যাব। বিয়ে আপনারাই দেবেন—আনন্দ আপনারা করবেন। আমি শুধু প্রদ্যুম্নকে একবার আশীর্বাদ করে যাব।

আচ্ছা—আসুন।

১৩

ট্রেন চারিটা হইতে লালদীঘির ধারে পাকুড়ে তলা অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশের বর্ণবিভাস দ্রুত নিরুদ্দিষ্ট। ঘোলাটে পোষ্ট আফিসের পথটার উপর সন্ধ্যার ছায়া নামিতেছে ঘড়িটা এখনই মুছিয়া যাইবে। মাথার উপর কয়েকটা কাক কলরব করিয়া উঠিল। নূতন সবুজের আটটা রাখে।

প্রদ্যুম্ন এখন কি এ পথ দিয়া ফিরিবে না? চারিটা হইতে যে অবিশ্রান্ত জনস্রোত কখনও কমে, কখনও বাড়ে—তাহার মধ্যে প্রদ্যুম্নকে দেখা যায় না বলিলেও প্রতীক্ষমান তাহার দীর্ঘদৃষ্টিকে সে এড়াইতে পারিবে না। কোন দিন এই পথ দিয়া যাইতে প্রদ্যুম্নর ভুল হয় না, অথচ আজ এই পরক্ষণে—

অবশেষে দূরে একটা দ্রুতগতি মূর্তিকে দেখা গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার তার সর্বাঙ্গে মেশিয়া বসিয়াছে বেশ চিনিবার উপায় নাই—অথচ না চিনিয়াও উপায় নাই।

বুদ্ধি সামনে আসিয়া পড়িল। প্রদ্যুম্ন একা। সন্ধ্যার বিষণ্ণতা সর্বাঙ্গে মাখিয়া বুঝি এখন সে ভাবিয়া পড়িয়াছে, না ওর অন্তরের বিষণ্ণতা সন্ধ্যার অন্ধকারকে রঙ দিয়াছে?

শুভ্রা আসিয়া তার পাশটিতে দাঁড়াইল।

অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন যেমন হেঁট মুখে চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন দাঁড়াইল।

আমি বিকেল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রদ্যুম্ন শুভ্রার ঘুঙুরী-গন্ধী পাউডারের গন্ধ নাসিকা দিয়া গ্রহণ করিল। কোন প্রশ্ন করিল না কিংবা চঞ্চল হইল না। সে যেন নিশ্চিত জানে, শুভ্রা এমনই সময়ে আসিবে এবং এই কথাই বলিবে।

খানিক দাঁড়াইয়া দুইজনেই চলিতে লাগিল। অবশেষে শুভ্রা বলিল, সেদিন ট্রাম থেকে হঠাৎ নেমে গেলে কেন?

প্রদ্যুম্ন মুখ তুলিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মাথা নীচু করিল, আবার সে পা বাড়াইল।

কেন চলে গিছলে বলবে না?

দরকার নেই।

আমার যে শোনবার দরকার আছে। তুমি ভাগ্‌ করলে আমি দাঁড়াই কোথায়?

প্রদ্যুম্ন সহসা থামিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুভ্রার পানে চাহিয়া কহিল, তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই—নয়?

সে তো তুমি জান।

প্রদ্যুম্ন মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে কহিল, জানতাম। খানিক থামিয়া সহসা ছোট একটি নিশ্বাস বুকের মাঝে টানিয়া সে কহিল, আমি তো ত্যাগ করছি না তোমায়?

মানে?

আজ বাবা এসেছিলেন দেশ থেকে। তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন। আমি তোমায় গ্রহণ করবো।

সত্যি—সত্যি? শুভ্রার মন আনন্দে প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে প্রদ্যুম্নর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তাহার একখানি হাত নিজের দু'হাত দিয়া টানিয়া ধরিয়া কহিল, সত্যি?

হ্যাঁ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন সকালে ট্রামে আসছিলাম—তাই হবে। হিসুবেড়ে না—ডিভিসি হয়েছে। প্রদ্যুম্নর স্বরে আনন্দের লেশমাত্র নাই।

শুভ্রা সে কথা বুঝিল। আরও বুঝিল—বিরহ-সন্ধ্যা তাহাকে প্রতারণা করে নাই। দীর্ঘের অন্ধকার শুভ্রা যাহিত হয় তো বাস্তবধর্মী। সব-বুদ্ধিমতী সে এতটুকু কল্পনাকে বিসর্জন দিতে পারিল না। প্রদ্যুম্নর হাতখানি আরও আদুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বুকের কাছে আনিল।

আকাশে আলো নাই—ভরে দুঃখে সন্ধ্যেই হয়তো তার সকোচে লাজাইতেছে। কেবলই মনে হইতেছে—এই উদাস নিবিড় অন্ধকার মুহূর্ত কি কোনভাবে পার হইতে পারিবে?

সুচিত্রার কথা

শ্রীমণিলাল বসু

[যেদিন "রমলা"কে সঙ্গে নিয়ে বসু মহাশয় বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন, মনে আছে, সেদিন কি উৎসুক আনন্দে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম···তাঁর গল্পের মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন ডাচ চিত্রকরদের মতন প্রচুর রঙ···য়ুরোপ আর ভারতের কাল্‌চারের নানান্ রঙীন ফুলে ভরে উঠলো তাঁর ভাষার বাগান···সৌন্দর্য্যের স্বপ্নে, কবিতার রসে, জীবনের রঙে ঝলমল করে উঠলো একটা বেগবতী আকাঙ্ক্ষা···তারুণ্যের আত্ম-বিলাস···এই গল্পের নায়িকা সুচিত্রার মধ্যে আবার দেখছি সেই স্বপ্ন-ছবি···সেই রঙের সমারোহ···তবে এ রঙ বোধ হয় গোধূলির আকাশের রঙ···দিনের বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আতুর···]

দীর্ঘদিন ছিন্ন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিল অবগুণ্ঠিতা নারীর রহস্যমণ্ডিত মুখের মত, অপরাহ্ণে সহসা থেমে-যাওয়া বাতাসে স্তব্ধতা ছিলবিন্ন, নির্মেঘ পূর্বাকাশে স্নিগ্ধ নীলিমা, পশ্চিমাকাশের পুঞ্জীভূত মেঘস্তূপে সূর্য্যের রক্তাভাস যেন বিশ্বব্যাপী চিতাবহ্নির রক্তিমা।

ঘরের অন্ধকার হতে খোলা বাগানে আলো-জোড়া আলোছায়ার মায়ালোকে এসে বসলুম। সমস্তদিন সুচিত্রার কথা ভেবেছি। বর্ণহীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বিষণ্ণ মনে শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না, সহসা দিগন্তর আলোকস্পর্শে অন্তর দীপ্ত হয়ে উঠল, বিষাদভারপীড়িত দিবসের পাত্র ফেটে গিয়ে বাহির হল সুধাধারা। যার দুঃখক্লিষ্ট জীবন ব্যর্থ হল ভেবেছি, মনে হল কোন অমর্ত্যলোকে দীপ্ত মহিমায় সে উদ্ভাসিত।

রঙীন আলো-ভরা এক চৈত্র-অপরাহ্ণে কুসুমিত উপবনে সুচিত্রার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন তরুণী বসন্ত-লক্ষ্মী কুসুমাকীর্ণ পথ রাঙা করে আমার দ্বারে এল। বুকের রক্ত দুলে উঠেছিল।

বিকচোন্মুখ শতদলের মত তরুণী তনুলতা বাসন্তী রঙের বস্ত্রে সজ্জিতা, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছে রক্তকরবী-মালিকা, তপ্ত কোমল কণ্ঠে চুণীপান্না-মেলান মালিকা, হীরকদ্যুতিময় নয়নে স্বপ্নের গোলাপী আভা, বসন্তের পুষ্পচর্চিত বনে অজানা ব্যাকুল বেদনার চকিতা বিহারিণী, সে তরুণী বসন্ত-লক্ষ্মী, নবযৌবনের দূতী।

বেনারসী শাড়ী ঝলমল করছে গলিত রক্তমণির মত, লজ্জারুণ আননে চন্দনসজ্জার শোভা, সোনার সিঁথি সীমন্তকের রেখা অনাবৃত করছে, প্রভাতের শুকতারার মত দীপ্ত নয়নে নবযৌবনের আলো, ঈষৎ-রক্তাকম্পিত ওষ্ঠে রক্তের নর্তন, সারাঙ্গে সুরভী নবত্ব সে।

তাদের ভরা নদীর মত পূর্ণ পূর্ণ যৌবনে পূর্ণ দেহ, কিন্তু মৃগবাসিত মাদুরের অপূর্ব আভা, নয়নে স্নিগ্ধ স্নেহের ছবি, অমৃত সন্তানের শিয়রে স্থির বসে আছে, শান্তিহীন সেবায় [illegible] ভোলানো।

রাজপথে বিপুল জনতা তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত, মহাত্মা গান্ধীচালিত অসহযোগ-আন্দোলনকারীদের সঙ্গে রাজশক্তির শান্তিরক্ষকগণের অপূর্ব সংঘাত লেগেছে, তাদের মধ্যে কংগ্রেস-পতাকা হস্তে সব অত্যাচার তুচ্ছ করে নারী নারী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বৈশাখের রৌদ্রদীপ্তি আকাশের মত প্রখর দীপ্তি তাহার চক্ষে, ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে সে তখী তাপসী।

তারপর তাকে দেখলুম রক্তাম্বরা পথিকা, ওই শুকতারার মত পথহারা করুণ ছবি, এই বৈষ্ণবী সন্ধ্যার মত একাকিনী উদাসিনী চলেছে পৃথিবীর পথ-প্রান্তর পেরিয়ে অনন্তলোকের অন্ধকারে তারার আলোর নূতন পথ খুঁজে। সে অনন্তপথযাত্রিনী।

সুচিত্রার নব নব রূপের সম্ভার ছবির পর ছবি স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে। তাকে আমি ভালবেসেছি, এ কথা অলীক, আবার তাকে আমি ভালবাসি নি, এ কথা বলাও ভুল হবে। দীর্ঘ জীবনে তার সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম দেখাতেই দু'জনের মনের দরজা যে খুলে গেছলো, সে দ্বার কারোর রোষে রুদ্ধ হয় নি। যখনই দেখা হয়েছে, সে মন খুলে অনর্গল কথা বলেছে, দুঃখের দিনে যে সব কথা রুদ্ধ স্রোতের মত তার বেদনায় গুহায় রুদ্ধ থাকত, দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কথা মুক্ত নির্ঝরিণীর মত বাহির হয়ে আসত। রঙে হাতে বেদনার অঞ্জনে এলা কতদিনের কত কথা আজ মনে পড়ছে।

এম্ এস্-সি পরীক্ষা দিয়ে বেকার বসে আছি, কর্মহীন দিনগুলি নানা কল্পনার জাল-বোনা, কখনও নূতন কনস্টিনেন্টাল ফোর্স নতেল পড়ি, কখনও কলেজে নব প্রবেশিকা সহোদরা গৌরীকে অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্না করিবার প্রয়াসে তার সব সহপাঠিনীদের গল্প শুনি, অজানা ভবিষ্যতের কল্পনায় মানসকল্লোলিনী সুরবাহারের ঝঙ্কারের মত বাজে, অলস অপরাহ্ণ ভরে ওঠে। গৌরীর সব সহপাঠিনীদের মধ্যে একটি মেয়ের কথা বলতে তার যেমন উৎসাহ তেমনি সুখ; প্রকৃতিতে সে গৌরীর সম্পূর্ণ উল্টা অথচ তার সঙ্গেই সব চেয়ে ভাব হয়েছে। সে সুচিত্রা, ক্লাসের সেরা মেয়ে, তার নাম কলেজে সবার মুখে। সাঁওতাল কোন মিশনারী স্কুল হতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়ে এসেছে, তার নাকি নেম গভর্নেস ছিল, ভাল বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু ইংরাজী বলে ইংলিশ প্রফেসারের চেয়ে ভাল, চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারে, আর বোর্ডিতে গিয়ে মেয়েদের ইয়োরোপীয় নৃত্যের গভর্নেস শিক্ষা দিয়েছিল বলে ভয়ানক বন্ধুনী জুটেছে।

সেই সুচিত্রা মূর্তিমতী হয়ে একদিন আমাদের বাড়ী এল, রাঙা হলুদ রঙের শাড়ী এমন সুন্দর মানাতে কখনও দেখি নি, সরষে-উবার সোনার আভা তার চক্ষে।

বাগানের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম, গেটের কাছে এসে টাঙ্গি থামতে চক্ষে চাইলুম। নৃত্যের চকল ভঙ্গীতে এই মেয়েটি কখন এগিয়ে এসেছে।

—গৌরী কি আছেন?

—বোধহয় কোথাও বেরিয়েছে, এখুনি আসবে।

—আমি ততক্ষণ—অপেক্ষা করতে পারি—

—আসুন ভেতরে, আসুন।

—এ বাগান ত বেশ, আপনি বোধ হয় পলিটুডা।

—ঠিক চিনেছেন।

—শুনেছি আপনার অনেক কথা—If you please—

দুখানা চেয়ার বাহির ঘরে বাগানে দু'জনে বসলুম। এর পর ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলতে লাগল।

—আপনার কথাও অনেক শুনেছি।

—খুব নির্দোষ নয় আশা করি।

—গৌরীর মুখেও আপনার প্রশংসা ধরে না।

—হুঁ, গৌরী ত আমার অষ্ট প্রহরই লড়াই করে। হ্যাঁ, টুর্গনিয়েভের বইগুলির বড় অনেক বাকি।

—ভাল লাগছে?

—চেকভ আমার কিন্তু আরও ভাল লাগে, জীবনের প্রবহমান ধারা হতে টুকরা টুকরা আঁকা ছবি, একটা করুণ সুর আছে, আর সি গাল্-এর মিলার কথাগুলি কি সুন্দর। Men and lions, eagles and partridges—I am that spirit...

দুকণ্ঠী অভিনেত্রীর মত সে আবৃত্তি করে চলে। তারপর উচ্চরবে হেসে উঠল।

—চমৎকার আবৃত্তি করলেন।

—ভাল লাগলো! আচ্ছা-বাংলায় এ রকম প্লে আছে, আমার ভারি অভিনয় করতে ইচ্ছে করে।

—আমি নাটিকার হলে একটা লিখতুম আপনার জন্যে। জানেন, প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রীদের জন্যেই ভাল নাটক বড় লেখা হয়েছে।

—না, এখন আমি কারো প্রেরণা হতে চাই না! গৌরী ত এখনও এল না।

—ততক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ পাচ্ছি।

—তা হলে চলুক গল্প।

ইবসেন সাহিত্য হতে মঞ্চে আর্ট থিয়েটারের কথা উঠল, তারপর ইয়োরোপীয় নৃত্যের কথা, তাগনারের সঙ্গীতের কথা; সুন্দরতার সহিত নারীর লজ্জার সম্বন্ধ বিচার হল, নারীর অসহযোগ আন্দোলন, লেনিনের কবিতা, বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের তত্ত্বাতত্ত্ব, কিছুই বিষয়ে তর্ক উঠল। শেষে সে বলে, জানেন, এ সব আমি বুঝি না, আমার ভালও লাগে না, কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আকাঙ্ক্ষা বড় উচ্চে, তবে ওস্তাদের কাছে গান শিখতে পারবো না।

—যারা ইতোরোপীয় মিউজিকের পাঠ নিয়েছে তাদের সঙ্গে অবশ্য—

—আমি শিখতে খুব রাজী আছি, কিন্তু একটা প্রণালী চাইতো। আচ্ছা, তুমি—সেরা শুনেছেন? রকম তার নারের মাইনার সিম্ফনির প্রাইজ-সঙ্গীতের সুরটা—অনেকে বলে মারেইর মত—

সুচিত্রা গুন্‌গুন্ করে গানটি গাইলে। তারপর আবার সুরু হল সঙ্গীত নিয়ে তর্ক।

আষাঢ়ের সন্ধ্যা যখন ভাঙল, আকাশ তারায় তারায় ভরে গেছে।

সুচিত্রার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা প্রায় তিন বছর পরে। অবশ্য ওর মধ্যে তার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু সে দেখাগুলি যেন প্রথম দেখারই ছুঁড়ি, পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে ফুটেছিল, তারপর সে ফুল শুকনো হয়ে কখন ঝরেছিল জানি না। আবার তাকে নূতন করে দেখে, হৃদয়ের আর এক দ্বার খুলে গেল।

রিসার্চ ওয়ার্ক করে নাম হয়েছে, বিলেত যাবার এক স্কলারশিপ পেলুম। যাবার সব বন্দোবস্ত হয়ে, সেদিন বড় ক্যাবিন ট্রাঙ্ক এনে বই খাতা সব গোছ করছি, সুচিত্রা এল ঘরের মধ্যে।

—তুমি না কি এ মাসে বিলেত যাচ্ছ অমিট দা।

—প্যাসেজ ত বুক করে এসেছি, এখন ঈশ্বর গোপালীর অনুকম্পা।

—তোমার এখন যাওয়া হবে না।

—হবে না। স্কলারশিপটা পেয়েছি—

—এ মাসে অন্ততঃ হবে না। আমার মতে কোন সওয়ার রাখি? না প্রয়োজন মনে করো না—

—শুনছিলুম বটে একটা শুভকর্ম—তবে সেটা সত্যি কি না, তুমি ত কোথাও রাজী হও না—

—হ্যাঁ, আমি উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হচ্ছি এ মাসে।

—সেটা ত উদ্বন্ধন নয়, যে কথা করবার জন্য আমাকে থাকতে হবে, প্রায় সম্মান করবার লোকও ত আছে।

—তাহা হলে, এ মাসে তোমার যাওয়া হবে না।

—তথাস্তু। আর কি বলো। কেমন লাগছে, শুনেছি, এই কোর্টশিপের সময়টা মনে হয় পৃথিবীর ধূলি ছুঁয়ে চলছি না।

—হাই কোর্টশিপ! তোমার মত ত দেখাই পাওয়া যায় না।

—সুযোগের সদ্ব্যবহার আমি ভাল করেছি।

—তোমার ত বন্ধু!

—হ্যাঁ, [illegible] সঙ্গে খুবই ভাব ছিল। বহুদিন দেখা হয় নি।

—এ খবর পেয়েই দেখা কর নি?

—সঠিক জানতুম না।

—যেন না হোক!

সোফার কুশনটা পিঠে দিয়ে সুচিত্রা সোফার চেপে বসল। চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে, ভাবী জিনেই আনন্দে চঞ্চল।

—তোমার সঙ্গে অনেক কথা।

—কি, মার্কেটিং? সাহায্য করতে হবে, সে বিষয়ে গৌরীই বোধ হয়—

—তা নয়, তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে খবর চাই।

—প্রথমে জিজ্ঞেস করে নি, বিষয় কি ঘটকালি করতে হবে, না যাকে বলে শুভ-আরেজ?

—দুই বলতে পারো।

—কিন্তু পুষ্পরথা ওঁর পুষ্পবাস সরোবরে নিক্ষেপ করেছেন দেখছি!

—ঠিক বলেছ, আমাকে তুমি খুব বুঝতে পার দেখছি, আমিও love-এ পড়লুম at last।

—কণ্ঠে হতাশের সুর আনলে কি হবে, চোখের খুশি ধরছে না!

—বাব্, কাজের কথা বলি, আসিট্ ভা?

—কি জানতে চাও, বিষয় সম্পত্তি? ওরা বাংলার প্রাচীন অভিজাত বংশ, সুবোধ তার সম্পত্তির অংশ ভাগ করে নিয়েছে, বোধ হয় বিধবা মা ছাড়া আর কেউ বংশের নিয়ম ও নৈষ্ঠিক বিধিবিধান মানবার লোক নেই ঘরে, ওদের সাতমহল বাড়ীর মোটা থামের ইটগুলি নাকি ক্লাইভের আমলের, তবে তোমার জন্যে আশা করি বালীগঞ্জী পাড়ায় সাহেবী ফ্যাসানে বাড়ী তৈরি হবে।

—সম্পত্তির বিষয় আমি জানতে চাই না, আমি চাই মানুষ সম্বন্ধে জানতে। তোমার বন্ধু লোকটি কেমন?

—ভালই ত মনে হয়, বনেদী ঘরের ছেলে, দেখতেও সুশ্রী, ব্যবহার অতি নম্র, তবু—তোমার সঙ্গে ত আলাপ হয়েছে।

—তাই ত প্রেম করে?

—তয় আবার কি। বাঘের খাঁচায় ত ঢুকছি না।

কিন্তু খাঁচা ভাঙ্গে, একবার ডুকলে বাহির হওয়া শক্ত

[illegible] কথা আমি মানি না। বিয়ের বাকিযাত্রা শুরু হবে [illegible] আমি [illegible]

[illegible], তবু করে এ কথার মীমাংসা হয় না, জীবনের অভিজ্ঞতা সুকুমেরদের [illegible] তবে সত্য যাচাই হয়।

—সকাল বেলা তোমার কাছে আমি বক্তৃতা শুনতে আসি নি অসিতদা। [illegible] তুমি আসবে, মার্কেটিং করতে হবে কিন্তু, কাল বিকালে এক রঙের পাঁচটি ডিজি, তার সঙ্গে আর পাঁচটি রঙে কিনতে হবে। আর আর [illegible] কেলে তোমার বন্ধুর কাছে যাবে। একটু হুকুম ঘোরাতে চাই। তোমার কাজেরা [illegible] আজ [illegible]।

সুচিত্রার দীর্ঘতর নয়নে চাহিলুম, কৃষ্ণ চক্ষুতারকায় অস্বাভাবিক দীপ্তি। পুলকে, ওর চঞ্চলতার স্পর্শে আমিও মেতে উঠলুম। সত্যই বিলাত যাওয়া সেদিন ছিল।

যাত্রার আগে সুবোধ-সুচিত্রা আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করলে চাঁদের পুরাতন বনেদী বাড়ীতে। সুবোধের পূর্বপুরুষদের [illegible] তৈলচিত্রসারিশোভিত প্রাচীন পারস্যকার্পেটপাতা লম্বা বৈঠকখানায় বসে সুচিত্রার নবাগতাদের সঙ্গে [illegible] পিতামহী প্রপিতামহীদের প্রাচীন ভারি সোনার গহনা মিলিয়ে দেখতে হল, তর্কেটের শাড়ীর সঙ্গে প্রাচীন বেনারসীর তুলনা করতে হল, বিবাহের উপঢৌকন আসবাব সব দেখে অতি মুক্তভাব ভাব মুখে আসতে হল। আবেগে সুচিত্রা প্রগল্‌ভা। আমার বিলাত যাওয়া বা লেখাপড়া সম্বন্ধে কোন উৎসুক্য প্রকাশ করলে না, তার সাড়ী গহনা স্বামী শাশুড়ী এই নিয়েই গল্প চল। সুবোধ কথা বলে না, মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বিদায়ের সময় সুচিত্রা হেসে বলে, সারাক্ষণ নিজেই গল্প করলুম! সাবধানে যেও। ফিরবে আর বিলিতী মেয়ে কিন্তু এনো না ভাই, ফিরে এলে খুব ভাল মেয়ে দেখে দেব।

হেসে বললুম, সে চিন্তা এখন থেকে করতে হবে না। সত্যি কথা বলো, সুখী হয়েছ?

মুক্তার দুল দুলিয়ে সুচিত্রা বলে, কি মনে হয়? আর ঈশ্বর ফিরে এলে দেখে নেব।

তার মুক্তার মত অশ্রুবিন্দুতে আরক্তনয়ন উজ্জ্বল।

চোখ মুছে উজ্জ্বল হেসে বলে, যাবার সময় মন খারাপ করে দিলুম না ত? ভাল ভাল নিমন্ত্রণের রেখে পারিও।

ইয়োরোপ থেকে ফিরলুম প্রায় পাঁচ বছর পরে। সুচিত্রার খবর মাঝে মাঝে পেয়েছি সৌরীন চিঠিতে, চিঠি লেখা বিষয়ে সুবোধ আমার চেয়ে উঁচু। শুনেছিলুম প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল, দ্বিতীয় সন্তানটি [illegible]

এই ঘর [illegible] চিহ্নার অন্ত নেই—গান, মদ্য, নানা জিনিস [illegible] মাঝখানেই নামা যায়।

[illegible] দেখা করতে যাব বলে বাহির হচ্ছি, গৌরী আমার পথ আটকালে।

—[illegible] সিল্কের পাঞ্জাবী যে!

—তাবছি সুচিত্রাদের সঙ্গে দেখা করে আসি, ওর ছেলের জন্যে রাশিয়ান-ফার-রেওয়া গরম জামা এনেছি,

—বোকা দাদা, তোমার যাওয়া ত হবে না।

—কেন?

—জান না, সে ছেলেটি ত মারা গেছে কয়েক মাস হল, তোমার ও প্যাকেট ফেরৎ যাবে। আর অত [illegible] সুচিত্রা এখন একেবারে বদলে গেছে।

—সে ছেলেটি মারা গেল।

—শুধু পুরনোই নয়। আগে খবর নিয়ে যাওয়া ভাল। নয় ত দেখাই করবে না।

পরদিন সকালে সুচিত্রাদের বাড়ী গেলুম। তকমাপরা বুড়ো দরওয়ান যেমন বসে থাকে বৈঠকখানায় বসালে। সেই চিরপ্রাচীন বৃহৎ ঘরের ঝাড়লোক দেয়ালগিরিগুলি বা সন্ধ্যার আলো নয়, এ যেন কোন কালাতীত লোকের আলোক। পিটি-করা মোটা ফ্রেমের তৈলচিত্রগুলি চিরপুরাতন স্থানে তেমনি স্থির নিশ্চল, দুষ্পিলিন চিত্রগুলি হতে যেন ধূপধূনার গন্ধপ্রবাহ, লক্ষপ্রদীপ প্রভৃতি যুবোপের পূর্বপুরুষগণ তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে, হলদে মার্বেল পাথরের তাকে তাকে শ্বেতাঙ্গের মূর্তি, পুরাতন ফরাসী ঘড়ি, নানা শতাব্দীর পুস্তকগুলি তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। মাথার বৃহৎ ঝাড়ের ত্রিকোণ কাচগুলি তেমনি ঝকমক করছে, বুঝি এখনি পরিহাসের সুরে টুং টাং হেসে উঠবে। সেই শুদ্ধ ঘরে সুচিত্রা যখন চঞ্চলগতিতে নীরবে এল, মনে হল, সেও বুঝি এই ঘরের একটা আসবাব বা পুতুলী হঠাৎ নড়ে উঠল, অথবা সোনালী ফ্রেম থেকে শতাব্দীমলিন মূর্তি গতিভঙ্গীতে নেমে এল।

একটু পরিহাসের সুরে সুচিত্রা বলে, মনে পড়লো, ও' হলে একেবারে ভুলে যাও নি, অসিটা!

তার দীর্ঘ মুখের দিকে চাইলুম, আরও আলুর মত কালো চোখ।

—আমার ছেলেটি মারা গেছে জান ত।

—কাল শুনলুম।

—কাল শুনলে! তোমার কাছে সে কাল [illegible] ছিল কিন্তু আমার কাছে সে যে অনেকদিন হল মারা গেছে। [illegible] কোটি কৈ? আমার সি... ছেলে?

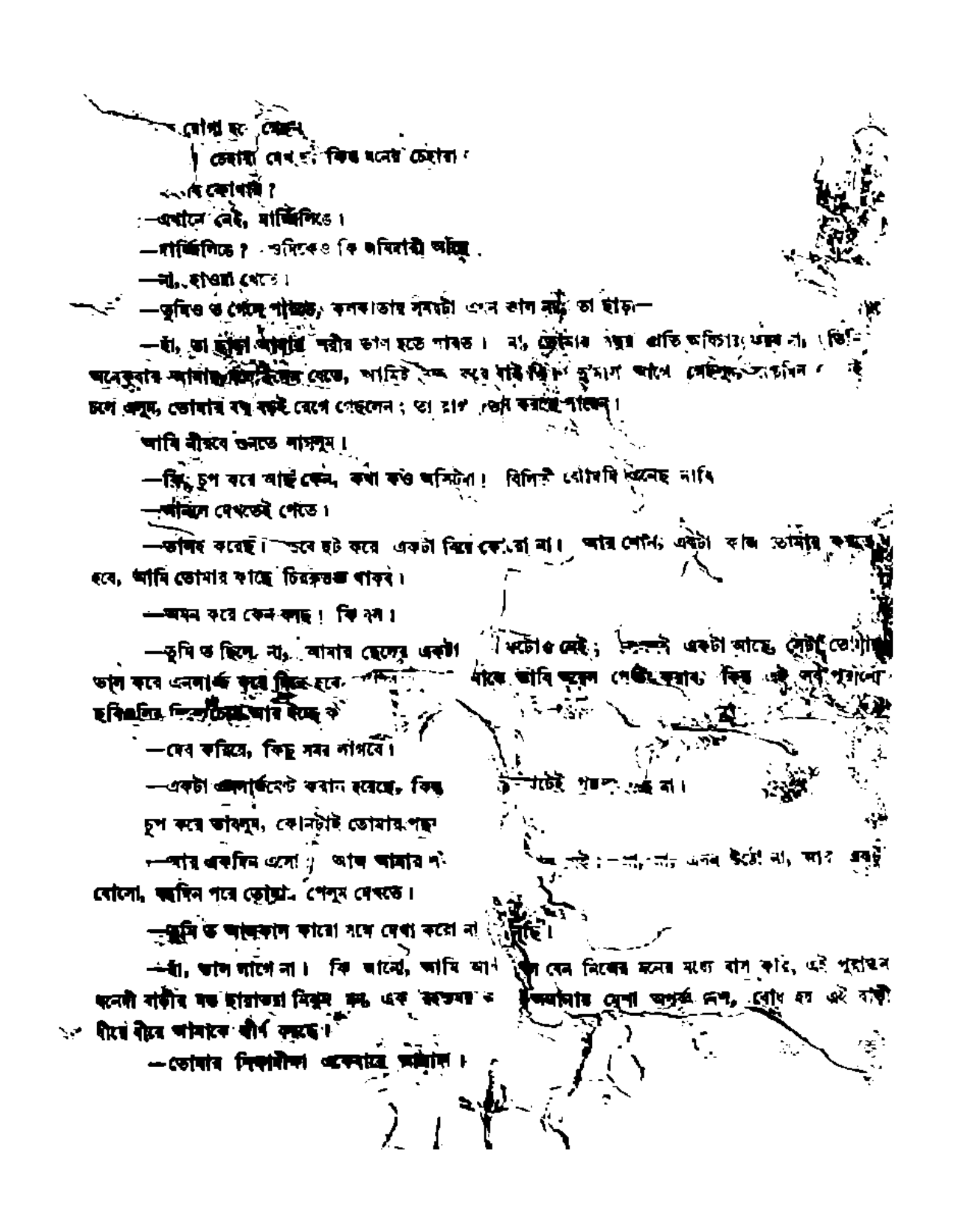

—যোগ্য হয়ে যেতেন,
তোমার মেয়ে হয়, কিন্তু মনের চেহারা
—কি কোথায় ?
—এখানে নেই, দার্জিলিঙে।
—দার্জিলিঙে ? ওদিকেও কি জমিদারী আছে
—না, হাওয়া খেতে।
—তুমিও ত গেলে পারতে, কলকাতার সময়টা এখন ভাল নয়, তা ছাড়া—
—হাঁ, তা ছাড়া আমার শরীর ভাল হতে পারত। না, ছেলের পড়ার ক্ষতি অফিসার ভাল না। তিন-
একেবারে আমাকে নিয়ে যেত, আমিই যাই নি। দুমাস আগে গেলুম, তখন
চলে এলুম, তোমার বন্ধু বড়ই মেগে গেছলেন ; তা হাত তোর করতে পারেন।

আমি নীরবে শুনতে লাগলুম।

—কি, চুপ করে আছ কেন, কথা কও অমিটা। বিলিতী বোমাবি ভুলেছ নাকি
—আমরা দেখতেই পেতে।
—তাদের করেছি। তবে হট করে একটা বিয়ে কোরো না। আর শোন, একটা কাজ তোমায় করতে
হবে, আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।
—অমন করে কেন বলছ ! কি বল।
—তুমি ত ছিলে না, আমার ছেলের একটা ফটোও নেই ; কোনটা একটা আছে, সেটা তোমার
ভাল করে এনলার্জ করে দিতে হবে, যাতে আমি ড্রয়িং করাব। কিন্তু এই সব পুরানো
ছবিগুলির দিকে চোখ আর ইচ্ছে ক
—বেশ করিয়ে, কিছু সময় লাগবে।
—একটা এনলার্জমেন্ট করান হয়েছে, কিন্তু ঘটেই পছন্দ হচ্ছে না।
চুপ করে ভাবলুম, কোনটাই তোমার পছন্দ
—আর একদিন এসো ; আজ আমার শ নেই ; —না, না, এমন উঠো না, আর একটু
বোসো, অনেকদিন পরে তোমায় পেলুম দেখতে।
—তুমি ত আজকাল কারো সঙ্গে দেখা করো না শুনেছি।
—হাঁ, ভাল লাগে না। কি জানো, আমি আর যেন নিজের মনের মধ্যে বাস করি, এই পুরাতন
জমিদারী বাড়ীর মত ছায়াভরা নিরুম ঘর, এক রহস্যময় ক অমাবস্যার মেঘা অন্ধকার নেমে, বোধ হয় এই বাড়ী
ধীরে ধীরে আমাকে ঘীর করছে।
—তোমার নিরাশাটা একেবারে অমূলক।

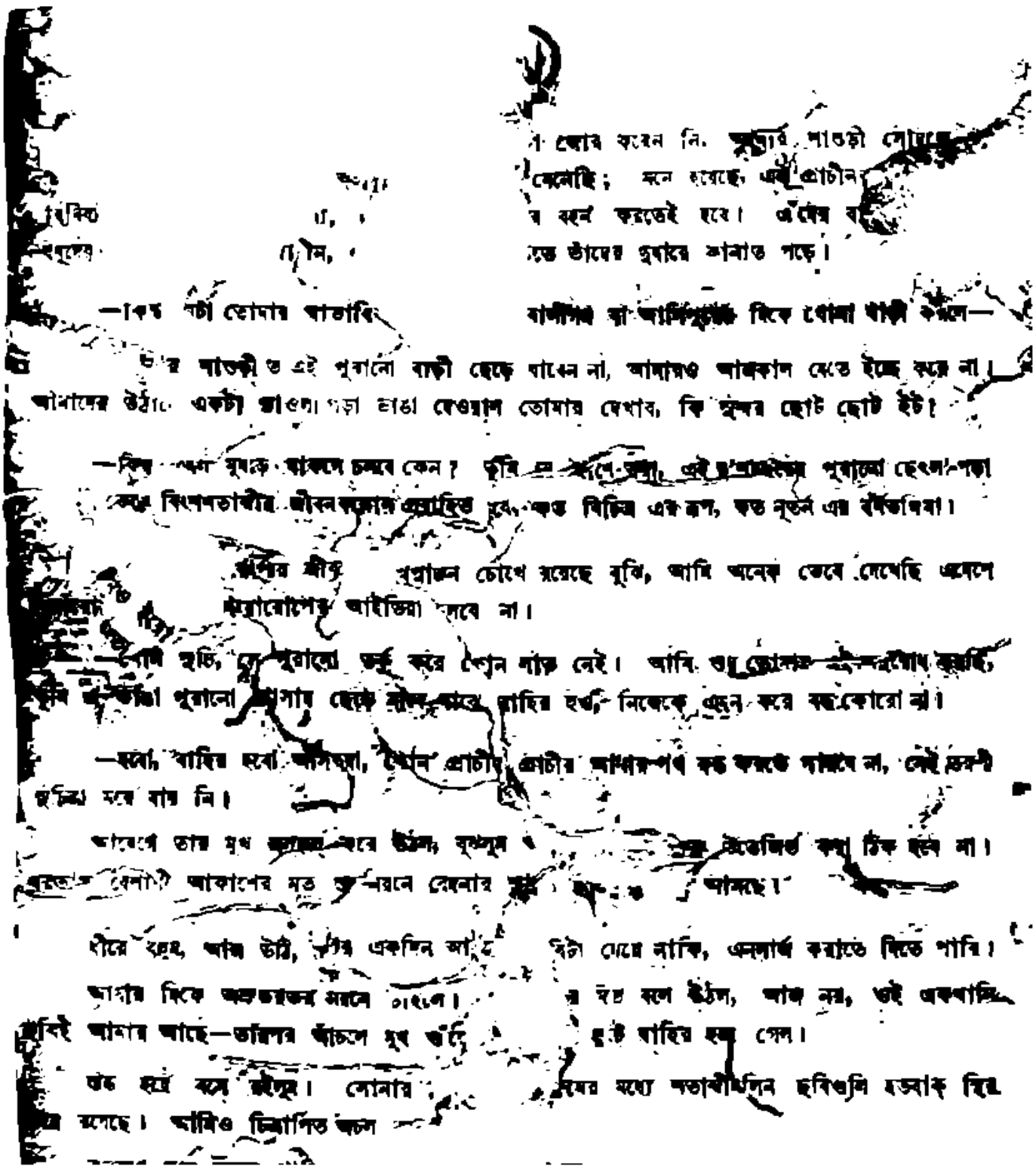

...ো করেন নি. ...ার পাতলা সোনালি
...েছি; মনে হয়েছে, এই প্রাচীন
...ন করতেই হবে। এঁদের বই
...তে তাঁদের দুয়ারে দাঁড়াতে পড়ে।

—কিন্তু এটা তোমার খাতাবি... বাণীরূপ না আপিসঘরই কিনে খোলা খাড়ী করলে—

...র খাতকী ও এই পুরানো বাড়ী ছেড়ে যাবেন না, আমারও আজকাল যেতে ইচ্ছে করে না। আমাদের উঠানে একটা ভাঙলা পড়া ভাঙা দেওয়াল তোমায় দেখাব, কি সুন্দর ছোট ছোট ইট!

—কিন্তু এমন মুষড়ে থাকলে চলবে কেন? তুমি যে বলেছ, এই ঐশ্বর্যের পুরানো ছেঁড়া-পড়া ...বিশতাব্দীর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ... কত বিচিত্র এর রূপ, কত নূতন এর ব্যবহারিকতা।

...র শীর্ণ ...ুপ্রাজন চোখে রয়েছে বুঝি, আমি অনেক ভেবে দেখেছি এখানে ...য়োগের আইডিয়া চলবে না।

—বোধ হচ্ছে, যে পুরানো ভাঙা করে দেখার নাম নেই। আমি শুধু তোমায় ...যোধ করছি, ...ন ভাঙা পুরানো ...সার ছেড়ে নতুন ঘরে বাহির হও, নিজেকে এমন করে বঞ্চনা কোরো না।

—যাব, বাহির হবো বলেছি, যেমন প্রাচীর প্রাচীর আমার পথ রুদ্ধ করতে পারবে না, সেই রকমই ভুলিয়ে মরে যায় নি।

আবেগে তার মুখ ...য়ে উঠল, মৃদুস্বরে ... ...ক উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। ...ত বেলাটা আকাশের মত ... ...য়নে রেখার মত ... আসছে।

ধীরে বহ, আজ উঠি, ... একদিন আ... ...টা মেরে নাকি, এনলার্জ করাতে দিতে পারি।

আমার দিকে অন্যমনস্কের মতন চাইল। ... হঠাৎ বলে উঠল, আজ নয়, ওই একখানি ছবিই আমার আছে—তারপর আঁচলে মুখ ... ...ত বাহির হয়ে গেল।

...ত হয়ে বসে রইলুম। সোনার ... ...ধ্যের মধ্যে শতাব্দীজীর্ণ ছবিগুলি হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। আমিও চিত্রার্পিত অচল

—তুমি বসে আছো। আচ্ছা, আর যখন আর একটা ?

—না না, আর একদিন আসবো।

—তাও তনে যেতে হবে। শুনেছ কিছু ?

—কি ?

—আমার ছেলের চিকিৎসা সম্বন্ধে শুনেছ কিছু ?

—কলকাতার বড় বড় ডাক্তার সব দেখেছিলেন।

—ভুল শুনেছ। মিথ্যা কথা। কে বলেছে ? আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরেছে।

—ডাক্তার-বিদ্যি ? কলকাতার অনেক লোকের বাড়ীতে তাই হয় বটে।

—মোটেই ডাক্তার-বিদ্যি নয়। প্রথমে এঁরা চালাকি দেখান নি, শাস্ত্র ঘাঁটান তারা হাড়ি মানবং চণ্ডীপাঠ এই চলেছে আর চলেছে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ-পড়া। আরও যখন [illegible] গাড়ী ঘুরে। মোটর করে কলকাতার ডাক্তারের দল ভেঙে পড়ল, তখন too late too late—বুঝলে ?

—শোন সুচি—

—আমি তুমি আমরা কি করবো, যে ঈশ্বর রাখেন কোন ডিবক্ তাকে বাঁচাতে পারে না। মানি। কাউকে আমি দোষ দিচ্ছি না। ভাল ভেবেই এঁরা যত্ন করেছেন। কিন্তু এই ঘটেছে : সুচিকিৎসা হয় নি। এই কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছলুম। বলা হল। আচ্ছা, এখন যাও ভাই, আর একদিন এসো।

[illegible] ওষুধালয়ের প্রথম দীপ্তি সুচিত্রার চোখে কেমন ভয় হল। [illegible] উতলা হয়ে উঠবে। সত্যযুগে [illegible]

কয়েক মাস পরে পশ্চিমের এক বিখ্যাত [illegible] পেয়ে চলে যা[illegible] প্রায় তিন বছর পরে কলকাতায় ফিরলুম। ইতিমধ্যে ভারতের আকাশে [illegible] করে দিয়ে, রাজনৈতিক [illegible] করছে। আমি যখন ল্যাবোরেটারীতে টেষ্ট-টিউব [illegible] দেশের সঙ্গে বিজ্ঞানের নব জন্মের সন্ধান করছি, মহাত্মা গান্ধী তখন ঊনআশি বীর সহযোগী [illegible] ভারত গভর্ণমেণ্ট মহাত্মাকে বন্দী করলে, তারপর আ[illegible] [illegible] আগোষের চেষ্টা করছে।

...টই চলবে না। ওরকম ছুট পরে ওঁর স্বামী ছাড়া আর কেউ ওঁর খদ্দরের কাপড় আছে?

...খদ্দর? গন্ধিয়ে মৃত্যি ত' বড় পরি নি, ওই মোটা খদ্দর পরবো! সুচিত্রার কাছে খদ্দর পরে ...ও হবে নাকি? এ ত গান্ধী-মহারাজকে দেখতে যাচ্ছি না।

সৌরী হেসে বলে, হ্যাঁ, সুচিত্রাদিদির দর্শন যদি চাও ত খদ্দর পরেই যাওয়া ভাল, তা না হলে মিছিমি খানিকটা বক্তৃতা শুনে ফিরে আসবে। সুচিত্রাদি যে এখন মস্তবড় গান্ধীবিদ্ধ, কংগ্রেসের এক নেত্রী, ছেলেদের দল নিয়ে শোভাযাত্রা মিটিং কত করেছেন, জেলে গেছলেন, এই ত ক' মাস হল জেল থেকে বাহির হয়েছেন।

লক্ষ্য করে দেখলুম, সৌরীর গায়েও খদ্দরের। অতি সম্ভ্রমভাবে সে সুচিত্রা সম্বন্ধে কথা বলছে। আগে সুচিত্রাকে এত বড় বলতে ওকে কখনও শুনি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, তুইও কি সুচিত্রার শিষ্যা হয়েছিস?

গম্ভীর ভাবে সৌরী বলে, চেষ্টা করছি, পারি কি? সংসারের যা ঝামেলা! শোন দাদা, তুমি বরং একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে এসো, আমি খদ্দরের কাপড় জোগাড় করে রাখি, কাল খদ্দর পরে যেও।

বাব্বা, তবেই! এ সব ব্যাপারে তোদের পরামর্শ শুনে চলাই ভাল।

বিলিতী গরম গেঞ্জির ওপর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে পরদিন সকালে সুচিত্রাদের পুরানো বাড়ীতে হাজির হলুম। দেখলুম গেটের সামনে সরু গা... রঙ প্রকাণ্ড এক মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে। গাড়ীর ভেতর চামড়া-ঢাকানো টুইডের-সুট-পরা একটি মোটা কা... পাশে জর্জেটের শাড়ী-পরা একটি যুবতী মাঝে মাঝে সুন্দর চোখে দেখা লাগে, কানে ... লে আঙুলের মধ্যে—সাদা রঙের বাহার, গাড়ীর পাড়ে সোনা, ঝক্‌মক্ করছে ... খোলা দরজার কাছে নিখুঁত পাট-ভাঙ্গা সুট পরে-সুবোধ দাঁড়িয়ে।

আমাকে হঠাৎ দেখে সুবোধ একটু ... এগিয়ে এল, তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে চলে যাবার ... খবর, হ্যালো, কত বর! যাক্, সুচিত্রা আছে বোধ ... এঁদের সুটিং অধ্যটার মধ্যে আরম্ভ হবে, আর ... পারছো, সুবিখ্যাতা শিল্পী, ভারতের সিনেমা-গগনে ... আর ইলি ভিখারিণী ভিখে দি—আচ্ছা, আজ তবে ওড বাই।

হাইতার্স আর্ট দেখাতে সুবোধ তা... গাড়ীতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার সেই স্থানে ... বসালে। ঘরটা যেন আরও অন্ধকার, তৈলচিত্রগুলি ... আরও মলিন মনে হল।

বিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। খদ্দর পরিহিত এক যুবক এসে বলল, আসুন, সুচিত্রা দেবী ডাকছেন।

অবাক হয়ে তার সঙ্গে চলল। বৈঠকখানা বাড়ী ও অন্দরমহলের মধ্যে বড় হলে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে সুচিত্রা বসে, কয়েকটি তরুণ যুবক সামনে দাঁড়িয়ে।

টেবিলের ওপর লিখতে লিখতে সুচিত্রা বলে, ও, তুমি অসিতদাদা, বোসো, এক মিনিট। যাচ্ছা, সুচিত্রা, তুমি কি বলতে চাও, বলো। আমি কোন বিরুদ্ধ মত এখানে বাদা দেব না, চিন্তার স্বাধীনতা চাই। আমি যা বুঝছি, তুমি বলতে চাচ্ছ, মহাত্মা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রফা করছেন, বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো না কেন, আমরা ত কোন বাধা দিচ্ছি না। না, সুচিত্রা, এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখেছি, সুতরাং এরূপ আলোচনা করতে মত দিতে পারি না। মত দিচ্ছি হয় ত হতে পারে, কিন্তু এ সভায় নয়। আচ্ছা, আজ তোমার এই পুরাতন বন্ধু এসেছেন, তার সঙ্গে সবাই এসো, আলোচনা হবে।

যুবক দল চলে গেলো, সুচিত্রা খদ্দর-মোড়া সোফায় এলিয়ে দেহভার সোফার ওপর দেওয়ালে বঙ্গীয় গান্ধীর বৃহৎ তৈলচিত্র, জানলায় খদ্দরের রঙীন পর্দা, ঘরের কোণে ত্রিবর্ণ কংগ্রেস-পতাকা।

—বড় আনন্দ হল তোমায় দেখে অসিতদাদা, খদ্দর পরেছ দেখে আরও সুখী হলুম।

—তা তোমরা জেলে যাচ্ছ, আমরা আর খদ্দর পরতে পারবো না। বরটিকে বেশ সুন্দর সাজিয়েছ খদ্দর দিয়ে। এমন সুন্দর যে খদ্দরের সব জিনিস আছে জানতুম না। তবু বেশ শীতল বাতাস ঘরটাতে।

—হাঁ, ওই ঘুপসি বৈঠকখানা ঘরে আমি বড় একটা ঢুকি না, ও রকম সব ঘর ছেড়ে দেওয়া দরকার। মুক্তি পেয়েছি অসিতদা, [illegible]

—সত্যিই কি মুক্তি পেয়েছ! [illegible] পাচ্ছি।

—তোমরা অবিশ্বাসীর দল! হাঁ, জেলে গিয়ে [illegible] হয়েছি। কংগ্রেস পড়েছিলে ত কি রকম শোভাযাত্রা হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি। [illegible] জানলায় দাঁড়িয়েছিলুম, ভাবছিলুম মধ্যরাত্রে সুষুপ্ত মহাত্মাকে ভারত গভর্ণমেণ্টের [illegible] জাগিয়ে তুলে বন্দী করতে নেবেন, তখন কি সুন্দর হেসেছিলেন, আর সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] এতগুলি ছেলে ভাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছে; একটি ছেলে [illegible] বড় রাস্তায় যেতে কিছু বাওয়া হবে না, গলিতেই ঘুরি, সেখানে না কি লাঠি চলছে—এ একটি ছেলে বলে, তবু করলে চলবে না। থাকতে পারলুম না, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ে বাহির হয়ে গেলুম, নিলুম পতাকা তাদের হাত থেকে, বললুম, এস আমার সঙ্গে কোন ভয় নেই।

—তোমার সেই সময়ের দীপ্ত মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।

[illegible] এ প্রশ্ন [illegible] মেয়ে উঠেছে, ডাইরেক্টর আমলের পুরাণো ঝোলা-পড়া মেরুদণ্ড কেন্দ্রে যে বাড়ির ইট [illegible] দেখে আমার আনন্দ!

বক্তৃতা [illegible] আমিও উত্তর দিয়ে উঠলুম। সুচিত্রা রাগ হয়ে চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ পরে সে বলল, তোমার বন্ধুকে দেখতে পেলে?

কণ্ঠে আর বক্তৃতার সুর নেই, মুখে উদাস ভাব।

—হাঁ, খুব বড় নতুন মোটরকার কেনা হয়েছে দেখলুম।

—সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টরের তো খুব গাড়ী না হলে চলবে কেন! সেই গাড়ীর ঝুঁ বিঁধে উঠবে। নিশ্চয়ই ফেরেল!

—ওই অভিনেত্রী, হাঁ, চুলীতে করেছে হরীন কমল।

—হাসালে বন্ধু টমল দীন তু!

সুচিত্রার কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হলুম। এ পরিহাস নয়, চাপা কান্না। সম্মুখে মেওয়াল-জোড়া ডগডগে [illegible] এক টেলিফিল্মের দিকে চেয়ে রইলুম, একটি ছোট ছেলে, রঙীন ব্রোকেডের কোট পরা, মুখে [illegible] ভঙ্গীতে পাকে কলকাতায় দাঁড়িয়ে, মনে হয় সুবিখ্যাত চিত্র "ব্লু বয়" ছবিটির অনুকরণে অঙ্কিত।

—শোন্, একটা কাজ তোমায় করতে হবে, আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকবো। না, এনগেজমেন্ট নয়, অয়েল-পেন্টিংই একটা করাবুম, এক বড় ইংরাজ চিত্রকর এসেছিলেন, তাঁকে দিয়েই করাবুম। শোকনকে ত তুমি [illegible] প্রতিমূর্তি হয়েছে। মাঝে মাঝে আমি চুপ করে ডেকে উঠি, খোক—ওরে খোকা।

—সুন্দর হয়েছে ছবিটি। ভান্ ডাইকের ছবি

—ঠিক বলেছ, ছবিটি সবাই আধুনিক চায়না

সেদিন মুছে সুচিত্রা বলে, কিন্তু এ কাজটি তোমাকেই করতে হবে। তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলতে হবে, আমি যেন মুক্তি পেয়েছি, তোমি [illegible]।

—গাড়ী যা করুক সবতে তার [illegible] বলে মনে হয় না।

—এ কথা আমি জানতে চাই না। আমি [illegible] চাইবার বিবাহ করল।

—বিবাহ! আর একটি!

—এত অবাক হোস, চমকে উঠিস কি জন্য?

—তুমি সত্যিই বলছ?

—মুখে মিথ্যে কেন আমি মহাভার দিব্যি

—বেশ, সুরোধকে আমি [illegible] সে যদি একটি বিবাহ করতে পারে, তাতে তোমার বিবেক হয় পারে।

—সে কথা ও আমি জানিয়েছি। ওঁর দ্বিতীয় বিবাহ করা দরকার, সে চেষ্টা তো করছেন ও ওরা।

—অর্থাৎ সিনেমা কোম্পানীটিকে তুমি সিকিউরিটিজে দিতে চাও।

—তুলোর বাক্স সিনেমা কোম্পানী। তুমি কিছুই বুঝছো না। আমার মাসতুতো বোন প্রথম যখন বিয়ে করেছিল, তিনিও ছাড়েন নি, প্রথমে খুব আপত্তি করতেন, এখন মত দিয়েছেন, এ প্রস্তাবে বংশ মূল নষ্ট যায়, এ তিনিও চান না। বুঝলে, বংশরক্ষা হওয়া দরকার। আজ যদি খোকা বেঁচে থাকতো!

—আচ্ছা আমি সুবোধকে বলব, কিন্তু তুমি ভাল করে ভেবে দেখ।

বিছানার বসে সুচিত্রা আমার দিকে চাইলে, ক্লান্ত হতাশের সুরে বলে উঠল, ভেবে ভেবে আমি শেষ, আর আমি ভাবতে পারি না অনিতদা, তোমরা আমার জন্যে একটু ভাবো, একটু ভাবো—

দুই চক্ষুর জল ছাপিয়ে অবশ্য বান ডেকে গেল।

প্রায় দু'বছর পরে।

'গৌরী চিঠি লিখলে, সুচিত্রাদিদির বড় অসুখ, বোধ হয় বেশীদিন বাঁচবেন না, তোমার কথা প্রায় বলেন, তোমাকে একবার দেখতে ওঁর বড় ইচ্ছে, তোমাকে চিঠি লিখবেন বলছিলেন, কিন্তু বোধ হয় লিখতে পারেন নি, তুমি একবার এসো দাদা। কয়েক মাস আগে গেছলেন উনি দার্জিলিঙের এক গ্রামে মেয়ের কাছে কয়েক, বাঙালীর ঘরে থাকবো, তাদের মতন। এই নিয়ে সুবোধবাবুর সঙ্গে খুব ঝগড়া, মুখ দেখা গেছল। সুচিত্রাদি বলেছিলেন, তুমি তোমার জমিদারীতে ছুটিং করবার জন্যে যেতে পারো আর আমি কাজ করবার জন্যে যেতে পারবো না কেন? সুবোধবাবু বলেন, তুমি অন্য গ্রামে গিয়ে ও কাজ করতে পারো, আমার জমিদারীতে গিয়ে এমি তাঁর থেকে শুধু আমার ইজ্জত নীচু করবার চেষ্টা করছো, কিন্তু জেনো আমাদের মান যশ শতাব্দীর, এ সব ইতর চেষ্টায় কিছুই হয় না। সে এক মস্ত কাণ্ড। বাবু গ্রাম ছেড়ে সুচিত্রাদিদি যে জল নিয়ে কিছুতেই [illegible] হয় নি। ডাক্তারেরা অসুখের আসল নাম উচ্চারণ করে, দু'দিন অন্তর ওষুধ বদলায়, কিন্তু অসুখ [illegible]। [illegible] বেশীদিন নেই, তুমি নিশ্চয় একবার এসো দাদা।

ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে হল।

মনে পড়ে, বৈত-অপরাহ্নের ম্লান আলোয় [illegible] শত শতাব্দীর পথের কাজ করা বেতের পুরানো হাতীর দাঁতের মতন, পিঠে গোল কুশন ঠেসান দিয়ে সুচিত্রা বসে, পায়ের ওপর অরি-গায়ে আঁকা পুরানো শাল জড়ান, সান্ধ্য-সূর্যের এক ঝলক আলো তার পাণ্ডুর [illegible] ঠোঁটের রক্তাভা শুকনো। অনেকক্ষণ ছিলুম সে ঘরে, তার রোগশয্যার পাশে, কি বেশী কথা হয় না; সব কথা মনেও নেই।

জানিয়েছিলুম, ছুটি নিয়ে এলুম তোমায় দেখতে।

মান হেসে বলে, এসেই যে জিজ্ঞাসা করো নি, কেমন আছ, ডাক্তারেরা কি বলছে, কি করে অসুখ হল, সে জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে, জানলা আকাশের [illegible] মনের [illegible] ছিঁড়ে ছেঁড়া ঘুড়ির মতন, পুরানো দিনের কথা, ছিন্নভিন্ন শৈশবের [illegible] যৌবনের কথা মনে পড়ে। সেই যে বোডিঙের ঘরে

হয়ত বন্ধ করে কয়টা নেড়েছিলুম সেবক প্রিন্সিপাল কি আড়াই ঘিরেছিলেন! আর আমার সঙ্গে সেই সোমাদের বাড়ীতে ব্যাপারে প্রথম দেখা মনে পড়ে? সেদিন সৌরী বাড়ী ছিল না।

বলুন, খুব খারাপ লাগে, সৌরী থাকলেও তোমার সঙ্গে আলাপ হতো। করুণ হেসে বলে, হাঁ, এ যে ভাবতেও! মোন অসিটুডা ইয়োকোশীর সঙ্গীতের কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দেবে আমায়, তান অপেরার গান আর ভাল ফিউজিকও চাই, আমারগুলো হারিয়েছে, ভেঙে গেছে, এখানে খুঁজেও পাচ্ছি না।

ধীরে বলুন, নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব, আমি নিজে এসে শুনিয়ে যাব তোমায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সুচিত্রা আবার বলে, ভদ্রলোকটির সঙ্গে বোধ হয় দেখা হল না। আজ কোন বারের "প্রথম রজনী" বুঝি! আলো, এখন মনে আমি একটা গভীর শান্তি অনুভব করি, মাঝে মাঝে এক একটা অলৌকিক গভীর আনন্দের বোধ হয়, এই ঘর বাড়ী ভাড়া দেওয়াল, এই সময়ের জনতা, ই ছুটাগা যেন সব স্তরে সেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যে অপূর্ণ উপলব্ধিতে, এখন কিছুই ভালবাসতে কথা কইতে পারি, কিন্তু সে বোধ বেশীক্ষণ থাকে না।

শ্রান্ত হয়ে সুচিত্রা চুপ করলে। ছায়াভরা ঘরে নীরবতা থমথম করতে লাগল।

একটু পরে আবার সে বলতে লাগলো, জানো, বর্তমানের ঘটনা যেন আমায় স্পর্শ করে না, অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন, এই নিয়ে ভাবি, মনে আছে, তোমায় একদিন সি গালের নিনায় কথা আবৃত্তি করেছিলুম, সে দু'দশ বৎসর পরের কথা ভাবতে পারি নি, আমি দু'শত বছর পরের কথাই ভাবি, তখন ভারত স্বাধীন হয়ে গেছে, সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি, নূতন সমাজ ব্যবস্থা, I am that spirit, তখনও থাকবো—

অন্ধকার কোণে রোমান ক্যাথলিক নার্স যে এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে মালা জপছিলেন, সেদি নি, কালো নারীর মত তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়াতে চমকে উঠলুম।

সুচিত্রা হেসে উঠল, ওই, আমার monitress উঠেছেন, আর আমাদের কথা কওয়া চলবে না; তোমাকেও ত যেতে হবে, আমি ওকে যদি পুলিস হলেই পারি, নার্স হলে কেন! তবে মায়ের চেয়েও যত্ন করে। ওকে দেখলে আমার কনভেন্টের দিনগুলি মনে পড়ে যায়, বিশেষতঃ সিষ্টার এলেনরোজেনের কথা।

নার্সটি আমার কানে চুপে চুপে বললেন, সময় হয়ে গেছে, যেতে হবে। তারপর টেবিল-ল্যাম্প জেলে দিয়ে চাকা দিয়ে ঠেলে নিয়ে বসলেন মালা জপতে।

সুচিত্রা খুকীর মেজে বলে, আমো অসিটুডা এই ছবিখেলিনী জাকে আমাকে সারিয়ে তুলবেন, হাঁ, I shall live, dance and sing—কি ভালো সিষ্টার—ঈশ্বর শেষে রোমান ক্যাথলিকও হয়ে যেতে পারি—হা—হা—Shall dance and sing—হা হা!

আমিও হেসে সুচিত্রার নিকট বিদায় নিলুম। মনে পড়লো আগে প্রতিবার সুচিত্রার অসুখের সময় বিদায় নিয়েছি। এবার সে হেসে বিদায় দিলে। কিন্তু পথে বাহির হয়ে সেই পুরাতন অন্ধকার বাড়ীটির দিকে চেয়ে চোখের জল রোধ করতে পারলুম না।

সুচিত্রার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। আর জীবনে দেখা হবে না।

মহীশূরের নরভুক

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

[একদিন অরণ্যই ছিল মানুষের আদি-জন্মভূমি...তার যৌবন...ধীরে ধীরে অরণ্য থেকে সে গড়লো শহর...অরণ্য পড়ে রইলো অপরিচয়ের অন্ধকারে...হিংস্র জানোয়ার রাজত্ব পুরাকালে অরণ্য তপস্বীরা মাঝে মাঝে ফিরে যেতেন অরণ্যে...নির্জনতার খোঁজে...কিন্তু কালক্রমে সে-ধারাও গেল বন্ধ হয়ে...এখন শহর থেকে অরণ্যে যায় মানুষ শিকারির রূপে...হাতে বন্দুক নিয়ে...অন্তরে নিয়ে আশঙ্কা এবং সেই সঙ্গে, মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখবার এবং জয় করবার একটা আদিম পৌরাণিক কশোলিপ্সা...পশু যে বধ করে সেই-ই শিকারি নয়...শিকারি হলো এই সভ্যতার অরণ্যে হারিয়ে ফেলা আদিম-রস-পিপাসু এক ধরণের অপূর্ব পুরুষ...অরণ্যের বাঙ্ময়হীন ভাষার মধ্যে যে খুঁজে পায় তার অন্তরের ভাষা...যার রক্তে আছে এমন এক বিচিত্র অনুভূতি, যার স্পন্দন জাগাতে পারে শুধু অরণ্যের অতর্কিত আক্রমণ...বর্ণ-বিলাসী শিল্পী দেবীপ্রসাদ সাহিত্য-জগতে এসেছেন এই ধরণের ব্যক্তিটিকে...তাই তাঁর শিকার-কাহিনী পশু-হত্যার বিবরণ নয়...প্রেম-কণ্টকিত, বাঙলা সাহিত্যের উপবনে তিনি এনেছেন এক নতুন স্পন্দনের অনুভূতি...নিরাপদে ঘরে বসে যা আমরা মনের আনন্দে উপভোগ করতে পারি...আঘাত যা কিছু, বাজুক যা কিছু, তা থাকুক-লেখকের...]

গল্পটা শুনেছি মশাইদের কাছ থেকে শোনা। তাঁর স্বকীয়তই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করি।

খেয়াল হলো মহীশূরের জঙ্গলে বাইসন মারতে যেতে হবে। তখনকার দিনে শিকার নিষেধ ছিল না, বড় সহজলভ্য জিনিস ছিল না। হাই ভেলসিটি কর্তাইট রাইফেল (High velocity cordite rifle) ও রাঘের শিকারের জন্য বৈদ্যুতিক টর্চের আমদানী হয় নি, তার উপর দেশে হাতী সংগ্রহ একটা সমস্যা। সাজনের প্রয়াস সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, শিকারীকে একটা কথা মনে রাখতে হত—এর মার কিলা মর। জমি জানোয়ার বেমন, লোক কিলা বরাহ আক্রমণ করলে প্রাণে বাঁচার যেটা পথা ছিল—বন্দুক উঁচিয়ে ধরা। বন্দুক দিয়ে যেমনই ভাবে গুলি চার্জ (charge to kill) করতে পারে সে ভেবে বাঁচবে-নইলে গেল।

যাক মাঁসুরের প্রথম আঙ্ক থেকে তোফলাড় করে বেরিয়ে পড়া গেল—ভোর তখন চারটে, অন্ধকার তখনও ঘোর অন্ধকার। দশ-বারজন ভাড়া করা বিটার পাওয়া গিয়েছিল, তাদের চাল চলন দেখেই মনে হলো কিছু আনাড়ী হোয়া করলেও কিছু শেখান যাবে না—তবু মন্দের ভাল—হানীয় লোক অন্তত কোন দিকে শিকার পালাতে পারবে না! বিটারদের সঙ্গে তিনটী গরুর গাড়ীও জোগাড় হয়েছিল।

রামদিন তার বন্দুকগুলো নিয়ে আমার গাড়ীতেই উঠল। জোসীন মাল সামলাবার জন্যে ছাউনী-ওয়ালা গাড়ীতে গিয়ে ঢুকল। বিটাররা তখন মশাল জ্বালিয়েছে। অভিযানের সুরুতেই জোসীন পিছে ডাকা সুরু করেছিল। তার চেঁচামেচিতে সব কয়টা গাড়ীই থামাতে হল—সে হন্তদন্ত হয়ে একজন মশালধারীর হাতে ধরে রাখা দুটো জল নিয়ে হাজির, বললে—"হুজুর আপনার খাবার জল।" ধমক দিয়ে বল্লাম খাবার জল তো তুই নিজেই গাড়ীতে রেখেছিলি। আবার আরেকটা কুঁজো আনতে গেলি কেন, জায়গা কোথায় যে রাখব। ব্যাপারটা সহজ করে নিয়ে বল্লে—আজ্ঞে ভুল হয়ে গিয়েছে। তারপর গিয়ে উঠল মাঝের গাড়ীতে। তার ভুল ও প্রভুর প্রতি অযাচিত দরদের কারণ আবিষ্কার করলাম। আসলে পিছনের গাড়ীতে একলা বসে ভয়টা নিরাপদ বোধ করছিল না।

গাড়ী আবার চলতে সুরু করল। আকা-বাকা পাহাড়ী পথ ক্রমেই এগুতে লাগল ততই সুড়ীর আকার ধারণ করে উঠতে থাকল। অবশেষে এমন অবস্থা হল যে, হেঁচকা আর সহ্য করা গেল না। অভিজ্ঞতাটি খালি পিঠে ঘোড়ায় চড়ার মত। পথে কোথা পাথর আর পাথর, সব বড় বড় সুড়ী তার উপর খাড়াই পথ, তার চার কদম চড়ে-তো এক কদম নামে—শেষ পর্যন্ত গোমান থেকে নেমে পড়লুম।

আমি গাড়ীতে আরিস্ত করেছি দেখে, রামদিনও ছুটো বন্দুক নিয়ে আমার পিছু নিল। চলাটা মন্দ লাগছিল না। আট-দশটা মশালের আলোয় বনানীর অন্ধকার অবগুণ্ঠন আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে একটু একটু করে অপসৃত হয়ে যাচ্ছিল। দেখছিলাম আলো-ছায়ার মায়া প্রকৃতির দৃশ্য জগৎ রূপান্তরিত আবির্ভূত হচ্ছে। কোথাও পাথরের কঠিনতার উপর নক্সের সমৃদ্ধ আত্মপ্রকাশ—দুর্বার কচি মুখ আলোর ছটায় কাঁচা সবুজ সোনা হয়ে গিয়েছে। কোথাও আত্মগোপনী লতা বিরাট বটের দেহে আত্মোৎসর্গ করে নেতিয়ে পড়ে আছে, মনে হয় এরা যেন জীবনে কখনও একের ছায়াছাড়ি হবে না।

রামদিনের ভুল আমাকে সাবধানতার সঙ্গে করে তুলেছিল। কিভাবে চলেছি এবং কতটা চলে এসেছি খেয়াল করছি। অকস্মাৎ রামদিন আমার হাতে একটা বন্দুক দিয়ে বলে—মালুম, আমি পিছনে ফিরবার আছি।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কতকটা ভ্যাবাচ্যাকা গোছের মত অবস্থা—দুই প্রহর করে রাস্তার সামনে কোথাও, যেমি বিরাট আকারের বাঘ আমাদের চলার পথেই চলেছে—মাত্র ৪০।২৫ গজ দূরে—গতিতে কোন তাড়াহুড়ো নেই—অতি সহজ চলা পিছনের গরুর গাড়ী ও মানুষ বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই।

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে বাঘ আমার দিকে ফিরে তাকাল। মশালের আলোয় চোখ দুটো ছোট ঘোড়ার ডিমের মত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল না দেখতে দেখতে আরো বড় ও বড় হতে লাগল। আক্রমণের পূর্ব লক্ষণ—

এক মুহূর্ত দেরী করলে—আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অত কাছ থেকে একবার মাথায় ছাড়া দেহ আয়ত্তে আনা চলে না। বাঘ যেখানে আছে সেইখানেই তাকে থামাতে হবে, অন্যথায় আমার মৃত্যু অনিবার্য। মুহূর্তে অতগুলি যুক্তি শেষে সিদ্ধান্ত করে প্রতিশব্দ হয়ে গেল—বন্দুক তুলে ঠিক চোখ দুটোর মাঝখানে গুলী চালালাম। নিশানায় কোন অসুবিধা হয় নি—রামদিন বন্দুকের নল চুপ মাখিয়ে রেখেছিল—তার উপর ভোর মশার [illegible] আকাশ তাগমাফিক সফলতা প্রমাণিত হয়ে গেল। গুলী চলার সঙ্গে বাঘ রাস্তায় লেজিয়ে পড়ল—হয় কিছু ক্ষণিকের জন্য, পর মুহূর্তেই খাড়া হয়ে উঠল মাত্র—একটি চোখ অন্ধ হয়েছে। দৃষ্টি ঠিক আমার উপর [illegible] শরীর খুব বেশীক্ষণ দাঁড়ান সহজসাধ্য হতে পারে না। আর একটা মশাল তার উপর খালি করে দেবার জন্য হাত টিপলাম—খট করে আওয়াজ হল গুলী বেরুল না, কার্তুজ গলতি ছিল। অবশ্যে বন্দুক [illegible] খুঁটির মত দাঁড়িয়ে গেলাম। এইরকম অবস্থায় যাঁহারা না পড়েছেন তাঁহাদের নিকট আমার মানসিক অবস্থা [illegible] যাওয়া বিড়ম্বনা।

দ্বিতীয় গুলী নির্ঘাত হলেও আমার পাশ থেকে রামদিনের বন্দুক ছুটল—বনস্থলী সেবার ভয়ঙ্কর কম্পিত হয়ে উঠল। ধোঁয়া ও বিকট শব্দের প্রতিধ্বনি কেটে গেলে দেখলাম বাঘ পড়ে গিয়েছে। ঠিক হয়ে উঠে দিকে পা ছুড়ছে বলিদানের পর কতকটা ছিন্ন মস্তক পাঠাকুর্দিত। আফ্রিকী মতে মরা বাঘকে দুবার মারলে বিশ্বাস করে বই বাঁচে না—রামদিন এ যুক্তি বিশ্বাস করে—সে আর একবার গুলী চালাল—বাঘ তার পরেও নড়ছিল। মৃত্যুর লক্ষণ তখনও সুস্পষ্ট নয়—তখন বাঘরক্ষার জন্য বন্দুক উল্টে ধরার সময়—কারণ দুইটি কার্তুজই শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে, বড় বাঘ লাঠি চার্জকে গ্রাহ্য করে না—গত্যন্তর না থাকায় আমরা উভয়েই সামনে মুখ রেখে আস্তে আস্তে পিছু হটতে লাগলাম, বাকেয়ের আদর পাব বলে।

খানিকটা এইভাবে চলতে বোধ একটা, দুটো, তিনটে—অনেকগুলো মশাল বাঁশিতে পুঁতে রয়েছে, তাঁহার—দু'একটা শুকনো ঝোপের গায়েই লাগছে—বলল ছাড়া লাগলি [illegible] রামদিন শিকারের ব্যাপারে কখন কথা বলে না কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিরুপায়—বলল—আপনি বাড়ী থেকে আর বন্দুক নিয়ে আসুন, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। যদি ফেরে আসে তো দু'জনকেই নেবে—বাঘ মোষ হবার আগে মরা বাঘকে বিশ্বাস নেই। কাপুরুষের মত রামদিনকে বিপদে ফেলে যেতে মন চাইছিল না—আমাকে বিপদ্মুক্ত দেখে ফেরে ফিরেই হয়তো প্রভুকে [illegible] কত্তা হুজুর এসেই রাম—এখনো [illegible]—গাড়ী হয় ত পাশে পড়েছে—বন্দুক খুঁজে বার করতে হবে—একটা মশাল তুলে নিন।

বাল্যকালে রামদিনকে রামু কাকা বলতাম। কৈশোরে ওরই কাছে শিকারের হাতেখড়ি—তখনকার [illegible] আদেশ অমান্য করতে পারতাম না। একটা মশাল তুলে নিয়ে সামনের দিকে মুখ রেখেই পিছু হাঁটতে লাগলাম। কতক পা চলতেই হুঁশের সঙ্গে চোখ মেলে আছাড় খেলাম, মাথাটা ঘোরা গিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের চাই—তার উপর—তারপর [illegible] ভাল-গোল পাকিয়ে গেল। কোথায় বাঘ আর কোথায় বন্দুক খোঁজা। অতল [illegible] হয়ে [illegible]—চাইতেও মেরি [illegible] যত [illegible]

জ্ঞান হারিয়েছিলাম, পরের কথা—বেশ্ হয়ে গিয়েছে, বাড়ীতে বিছানার উপর শোওয়া রোগী। পূর্ব ঘটনাগুলি মনে পড়তে লাগল—রামদিন পাশেই ছিল, কিন্তু মরেছে তো? সে কেমন কচু ঘাঁচু করে উত্তর দিল—আছে হাঁ।

শিকারের সরলতায় ন্যায় রামদিনের কখন তো এইরূপ আচরণ দেখি নি—সব ঠিক তাহলে মাথা চুলকে বলল—তাড়াতাড়ি বন্দুকটা দিতে বড্ড ভুল করে ফেলেছিলাম,

রোগারটা বুঝলাম না।

রামদিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বীকার করল—আমাকে যে বন্দুক দিয়েছিল সে গুলে ভরা ছিল, কথা শুনে চমকে উঠলাম—বুকের ভিতরে দারুণ ঝাঁকুনি লাগল—মরা নয় একেবারে জীবন্ত বাঘের সামনে পড়ে গিয়েছি। সাজ্ঘাতিক ফাঁড়া কেটে গেছে—নেহাৎ যদি ছোট ছররায় ভরা হত—এবং চোখের পলক পড়ার আগে রামদিনের কি হত ধারণা করা যায় না।

মনে মনে রামদিনের উপর রাগ এলেও তাকে কিপ্রতাসহ অদ্ভুত নিশানা এবং দৃঢ় করে পারলাম না—আমার গুলী প্রথম লাগলেও বললুম—"বাঘটা তোমার" (শিকারে গুলী চালায় জানোয়ারের উপর যারই—সেজের ডগায় লাগিলেও নিজের ব্যক্তি

পুরস্কার লাভে রামদিন আত্মপ্রসাদে ডিগবাজী খেয়ে গেল। মারাত্মক ভুলের জন্য এ পেল দুরকমের পুরস্কার—অধিকতর পীড়াদায়ক লাঞ্ছনা।

সে নাথা নুয়ে চলে গেল—আমি ডাকলাম; বাঘমারার সব ঘটনা শুনতে চাওয়ার উৎসাহে হয়ে বসে চলল—লোকগুলো পরথা নম্বরের মিথ্যুকহারাম, ওরা দেখেছিল—গাড়োয়ানরা পর্যন্ত। আমরা সামনে ছিলাম, বিটাররা কখন মশাল ফেলে দিয়েছে পারিনি... গাড়োয়ানরাও ঘোং ছেড়ে ওদের পিছু নিয়েছিল। ফোরা বোগীন গাড়ীতে শুয়ে আছে—ছাড়ে কোন গাড়ী যায়ে পড়ে নি। রোগীনের কথা শুনে আছে মানেই ওর অত্যাসকরা ঝাকানী—বাড়ীতেও বেশী কাজের অছিলায় ঐরূপ নিজের চাপ লুকাবার চেষ্টা—সে হুক চড় কষিয়ে ওর অসুখ ভাল এখুনি কেটে

রামদিন হুকুমটা যে সত্যি সত্যি কাজে লাগাবে অনুমান করতে পারি নি। বাঘ মেরে নামছে বাড়ি এমন সময় রোগীন ছুটে তাদুতে মুখ ফেকে আমার সামনে দাঁড়ি রোগীনের অভিযোগ যাই থাক তার কাঁপিয়ে তাঁবার কারণ তো আমি নিজে সুতরাং না চাকে পেছনে ফেলে চলতে লাগলাম। বেশী দূর যেতে হয় নি এমন সময় একটি ভারী গাড়ী পেল। ফিরে দেখি রামদিন দাঁড়িয়ে আছে মাটিতে বসে—তার কাঁ

...মে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে রামদিনের দিকে তাকিয়ে আছে...ছু, আমাকে চাবুক? আমি কি করেছি ভাই?

রামদিন এগিয়ে এসে বললে—হুজুর ওর নালিশ শুনে কি বল শুধু চাকরী ছেড়ে দেবার জন্য দেখায় নি—বলে কিনা অমন বাবু ঢের ঢের দেখেছি।

আমি বাবু মোটেই নই। তথাপি খাটিয়ে গদি মাথা পেতে নিতে বা [illegible] উপর রাগ করার কিছু ছিল না। কারণ আমার মত সস্তার বাবুগিরি বেশীর ভাগ লোকেই করে থাকে, সুতরাং তারা অনেক কিছু বাদ দিয়ারে এসে শার্দূল দর্শনে চাকরী ছাড়ার জন্য দেখালে গিটান করার দৌড়।

যা হোক রামদিনকে বকা উচিত ছিল। কিন্তু শিকারের সুখস্মৃতে বকা ভেবে নিরস্ত হলাম। সব তত্ত্বাবধানই রামদিনের উপর। সুতরাং তার অধীনস্থ লোকের সামনে বকতে পারলে না। আমরা শিকার দেখতে এগিয়ে গেলাম।

ছাউনির আড়াল থাকায় শরীরের খানিকটা দেখতে পাচ্ছি [illegible] বাঘ তাদের মোয়ান, ডোরায় (stripes) যৌবনের ছাপ রয়েছে। সামনে এসে দেখলাম বাঘার ঘাড়বাদে তখনও রক্ত জমে আছে—একটা চোখও জখম হয়েছে। শিকারীর দুর্বলতা কিভাবে থেকে উঁকি মারছিল, তাই ফেলুদা—পাল পোষের সর্দার আঘার খুশিটা ভাল করে দেখিয়ে ও।

রামদিন প্রশ্নের অর্থ বুঝলে, সহজ ভাবেই উত্তর দিলে—হাঁ। হুজুরের গুলীতেই লেগেছে। আঘার একটাই গুলী চলেছিল, আমি তাগ করেছিলাম বুকে। ও আঘাতে ছাড়ল না যে, কাবণ ওরই দুরে থাকলে বাঘ প্রথম গুলী খাবার পর আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করলেও কিছু করতে পারত না। [illegible] বেশীদূর চলার মত জান ছিল না। অর্থ দুজনার বন্দুকের গুলী [illegible] রক্তে দিয়েছে। তবু সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমার গুলীতেই বেশীরভাগ [illegible] লেজের ডগা উড়িয়ে দিই নি।

গাড়ী আবার চলতে লাগল। হেঁচকাদিয়েও থামে উঠে বসলাম। প্রচুর রক্তক্ষয়ে হাতিমত দুর্বল বোধ করছিলাম। ঘণ্টা দুই হেঁচকার বিড়ম্বনা সহ্য করে বনবাসের আস্তানায় এসে পৌঁছান গেল। একটা পরিত্যক্ত ছোট গ্রাম, তাহারই নিকটে পোড়ো পাকা বাড়ী যে কোন সময় কোন [illegible] অধিকারভুক্ত ছিল। এখন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে। গ্রাম জনমানবশূন্য—জঙ্গলের আশ ঘরে [illegible]

মাথা গোঁজবার স্থান পেলেও বাড়ীটিকে নিশ্চিন্তমনে আশ্রয় বলা চলে না। জানালা দরজা নেই আছে তবে কোনটাই বন্ধ হয় না এবং যে কয়টি পাল্লা আলগা থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সেগুলি খুলে হলে ঝামেলা দিয়ে আটকাতে হয়। শোবার ঘর ঠিক করা হল—তার খোলা জানালা জঙ্গলের দিকে এবং এত নীচে যে, লোকজন হেঁটে বন্দুকে ভিতরে হাত আনতে পারে। জানালার গ্রিল [illegible] মোটা ছিল। বেশ শক্ত-চওড়া—এদিককার [illegible] বাঘ বাবু সাধ্যমত করেছে।

মোহনবাগান। কলিকাতা। কলিকাতার বর্তমান অবস্থা ইতিহাসপূর্ণ থাকা সত্ত্বে নয়। অতিরিক্ত হলেও রাস্তায় আসতে আসতে দু-চারটে টুকরো ঘটনা মনে হচ্ছে থাক দিলেও সত্যের ছিটে-ফোঁটাই সত্যতার পক্ষে যথেষ্ট।

ভোর ভোর—রামদিন যোগীন আর দুটো কুলী মিলে ঘর পরিষ্কারে লেগে গেছে, ইতিমধ্যে রামভরোসার খাল পেটের আয়োজন দেখছি, বাবু ঘরে বসতে হলে লোহা লাগান হয়। সবে কিতা ঘরে টান মেরেছি—এমন সময় যোগীন চীৎকার করে উঠল—হুজুর সাপ—আপনার দিকেই চলেছে—তাড়াতাড়ি দাঁড়াতেই দেখি চৌকাঠের উপরেই আছে। ছোবল মারার পূর্বলক্ষণ নয়—পথ ছেড়ে দেবার সঙ্কেত। ভাত সাপকে দাঁড়াতেই বলা নামিয়ে সেই চৌকাঠ পার হয়েছে—অমনি সতরঞ্চি তুলে দিলাম ও আবার ঘরে সামরিক জুতো দিয়ে খেঁতলাতে আরম্ভ করলাম। যতই খেঁতলাই তত পাচ্ছি—যেন সাক্ষাৎ যমকে পিষে মারছি। অনুভূতিতে বেশ বুঝতে পারছি—সে নিয়েছে—তবু বিষাক্ত জন্তুকে মারার আশ মেটে না—লেজের দিকে অনেকটা ছিল—তারে ছোট গাদট খাচ্ছে তবে তেজস্বী নয়।

আসছিল এমন সময় রামদিন—আরে বাপরে, বলে বাইরে এসে আমার বাহারি চুকল। তারপর ছাতা পেটানর আওয়াজ। আওয়াজ থামার পর রামদিন আর একটি ধরে ঝাঁটা বাইরে নিয়ে এল—কালো ছোড়ে ছিল।

তখন ঝাঁটাতারে রামদিনের হাতে গলায় বেড় দেবার চেষ্টা করছে। আমি নিরাপদ দূরত্বের অংশ ছেটে দিতে পারতাম কিন্তু পায়ের তলায় জীবটি আমাকে যেন ইচ্ছা থাকলেও পাখা খেঁতলান থামাতে পারছিলাম না।

ন নেবেছে ঐ সময়ের ভিতর কেমন করে সাপের নিরাংশ রামদিনের গলায় বেড় দেব বলি, তারই দৃঢ় বেষ্টন গলার উপর পড়লে লোকটাকে ধরাশয়ী হয়ে মরতে কথার সময় নেই—উঠানে নেমে পড়লাম এবং কোনরূপ কথাবার্তায় বিলম্ব না করে হাত রামদাস যাতে বেড় কর্তনালীর কাছে না আসতে পারে। হাত রাখার সঙ্গে যখন দুজন হল—সোখুরের বাঁধনে মোটা কর্তী জখম হতে পারে কথাটা ঠিক ও বিশ্বাস নই চাপের অনুভূতি আজও আমার মনে আছে। দুটিনাটি মনে পড়লে আজও আতঙ্কে। তান হাতের পাঞ্জাই বিপদের মুখোমুখি হয়েছে—মুহূর্তে যার যেন চোখের সামনে দুজনারই হাত বাঁধা পড়েছিল—তবু রামদিনকে বলছি টেনে যে—কোথায় তার ত্রুটি নেই পা পাওয়া যাচ্ছে না, বরং বাঁধনের চাপ আমার হাতের উপর আরো বেড়ে চলেছে। াকলে হয় ত আমার হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেত, ভাগ্যগুণে বাগানের জমাদার একজন আমাদের দেখতে পেয়ে ছুরি নিয়ে ছুটে এসে—রামদিনের

ওটীন ক্রীম
অপরিহার্য্য
ও
কণ্ঠের অপর
সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রীবৃন্দও
এর [illegible] সমর্থন

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sashona Bose

Oatine

SNOW for DAY • CREAM for NIGHT

হাতের পাশেই মাথাটা কেটে, দেহের অংশ দুই-তিন টুকরা করতে সময় নিষ্কৃতি পেলাম। পরে সাপের দাহন ক্রিয়া শেষ করে রামদিন ফিরে এল। তারপর সকলের স্নান আহার ইত্যাদির পালা শেষ হতে আমি একটু বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলুম। তবে তখনও চামেলি গাছের উপ্রতা কমে নি। নিরুপায় হয়েই সামনের বারান্দার মত জায়গায় কেশ খাটে শুতে নিজেকে এলিয়ে দিলাম—ইচ্ছা ছিল, সময়ের ভিতর আরাম গাঢ় নিদ্রায় তলিয়ে দিল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সময় অপরাহ্ণ পার হয়ে সন্ধ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সেই শুকনো ঝরা পাতার আওয়াজ তখনও কমে নি। জঙ্গলের তাজা সবুজের চেয়ে শুকনো ঝরা পাতা আরও মনকে কম টানে না। শুকনো পাতার পতনধ্বনি শুনবার জন্য কান পেতেছিলাম—কত চিন্তাই না ঐ শব্দ থেকে গড়ে উঠছিল।

যাক বাস্তবে ফিরে আসি, বিটারদের ভিতর একজন তখনও জঙ্গল থেকে ফেরে নি—তার সন্ধানে গিয়েছিল—সারারাত বাড়ীর চারপাশে আগিয়ে রাখবে বলে বাড়ীর সীমানা নির্দিষ্টের পর পর নীচু পাথরের টুকরা সাজিয়ে পাঁচিল তোলা হয়েছিল। এখন তার দুর্বিলাসী ধ্বংসাবশেষ ছাড়া, অন্য কোন চিহ্ন নেই। জঙ্গলের সঙ্গে বাড়ীটার ঘনিষ্ঠ যোগ তো আছেই তার উপর ইভিনিংএ আমাদের আগমন নিয়ে বিটারদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে গিয়েছে। কোন অভিজ্ঞ বিটার আর একজনকে জানিয়েছে—এখানে আস্তানা গাড়া হবে জানলে সে কখনও আসত না, কারণ বেশী কালা আদমী ও দুধের কথা সাদা সাহেবকে পর্যন্ত বাঘ এই বাড়ী থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে। মনের জোর সাদার প্রতি কোন বিশেষ সম্ভ্রম দেখায় নি। তা ছাড়া আরো কত কথা এই বাঘী সম্বন্ধে কোন কাণ্ড জ্ঞান ঠিক ঠিকানা নেই।

এদের কথা শুনে আমারও কেমন খটকা লাগছিল—গোড়া থেকেই কেমন একটা গা ছমছম ভাব অনুভব করছিলাম। বাঘের ভয় নয়, একটা এমন কিছুর ভয় বাঘ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এর পিছনে Auto suggestion-এর মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন যদি উঠে ত বাচার, মোট কথা অভয়ের কথা লুকাইনি।

একলাই বসেছিলাম। বেশ দূরে রান্নাঘর—দুই দিকের কোণ আছে—বাকিটা অঙ্গনে নিয়ে গাড়ী রামদিনকে পরম হুজুরের মত পাশে বসিয়ে যৌবন রাত্রের রান্না চড়িয়েছে—আলো দূরে রান্নার চালায় চারজন বিটার ঘুন ছড়াচ্ছে—কেন বলতে পারি না—সকলের উপস্থিতি সত্ত্বেও কেমন একটা নির্জনিকর ভীতির আশঙ্কা আমাকে পেয়ে বসেছিল। উঠলুম নিরুপায় অবস্থায়—জঙ্গলের ঐ গাঢ় ঘোপের সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ঘরের ভিতর থেকে বন্দুক আনতে যাব বলে চটি জোড়া জোড়া করে পরছি—এমন সময় ঠিক ডানদিকে পিছনে অতি নিকটে শুকনো পাতার উপর দ্রুত গতিশীল জানোয়ারের পদশব্দ শুনলাম। পরক্ষণে ঘাড়ে ঐ জোর ঝাপটা মারতে আমি চিনি—চিতা—সঙ্গেই চীৎকার করে রামদিনকে জানিয়ে দিলাম—সাবধান, কাছেই বাঘ ঘুরছে। চীৎকার জিনিষটা মার্জিতরুচিসম্পন্ন হয় না

স্থির করতে পারে না। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘ কতক্ষণ ওৎ পেতে বসেছিল কে জানে। ঘরে ঢুকে দুটো ভরা বন্দুক তুলে নিলাম, রান্নাঘর অন্ধকারময়ো, খোলা—হাঁ হাঁ করছে।

রামদিনকে একটা বন্দুক দিয়ে জানালাম—বাঘ এসেছে, মানুষখেকো—পিছন দিকটা নজর রাখিস—আমি এদিকে দেখে আসি। সে বললে আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমি বারণ করলুম—তার আপত্তির কারণ কাটিয়ে দিলাম এই বলে—বেশী দূরে যাব না, সন্ধ্যার আগেই ফিরব—কাছেই ঝোপ ঝাপ দেখে আসছি। রামদিন ভৃত্য হলে কি হবে জঙ্গলে সে আমার অভিভাবক। একটু তোয়াজ না করলে চলে কেমন করে? তার উপর নিজের হাতে মারা বাঘের উপর প্রথমবার দখল দিয়েছি, এবার আর নয়। বাঘ যদি মারি ত একলাই মারব—শিকারের তারিখে—অংশীদার চাই না।

রামদিন বহুবার আমাকে একলা বাঘের সামনে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এখানে তারও যেন কেমন কেমন ভাব লক্ষ্য করছিলাম।

ভরা বন্দুক হাতে নিয়ে বারান্দা থেকে বেরিয়ে এলাম—এইবার আমার মাথা চুলকাবার পালা। মানুষখেকো বাঘের পিছনে কখনও ধাওয়া করি নি, বিশেষ করে ঠিক সন্ধ্যার আগে।

এখন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হলেও ঝোপ ঝাপের অভাব নেই—বাঁশবনগুলোই মারাত্মক। ওর তলায় স্বয়ং ভগবান মূর্তিমান হয়ে লুকিয়ে থাকলেও ভক্তের খুঁজে পাবার উপায় নেই।

বন্দুকের গোড়া তুলে এগুতে লাগলুম—একলা দুর্গা স্মরণ করে চলছি আর শুকনো পাতার উপর চেনা মড়মড়ানি শুনবার জন্য থামছি—দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ রাখলেও আড় চোখের কাজ সমান ভাবে চলছে। নরভুক বাঘ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই—সন্তর্পণে হয়ে অগ্রসর হচ্ছি। বেশী দূর চলতে হল না—বাড়ী থেকে শ'খানিকটা আসার পরেই সামনে ঢালাই ঘাস পেলাম। চারধারে মাথার উপর ঝোপ রেখে নীচু নামব কিনা ভাবছি এমনি সময়ে খানে খাড়াই ঘাসের ডগা নড়ে উঠল—গতি তার আমার দিকে। ক্ষিপ্রতালে বন্দুক তুলে ধরলুম—কিন্তু অত কাছ থেকে আন্দাজে নিশানা করতে সাহস হল না। আন্দাজে টিপে যদি সামান্য খাঁচড় দিয়ে গুলী চলে যায় তা হলেই মারাত্মক। গুলীচালনি সম্বন্ধে ইতস্ততঃ ভাবটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারি নি—এরই ভিতর বাঘের চলার দিক থেকে বহুদূরে মানুষের কীণ কলরব শোনা গেল। কান খাড়া করে শব্দ কোন্ জাতীয় জানবার জন্য দাঁড়ালাম। শব্দ ক্রত নিকটবর্তী হচ্ছিল, মুহূর্তের ভিতর বহুলোক লোকগুলি ছুটে আমাদের আস্তানার দিকে আসছে। এরই ভিতর খাড়াই ঘাস আবার নড়ে উঠল—তার লক্ষ্য ধাবমান আমাদের আস্তানার দিকে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিটাররা শূন্য হাতে এসে বললে—সরয়াহকে বাঘে নিয়েছে। নালার জল খেতে গিয়েছিল সেইখানে তাকে মেরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছে। যে কয়জন স্বচক্ষে দেখেছিল তারা সকলেই এক জোটে ঘটনার বিবৃতি দেবার জন্য এগিয়ে এল। বর্ণনা শেষ পর্যন্ত কোলাহলে পূর্ণ হয়ে উঠল—ধার দার অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলবের কইবাধ ব্যাপার।

ওদের ভিতর একজন ভাঙা হিন্দুস্থানী বলতে পারত, তাকে ডাকলাম। সে কিছু বলবার আগেই কাতর মিনতির ধারা জানাল—সরদারকে বাঁচাও, সে এখনও বেঁচে আছে।

বেড়ালে ইঁদুর ধরার মত বাঘ সরদারকে পিঠের কাছটা ধরে খুলির খোপের ভিতর ঢুকেছিল। ঘাবার পথে বেচারা সরদার—হাতের সামনে কাঁটাবন থেকে আরম্ভ করে বিচুটি লতা পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল—স্বচক্ষে দেখা। সরদারকে বাঁচাবার জন্যে আমরা তাড়া করে গিয়েছিলুম—কিন্তু খোপের ভিতর থেকে বাঘের গর্জন শুনে পালিয়ে এসেছি। সত্য বলছি, আমরা পালিয়ে আসবার সময়ও সরদারের চেঁচানী শুনেছি।

গোপী বলল, তবে কি যেটাকে দেখলাম সেটা ছাড়া আর একটা বাঘকে? আমি জানতাম সরদারকে বাঘের গ্রাস থেকে বাঁচালেও মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবে না। হয় ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেকের উপর খেয়ে ফেলেছে। গোলমাল শুনে রামদিন আর গোপীনাথ উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিল রামদিনের দিকে তাকাতে বললে—এখন যাওয়া চলে না। অনেকদূর থেকে বিটারদের শব্দ শুনেছি—সরদারকে কাছে যারে নি—তার উপর কি রকম জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেছে ঠিক নেই। শিকার করার সময়ই লোকগুলো ভড়কে দিয়েছে সুতরাং যে খোপে প্রথম টেনে নিয়েছিল সে খোপেও যাবে কিনা আপনারা সরদারের কাছে পৌঁছাতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অন্ধকারে শিকারের সামনে যাবতীয় বাঘকে মাটিতে দাঁড়িয়ে কবেক গজের ভিতর থেকে মারতে গেলে নিজের এবং আরো কয়েকটা কুলির প্রাণ বিপন্ন করবেন।

সবই বুঝি কিন্তু কুলীদের বোঝাই কি করে? ওদের ধারণা, হাতে যখন বন্দুকের মত গাত্তিয়ার আছে তখন বাঘও মরবে, ওদের সরদারও বেঁচে যাবে। আমার নির্ভীকতা এবং সাহসের উপর অটল বিশ্বাস না থাকলে কখন অমন করে মিনতি করত না। আত্মপ্রসাদ লাভের আর একটি সুযোগে, 'যাওয়া না যাওয়ার' টানা পোড়েনে ফেলে দিল। শেষ পর্য্যন্ত কুলীদের সামান্য প্রশংসাই বিপদসঙ্কুল পরীক্ষায় নামিয়ে দিল—ভাবলুম সিসীমার আদর্শছেলে হবার জন্যে অসংখ্য লোক আত্মবলিদান দিচ্ছে, ঘৃণীয় হয়ে জীবন যাপন করছে। আত্মমর্য্যাদা ও নিজের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করে ভালছেলের খ্যাতিকে পরম আদরে বরণ করে নিয়েছে। এ দুর্ব্বলতা শুধু সাধারণ বা অসাধারণ ভালছেলেরাই পোষণ করে না—বিরাট কীর্ত্তি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এমন কি নিষ্কাম সন্ন্যাসীকেও আত্মপ্রশংসালোভী হতে দেখেছি।

যে গুণকীর্ত্তন আড়াল দেওয়া চাটুবাক্য তাও সাগ্রহে অনেক মহাপুরুষদের সভা বসে শ্রবণ করতে দেখেছি। সুতরাং কুলীর প্রশংসার দাম আমার কাছে কম নয়। নিজেকে ভালবাসি—অপরে ভাল বললে ভালই লাগে। তবে এই ভাল-লাগা আমাকে এখন ভালছেলে হবার পথে এগিয়ে দেয় নি ঐ টুকুই আমার পরম সান্ত্বনা।

চিন্তাস্রোতে যে সিদ্ধান্তে এলাম, তাতে যাওয়াই ঠিক হল—অর্থাৎ কুলীরা সকলেই যদি মশাল জেলে আমার পাশে পাশে জঙ্গলে চলে, তা হলে ওদের মধ্যে সরদারকে উদ্ধার করতে রাজি আছি।

সকলেই সোৎসাহে রাজী হল। কিন্তু রামদিন ওদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে চায় না। বলল—বাঘের হুঙ্কার শুনলেই মশাল ফেলে সব কটা বাঁদরের মত গাছের আগডালে উঠে পড়বে। রামদিনের কথাটা প্রায়শিক সত্যে বার বার এর আগের ঘটনায় কুলীদের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তবু আত্মপ্রসাদলোভী তালচেলের দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসেছিল—মৃত্যুকে বরণ করেই সাহস প্রদর্শন করব ঠিক করে ফেললুম। রামদিনকে বললুম, তৈরী হও। দুটো দোনলা হলেই যথেষ্ট হবে। রামদিন ইতস্ততঃ করে জানাল—সব কয়টা বন্দুকই বড় গুলী দিয়ে ভরা হয়ে গিয়েছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে অত কাছ থেকে বাঘ মারার জন্যে বড় ছররা নিলে ভাল হত। একটা একনলা খালি আছে সেটা ওকে দিতে পারি কিন্তু একনলা—কথাটা শেষ করে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন হয়ে তাকাল। অবস্থা উপলব্ধি করে বললুম, থাক। আজকালকার কার্তুজওয়ালা বন্দুক নয় যে ইচ্ছা করলেই অস্ত্র খালি ও ভরা যায়। নিরুপায় হয়েই রামদিনকে কথা জানলুম—অন্ততঃ একটা মোটা ছররাভরা বন্দুক কাছে থাকা ভাল।

এই সময় একটি অবস্তিকর কাণ্ড ঘটল। যোগীন ছুটে এসে একেবারে আমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। মাথা খোঁড়ার সঙ্গে কান্না চলল। রামদিনকে নিয়ে আমি মরব, আমার বুড়ো বাপের কি হবে। বিরক্ত হলুম—রামদিন এখনও এখানে চার-পাঁচজন লোক দেখছিল না, এখনো খাল পোষের সব কাজ শুরু হয় নি। কিন্তু ওকে তোলবার নয়। কিছুতেই সে পা ছাড়ে না। ওর মতে প্রধান আপত্তি—সে যে মায়ের একমাত্র ছেলে। মাতৃভক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, গত্যন্তর না থাকায় যোগীনকে রামদিনের জিম্মায় রাখতে হল। তার আর্জি সমর্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রামদিনকে চেপে ধরল—মোটা ছররা দিয়ে খালি বন্দুকটা ভরে নিতে হবে না। সুযোগটা এইখানেই থাকা ভাল। অর্থাৎ আমাদের কথাবার্তায় বুঝেছিল তাতে তার শ্রদ্ধা বন্দুক ছুড়ে গিয়েছে যে-সব গুলী কোন কাজের জিনিষ নয়।

আর রামদিন নেচে নেই কিন্তু তার স্মৃতি মৃত বন্দুককে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখনো শিকারে যাই। ওর নেশায় মত দাঁড়িয়ে গিয়েছে কিন্তু রামদিনের অভাবে মোহ আসে না। শিকারের যাবতীয় প্রশংসা কেউ আমার উপর চাপিয়ে দেয় না। যখন একলা অভিযানী ও আনাড়ী বিটারদের উপর নির্ভর করে শিকারে যেতাম, তখন, রামদিনের মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। সাংঘাতিক জোয়ান, অসমসাহসিক ও বাঘশিকারে অক্লান্ত কুলীর তোলবাড় করে চোখে জল এসে গিয়েছে। বাষ্পপূর্ণ চোখ দুটি আড়াল দিয়ে আমার কাছে এসে উপদেশ দিলে—বন্দুক কড়া রেখে চলবেন, ঠিক নিশানা না হলে গুলী চালাবেন না, বিটারদের গায়ে ঢিল ছুড়তে বলবেন, একটা কথা মনে রাখবেন—গুলী খাওয়া বাঘ খাল পোষ না হলে ছাড়ে না। পিতা বীরপুত্রকে যুদ্ধের পূর্বে মৃত্যুর সামনে এগিয়ে দেবার সময়ই রামদিন উপদেশ দিচ্ছে, আমাকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দিল। পুত্র শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হলেও বাৎসল্য যেন পিতামাতাকে এমন একটু ওরে ভুলে রাখে—যাতে সন্তানকে সব সময় বাবালকভাবতে কিছুমাত্র অসুবিধা আসে না।

শিকারে আমার সম্বন্ধে রামদিনের ঐ দুর্বলতা ছিল, ওর শিষ্যকে সব বিপদ থেকে আগলে সব প্রকার দায়ীত্বার করতে পারলে আত্মগরিমায় প্রচুর হয়ে উঠত।

আস্তানা থেকে বেরুবার আগেই এক ঢিলে দুই পাখী মারার বুদ্ধি খেলছিল। প্রথমে নিজের আশ্রিত বাঘের দিকে চলুন ঠিক করলুম—জঙ্গলে কাঠ কুড়াবার জন্য অন্তত যেতে হল কেন? উত্তর এল: আমরা মধু আগাড় করতে গিয়েছিলুম। সহরে টাটকাপাড়া মধুর দাম অনেক। কুলীরাও দেখি এক ঢিলে দুই পাখী মারার চেষ্টায় ছিল।

মশালগুলি ঘন আলকাতরায় চাকা পড়ায় বেশ পুষ্ট আকার ধারণ করেছিল। অনেকক্ষণ চারপাঁচ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখা চলে। সকালে ঘরের ভিতরে বিষধর বাণিকলোড় দর্শনে যে আতঙ্ক লাভ করেছিলাম তার রেশ এখনও কাটে নি। এটা জানি আগুনকে সাপ এড়িয়ে চলে, পাকে-হাঁটা পথও জঙ্গলে নেই যে, সাপখোপের স্থান দেখতে পাব। তাই যাত্রার গোড়া থেকেই চারটে মশাল জ্বালতে বললুম। দুটো মশাল কাঁধে পুঁজি রাখা হল। কুলীকের শিখিয়ে দিলাম সরদারকে যেখানে বাঘ ফেরেছিল তার কাছাকাছি এলে মশালগুলো নিবিয়ে দিতে। মশাল দেখলে বাঘ পালাবে—সরদার-বাতককে আর মারা যাবে না।

বন্দোবস্ত ঠিক হতে খালের দিকে চলা সুরু হল। যথাস্থানে আসতে নীচে নামলাম। সামনে ছুটো কুলী খালি মশাল নিয়ে চলেছে। অন্য মশাল ধরিয়ে বাকী চারজন পিছনে।

খুব সাবধানেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। বেশ খানিকটা এগোন গেল, কোন [illegible] সন্ধান নেই, তবু আমার বিশ্বাস কাটে নি যে বাঘ আমাদের নিকটেই আছে। ঘাসের তলায় তার হাঁটার গতি উপলব্ধি করেছিলাম—যা পলাতক জন্তুর গতিভঙ্গি—মাত্র একটু গা ঢাকা দেবার প্রয়াস।

চলেছি, ঘুসিময় জমি পেলেই পায়ের দাগও খুঁজছি। আরো খানিকটা এগোতে ছোট অশ্বত্থ Perennial নালা পাওয়া গেল—গাছের ছায়ায় স্থানটি ঠাণ্ডা হয়ে আছে। নালার সব দিকেই পাথর—নালার পাশ দিয়ে দু-চার কদম হাঁটতেই বালি পাথরের উপর পশুরাজের পদচিহ্ন পড়ছে, জলের ধারা তখনও সিক্ত, থাবার আকার বিশাল। অনুসন্ধানের ফল আনাড়ী বিটারদের বলতে সাহস হল না।

চোখ ও হাতিয়ার উভয়কে প্রস্তুত রেখে চলেছি—নালা ছাড়িয়ে প্রায় furlongখানেক এসে পড়েছি, হঠাৎ পিছনে হৈ চৈ গণ্ডগোল শুনে।

আমার ধারণা ভুল হয় নি, বাঘ তবু কাছে ছিল না—পিছনেই আমাদের অনুসরণ করছিল—সুবিধা বুঝে পিছিয়ে পড়া মশালধারীকে নিয়েছে। পিছনের লোকটার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মশালধারীরা এলো-মেলো মশাল ফেলে দেওয়ায়, বাঘ মানুষটাকে নিতে পারে নি—পাশের জঙ্গলে আবার ঢুকিয়েছে।

আহত লোকটা দু-একবার মাটী থেকে উঠার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। মাথায় চাকা ত্রিপলটা অপর দিকে ঝুলে গেছে, ঘাড়েও কোন শক্তি নেই। এরই ভিতর লোকটার অবস্থা খুবই খারাপ মনে হল—নিকটে এসে ঘাড়ের কাছে পরীক্ষা করতে দেখলাম—একটী থাবার সংস্পর্শে ঘাড়ের হাড় স্থানভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষখেকো বাঘের অদ্ভুত সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এতগুলো লোক, হাতে হাতে মশাল জ্বলছে তারই ভিতর এই কাণ্ড ঘটে গেল। নিজের চোখে না দেখলে [illegible] বিশ্বাস করতাম না। অনেক বাঘের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কিন্তু এমন আচরণের সঙ্গে পরিচিত আমার এই প্রথম।

শিকারের কথা তখন মাথায় উঠে গিয়েছে—প্রধান চিন্তা লোকটাকে আস্তানায় নিয়ে তোলা যায় কেমন করে। First-aid দিয়ে, যদি কোন প্রকারে হাসপাতালে পাঠাতে পারি অন্ততঃ চিকিৎসার বন্দোবস্ত হতে পারে। ঘাড় বেভাবে জখম হয়েছে তাতে সামনের দিকে দু'জনায় না ধরলে চলবে না। বহন করার জন্য আট চারজন লোক হলেই সুবিধা হয়, এত অবস্থায় চারজন মশাল না নিভালে চলে না। কিন্তু কেউ মশাল নিভাতে রাজী নয়।

এখন কি করা যায়, ভাবতে পড়ে গেলাম। কিন্তু পরেই লোকটার নাভিশ্বাস উঠতে লাগল—বুঝলাম আর বেশীক্ষণ নেই, এরই ভিতর চার ধার অন্ধকারে ভরে গিয়েছে—হঠাৎ পশুরাজের বিরক্তিপূর্ণ গলার আওয়াজ পেলাম—খুব মোটা গলার কাসির মত ঘড়ঘড়ানী—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছেই একটা গাছ থেকে কোন সশাতক মশালধারী বন্ধু উঠল—হুল্লা, পুলি-পুলি। আশু দুর্ঘটনার সঙ্কেতে সব কয়জন মশাল-ধারী আমাকে ঘিরে দাঁড়াল—আশ্রয়, পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস।

এখন বাঘের কাছ থেকে তাড়াতে হলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন গতি নেই। আগুনকে ভয় না করলে, উঁচুকে ভয় না করুক—বন্দুকের আওয়াজে নিশ্চয় পালাবে। দুইটী মাত্র গুলী, তারই ভিতর কয়টা নির্ভিতার পরিচায়ক হবে জানলেও গত্যন্তর খুঁজে পেলাম না। গাছ বাঁচিয়ে উপর দিকে চালিয়ে দিলাম। প্রত্যাশিত ফল ঘটল; কিন্তু ঘটল বিকট ভাবে। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কয় ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠাতে মশালের আলোয় সকলেই তাকে দেখেছিল। তখন রাত মাত্র ১০।১৫ গজের ভিতর গা-ঢাকা দিয়েছিল। হইহোল বেধে গেল—মশাল ফেলে সুবিধা মত যে যে গাছ সামনে পেল উঠে পড়ল, মাটিতে আমি রইলাম পড়ে একা। বিপদ যদি এখন কাহার থাকে ত সে আমার—জাগিয়াই কেউ নেই। সকলেই নিরাপদ স্থানে গিয়ে উঠেছে। প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। অপ্রত্যাশিত সঙ্কেতে মানুষ এক ঝোটে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে গাছে উঠতে পারে অনুমান করা শক্ত। মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল বাঘ যেখানেই থাক তার নিশানার বাইরে আমি নেই। এখন গাছে উঠা উচিত হবে কি না ভাববার বিষয় কিন্তু ভাববার সময় কোথায়? ঘটনাগুলি চক্ষের পলক পড়বার আগে ঘটে যাচ্ছে। কোন মুহূর্তে আমার উপর কোন দিক থেকে লাফিয়ে পড়বে তার নিশ্চয়তা নেই। যেদিকেই সামনে রাখি একটা দিক পিছন হয়ে যাবে। কিন্তু মাটিতেই বা কতক্ষণ বাঘের শিকার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বাঘের শিকার ধরা ত সৌখিনতা নয় ওটা ওর খুব বাঁচা মরার সমস্যা—নিতান্তই প্রয়োজনীয়তা এবং আমার মত লোভনীয় মাংসল জীবকে যদি "অধিকন্তু ন দোষায়" ভেবে মারতে চায়, কে বাঁচাবে?

বেশ দূরে পরিচিত গলার আওয়াজ পেলাম—বাঘ রীতিমত বিরক্ত হয়ে আছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, তাড়াতাড়ি বন্দুক পিঠে ঝুলিয়ে নিকটেই একটা গাছে উঠতে লাগলাম—সুতার রবারের সোল ছিল উঠতে তেমন অসুবিধা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত একটা এড়ো ডাল পেয়ে তার উপর বসলাম—একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলাম—মনে হল এখন নিরাপদ। ভাগ্যগুণে আরেকটি সুবিধা বিনা চেষ্টায় জুটে গেল, আমার সামনেই প্রচুর পাতাওয়ালা একটী ডাল আড়াল হয়ে দাঁড়াল। নড়াচড়ি এখনই শেষ করে ফেলা ভাল—কোমরবন্ধ খুলে বগলের কাছে একটী ডাল জড়িয়ে বন্দুক পাশ্রিয়ে দিলুম তারপর সমস্ত হাতটা তার মধ্যে ঢুকিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

বেশী রাত্রিতে যদি চুলি ও কোমরবন্ধে টান পড়বে—চেঁচিয়ে হল্লা করে যাবে।

এইবার বাঘের সঙ্গে বোঝা পড়া। বন্দুকের নল পাতার আড়াল এড়িয়ে—আহত মানুষটার দিকে ঠিক করে রেখে বসলুম। সব কিছুই নূতন লাগছিল—চোখের সামনে মানুষ মারার পর তাকেই কিল (kill) করে এর আগে শিকার করি নি।

গোলমাল চেঁচামেচি তার পর সব চুপচাপ, অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা। মশালের ঠিক আলো অন্ধকারের সঙ্গমস্থলটি রোমাঞ্চকর, নানা কাল্পনিক রূপের আভাস ইঙ্গিত করছে।

এতক্ষণে মানুষটাকে আবার দেখবার অবসর পেলাম। মশালের আলো সামনে পিছনে অনেক তার মাঝে লোকটা অসাড় অবস্থায় পড়ে রয়েছে, লোকটা মরেছে। চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ল একটা ঝিক মেরে বার কেউ যেন কোটর থেকে আঙুল দিয়ে ঠিঁচড়ে বার করে এনেছে—বীভৎস আকার ধারণ করেছে। হঠাৎ দেখলে গা ছম ছম করে ওঠে। যতই মৃত অন্তহিতকে কেরাবার চেষ্টা করি ততই মৃতের দৃষ্টি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকে। সাহসকে আঁকড়ে রয়েছি—এমনি সময় প্রত্যাশিত ব্যাপারটি ঘটবার সূত্রপাত হল। মৃতের নিকটেই নড়তে দেখলুম। ধীরে অতি সন্তর্পণে বন্দুক তুলে ধরলুম, আত্মরক্ষা শিকার সব কিছুর জন্য নয় একটা গুলী সম্বল। কিছুক্ষণ দারুণ উত্তেজনার ভিতর কাটল। ঝোপের বড় [illegible] করে দিল, প্রস্তুত থাকো, যে কোন মুহূর্তে বাঘ লাফিয়ে পড়বে—নড়ার মাত্রার কাছটা তাগ করে বন্দুক এইখানটায়ই ধরবে—আত্ম-নির্দিষ্ট উপদেশ পালন করবার জন্য সবে মাত্রার উপর নিশানা করেছি ঠিক এই সময় হুঙ্কার দিয়ে কাছাকাছি বাঘ লাফিয়ে পড়ল এবং চোখের পলক না পড়তে আমার বন্দুক থেকে গুলীও বেরিয়ে গেল—যেন ঘোড়া টেপার সঙ্গে বাঘের লাফের সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার যোগাযোগ ঘটেছিল। আশ্চর্যের বিষয় কোনরকমই করেছিলাম এলো আন্দাজী ঘোড়া টেপায়, গুলী ঠিক তার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করে দিয়েছিল। বাঘ ঠিক মরা মানুষের উপর লেজিয়ে পড়ে গেল। আমার নিশানার বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করব না—কারণ বাঘ বেছে নিশানা করি নি। তবে আন্দাজে যেখানে টিপ করেছিলাম সেইখানেই ভবিতব্যের নির্দেশে বাঘ তার মাথা এগিয়ে দিয়েছিল। বাঘ মরার পর নিশ্চিন্ত হবার কথা কিন্তু পরের পটনাগুলি—রোমাঞ্চকর মনে উঠল—বিবরণ দিচ্ছি—

শিকারের পালা শেষ হতে অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। মশালগুলো দেখছি একটার পর একটা নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সময় দ্রুত গতিশীল। এরই ভিতর চার-পাঁচ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। দেখতে দেখতে একটার পর একটা মশাল নিবতে লাগল—পরে এমন সময় এল যখন সমস্ত আলোকরীকে ঘন অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল। প্রথমটা হাঁপিয়ে উঠার মত লাগছিল। এইরূপ অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় নূতন নয় তবু জঙ্গলের অন্ধকার প্রতিবারই নূতন ভীতি সৃষ্টি করে।

কতক্ষণ আপন মনে বলেছিলাম মনে পড়ে না। অকস্মাৎ শুনলাম কে রামদিনকে ডাকছে। স্পষ্ট কে যেন জিজ্ঞাসা করল—এরা কারা? প্রশ্নে স্তম্ভিত হয়ে উঠলাম, কিন্তু রামদিনের সাড়া পাওয়া গেল না। পরক্ষণে অনুভব করলাম কোমরবন্ধে টান পড়েছে—বাঘ ফেরে—বাবার উঠলাম। আমি নিজেই হেসে আছি গোড়োবাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই—ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।

গাঢ় তন্দ্রার ঘোর খানিকটা কেটে যেতে বসলুম—আবার খানিকটা সময় কেটে গেল—তন্দ্রা আছি—হঠাৎ হল যমা বাঘটাকে নিয়ে বাঁশ বনজঙ্গল পার হয়ে টানাপোড়েনের ব্যাপার। তারপর বাঘ সমেত ছোট্ট তীরের অনুসরণে আমার গাছের গোড়ায় এসে হাজির। তলায় মানুষের ঘাটি ঘাঁচড়ানির আওয়াজ শুনলাম। তারপর গাছের গুঁড়িটা কেঁপে করে বার দুই ঝোঁপ দিল। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এইবার বুঝি আমায় উপর আক্রমণ করবে। মাচানের চাইতে বলেছি কিনা তাও জানি না। ঘাঁচড়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম বাঘ-বাচ্চাদের কাছে ফিরে গেছে। আমি নিরস্ত্র, আক্রোশ কাল ক্রমে আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। সেখানে বসেছিলাম সেইখানে আমার স্নিগ্ধিকে জড়ের মত অটল করে দিলাম। সময়ের গতি যেন এখন অচল হয়ে গিয়েছে, অন্ধকারের গ্রাস থেকে যেন মুক্তি নেই—ভোরের আলোর জন্য অধীর হয়ে উঠেছি। আলোর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে—যাতে সব ভয়ের বিলয় হোক পরিত্রাণ না পেলেও ভয়ের তাড়নার মুহূর্মুহু মৃত্যু থেকে বাঁচা যায়।

হঠাৎ নিশ্চিতই গাছের উপর থেকে, একটু দূরে—বাঘের কাশির শব্দ শুনলাম। কাশির আওয়াজে বাঘের কথা মনে পড়ল। বাঘের গলায় মনে বল পেলাম—ঠিক করলাম হাতটা জোগাই কাটিয়ে দেব। তার শরীর ঘুমে ঢুলছে—সময় কম হলেও এরই ভিতর দুই-তিন বার কোমরবন্ধের চেঁচকা টান খেয়েছি। [illegible] tug-of-war চলেছে—এরই মাঝে, দূরে কাছে কোকিলের ডাক শুনছি। প্রভাতের [illegible] নানা আরণ্যিক সঙ্গীত বরন করে আনছিল। তথাপি তন্দ্রার ঘোরে পাঁচ মাতালের মত ঘুরেছিলাম।

[illegible]—বাঘের কাশির পর বাঘের চলার কোন শব্দ শুনি নি। ধীরে পশ্চিম আলো একলাফে তিরোহিত হয়ে গিয়ে। জোনের তলা তখন আলো-আঁধারিতে ঝাপসা হয়ে আছে। দুটিকে জোর করে গত রাত্রের ঘটনাগুলিতে নিবদ্ধ করে রাখলাম। বাঘ মানুষ উভয়েই জড়ের মত একই স্থানে পড়ে রয়েছে। এর মাঝে ছল কোথা—আত্মপ্রতারিত কল্পনা? না তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখলুম? কে জানে।

দেখতে দেখতে সকালের রোদ ঘন পাতার আড়াল ভেদ করে—মাটিতে এসে পড়ল। তখন কয়েক-জন বুনো গাছ থেকে নেমে পড়েছে।

আমিও নামলাম—সাবধানে। আমার বসার জায়গাটা মাটি থেকে বার সাত কিট উপরে ছিল—বিরাগপুর হাঁটু বটে!

[illegible]বাঘের চলাফেরার কথা ভুলিনি। [illegible] যখন করতে পারলাম না—তখন মানুষটার [illegible] শরীর [illegible] করতে দেখল, তখন বাঘের চলার পথে [illegible] পড়েছে। আমার গাছের তলাতেও [illegible] বসে গেছে। বাঘের ফাঁসির আওয়াজ না পেলে হয় ত বনের রাজাকেই আহার ফুরে ছাড়ত।

আস্তানায় ফিরে দ্বিতীয় রাতের বাঘ শোবের তন্দ্রায় সমেত, বাঘেমারা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দিনের আলোয় হয় ত বন্দুকধারী একজন লোক দেখিয়ে পড়ল গ্রামের খাবার খবর দিতে।

সেদিন আমার আর শ্রদ্ধিয়ে হলাম না। একটার পর একটা ঘটনার প্রবাহ সমস্ত ক্লান্তির অবসাদ ভুলিয়ে দিয়েছিল। ঘুমি হল না—তখন বাকি অনেক দূরে এবং আরও গভীর।

[illegible]

[illegible]

হিমকল্যাণ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত
কেশতৈল
নিত্যপ্রসাধনে
অপরিহার্য্য
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্
কলিকাতা

কাপড়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[বাংলা দেশে যখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, বিবেকানন্দ ছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, ইলেক্‌ট্রিক্ আলো ছিল না, তখন ছিল···কাপড়···যে-কাপড়ের লোভে রোম থেকে লোক আসতো বাংলার বন্দরে...এক টুক্‌রো বাংলার কাপড় পাবার জন্যে মধ্যযুগের য়ুরোপের বিলাসিনীরা পর্য্যন্ত হাঁ করে থাকতেন সমুদ্রের দিকে...আজ সেই বাংলা দেশে কাপড়ের অভাবে বাড়ীর ভেতর থেকে নারী ঘরের বাইরে পর্য্যন্ত আসতে পারে না···সমগ্রদেশের বস্ত্র অপহরণ করে নিয়ে রসিক বিধাতা আবার বৃন্দাবন-লীলা করছেন···বৃন্দাবনের গোপিনীদের ভরসা ছিল, যমুনার আবদ্ধ জল... কিন্তু আজকের বস্ত্রহীনেরা করবে কি ? তাদের আশে-পাশে চারদিকে যে শূন্য মাঠ···]

কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠিল—"দাদু যাচ্ছে !···পাগলা দেলো !···দাদু !-ও দাদু বাবু !···"

দূরে, এই রাস্তার আড়াআড়ি যে রাস্তাটা গেছে তাহার উপর দিয়া একটা লোক একটু মাথা গুঁজিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আরও দু'একটা ডাকে এই দিকেই অগ্রসর হইল।

রবিবারের প্রভাতী মজলিসে আমি নবাগত; এ খানিক, ও খানিক করিয়া বলিয়া আমায় পাগলা দাদুর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া দিল; দাদু একটা ওয়ার্ ক্যাজুয়ালটি (war casualty)। য়ুনিভার্সিটির সেরা ছেলে-ছাত্রদের যত রকম আন্দোলন সবতে অগ্রণী, এদিকে জনসেবাতেও সেই রকম—যুদ্ধের ঝিক্কিও হঠাৎ মাথা গেল বিগড়ে—সব সময় তাল ঠিক রাখতে পারেনা···

একজন হাসিয়া বলিল—"কোথায় হচ্ছে যুদ্ধ, এখানে দাদু বাবু আমাদের টাল সামলাতে পারলেন না···

অবসরের সভা, তর্কেরই ঝোঁক থাকে বেশি, এক পাশ থেকে অন্য একজন ফোঁস করিয়া উঠিল—"এটা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় শ্মশান মশাই, করেকদাসে হাসতে-খেলতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোককে শুইয়ে দিলে।···শুধু একা দাদু পাগল হয়েছে, তার কারণ দেশে আর দাদু ছিল না···"

প্রতিবাদ উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় দাদু আসিয়া উপস্থিত হইল।

বয়স বোধহয় চব্বিশ পঁচিশ হইবে, তবে অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশি দেখিলে মুখে যে একটা বার্দ্ধক্যের ছাপ আসিয়া যায় সেটা বেশ স্পষ্ট। চুলগুলা বড় বড় রুক্ষ আর অবিন্যস্ত। খালি পায়ে

এক পা ধূলা, কাপড়টা ধূলায় লাগচে হইয়া গেছে, গায়ে একটা ময়লা বোতামহীন পাঞ্জাবী। দৃষ্টিটা যে উদ্‌ভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, তবুও তাহার অনেক পিছনে একটা স্থির বুদ্ধির প্রশান্তি আছে।

আসিয়া ব্যঙ্গ-ঘেঁসা কতরকম উৎসুক প্রশ্নের মাঝখানে দানু দোরের কাছটায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।…"কোথা থেকে দানু বাবু?…কি ব্যাপার হে—ছিলে কোথায়?… দানু বাবু চলেছে যেন ডিটলারের ডেথ্‌-ওয়ারেণ্ট সাইন করতে হবে!"

আমি স্থির ভাবে দানুর দিকে চাহিয়া একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি,—দৃষ্টির সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা মিলাইয়া তাহার পিছনের স্থির বুদ্ধির প্রশান্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে। দানু যেন কোথায় ছিল, এবার বুঝিতে পারিতেছে কোথায়, কি ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে ধীরে ধীরে একটা হাসি ফুটিল, আর পাঁচজনের মতোই বেশ সহজ ভাবে বলিল—"ও, সান্‌ডে পার্লামেণ্ট? একটা সিগারেট ছাড়ো দিকিন কেউ…"

বেশ সহজ ভাবে গিয়া একটা চেয়ারে বসিল।

একজন সিগারেটের কেস খুলিয়া দানুর সামনে ধরিল এবং সে একটা বাহির করিয়া লইলে একটু বাড়িয়া লইয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা দিল। সিগারেট ধরাইয়া গোটাকতক টান দিয়া দানু হাসিয়াই বলিল—"আজকের মিটিংয়ের বিষয় কি—অ্যাজেণ্ডা?"

পাগল লইয়াই ঔৎসুক্য-কৌতূহল থাকে, প্রকৃতিস্থ হইয়া আসায় কাহারও আর সে আগ্রহটা নাই, বরং আগেকার ব্যঙ্গের-টোনের জন্য অনেকেই যেন একটু অপ্রতিভ, কাহারও আড়ালে অপ্রিয় কিছু বলিয়া যদি তখনই দেখা যায় সে পাশেই ছিল, সে অবস্থার ভাবটা যেমন হইয়া পড়ে। তবুও একজন হাসিয়াই বলিল—"এ পার্লামেণ্টের অ্যাজেণ্ডার কথা ছাড়ো; ওয়ার, প্রি-ওয়ার, পোষ্ট ওয়ার সব জিনিসই পাবে। তোমার লেটেষ্ট বুলেটিন কি বলো—মানে, পার্লামেণ্টে রিপোর্ট করো।"

সঙ্গে সঙ্গেই বেশ স্পষ্ট একটা পরিবর্তন দেখা গেল! দানুর হাসি—হাসি ভাবটা মিলাইয়া গেল, কতকটা যেন নিভিয়া যাওয়া গোছের। পায়ের উপর পা দিয়া সিধা হইয়া বসিয়াছিল, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া সামনের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল। আমি প্রথম থেকেই ওর প্রতি একটু বেশি অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ওর মনের মধ্যে পাগলামি আর প্রতিভার যেন একটা মস্তবড় সংগ্রাম চলিয়াছে, দানু যেন কি একটা প্রকাশ করিতে চায়—ঠিক যেমন ভাবে উচিত, কিন্তু তাহার জন্য মনের যা ব্যালান্স বা সাম্য সেটা যেন হারাইয়া ফেলিতেছে বা দ্রুত হারাইয়া ফেলিবার ভয় আছে।…চোখের মধ্যে মুহূর্তে স্থৈর্য আবার পরমুহূর্তেই উদ্‌ভ্রান্তির এমন আলোছায়া আমি আগে কোথাও দেখি নাই। ক্রমে বোধ হইল অনেক চেষ্টায় মনটি যেন মাঝামাঝি এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেখান থেকে সে নিজেকে প্রকাশ করিবার সাহসটুকু করিতে পারে। ঠিক এই সময় একজন ঘরের গাম্ভীর্যটা আরও একটু তরল করিয়া বলিল—হ্যাঁ, এমনভাবে

যাচ্ছিলেন যেন মস্তবড় একটা ওয়ার-ট্রফি আপনাকে দেওয়া হবে—হিটলারের মাথাই হোক বা মুসোলিনীর কাঁথাই হোক—তাই, প্রেজেন্টেশ্যান সেরিমনিতে যাচ্ছিলেন···ব্যাপারটা···"

দাদু হঠাৎ বুক পকেটে হাত দিতে, কথাটা মাঝপথেই থামিয়া গেল। পকেটে হাত রাখিয়া দাদু ক্ষণমাত্র কি একটু ভাবিল, তাহার পর পকেট থেকে একটা আন্দাজ চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি ঝকঝকে স্ন্যাকড়া বাহির করিয়া চৌকির ওপর বিছাইয়া দিয়া বলিল "No I have it on me already this is the greatest war trophy yet." (না আমার কাছেই আছে, এখন পর্য্যন্ত এর চেয়ে বড় লড়াইয়ের পুরস্কার আর হয় নি) একটু সামনে চাহিয়া থাকিয়া সিগারেটে আরও দুইটা টান দিয়া প্রশ্ন করিল—"কি লেখা আছে পড়তে পারলেন?"

হঠাৎ একটা বিচ্ছেদের চোট খাইয়া দাদুর মনটা টাল খাইয়া গেছে, কিন্তু তখনই যেন মনে হইল ওর একটা মস্ত কাজ আছে, একটা খুব মস্তবড় কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। দাদু চেয়ারে হেলান দিয়া সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিয়া ভিতরে ভিতরে একটা অমানুষিক চেষ্টায় যেন মনটাকে আবার গুছাইয়া লইল, তাহার পর আর কালক্ষেপ না করিয়া মাঝখান থেকেই আরম্ভ করিয়া দিল:

"ধীরেন দা' কখনও হারে নি, কারও অন্যায় বাজিয়ে যেন। মহিষবাথানের যুগের কথা আমার মনে আছে। ধীরেন দা' দাঁতে দাঁত দিয়ে হাত মুঠোয় পড়ে রইল—মুখ আমি খোব না। অবশ্য একজন ক্ষীণমুষ্টি বাঙালীর কাছ থেকে মুখ ওরা স্বচ্ছন্দেই কেড়ে নিতে পারত কিন্তু ঘটনাটুকু সরল করে তোলবার জন্যে একজন তার নানাকাজের মিলিটারী ছুরি বের করে বললেন—গান্ধীজীর চেলা তুমি, "প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব না, ভালো করে ধরে থেক···"

নিশ্চয় ঠাট্টা করে কব্জির ওপর ছুরিটা বসাতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটু বেশি রাশি গোছের একজন মুঠোর পিঠটায় খুব জোরে একবা লাঠি বসিয়ে দিলে। ধীরেনদা'রই কোট রৈল বজায়, তার অবশ হাত থেকে ঝর ঝর করে ছুরিগুলো পড়ে গেল। সে হাতটাতে আর সাড় আসে নি। ধীরেনদা' কিন্তু কখনও দুঃখ করে নি তার জন্যে, অবশ্য যা হাতটার কথা উঠলেই হেসে উঠত, বলত—'নিজের কাজ করতে পারলে না বলে আমার সমস্ত শরীর এটাকে একঘরে করেছে, এর ধোপা-নাপিত বন্ধ।'

তারপরে এল যুদ্ধ, তার সঙ্গে বাংলায় দুর্ভিক্ষ। এতে জেতবার কিছু ছিল না, কেন না যুদ্ধ তো আর ধীরেনদা'র যুদ্ধ নয় যে তার হার-জিতের প্রশ্ন উঠবে; আর দুর্ভিক্ষ জিনিষটাই আগাগোড়া হার, একটা গোটা সভ্যতারই হার; তবু কিন্তু জিতল ধীরেনদা'। ওর সব জিনিসের মধ্যে থেকেই—হৃৎসৈর্যধৈর্যমিবাম্বুমধ্যাৎ—জেতার অংশটি বের করে নেবার একটা চমৎকার ক্ষমতা ছিল।—যখন গ্রামে—গ্রামান্তরে। সারা দেশে আর একটি তণ্ডুলকণা নেই—যারা গোরু মারলে, সমস্ত দেশটাকে যখন লঙ্গরখানা আর ফ্রি-কিচেন করে দাঁড় করিয়েছে, ধীরেনদা' পণ করে বসল সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তার মানে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে বরণ করা। ধীরেনদা' গ্রামের জমিদারের আতঙ্ক ছিল, যুদ্ধের সময় ব্যবসাদারদের আতঙ্ক

হয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক আতঙ্ক বললে ভুল হয়—ইচ্ছে করলে ওকে পিষে ফেলতে পারে, অথচ অতটা ইচ্ছে করে ওঠাও শক্ত—এই রকম গোছের আপদ একটা—a pest ; কিন্তু মানতও অনেকে, আর বাকি যারা তারা একেবারে দেবতার মতন পূজো করতো। বরঞ্চ দেবতার চেয়েও বেশি, কেননা দেবতার পূজোয় পূজারীকে ফুল-নৈবেদ্যের যোগাড়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়তে হয়, ধীরেনদা'র পূজোয় সে সবের কোন বালাই ছিল না। ধীরেনদা ছিল তাদের কাছে নিরাকার পরম ব্রহ্ম—তার নিজের দিয়ে নেবার বলে কিছু নেই, তার কাছে চেয়ে যাও যত পার।

ধীরেনদা'র ঘরখানার সব ব্যবস্থা করে সেটাকে দাঁড় করিয়ে দিলে, তারপর নিজের যখন পালা এল, সরে দাঁড়াল। সবাই যখন টের পেলে, ভীড় করে এসে ওকে ঘেরে দাঁড়াল ;—'এ ভিক্ষে, আর পাপীর হাতে ভিক্ষে বলে যদি তোমার ঘেন্না তো আমাদের কেন এগিয়ে দিয়েছ ? এসো এক সঙ্গেই সব উপোস করে মরি, আমরাও আর ওখানে যাবো না।'

ধীরেনদা' হেসে বললে—'দেখ্, সব অধিকার সবার থাকে না, বরং আরও ঠিক করে বলতে গেলে—থাকা উচিত নয়। এমন সময় আসে যখন একটা জাতিগত দুঃখ বা অপমানের প্রতীক হয়ে একজনের দাঁড়ালেই চলে। যাঁর পায়ের নখের মতন নই আমি, তাঁরই নাম করতে হোল, গান্ধীই হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরে থাকুন না, সবারই আমাদের দারিদ্র্যের ঐ নিশানা বইবার দরকার আছে কি ? আমায় দেখেছিস, কখনও ওরকম ন্যাঙ্গা-ফকির সাজতে ? ···একবার ওঁর উপোসের অবাব দিয়ে কতকগুলো লোক আমরণ উপোস করতে গেছল, তাদেরও তিনি ঐ কথা বলেছিলেন—সবার অধিকার নেই, দরকারও নেই। ঘরে ধান যা হোল তাতে সারা জগৎটার পেট ভরে, অথচ আমরাই হলাম ভিক্ষাজীবী—তাও কাদের কাছে, না যারা আমাদের নিরন্ন করে চারমহল বাড়ী হাঁকড়াচ্ছে,—এই অন্যায় আর অপমানের বিরুদ্ধে একজন তো দাঁড়ালাম—তোদের মাকে যদি আলাদা করে ধরিস তো দু'জন। আর তাও কি না খেয়ে মরব নাকি ভেবেছিস ? সে বান্দাই নয়। আমি খাব সেই চাল যাতে তোদের অধিকার। এদিকটা ঠিক হোল, এবার আমি চলনাম তার জোগাড়ে। জানিস তো, কখনও হার মানিনি, হবেই জোগাড়। তোরা সর্ব্বদাই অনুভব করিস ধীরেনদা' তোদের ঘরে হকের চাল আছে।"

করলে জোগাড় ধীরেনদা'। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কি কমিশনার, কি লাটসাহেবকে উদ্যত করে তুলেছিল বলা যায় না—জেনে আর বলে না সেটা—তবে কোথা থেকে একটা গাধা ভাড়া করে দু'থলে চাল ঝুলিয়ে একদিন উপস্থিত। একটু দেরি হয়ে গেল কিন্তু, ঘরে চাল যা ছিল তা দু'দিনের, দেরি হল সাত দিন, স্বামীর ব্রত মাথায় করে মা সেই দিন সকালে বিদায় নিয়েছেন, একদিক থেকে লক্ষ্মী ঢুকলেন, অন্যদিক থেকে যারা লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে গেছল তারা ঢুকল।···ধীরেন দা' একবার ভেতরে গিয়ে শূন্য বয়ামগুলো দেখে এসে বাইরে দাঁড়াল। একেবারেই কথা কইতে একটু গলায় যে আটকাল না—এমন নয় ; গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে হেসে বললে—"তোদের সবার মা ছিল কি না, হকের চাল যাতে তোরাও রোজ অন্ততঃ এক মুঠো করে পেটে দিয়ে আত্মা শুদ্ধ রাখতে পারিস,' তার ব্যবস্থা করে গেল। একা আর কত খাব ?"

দাদু চুপ করিল। একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; সাধারণ লোকের গল্প বলা নয় তো, অসীম প্রয়াসে মনের লাগাম কষিয়া রাখিতে হইয়াছে, যাহাতে একটু পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে। বলিল—"একটা সিগারেট দাও আরও।"

আমি বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছি—এতটুকু বেতাল নাই কথায়, একটি কথা অবান্তর নয়, অথচ যেই এই গল্পটি শেষ হইবে মন আবার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে; একটা প্রতিভাবান যুবকের মানসিক পরিণতিতে মনটা বড়ই বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, পাশের লোকটিকে নিচু গলাতে বলিলামও "এতই পরিষ্কার মাথা, অথচ…"

আমার কথার ওপরই একটু আলোচনার-গুঞ্জন উঠিল। প্রত্যেক সভাতেই দু-একজন করিয়া কাঠ-রসিক থাকে, নিজে যতগুলি সম্ভব দন্তবিকাশ করিয়া একটা কিছু বলিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা না করিলে তাহাদের হাঁপ ধরে। সেই রকম গোছের এক ভদ্রলোক যথাশক্তি হাসিয়া,—তাহার রসিকতা শুনিবার আমন্ত্রণস্বরূপ সবার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মজলিসি গলায় বলিল—"আমিও তো কতবার তাই বলছি দাদুবাবুকে—অমন পরিষ্কার মাথা, দিব্যি করে সেলুনে গিয়ে দশ আনা-ছ আনা চুল ছাঁটিয়ে—মাথার ওপর একখানি এপাশ-ওপাশ টেরি তুলে দিন, দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া লাগবে, আর…"

দাদু সিগারেট শুদ্ধ হাতটা তাহার দিকে বাড়াইয়া বলিল…"থামুন তো, থামুন তো, আগে তাই করেছি, হাওয়াও লাগত, ছেড়ে দিলাম কেন?…"

স্মৃতির জোরে টোকা মারার মতো করিয়া মাথার মাঝখানে কয়েকটা তর্জনী আঘাত করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল—"পড়েছে মনে—একদিন বীরেনদা' বলেছিল—যাঃ, সত্যসত্যই বীরেনদা'র কথা ভুলে যেতে হবে?—বারে!—হ্যাঁ, বীরেনদা বলেছিল—আমাকেই তো…বললে · দাদু, একটি তো মাথা, তাতে টেরিকেই বা রাখবে কোথায়, আর ভারতমাতাকেই বা রাখবে কোথায়?—আগে বরং বেছে ঠিক করে নাও…"

সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ঘরটা উচ্ছকিত করিয়া একেবারে পাগলের হাসি হাসিয়া উঠিল।…দাদু আবার মনের ব্যালান্স হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সময় গেল ঠিক হইতে। আর কিন্তু কেহ ওকে কিছু বলিল না। দাদু এক সময় তেমনই হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল:

কাল ছিল কাপড়ের কিউ।…আচ্ছা, তোমরা কি বল—কিউকে যদি বাংলায় তর্জমা করতে হয় তো 'ও' অক্ষরটা ঠিক হবে না? ওদের দেশে ব্যবস্থাও ভালো, তা ভিন্ন খাবার, তেল, কাপড় কোনদিক দিয়েই অবস্থা এত মারাত্মক নয়, তাই কিউ অক্ষরটার ওরই মধ্যে যেমন একটা বাঁধুনি আছে, ওদের সার বেঁধে দাঁড়াবার মধ্যেও সেই রকম একটা বাঁধুনি আছে। আমাদের এখানে পেটের জ্বালায়, লজ্জার চোটে আর সব রকমের অন্ধকারে যা দাঁড়ায় সেটাকে 'ও' বলাই ঠিক, গুছিয়ে দাঁড়ানো নয়, একটা জোট পাকানো।

কাপড় নেবার জন্যে এই 'ও'-র মতন জোট পাকিয়ে সবাই দাঁড়াল। এক একজনের এমন অবস্থা যে, ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে না দাঁড়ালে লজ্জা রাখাই দায় হয়ে ওঠে।

আগের দিন সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে লোকে কাপড় পায় নি। ধীরেনদা' খুব একটা হৈচৈ তুললে গ্রামে। ধীরেনদা' হৈচৈ তুললে সেটা গ্রামেই আবদ্ধ থাকত না। ফলে, কাল সকালেই চাঁড়রা হোল—কাপড় এসে গেছে, দশটা থেকে বিলি হবে। লোকেরা গিয়েই সকাল থেকেই কিউ হয়ে দাঁড়াল। একটা গুজব উঠল রুথ-ইনস্‌পেক্টার নিজে এসেছে,—তারই হুকুমে চাঁড়রা দেওয়া হয়েছে, সে নিজে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাপড় বিলি করিয়ে দেবে। দশটা বেজে গেল, এগারটা বেজে গেল, বারোটা বেজে গেল, দোকানও খোলে না, রুথ ইনস্‌-পেক্টারেরও দেখা নেই। চন্‌ চন্‌ করে মাথার ওপর রোদ বেড়ে উঠেছে, কয়েকজন তো ভির্মি গেল, ভেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষেরই ঝড়তি পড়তি সব তো? বাকি যারা তাদের মেজাজ উঠচে সপ্তমে চড়ে, চেঁচামেচি, গণ্ডগোল বেড়ে উঠতে লাগল, একটু একটু করে একটা রব উঠল—'কাপড় এমনি দেবে না, চালের মতন লুকিয়ে ফেলবে।'

'এমনি দেবে না'-র মানে হব কেড়ে নিতে হবে। কিউয়ের মাঝে মাঝে ভাঙন ধরতে লাগল, লোক আরও গেল বেড়ে। এক আধটা টিল গিয়ে দোকানের বন্ধ দরজার ওপর পড়তে লাগল। বেলা দুটো পর্য্যন্ত ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে উঠল। একটা কিছু শুরু হয়ে যেত কিন্তু ঠিক এই সময়ে একদিক থেকে দারোগা, রুথ ইনস্‌পেক্টার, আর জন আষ্টেক লাঠিওয়ালা পুলিস আর তার একটু পরেই অন্য দিক থেকে ধীরেনদা' এসে উপস্থিত হোল। ধীরেনদা' গ্রামে ছিল না, একটা কাজ থাকে তবে তো? আমাদের মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত ওর রান্নার পাট ছিল না, যখন যেখানে খুশি এক মুঠো খেয়ে নিত, বলা কওয়া থাকত না। "এক মুঠো ভাত বাড়ো রাঙা খুড়ি"—বলে নবী ঘোষের বাড়িতে পা দিতেই নবী ঘোষের নাতনি রাখালি বললে—"তুমি গেছলে কোথায় ধীরু কাকা? উদিকে শায়েদের দোকানে যে লুট হতে চলল, বোধ হয় এতক্ষণ শুরুই হয়ে গেছে।" ধীরেনদা' জিগ্যেস করলে—"কেন, তোর দাদু কাপড় নিয়ে ফেরে নি?" রাখালি হেসে বল্লে—"কাপড়! কাপড় যে বলে আছে শা বুড়ো, শুধু নিয়ে আসতে বা দেরি!"···ধীরেনদা' সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। যখন পৌঁছল তখন দারোগা, ইনস্‌পেক্টার সবাই মিলে লোকগুলোকে আবার গুছিয়ে লাইন করাবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কিন্তু তখন একটু শক্ত হয়ে উঠেছে, আরও শক্ত হয়ে উঠেছে পুলিসের হাতে লম্বা লম্বা লাঠি দেখে; কতকগুলো লোক ভয় পেয়ে আর কতকগুলো লোক মরিয়া হয়ে যেন গোলমালটা বেড়ে গেছে। এমন সময় ধীরেনদা' এসে উপস্থিত হলো। ওকে দেখেই গোলমালটা আবার একচোট বেড়ে গেল—গোলমাল জিনিসটাই এমন যে, ভয়েও বাড়ে আবার ভরসাতেও বাড়ে; গেল বেড়ে এক চোট, তারপরই ধীরেনদা' হাত তুলে সবাইকে বুঝিয়ে থামিয়ে দিলে।

দোকানটা উদয় শা'য়ের। দোকানের সামনেই খানিকটা রক। বুড়ো উদয় শা' ততক্ষণে দোকান খুলিয়ে দুখানা চেয়ার বের করে দারোগা আর ইনস্‌পেক্টারকে বসিয়ে নিজে নিচে একটা কম্বল পাট করে বসেছে। ধীরেনদা' গটগট করে গিয়ে সোজা একেবারে উদয় শা'য়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলে—'এতক্ষণ দোকান খোলা হয়নি কেন? কাপড় বিলি হয়নি কেন?' দারোগা আস্পর্দ্ধাটা দেখে কাঁপছিল, ছোট ছড়িটা রকে ঠুকে হুঙ্কার করে বললে—"এদিকে আমি যখন এখানে রয়েছি, আমার সঙ্গে কথা কও, যা জিগ্যেস করতে হয় আমায় করো।'

ধীরেনদা' ফিরে দাঁড়াল, বললে—'বাঃ এ প্রশ্নের সঙ্গে আপনার তো কোন সম্বন্ধ নেই। এ ডিস্‌ট্রিবিউটার

আর কনস্টিউমার-এর মধ্যেকার প্রশ্ন। কাল লোকগুলোকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রিলেস করেছে। আজ সকালে চাঁড়া পিটোন হয়েছে দশটা থেকে রিলি হবে, এখন দু'টো। ওষুধি সাধারণ দোকানদার হোত তাহ'লেও বোধ হয় জিগ্যেস করতাম না। ও হচ্ছে সরকার বাহাদুরের পক্ষে ইনভিট—একটা নির্দ্ধারিত কমিশনের বদলে ও তাঁদের তরফ থেকে কাপড় বিলি করবে।···এ প্রশ্ন তো আপনাকে করবার নয়, আপনি বরং ওর উত্তরটা শুনবেন, তারপর দুজনের প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে বিচার করবেন।"

শুধু আর একটা হুঙ্কারই হলো—'মুখ সিয়ানা থামাও, তুমি একটা পাবলিক ন্যুসেন্সে বাধা দিচ্ছ, এর জন্যে তোমায় সাজা পেতে হবে।'

ধীরেনদা' এবার এদিকেই ঘুরে দাঁড়াল। বললে—"আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন দারোগাবাবু, পাবলিক ন্যুসেন্সে বাধা দেওয়ার আমার তো ইচ্ছেই নেই বরং চোখের সামনেই দেখলেন আমি লোকগুলোকে ভড়িয়ে দিয়ে আরও সাহায্যই করছি। আর সাজার ভয় আমায় মিছে দেখাচ্ছেন, আমি এত সাজা নিতে পারি, আপনারা এতো সাজা দিতেই পারেন না, মানুষই তো?···আপনি দেখছি আরও চটে উঠছেন—"বেশ, প্রশ্ন তাহলে আপনাকেই করি—উদয় শা'কে কাপড় বেচবার অনুমতি কে দিয়েছে?—কেন দেওয়া হয়েছে?"

উদয় শা' সেই জাতের লোক যারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে বলেই লক্ষ লক্ষ লোককে ভাতে মেরেও আবার বাকিদের বিবসন-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার অধিকার পেয়েছে। ভুঁড়ির ওপরে মাঝে মাঝে ডান হাতটা শুধু উল্টে দিচ্ছিল, অর্থাৎ— কলিতে আরও কত দেখতে হবে, এবে চাঁদে হাত একেবারে!

দারোগা একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল, এক পা এগিয়ে ছড়িশুদ্ধ মুঠোটা কোমরে চেপে বললে—"তুমি সাহস করছ এরকম প্রশ্ন আমায় করতে?"

ধীরেনদা' একটুও না নড়ে বললে—"আপনাকে করারই প্রশ্ন এটা, করে কি আর এমন সাহসের কাজ করেছি?··এই একটা লোক যার দোকানের চালে কিছুদিন আগে খড় জুটত না। তেতাল্লিশের লোকমারা ব্যবসায় দোতালা হাঁকড়েছে যার তুলনা সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে আর নেই। আপনি এই এলাকার মালিক, নিশ্চয় উদয় শা'য়ের মতন লোকের ভেতরকার খবর রাখেন, না রাখলেও সাব রেজেষ্ট্রারী আফিসে খবর পেতে পারেন উদয় শা' এখন গ্রামের কতখানি জমির মালিক, আর কতদিনের মধ্যে হয়েছে। অথচ সেই উদয় শা' আবার কাপড়ের লাইসেন্স্ পেলে! উদয় শা' যাদের না খেতে দিয়ে মেরেছে তারা জিগ্যেস করতে আসবে না, কিন্তু যাদের স্যাংটো করতে বসেছে তারা জিগ্যেস করবে বৈকি দারোগাবাবু।"

ওদিকে আবার গোলমালটা বেড়ে যাচ্ছিল, নিজেদের নেতাকে খোদ দারোগার সঙ্গে অমনভাবে কথা কইতে দেখলে যেমন একটা হয়ই,—দারোগা ধীরেনদা'কে ভালোরকম জানতোও, বেশি ঘাঁটালে নিজে যে কাজের চার্জে এসেছে সেটা পণ্ড হয়ে একটা বদনাম হবে মাত্র, ওকে ছেড়ে উদয় শা'কেই অনেকটা ধমকের সুরে বললে—'আপনি বসে কি করছেন শা'মশাই, কাপড় বিলি শুরু করুন।'

তারপর চেয়ারে এসে বসে বাইরের দিকে ছড়িটা দেখিয়ে বললে—'তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, পাগলের সঙ্গে আলাপ করবার আমার এখন ফুরসৎ নেই।···এত সাহস তো এস-ডি-ও'র কাছে দরবারদিহি চাও গে, সব বিলি বন্দোবস্ত যার হাতে।···নাউ, গেট আউট!"

গেট আউট অবশ্য ধীরেনদা' সঙ্গে সঙ্গেই করবার পাত্র নয়। যেন হুকুমটা কাণেই যায় নি বা কাণেই তোলবার মতন নয়, এইভাবে আগেকার মতনই দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললে—"এস-ডি-ও'কে জিগ্যেস করলে, তিনি বলবেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাও, তাঁকে জিগ্যেস করলে তিনি বলবেন আরও ওপরে যাও; আমি জানি আসল কথাটা এক অ্যামেরি সায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না, কিন্তু একটা সামান্য কথা জিগ্যেস করতে আমার তো অতদূর গেলে চলবে না। আপনি প্রতিভূ হিসেবে আছেন সামনে, আর খুব সম্ভবতঃ আপনি, ইন্‌স্পেক্টার-মশাই এইরকম কাছাকাছি অফিসারদের সুপারিশেই হয় এই সব ব্যবস্থা, তাই জিগ্যেস করলাম।···আপনি আরও চটছেন, বেশ, সবই যেমন মেনে নিচ্ছি, তেমনি এ ব্যবস্থাও আমরা মেনে নিলাম; আপাততঃ কাপড় পাওয়াটাই দরকার, আপনি করুন সেটার বন্দোবস্ত, আমি নেমে দাঁড়াচ্ছি।"

ধীরেনদা' নেমে ভেতরের দিকে চলে গেল। যেখানে যেখানে গোলমাল হচ্ছিল, দাঁড়িয়ে ঠিক করে দিলে। বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই কাপড় বিলি হতে লাগল। ওর একেবারে সামনে থাকাটা দারোগার পক্ষে দৃষ্টিকটু হবে বলে পেছনেই রইল। শুধু একবার বিলির জায়গাটায় একটু ঘটলা হতে দু'তিন জন চৌকিদার লোকেদের মাথার ওপর ছড়ি তুলতেই ধীরেনদা' তাড়াতাড়ি সামনে এসে তাদের একরকম চোখ রাঙিয়েই বললে—"খবরদার, ছড়িবাজি চলবে না চৌকিদার-সায়েব, ওরা সইবে না। ভিক্ষে চাইতে আসে নি, হকের জিনিস নিতে এসেছে!"

দারোগার চোখে একেবারে আগুন ঠিকরে পড়ল; কিন্তু কিছু বললে না। উদয় শা' কলির স্পর্ধা দেখে একবার আড় চোখে চেয়ে মোটা গোঁফশুদ্ধ ঠোঁটের একটা কোণ কুঞ্চিত করলে। ধীরেনদা' যেমন এসেছিল, তেমনি ফিরে গেল।

একটু পরে দারোগার হুকুমে একজন চৌকিদার ভেতরে গিয়ে ধীরেনদা'কে আবার ডেকে নিয়ে এল। দারোগা জিগ্যেস করলে—"তুমি এখানে করছ কি? এখানে তোমার থাকবার কি দরকার?"

ধীরেনদা' বললে—'সে উত্তর তো দিয়েছি, যখন আপনি বললেন পাবলিক ফাংকশানে বাধা দিচ্ছি।'

দারোগা বললে—'সাহায্য করা! কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, গবর্ণমেণ্টের নিজের শক্তি আছে নিজের কাজ করবার।'

ধীরেনদা' কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর বললে না; একটু ভাবলে, তারপর বললে—'কিন্তু সাহায্যটা তো কালচু কাপ। আমার নিজের কাপড়েরও দরকার যে।'

দারোগা বললে—'বেশ তা'হলে সবার সঙ্গে কিউ-এ গিয়ে দাঁড়াও, একেবারে শেষে।'

'ওরা যদি আমার আগে বা মাঝখানে জায়গা দেয়?'

'আমার আপত্তি নেই।'

ভুলটা বুঝতে অবশ্য ধীরেনদা'র দেরী হোল না। ও গিয়ে কিউ-এর একেবারে শেষে গিয়েই দাঁড়াল। কাপড় বিলি চলতে লাগল।

যখন আধাআধি লোক বাকি আছে উদয় শা' উঠে দারোগার দিকে হাতজোড় করে দাঁড়াল, মুখে শুধু বললে—"এবার হুজুর…"

কথাটার সব রকম মানেই হয়—আর মাল নেই, বা আজ এই পর্য্যন্ত থাক, বা হুজুরের এবার যেমন হুকুম। কিন্তু হাত বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে একটা তুমুল হল্লা উঠল—"কাপড়! কাপড়! হাত বন্ধ করলে চলবে না!…"

উদয় শা' তা ভ্রূক্ষেপ না করে দোকানের দরজা বন্ধ করবার জন্যে সেই এগুবে, অমনি ভিড়ের ভেতর থেকে, গোটাকতক ঢিল সজোরে এসে পড়লো…

দেখতে দেখতে হৈচৈ…গোলমাল…ঢিল…আর লাঠী…ধীরেনদা' অথম…

দাদু হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, তাহার মন একেবারে কোথা থেকে যেন কোথায় চলিয়া আসিয়াছে একটু যেন বিস্মিত ভাবে চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া বলিল—'ও! এটা তোমাদের সানডে পার্লামেণ্ট?'

বুঝিলাম দাদু বর্ণনা করিতেছিল না, ঘটনাটা যেখানকার সেখানে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—তারপর ওদিকে কি হোল তাই বলো, ধীরেনদা'র…

আবার গল্পের খুঁট ধরিতে একটু দেরি হইল দাদুর, তারপর বলিল—"ও! ধীরেনদার?—ধীরেনদা'র শরীরে আর কিছু ছিল না—বললে হেসে বলত—কেন, অর্দ্ধাঙ্গ তো ঠিক আছে রে!…পরশু দিনরাত মেহনৎ গেছে, কালও কিছু খায় নি, তার ওপর দুটো চোট, একটা মাথার ঠিক মাঝখানে, একটা পাঁজরার…সব শেষ করেই তো এই ফিরছি…'

পার্লামেণ্ট অনেকক্ষণ নীরব রহিল। দেখিলাম কয়েক জনের জানালা দিয়া বাহির দিকে চাহিয়া থাকিবার দরকার হইয়াছে, দু'একজনের চোখে কি পড়িয়াছে এইরূপ ভান করিবারও।

কাঠরসিক কিন্তু ঠিক আছে—সেইভাবে যতগুলিসম্ভব দাঁত বাহির করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"তাহলে ধীরেনদা' আপনার শেষ পর্য্যন্ত হারল, হকের কাপড় আর পেতে হোল না…"

দাদু কঠিন প্রয়োজনে যে পাগলামিকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে যেন মুক্তি দিয়া দিল, আবার সেই অদ্ভুত উৎকট হাসিতে ঘরটা উচ্চকিত হইয়া উঠিল, দাদু হাত বাড়াইয়া বলিল—"লোকটা ক্ষ্যাপা না পাগল! বলে ধীরেনদা হারবে!…এস্-ডি-ও'র স্পেশাল মেসেঞ্জার ছুটে এল সেই রাত্তিরে, সেই দারোগাকে সেই দোকান খুলিয়ে ধীরেনদা'র কাপড় বের করে দিতে হোল!…The greatest war trophy yet…একটা টুকরো না কেটে নিয়ে পারলাম না।" চৌকির উপর হইতে আনকোরা-নূতন শা'এর কাপড়ের টুকরাটা সযত্নে ভাঁজ করিয়া বুকপকেটে পুরিতে পুরিতে পাগল আবার নিজের পথে চলিয়া গেল।

খুকীর ঝিনুক

"ভাস্কর"

[পথের ধারে যে-লোকটী নিঃশব্দে পকেট থেকে এ-টা ও-টা সে-টা না জানিয়ে তুলে নিয়ে দিন চালায়, সে বেশী অপরাধী—না, যে-লোকটী শত সহস্র লোকের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে, নিজেকে বিপন্ন না করে একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল করে দিয়ে নিজের চার-তলা বাড়ী তৈরী করলো, সে বেশী অপরাধী? কাগজে কলমে বিচার করতে গেলে, আমরা সবাই বলবো, দুজনেই সমান অপরাধী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দ্বিতীয় লোকটীর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো, অথচ প্রথম লোকটীকে ছুঁতে পর্য্যন্ত ঘৃণা হবে। তাই আজকের মানুষ বলছে, নৈতিক বিচারের একটা নতুন সামাজিক ভিত্তি হওয়া দরকার। কিন্তু কথা হলো, বিচার করবে কে?]

খুকীর ঝিনুক হারাইয়াছে।

খুকীর ভাতের সময়ে খুকীর ন'মাসিমা আদর করিয়া উহাকে ওই ঝিনুকটি উপহার দিয়াছিলেন, কাজেই ঝিনুকটি বাড়ীর সকলের কাছেই খুব আদরের জিনিষ। খুকীর মা রেবা সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছে, খুকীর বাবা রমেশ ড্রয়ার, আলমারির পিছন, খাটের তলা, প্রভৃতি সম্ভব ও অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু ঝিনুকের সন্ধান মিলিতেছে না। যদি কাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথাও ফেলিয়া থাকে, এই সন্দেহে উঠান, ছাদ, পাঁচিলের এপাশ ওপাশ সব খোঁজা হইয়াছে। শোবার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, কলতলা, প্রভৃতি কোন স্থানই বাদ যায় নাই। প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি কোণ, প্রত্যেকটি শেল্ফ, অতি সাবধানে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ঝিনুকটি গেল কোথায়? বাজার হইতে কিনিয়া আনা কিংবা ডাকরাকে দিয়া গড়ান ঝিনুক যদি হইত, তবু একটা কথা ছিল, কিন্তু এটি যে ন'মাসিমার কত আদরের দান! এই ঝিনুকটিই গেল হারাইয়া! এত সহজে নিরস্ত হইলে চলিবে না। আরো ভাল করিয়া সন্ধান করিতে হইবে।

বাড়ীর প্রত্যেকটি লোককে ডাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা করা হইল। তাহারা প্রত্যেকে কে কখন কোথায় ছিল, কে কখন কোথায় গিয়াছে, কে কখন কাহার সহিত কথা বলিয়াছে, কে কখন বাড়ীর বাহিরে গিয়াছে, কে কখন বাড়ীতে আসিয়াছে, কে কখন কোন ঘরে ছিল, কে কখন কোন ঘর হইতে কোন ঘরে গিয়াছে এবং কেন গিয়াছে, কে কোন ঘরে কতক্ষণ ছিল, কি জন্য ছিল,

কি কাজের জন্ত ছিল, বাহিরের কেহ বাড়ীতে আসিয়াছে কি না, গোয়ালা, কাজুদার, ঠিকা-ঝি, প্রভৃতি কে কখন আসিয়াছে, কে কখন গিয়াছে, তাহারা কে কতক্ষণ কোন ঘরে ছিল, প্রভৃতি বহু ঘরসহকারে খুঁজিয়া দেখা হইল। কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

সমস্তদিন অতি সাবধানে লক্ষ্য রাখা হইল, ঝি চাকর বা বাহিরের অন্ত কেহ কোন প্রকার সন্দেহ-জনক কথা বলে কি না, কোন প্রকার ফিস্-ফিস্ করে কি না বা কাহারও মুখে কোন অপরাধীর মত হাব-ভাব লক্ষিত হয় কি না। কাহাকেও উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা যায় কি না, কাহারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে কি না, প্রভৃতি বিষয়ে অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখা হইল।

রেবা বলিল, ও আর পাওয়া যাবে না। কেন আর ও নিয়ে এত হৈচৈ!

রমেশ বলিল, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। চুরি অমনি করলেই হ'ল?

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। বহু সন্ধান, বহু গবেষণা, বহু বিশ্লেষণ ও বহু প্রতীক্ষার পর রেবা ও রমেশের ধারণা হইল, এ ঝিনুক চুরি করিয়াছে মালতী, ঠিকা ঝি সৌদামিনীর দশ বছরের মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আসে তার মায়ের সাথে, কখনও কখনও মায়ের কাজে সাহায্য করে, কখনও বা রেবাকে সাহায্য করে, এটা ওটা করিয়া দিয়া। রেবাও তাকে মাঝে মাঝে কিছু খাইতে দেয়, কখনও বা দুই চারিটি পয়সাও দেয়। এই মেয়েটিই কি না শেষে ঝিনুক চুরি করিল! তা এমন আশ্চর্য্য হবারই কি আছে। যে সংসর্গে প্রতিপালিত এবং যে অবস্থায় জীবন যাপন করে এরা, তাতে একটু লোভ হওয়া এমনই কি বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। চুরি চুরিই। ইহার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা বাড়ীর মঙ্গল নাই, সমাজের মঙ্গল নাই।

সন্ধ্যে পাকা হইতেই মালতীকে ডাকা হইল। মালতীর মাকেও ডাকা হইল। তাহারা কিছুতেই স্বীকার করিল না। বেশ বুঝা গেল, দুজনাই ভীষণ ভয় পাইয়া গিয়াছে। এদিকে পুলিশেও খবর দেওয়া হইয়াছে, কখন হয়তো তাহারা আসিয়া পড়িবে। সৌদামিনী ও মালতীর ভয়ার্ত্ত ও উদ্বিগ্ন মুখশ্রী দেখিয়া রেবা বলিল, দেখ বুঝাই তো গেল, ওরাই নিয়েছে। আর ও নিয়ে হৈ চৈ করো না। পুলিশ এসে ওদের নিয়ে গিয়ে ওদের পরে জোর জুলুম করবে।

তা করুক। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। সমাজের এই সব দুর্নীতি কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। কবি বলেছেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—মনে আছে তো?

তাই বলে ওই দুধের মেয়েটাকে—

কি যে বল, চুরি মানে চুরি, তা সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। ওর উপযুক্ত শাস্তি ওকে পেতে হবে।

রেবার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

পুলিশ আসিল। উহাদিগকে ধরিয়া উহাদের বাড়ীতে গেল এবং সৌদামিনীর একটি ছেঁড়া তাসি দেওয়া ময়লা বালিশের তলা হইতে কিছুকটি বাহির করিয়া ছোট দারোগাবাবু উহাদিগকে থানায় লইয়া গেলেন।

কেস হইল। জুভেনাইল অপরাধী হিসাবে একটা লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া হাকিম বলিলেন, মেয়েটাকে একটু ধমকে ছেড়ে দিলেই হতো? ভয়ে যে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। গরীবের মেয়ে, অতটুকু লোভ এমন কি গুরুতর অপরাধ?

ছোট দারোগাবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ওর মা অনেকদিন আমার বাসায়ও কাজ করেছিল। কোনদিন এতটুকু কোন জিনিষ চোরনি। কিন্তু এগ্রাহার পেলে আর মালসমেত আসামী পেলে আমিই বা কি করতে পারি?

(২)

পনের বছর পরে। লাহোরের লছমনঝোলা ব্যাঙ্ক লিমিটেড হঠাৎ ফেল করিয়াছে। ব্যাঙ্কের সামনে অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে, তাহাদের জমা টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য। জনতা নিয়ন্ত্রিত ও হাঙ্গামা নিরস্ত করিবার জন্য পুলিশ আসিয়াছে। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কত ধনী, কত গৃহস্থ, কত ব্যবসায়ী, কত জমিদার ভীত, উদ্বিগ্ন মনে এই ভীড়ের মধ্যে পথ করিয়া লইয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের ছায়া। যাহারা বিশ্বাস করিয়া নিজেদের সমস্ত সঞ্চিত ধন এখানে রাখিয়াছিল, তাহাদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক। এই ব্যাঙ্ক ফেলের ফলে হয়তো তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। কত নিঃসন্তান বিধবা হয়তো তাহাদের সর্ব্বস্ব এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তাহারই সুদের উপরে নির্ভর করিয়া কোন মতে দিনপাত করিতেছিলেন। এই বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের শেষ সম্বলটুকু হারাইয়া ভিখারিণীর বেশে সমাজের সামনে দাঁড়াইতে হইবে।

এই ভীড়ের মধ্য হইতে একটি ভদ্রলোক, পরনে বাঙালা পোষাক, হাতে একটি ছোট সুটকেস, ক্রমশঃ বাহির হইয়া আসিয়া রাস্তায় নামিলেন। সকলেই ঘিরিয়া ধরিল, ব্যাপার কি মশায়? কিছু আশা টাশা আছে?

আশা একটু আছে বই কি! ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন। ম্যানেজার হিসাবপত্র দেখ্‌ছেন। হয়তো সবাই কিছু কিছু পাবেন।

সকলেই ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। যুবকটী সোজা ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। গাড়ী পৌছিবামাত্র ভীষণ ভীড়ের মধ্যে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল।

বছর ঘুরের মধ্যেই সাদার্ন এভেনিউ-এ একখানি নূতন বাড়ী উঠিল। লাহোর লছমনঝোলা ব্যাঙ্কের

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ক্যাসিয়ার শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বাবু এ বাড়ীর মালিক। ব্যাঙ্ক ফেল করার সঙ্গে এ বাড়ীর ভিত্তিপত্তনের সম্বন্ধ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, কিছুদিনের মধ্যেই অতিথি-অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

৩

খুকী বড় হইয়াছে। উহার বিবাহের জন্য রেবা ও রমেশ উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কোন কথা তেমন অগ্রসর হইতেছে না। রাধাশ্যাম এখনও অবিবাহিত, তাহারও বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে। তাহারও সম্বন্ধ আসিতেছে, যাইতেছে, অথচ পাকাপাকি ঠিক হইতেছে না। রমেশ বলিল, রাধাশ্যাম এমন মন্দ পাত্র কি? দেখব চেষ্টা করে?

রেবা বলিল, বয়সটা একটু বেশী না? বোধহয় উনত্রিশ ত্রিশ হবে, তাছাড়া লেখাপড়াও তো তেমন—

লেখাপড়া বেশি না জানলেও, মূর্খ তো নয়। আই এ পর্য্যন্ত তো পড়েছিল। এমন অবস্থা, এমন বাড়ীঘর—এসবও তো দেখ্‌তে হয়।

কিন্তু কেমন করে এসব হ'ল তা তো জান। এ টাকায়, এ বাড়ীঘরে ওরা সুখী হবে মনে কর?

কি যে ছেলেমানুষের মত কথা ব'ল তার ঠিক নেই। চুরি করলেই যদি অসুখী হ'ত, তা হলে পৃথিবীতে চুরি বলে কিছু থাকতো না। ওসব বাজে কথা রেখে দাও।

যা ভাল বোঝ। আমি আর কি বলব?

সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। খুকী আর এখন খুকী নয়, সে এখন সুমিত্রা। সুমিত্রা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। সাদার্ণ এভেনিউএর বাড়ীতে মহা ধুমধাম আরম্ভ হইয়াছে। সুমিত্রার সঙ্গে আসিয়াছে মালতী। ঝিগুকচুরির পর সৌদামিনীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন ঝির অভাবে বহুপ্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিবার পর একটু দয়া করিয়া তাহাকে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। ঝি চাকরের আবার মান-অভিমান কি? সৌদামিনী পুরানো বনিবের কথা ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। তদবধি উহারা পূর্ব্ববৎ রেবা ও রমেশের কাজ করিয়া আসিতেছে। বিবাহের সময়ও মাসে ঝিয়ে দশটা চাকরের কাজ দুজনে করিয়াছে। রেবা ও রমেশ উভয়েই মালতীকে নূতন সাড়ী জামা বকশিস দিয়া আরো বখশিসের লোভ দিয়া সুমিত্রার সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছে। এখানে আসিয়া সে সর্ব্বদা সুমিত্রার সঙ্গে ঘুর ঘুর করে। তার সব কাজ করিয়া দেয়, তার যাহাতে কখনো মন খারাপ না হয়, সে চেষ্টা করে।

গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। অতিথি অভ্যাগতেরা প্রায় সকলেই বিদায় লইয়াছেন। একদিন বৈকালে সাদার্ণ এভেনিউ এর দিকে মুখ করিয়া সুমিত্রা ও রাধাশ্যাম বসিয়া আছে, কাছে একটি খেলনার বাক্স।

সুমিত্রা ছেলেমানুষের মতো খেলনার বাক্স হইতে একটি একটি খেলনা বাহির করিতেছে, আর তাই লইয়া উভয়ে হাসাহাসি করিতেছে। খেলনাগুলির মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল একটি ঝিনুক। ঝিনুকটি হাতে লইয়া সুমিত্রা বলিল, এই ঝিনুকটি দেখছ, এটা আমার ছেলেবেলাকার জিনিষ। আমার ভাতের সময়ে আমার ন' মাসিমা আমাকে দিয়েছিলেন। ওই মালতীটা এই ঝিনুক চুরি করে হাজতে গিয়েছিল।

ঘনশ্যাম যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল, তাই নাকি! অমন চোর—তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ এ বাড়ীতে। ওকে এক্ষুণি বিদেয় করে দেও। কত দামী দামী নানা রকম জিনিষ রয়েচে, কখন কি চুরি করবে, তার ঠিক নেই।

না, ও আর এখন চুরি করে না। ও আর ওর মা আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন আছে।

না, না, বিশ্বাস নেই। এ বাড়ীতে চোর টোর আমি কক্ষণো থাকতে দেব না।

পরদিন প্রাতে মালতীকে সুমিত্রার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুমিত্রা ছলছল চোখে বারান্দার রেলিং ধরিয়া মালতীর যাত্রাপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পূর্ণিমা

শ্রীসীতা দেবী

[মানুষ কতদিন থেকে ভাষা ব্যবহার করছে, তার সঠিক কোন হিসেব নেই.. তবে সে যে অনেকদিন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই অনেকদিনের মানুষের ভাষায় এখনও পর্য্যন্ত দু'একটা শব্দ এমন রয়ে গিয়েছে যে, আজও পর্য্যন্ত মানুষ তার ব্যাখ্যা ভাল করে করতে পারলো না। "প্রেম" হলো সেই রকম একটা শব্দ···বহু তাত্ত্বিক, বহু রসিক, নানাভাবে এই একটী শব্দের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন...বহু কবি, বহু সাহিত্যিক, বহু ছন্দে, বহু কাহিনীতে এই একটী শব্দকে রূপ দেবার জন্যে বহু কল্পনার ফাঁদ পেতেছেন.. কিন্তু এ-সবের ভেতর থেকে প্রেমের একটী রূপ আজ নিঃসন্দেহভাবে মানুষের মনে ফুটে উঠেছে, সে হলো তার সেবার রূপ, তার সাধনার রূপ। প্রেম হয়ত বিধাতার দান, কিন্তু মানুষের প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্ত্তের জাগ্রত চেষ্টায় তাকে রাখতে হয় বাঁচিয়ে...অনায়াসে আসে বটে.. কিন্তু তাকে স্থায়ীভাবে আসনে ধরে রাখতে হলে চাই, অসাধারণ সাধনা...লেখিকা সেই কথাই এই কাহিনীতে নতুন করে ফুটিয়ে তুলেছেন...]

মেল ট্রেণ ছাড়িবার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম মানুষের চীৎকারে ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে মুখরিত, লোকের ধাক্কাধাক্কিতে খুন জখমও দুই-একটা হইয়া যাইতে পারে।

একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার সামনে অনেকগুলি সুসজ্জিত মানুষ ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাত্রী বোধহয় একজনই, সমরসজ্জায় সজ্জিত একটি যুবক, তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে কম করিয়া দশ-বারোটি মানুষ। যুবক খুব যে রূপবান তাহা নয়, তবে মুখে বেশ একটা তেজ ভাব, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানা এখন স্বজনবিচ্ছেদের দুঃখে একটু ম্লান দেখাইতেছে, হাসিলে দুই পাটি ঝকঝকে শাদা দাঁত দেখা যায়। হাসিটাই তাহার মুখে মানায় ভাল। বয়স তেইশ-চব্বিশ বৎসরের বেশী না হওয়াই সম্ভব।

তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহাদের ভিতর প্রৌঢ় একজন, প্রৌঢ়া দুইজন, যদিও তাঁহার ভিতর একজন নিজের বয়সটা চাপা দিবার কিছু উৎকট চেষ্টাই করিয়াছেন। তাঁহার পরণে মুগার পাড় দেওয়া চাকাই শাড়ী, ব্লাউজের কাট এমন যাহাতে ব্লাউজ পরার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিরর্থক

এবং মুখে ও ঠোঁটে অনুলেপন এত বেশী যে, দর্শকের চক্ষু হতবুদ্ধি হইয়া যায়। ভদ্রমহিলা বয়স কালে দেখিতে ভালই ছিলেন বোধ হয়। বাদবাকি মানুষগুলি তরুণ, তরুণী ও বালক-বালিকা।

প্রৌঢ় ব্যক্তি ভারি গলায় বলিলেন, "রঘু, পৌঁছেই টেলিগ্রাম করতে ভুলো না বাবা, তোমার মা তা হলে একেবারেই শুয়ে পড়বেন।"

রণজিৎ বলিল, "হ্যাঁ বাবা, নিশ্চয় করবো। মা, তুমি শুধু শুধু মন খারাপ করছ কেন বল ত? এমন ত নয় যে একেবারে সাতসমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছি? দেশেই থাকবো ত?"

রণজিতের মা চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাসি তাঁহার কম্পিত অধরে ফুটিতে চাহিল না। অশ্রুসজল নেত্রে খালি ছেলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রণজিৎও মায়ের দিকে তাকাইয়া হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার উদ্যমটাও বিশেষ সফল হইল না।

সুসজ্জিতা বিধবা মহিলাটি বলিলেন, "মা যে কেন মন খারাপ করছে সে কি আর তুমি এখন বুঝবে বাবা? নিজেরা মা বাপ হবার আগে কেই বা মা বাপের ব্যথা বুঝতে পারে?"

যুবকটি এবারে হাসিয়াই ফেলিল, অবশ্য মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া। ট্রেণের কামরার জানলার হাত রাখিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের মেয়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার চোখে মুখেও একটা হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল, কিন্তু তখনই আবার মুখখানা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়, তবে সাজসজ্জা এত বেশী যে, তাহার স্বাভাবিক শ্রী একেবারেই লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিতা বিধবা মহিলাটি যে এই মেয়েটিরই মা তাহা দুইজনের দিকে একবার তাকাইলেই বুঝা যায়।

রণজিতের ছোট ভাই সুজিৎ এই সময় কয়েকটা ইংরাজী ম্যাগাজিন্ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "এই নাও দাদা, ভাল বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না, তবে সময় কেটে যাবে এখন। Strand magazineটার কি মূর্ত্তি হয়েছে দেখেছ?"

সেই তরুণী মেয়েটি কাছে আসিয়া রণজিতের হাত হইতে এক একখানা পত্রিকা তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। রণজিৎ নীচু গলায় বলিল, "খুব লোভ হচ্ছে না? বল্‌ব খোকাকে আর এক সেট্ কিনতে?"

মেয়েটি ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আহা, ম্যাগাজিন্ দেখে লোভ করতে যাব কেন। ও কি আর আমার জুটবে না?"

রণজিৎ বলল, "তাই কি আর বলছি? কথা বলা দরকার, অথচ কি যে বল্‌ব তাও ভেবে পাচ্ছি না।"

মেয়েটি মুখ ফিরাইয়া, মুখের উপর রুমাল চাপিয়া ধরিল। তাহার পর আবার মৃদুস্বরে বলিল, "বলবার কথা একেবারেই কিছু কি নেই?"

ছেলেটিও তেমনি স্বরেই বলিল, "ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এমন ত কিছু মনে পড়ছে না। চিঠি লিখবে ত?"

মেয়েটি মুখখানা একটু ভ্রুকুটিকুটিল করিয়া বলিল, "না লিখবার কি কারণ? এখন তুমি মনে করে লিখলেই হয়।"

পাশের কামরাটা ইণ্টার ক্লাশ। তার সামনেও ভীড়, লোকে প্রাণপণে ঠেলাঠেলি করিতেছে। গাড়ীটা বোধহয় মেয়েদের বিশেষ কামরা, ছেলের কান্নার সেখানে কান পাতা যায় না। এখানেও দুই-চারজন তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, যদিও বেশীর ভাগই যাত্রী। গাড়ীর জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া, এখানেও একটি তরুণী মেয়ে ভিতরের এক মহিলার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী নয়, একহারা চেহারা, রংটা গায়ের শ্যামবর্ণই। চেহারার ভিতর বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব, সুন্দরী সে নয়, তবে লোকে একবার তাহাকে দেখিলে আর একবার ফিরিয়া তাকায়।

ভিতরে যে মহিলাটি বসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "ওদিকে অত ব্যস্ত হয়ে কি দেখছিস্ বল্ ত? চেনা কেউ যাচ্ছে নাকি?"

মেয়েটির নাম পূর্ণিমা, তবে ডাকনাম হাসিটাই আত্মীয়-স্বজন মহলে চলে বেশী। সে বলিল, "হ্যাঁ মাসিমা, আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন দেখ্‌ছি।"

মাসিমা জানলা দিয়া মাথা বাহির করিয়া ভাল করিয়া পাশের কামরার সামনের মানুষগুলিকে দেখিয়া লইলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ খাঁকী পরা ছেলেটি বুঝি? যুদ্ধে যাচ্ছে? হরি হে, কি এক ফ্যাশানই যে হয়েছে আজকালকার ছেলেদের। সেদিন আমার মেজ ননদের এক ছেলে গেল চলে, বুড়ী মা কেঁদে মরে।"

হাসি বলিল, "কাঁদবেই ত, যারা যায় তাদের ক'জন বা ফেরে মাসিমা? ঐ দেখ না রণজিৎবাবুর মা কিরকম কাঁদছেন। ওঁর ছেলে ত আবার "এয়ার ফোর্স"এ যাচ্ছেন, তাদের ত প্রাণের মেয়াদ ছত্রিশ ঘণ্টার বেশী নয় বলে শুনি।" হাসির নিজের মুখখানাও যেন নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত নিষ্প্রভ হইয়া আসিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। সুসজ্জিতা প্রৌঢ়া মেয়েকে সাবধান করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "হিমু, সরে দাঁড়াও মা, গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে হাতে লেগে টেগে যাবে।"

রণজিতের মা ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় কোনোমতে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। বাবা, মা ও হিমানীর মাকে প্রণাম করিয়া অন্যদের কাহারও পিঠে হাত বুলাইয়া, কাহারও গাল টিপিয়া দিয়া, কাহারও দিকে শুধু পলীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া, রণজিৎ গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ীটা প্রথম একবার নড়িয়া উঠিল, তাহার পর ধীর মন্থরগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। রণজিতের ভাই

গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল, অনর্গল কথা বলিতে বলিতে। মেয়েরা এক জায়গায়ই দাঁড়াইয়া রহিল। হিমানী ও রণজিতের ছোট বোন শোভা রুমাল উড়াইতে লাগিল। মা ও বাবা ব্যথাকাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দূর হইতে হাসিও তাকাইয়া রহিল অপসিয়মান গাড়ীটার দিকে, তাহারও দৃষ্টিতে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গাড়ী প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। সকলে বাড়ী ফিরিবার জন্য বাহিরের গেটের দিকে চলিল। হিমানী ও তাহার মা মোটরে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। রণজিতের বাড়ীর সকলকেও তাঁহারা লইয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ছোট গাড়ী, অত ঠাসাঠাসি করিয়া যাইতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সুমিৎ তাহার ছোটভাইকে লইয়া ট্রামে চলিয়া গেল। প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া আর দুইটি ছোট ছেলেমেয়েকে লইয়া দুইখানা রিক্সতে চড়িয়া বসিলেন। পূর্ণিমা আসিয়াছিল পাড়ারই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, সেও ট্রামেই ফিরিয়া চলিল। অনাথবাবু বলিলেন, ভীড়ের চাপে একেবারে শুকিয়ে গেছ দেখছি। যা গরম তার উপর এই ভীড়, আমি বলেইছিলাম কষ্ট হবে।"

হাসি বলিল, "আজকালকার পৃথিবীতে কষ্ট বাঁচিয়ে চলা ত যায় না মেসোমশায়।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "তা বটে, তবে নিতান্ত বেটা না করলেও চলে, সে কষ্টটা আর কেন করা?"

হাসি হাসিল, তবে আর কোন উত্তর দিল না। বাড়ীতে পৌঁছিতেই তাহার মা বলিলেন, "বাবা, রোদে যেন ভাজা ভাজা হয়ে এল মেয়েটা। বলেছিলাম না যে ট্রামে যাস নে এই ভর দুপুরে। তা মাসতীরা গেল সব এই ট্রেণে?

হাসি চুল খুলিতে খুলিতে বলিল, "আমি একবার স্নান করে আসি, মাথাটা ধরে উঠেছে।"

মা বলিলেন, "তা-ত ধরবেই, যা রোদের ঝাঁঝ। বোস্, দুদণ্ড জিরিয়ে নে, অত রোদ থেকে এসেই চান করে না।"

হাসি দু-চার মিনিট বসিয়া তাহার পর স্নানের ঘরে ঢুকিল। দুই চোখ বহিয়া তাহার তখন অশ্রুজল ঝরিতেছে, মায়ের সামনে আর কতক্ষণ বা বসিয়া থাকা যায়। একটি তরুণ মুখের স্মৃতি কাঁটার মত তাহার বুকের ভিতর ফুটিতে লাগিল। আর কোনদিন কি সে রণজিৎকে চোখে দেখিতে পাইবে? সে তাহার কেহই নয়, তাহার সহিত হাসির পরিচয়ও নাই, অন্ততঃ মুখে কথা বলার পরিচয় ত নাই। কিন্তু হাসির জগতে কতখানি আলো এই ছেলেটি বিতরণ করিত, আজ তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল। মনের ভিতর তাকাইয়া দেখিল সেখানে গভীর অন্ধকার, যেন পরিপূর্ণ অমাবস্যা নামিয়া আসিয়াছে। একটুখানি ম্লেহের হাসি হাসিয়া মেয়েটি নিজের মুখ চোখ মুছিয়া ফেলিল, নিজের মনেই বলিল, "হাসি আর পূর্ণিমা, দুটো নামই বড় সকাল সকাল নিরর্থক হয়ে গেল।"

স্নান করিয়া বাহির হইবার পর তাহার মা মেয়েকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন। মেয়ে কিছু খাইতে রাজী হইল না, বলিল, "বড় মাথা ধরেছে মা, এখন থাক্ গে।"

মা বলিলেন, "চোখ মুখ থমথম্ করছে যেন, অসুখ বিসুখ বাধাও আর কি একটা! চিরকাল তোমাদের সেবা করতে করতেই কাটল আমার। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল, কোথায় ছেলেমেয়ে আমায় দেখবে তা না আমি বুড়িই তাদের ঝামেলা নিয়ে মরছি।" মায়ের কথার উত্তর দিলেই কথা বাড়িতে থাকিবে, তখন কোথা দিয়া কোনকথা তাহার বেদনাভারাক্রান্ত মন হইতে বাহির হইয়া পড়িবে তাহা কে জানে? চুপ করিয়া থাকাই ভাল। হাসি গিয়া শুইয়া পড়িল। বালিশটার ভিতর মুখ গুঁজিয়া জোর করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ঘুম আসিল না।

হিমানী ও তাহার মা নিজেদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন, সবার আগে। মধ্য কলিকাতার বাড়ী, নিজেদেরই বাড়ী। এককালে অবস্থা বেশ ভাল ছিল, স্বামী বাঁচিয়া ছিলেন, ছেলেমেয়েরা সকলেই একসঙ্গে ছিল। তখন সমস্ত বাড়ীখানাই প্রয়োজন হইত। এখন একতলায় ভাড়াটিয়া বসান হইয়াছে, গৃহস্বামী পরলোকগমন করিয়াছেন, বড় ছেলে সপরিবারে বিদেশে থাকে, বড় মেয়েরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দোতলায় থাকেন শুধু হিমানী, তাহার মা এবং দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতিপুত্র। অবস্থা অনেক পড়িয়া গিয়াছে, তবু গৃহিণী যথাসম্ভব চাল বজায় রাখিয়াই চলেন, গাড়ীও তুলিয়া দেন নাই, যদিও পেট্রোলের অভাবে বেশীর ভাগ দিনই গাড়ী গারাজ্ হইতে বাহির করা যায় না।

বাড়ী আসিয়াই তরঙ্গিণী বলিলেন, "যা, পাখা খুলে একটু শুয়ে থাক্ গে, যা চোখ মুখের ছিরি হয়েছে।"

হিমানী বলিল, "এখন আর শুয়ে কি হবে? দুপুরে ঘুম আমার হয় না বাপু।"

তাহার মা বলিলেন, "আয়নায় মুখ দেখ্ দেখি। বিকেলে শ্বশুরের বাড়ী যাবি না? সেদিন তারা অত করে বলে গেল। আর গেলে এমনি শুক্‌নো চেহারা নিয়ে যাবি নাকি?"

হিমানী ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিল, "আজ না গেলে তারা কিছু মনে করবে না।"

তরঙ্গিণী বলিলেন, "শোন মেয়ের কথা! এখন থেকেই কি তোমায় যোগিনী সাজতে হবে নাকি? অতশত আমি পছন্দ করি না বাপু, আর এ কথাটা আমি অত ছড়াতেও চাই না। এন্‌গেজ্‌ড্ হয়েছ ত হয়েছ, বেঁচে বর্ত্তে ফিরে আসে তখন দেখা যাবে, এখন থেকে জয়ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে হবে না।"

হিমানী আবার ছোট রুমালখানা দিয়া চোখ মুখ মুছিতে মুছিতে ঘরে চলিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "বুড়ো হলে মানুষ কি ভীষণ কেঠো হয়ে যায় মাগো!" ঘরে গিয়া পাখা খুলিয়া সে ধপাস করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। খান দুই-তিন নভেল ও ম্যাগাজিন্ টানিয়া লইয়া একটার পর একটা পাতা উল্টাইতে লাগিল। মনটা কেমন যেন ভার ভার। বইয়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে একখানা তরুণ উজ্জ্বল মুখ বারবার উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা এন্‌গেজ্‌ড্ হইয়াছে মাত্র দুই মাস, ইহারই মধ্যে ছেলেটা চলিয়া গেল। হিমানীর মায়ের বর তেমন কিছু পছন্দ হয় নাই। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের ছেলে, ছোট ভাইবোনে, বাড়ী ভরপুর। একেবারেই সাবেকী চালচলন। তবে ছেলে ভাল, বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া ফিরিয়া

আসে ও ভাল চাকরী বাগাইতে পারে, তখন বিবাহের কথা ভাবা যাইতে পারে এবং তখন যে বুড়াবুড়ী মা বাবা ও লেভিংগেভি ভাইবোন ঘাড়ে করিয়াই চিরকাল বসিয়া থাকিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। কিন্তু কথাটা এখন তিনি কাহারও কাছে ভাঙিতে চান না, ইহাতে মেয়ের অনিষ্ট হইতে পারে। ধর, রণজিৎ যদি নাই ফেরে, "এয়ার কোর্সে"র কথা ত? তাহা হইলে হিমানী বাগদত্তা ছিল জানিয়া অনেকদিন এখন কোনো যোগ্য ছেলে তাহার দিকে ভিড়িবেই না। দরকার কি সে ফ্যাসাদের ভিতর যাইবার? কিন্তু অল্পবয়সী মেয়ে, মাথা এখন রোমান্সের ধোঁওয়ায় ভর্তি, কথা শুনিয়া চলিলে ত? আজই একটা বেশ জাঁকাল পার্টি আছে। শীলদের বড় মেয়েটির জন্মদিন, তাহারা বেশ ঘটা করিয়া করিতেছে, চেনাশুনা বাড়ীর অনেক লোকই সেখানে উপস্থিত থাকিবে। শীলদের বড় ছেলেটি পাত্র হিসাবে বেশ ভাল, তাহাদের অবস্থাও এই কয় বৎসরে বেশ উন্নতি হইয়াছে, কলিকাতার সহরে বাড়ীই তিনখানা। তাহা ছাড়া উহাদের একটি মামাতো ভাই আছে, সেও এই বৎসরে বিলাত যাইবে। সব জড়াইয়া পরিবারটা আত্মীয়তা করার মত বটে। তাঁহারাও কিছু ছোট নয় পরিবার হিসাবে, তবে স্বামী চলিয়া যাওয়ায় এখন অবস্থা আর আগের মত অবশ্য নাই। হিমানীর একটি অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ হইয়া গেলে তরঙ্গিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন, এই কাজটাই তাঁহার বাকি আছে। কিন্তু মেয়ে মাঝে মাঝে বোকামী করিয়া বসে। এদিকে ত মেয়ে গাড়ীছাড়া এক পা চলিতে জানেন না, পাখা ছাড়া দিনরাত্রে তাহার ঘুম হয় না, তাঁতের শাড়ী ছাড়া পরিতেও পারেন না, সেদিন পর্য্যন্ত আয়া রাখিতে হইয়াছে তাহার জন্য, অথচ রোমান্স করিবার বেলায় জুটিয়া গেলেন এক অতি বাঙালী পরিবারের, অতি সাধারণ একটা ছেলের সঙ্গে। ছোকরা দেখিতে ভাল এবং নেশাটেশা করে না, এই তাহার গুণের মধ্যে। তা পুরুষমানুষের রূপ লইয়া ত আর কেউ ধুইয়া খাইবে না? আর যে ছেলের টাকা নাই, তাহার কোন গুণই নাই, ইহাই তরঙ্গিণীর এতদিনের জীবনের অভিজ্ঞতার ফল।

তখন আর হিমানীকে তিনি ঘাঁটাইলেন না, চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিকালের দিকে বাহির হইয়া যখন চা খাইতে গিয়া বসিলেন, তখন হিমানীও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিল, তখন তাহাকে প্রায় স্বাভাবিকই দেখাইতেছে। তরঙ্গিণী শীলদের বাড়ীর পার্টির কথাটা নিতান্ত যেন কথাচ্ছলেই পাড়িলেন। প্রথমটা হিমানী চুপ করিয়াই রহিল, তারপর বলিল, "আচ্ছা চল, হাঁ করে একলা বাড়ী বসে থেকেই বা কি রাজা হব?"

মায়ের নির্দ্দেশমতই সে সাজসজ্জা করিল, গহনা পরিল, পাউডার, রুজ, নেলপলিশ, সুগন্ধির ছড়াছড়ি করিল। মায়েরও কিছু সময় গেল সাজপোষাক করিতে, তাঁহারটা আবার বিশেষ সাবধানভাবে করিতে হয়, পাছে বেশী চোখে পড়ে। তাহার পর গাড়ী করিয়া মা মেয়ে দুইজনে বাহির হইয়া গেলেন।

রণজিৎদের বাড়ীটা সেদিন কেমন যেন অন্ধকার হইয়া রহিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলিও তেমন প্রাণ খুলিয়া গোলমাল করিতে ভরসা পাইল না। রণজিতের মা বাঙালী সংসারের গৃহিণী, মন খারাপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সুযোগ তাঁহার ছিল না, তাঁহাকে অনতিবিলম্বেই ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিতে হইল, কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখের জল প্রায়ই গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি ক্রমাগতই

তাহা সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী বিশ্বম্ভরবাবু পাশের বাড়ী হইতে একতাড়া খবরের কাগজ আনাইয়া একেবারে তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেলেন, কথাবার্ত্তা কিছু আর কাহারও সঙ্গে বলিলেন না।

পূর্ণিমা সন্ধ্যা অবধি শুইয়াই রহিল, তাহার পর উঠিয়া বসিল। সন্ধ্যাবেলা সে পাড়ারই একটি মেয়েকে পড়াইতে যায়, কাজে ফাঁকি না দিয়া সেখানেই চলিয়া গেল। ইহাদের দরিদ্রের সংসার, চার-পাঁচটি ভাইবোন, বাপ সামান্য বেতনে কাজ করেন, তাহাতে সংসার চলে না। পূর্ণিমা দুইটি ট্যুশনি করে, সকালে ও সন্ধ্যায়, দুপুরে নিজের পড়া শুনা করে, সামনের বৎসরে বি এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার এক ভাইও পড়াশুনা করিতে করিতেই নানাভাবে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। মা তাহাদের উদয়াস্ত খাটেন, ছেলেমেয়েরাও যে খুব বেশী আলস্যচর্চ্চার সুযোগ পায় তাহা নহে।

ছাত্রীকে সে নিয়মমতই পড়াইয়া গেল, তবে তার বেশী গল্প করা আর কিছু করিতে পারিল না। ছাত্রীটা একবার জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিদি, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?"

হাসি বলিল, "মাথাটা একটু ধরে আছে।" ছাত্রীটি পড়াশুনায় খুব আগ্রহবতী নয়, তাড়াতাড়ি বলিল, তা হলে আজকে আর থাক্। আমি এই অঙ্ক ক'টা বাড়ীতেই ক'রে রাখব, আপনি কাল দেখে দেবেন।" পূর্ণিমারও আজ কর্ত্তব্য পালনে খুব বেশী উৎসাহ দেখা গেল না, সে "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়ী কাছেই, সে হাঁটিয়াই যায়। রণজিৎদের বাড়ী ছাড়াইয়া তবে তাহাদের বাড়ী, একবার সে-দিকে তাকাইয়া দেখিল, বাহিরের ঘরে দুটী ছোট ছেলেমেয়ে, একজন "ঠাকুরমার ঝুলি" পড়িতেছে, অন্যজন একটা এক পা ভাঙা কাঠের ঘোড়া লইয়া তাহাকে দিয়া গাড়ী টানানোর চেষ্টায় আছে। রণজিতের ঘরের জানলাটা আজ অন্ধকার, সেখানে আলো নাই। পূর্ণিমার একবার জানিতে আগ্রহ হইল, হিমানী কিভাবে আজকার সন্ধ্যাটা কাটাইতেছে। হিমানীর মায়ের একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও কথাটা কিছু কিছু ছড়াইয়াছিল, পূর্ণিমাও গোড়া হইতেই ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইয়াছিল। হিমানীও একসময় কিছুদিনের জন্য তাহার সহিত একস্কুলে পড়িয়াছিল, অবশ্য এক ক্লাসে নয়, কাজেই, মেয়েটি তাহার একেবারে অজানা নয়। হিমানীকে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যবতী বলিয়া পূর্ণিমার মনে হইতে লাগিল, রণজিতের প্রেম সে পাইয়াছে, রণজিতের বিচ্ছেদের যে দুঃখ তাহাও গোপন করিবার জন্য তাহাকে প্রাণপাত করিতে হইতেছে না। পূর্ণিমার যে কাঁদিবারও অধিকার নাই।

পরদিন হইতে সংসার যাহার যেমন চলিতেছিল, চলিতেই লাগিল। একটা টেলিগ্রাম না আসা পর্য্যন্ত বিশ্বম্ভরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন, সেটা আসার পর নীরব হইয়া গেলেন, ছেলের সম্বন্ধে মুখে কোন আশঙ্কা প্রকাশও করিতেন না, পাছে কোনো দুষ্টগ্রহ ঐ অমঙ্গল আশঙ্কাকে সত্য পরিণত করিয়া তোলে। ভাইবোনেরা দু-চারদিনেই আবার আগের মত ভাবে চলিতে লাগিল বরং "বড়দা উড়তে শিখছে" এই কথাটা খুব মুখ বড় করিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করিতে লাগিল এবং তাহাদের ইহাতে গুরুমর্য্যাদা বাড়িয়াও গেল কিছু।

পূর্ণিমা কাজের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কাজও এখন তাহাকে কোনো আশ্রয় দিতে

পারিল না। রণজিতের একটু খবর পাইবার জন্য সে আকুল হইয়া থাকে, কিন্তু খবর আনিয়া দিবে কে? তাহার ছোটবোনের সঙ্গে রণজিতের বোন শোভার সামান্য একটু আলাপ আছে বটে, কিন্তু খুব বেশী যাওয়া আসা নাই। তবু কোনোমতে তাহারই সাহায্যে পূর্ণিমা জানিতে পারিল যে, রণজিৎ যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে, ভালই আছে, উৎসাহ সহকারে কাজ শিখিতেছে। হিমানী ও হিমানীর মা একদিন তাহাদের কুটুম্ব-গৃহে আসিয়া বেড়াইয়া গেলেন। খোলা জানলা দিয়া রণজিতের মায়ের শয়নকক্ষ দেখা যায়, দুই গৃহিণী বসিয়া কথা বলিতেছেন, পূর্ণিমা দেখিতে পাইল। হিমানী সারাবাড়ী ঘুরিতেছে, সুজিতের সঙ্গে রসিকতা করিতেছে, ছোটদের সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে দুই-একটা কথা বলিতেছে। তাহার তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ এতদূর হইতেও মাঝে মাঝে শুনা যায়। এত হাসিবার সে পাইয়াছে কি? ডালিমফুলের রংয়ের, জরির বুটি দেওয়া ঢাকাই শাড়ী পরা, সাজগোজের কিছু ত্রুটি নাই। পূর্ণিমা ভাবিল, "এদের শরীর আর মন কি একেবারে আলাদা? মনে যাই হোক, শরীরের দাবী সবটাই এরা মিটিয়ে চল্‌তে পারে? আমি ত আর চোখে তাকে দেখতে পাই না বলে, চোখ আমার খুল্‌তেই ইচ্ছে করে না।"

মায়ের ডাকে জানলা ছাড়িয়া অত্যন্ত তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল, হিমানীর লীলা দেখা আর সম্ভব হইল না।

পরের দিন সকালের কাজ সারিয়া সবে সে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন সময় দেখিল, বিশ্বম্ভরবাবু তাহার বাবার কাছে, সামনের ঘরটায় বসিয়া আছেন। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, "হাসি মা, ইনি তোমার কাছে একটু কাজে এসেছেন। ইনি বিশ্বম্ভরবাবু, ঐ ১০ নম্বর বাড়ীটায় থাকেন এঁরা।"

হাসি ফিরিয়া অনেকখানি নীচু হইয়া ভদ্রলোককে নমস্কার করিল। তাহার কাছে ইঁহার যে কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা কোনোমতেই সে ভাবিয়া পাইল না। বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, "আমি এসেছিলাম মা বলতে যে, তুমি যদি একটু সময় করে আমার মেয়ে শোভাকে হপ্তায় অন্ততঃ চারদিন পড়াতে পার ত বড় ভাল হয়। মেয়ের বনিয়াদটা বড় কাঁচা হয়ে যাচ্ছে, স্কুলেও অন্যদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না, ওর দাদাই ওর পড়াশুনো দেখত এতদিন। তা সে ত "এয়ার ফোর্সে" চলে গেল, শুনেছ বোধ হয় তোমরা?"

পূর্ণিমার বাবা বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এই সেদিন গেল, তা আর জান্‌বো না?"

পূর্ণিমার ত মরিবার সময় নাই, আর একটি ছাত্রী পড়াইবে সে কখন? অথচ বিশ্বম্ভরবাবুর কথার উত্তরে অম্লানবদনে বলিয়া বসিল, "বেশ ত বাবা, ওবেলা গিয়ে শোভার সঙ্গে কথা বলে আসব, কবে কবে যেতে পারব, তাও জানিয়ে আসব।"

বিশ্বম্ভরবাবু চলিয়া গেলেন। পূর্ণিমা ভিতরে ঢুকিতেই তাহার মা বলিলেন, "আবার একটা কাজ নিয়ে বস্‌লি যে বড়? এমনিতে ত মেয়ের নাইবার খাবার সময় নেই, কাজ তুমি কখন ফারো করবে শুনি?"

পূর্ণিমা একটা টুল্ টানিয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "যেমন করে হোক সময় করতে হবে। গোটা কুড়ি টাকা পাওয়া যাবে হয়ত, খানিকটা জমাতে পারব। সামনের বছরেই ত ছিরু যেওয়া, ছান ত্যান, কতগুলো খরচ রয়েছে!"

মা বলিলেন, "টাকা অত ওরা দেবে কোথা থেকে? অবস্থা ত প্রায় আমাদেরই মত দেখি। গিন্নী ত সারাদিন হাঁড়ি ঠেলছেন। ঠিকে ঝি রয়েল, তবে কাল থেকে একটা চাকর দেখছি যেন!"

পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বলিল, "বড় ছেলের ভাল চাকরি হয়েছে এখন, অবস্থার উন্নতি হওয়াই সম্ভব।"

মা যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "রক্ষে কর বাছা, গড় করি অমন ভাল চাকরিকে। অমন সুন্দর ছেলেটা, কখন কি হয় বেচারার!" তিনি আবার রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

পূর্ণিমা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বিশ্রাম, পড়াশুনা, ইহাদেরই ভিতর হইতে সময় তাহাকে আহরণ করিতে হইবে। রণজিৎদের বাড়ীতে যে সে প্রবেশের অধিকার পাইল, ইহা সে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইতে দিতে পারে না। তবু খবর পাওয়া এখন সহজ হইবে।

পরদিনই সে সকালে শোভাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বাড়ীর চেয়ে অল্প একটু বড়, ঘর একখানা বেশী, ছাদ আছে একটুকরা। আসবাবপত্রের বাহুল্য কিছু নাই, তত গোছাল-গাছালও নয়। রণজিৎ যে ঘরে থাকিত, এখন ছেলেমেয়েরা সেটিকে পড়ার ঘর করিয়াছে। শোভাকে পড়াইতে বসিল বটে পূর্ণিমা, কিন্তু মন তাহার বারবার বইয়ের পাতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। এই ঘরের অদৃশ্য বায়ুমণ্ডলে কাহার উপস্থিতি যেন সে সর্ব্ব দেহমন দিয়া অনুভব করিতে লাগিল। এইখানে, এই জানলার ধারে পূর্ণিমা তাহাকে কতবার বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। কতবার আসা যাওয়ার পথে দুজনের দৃষ্টি মিলিত হইয়াছে। কিন্তু রণজিতের চোখে তখন প্রেমের অঞ্জন, সে ভাল করিয়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাইত না, আর পূর্ণিমা প্রাণপণে নিজের দৃষ্টিকে অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিত, পাছে তাহার গোপন কথা ধরা পড়িয়া যায়।

ঘণ্টা খানিক জোর করিয়া পড়াইয়া, পূর্ণিমা উঠিয়া পড়িল। শোভাকে বলিল, "এই লেখাগুলো করে কাল আর আমি আসতে পারব না, পরশু এসে দেখব।"

শোভা বলিল, "আচ্ছা, ভালই হল, কাল আবার আমাদের হিমানীদিদের ওখানে নেমন্তন্ন আছে কি না? আচ্ছা, আপনি হিমানীদিকে চেনেন, পূর্ণিমাদি?"

পূর্ণিমা বলিল, "একসময় এক স্কুলে পড়েছিলাম বটে।" শোভা এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, "তিনি আমার বৌদিদি হবেন জানেন? দাদা কিরে আসতে অবশ্যি দেরি আছে।"

পূর্ণিমা জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তাই নাকি? বেশ ত! বেশ বৌ হবে তোমাদের।"

শোভা বলিল, "হ্যাঁ, বেশ দেখতে, আর বেশ সুন্দর গান করে। নাচতেও বেশ ভাল জানে, কিন্তু আমার মা মোটে নাচ পছন্দ করেন না। বলেন, "গেরস্ত ঘরের বৌ আবার নাচবে কি গা? বাইজী ত আর নয়!"

পূর্ণিমা বলিল, "হ্যাঁ, অনেকেই তাই ভাবেন বটে। আচ্ছা, চল্লাম এখন।"

শোভা তাহাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। রণজিতের মা ছোট একটা ঘরে বসিয়া দুইটা তোলা উনুনে ক্ষিপ্রহস্তে রান্না করিতেছেন, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই স্কুলের ও আপিসের যাত্রীদের ভাত দিতে হইবে। গরমে তাঁহার মুখ লাল, গায়ের কাপড় ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দিকে চাহিয়া পূর্ণিমা ভাবিল এই শাশুড়ীর ঘরে না জানি বধূরূপে হিমানীকে কি চমৎকারই মানাইবে।

দ্বিতীয় দিন যখন সে শোভাকে পড়াইতে গেল, তখন শোভার মন উত্তেজনায় এমন ভরপুর যে, পড়ার দিকে তাহাকে ফেরানই যায় না। সে গল্প করিবে, হিমানীদিদের কি চমৎকার বাড়ী, কেমন সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার, আর সব চেয়ে সুন্দর তাঁহার শাড়ী, জামা ও গহনাগুলি। বিবাহ কবে হইবে তাহা অবশ্য ঠিক নাই, কিন্তু হিমানীর মা অল্প অল্প সব গুছাইয়া রাখিতেছেন। হিমানী শোভাকে সব দেখাইয়াছে, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া, দুইটা গান গাহিয়া শুনাইয়াছে, নাচও দেখাইয়াছে। বড়দা হিমানীদিকে কত ছবি আঁকা পোষ্টকার্ড পাঠাইয়াছে, যেখানে আছে সেখানকার সব ছবি।

পূর্ণিমা বলিল, "আধঘণ্টা যে হয়ে গেল শোভা, পড়া হবে কখন? খালি ত গল্পই করছ।"

শোভা আবার মিনিট কয়েক পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার বলিয়া বসিল, "বড়দা শীগ্‌গির ফিরে এসে বিয়েটা করে নেয় ত বেশ হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "কেন এত তাড়া কিসের?" শোভা বলিল, "এই তাহলে আমরা একটু ভাল করে থাকতে পারি আর কি? একটা বড় বাড়ীতে ত উঠে যেতে হবেই, না হলে জায়গাই কুলোবে না, আর হিমানীদি বৌ হয়ে এসে অনেক ভাল ভাল ফার্নিচার, জিনিষপত্র সব আনবে, বাড়ীঘর বেশ সাজানোও হবে। বড়দা আজকাল অনেক মাইনে পাচ্ছেন, চাকর বাকরও রাখা যাবে।"

পূর্ণিমা দেখিল আজ শোভাকে পড়াইবার চেষ্টা বৃথা। বলিল, "শোভা, তোমার আজ পড়বার মতলব নেই তা বুঝতেই পারছি। এই একটা গল্প পড়ে রেখ, আর এই অঙ্ক ক'টা কষে রেখ দুপুরবেলা', আমি পারি ত সন্ধ্যার সময় এসে দেখে যাব, নয়ত কাল এসে দেখব।"

দোতলা হইতে নামিবার পথে সিঁড়ির মুখে রণজিতের মায়ের সঙ্গে দেখা হইল। পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল "বড় শুকনো দেখাচ্ছে আপনাকে, অসুখ বিসুখ করেছে নাকি কিছু?"

তিনি ময়লা শাড়ীর আঁচলে মুখটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমাদের বেঁচে থাকাটাই একটা অসুখ মা, নতুন করে অসুখের দরকার কি? ছেলেটার কোন খবর পাচ্ছিনা, ক'দিন থেকে, কি যে অশান্তির মধ্যে পড়েছি।"

পূর্ণিমা বাড়ী আসিবার পথটা খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতে করিতে আসিল। এমন করিয়া স্বার্থান্ত সলিলে ডুবিয়া মরিয়া লাভ কি? যাহা কোনদিন হইবার নয়, তাহার জন্য নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ

করিয়া হইবে কি? রণজিৎকে না ভুলিতে পারিলে, তাহার পড়াশুনা করা, চাকরি করা, বৃদ্ধ পিতাকে একটু আরাম দেওয়া কিছুই ঘটিয়া উঠিবেনা। কিন্তু ভুলিবার চেষ্টার বদলে প্রাণপণে খোঁচাইয়া হৃদয়ের এই ক্ষতটাকে সে নিরন্তর বাড়াইয়া তুলিতেছে। তিলে তিলে আত্মহত্যা ছাড়া ইহাকে আর কি বলে? কিন্তু এত মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। যে পুরুষ কোনোদিন তাহাকে চায় নাই, কোনোদিন তাহার দিকে তাকাইয়াও দেখে নাই, কেন তাহার জন্য এই আত্মাহুতি?

বাড়ীতে আসিয়া মাকে বলিল "হ্যাঁ মা, দিনাজপুর থেকে সেই যে চাকরিটার কথা শোনা গিয়েছিল সেটার একবার খোঁজ করবে?"

মা বলিলেন, "আবার সে চাকরীর কি হবে? সেখানে যাবার মত হল নাকি এখন? বাবা:, তোমাদের যদি মতির কিছু ঠিক আছে, কেন কলকাতা কি অপরাধটা করল শুনি?"

পূর্ণিমা বলিল, অপরাধ আর কি করবে? শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা মোটে, তাই ভাবছিলাম কলকাতার বাহিরে যদি কিছুদিন থেকে আসি তাহলে হয়ত শরীরটা সারতে পারে।"

তাহার মা বলিলেন, "দেখি হিমুদিকে চিঠি লিখে, এতদিন কি আর খালি আছে? কিন্তু সেখানেও ত সেই উদয়াস্ত খাটুনি, শরীর সারবে কিসে?"

পূর্ণিমা বলিল, "এখানেই বা খাটুনির কমতি কি মা? তিন চারটে ট্যুশনি করায় স্কুলের কাজের চেয়ে কম খাটুনি কিছু হয় না। জায়গাটা বদলালে হয়ত একটু লাভ হলেও হতে পারে।"

তাহার মা অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন, পূর্ণিমা খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে চলিয়া সে যাইতে পারে বটে, কিন্তু কতখানি লাভ তাহাতে হইবে কে জানে? তাহার প্রধান শত্রু ত তাহার নিজের মন, সে ত সঙ্গেই যাইবে? চিরটাদিনই তাহার কি এইভাবে কাটিবে? ভালবাসার প্রাণশক্তি কতখানি, কে জানে? কোনো আশ্রয় না পাইলেও কি তাহা বাঁচিয়া থাকে? প্রাণীজগতে উদ্ভিদজগতে খাদ্য না পাইলে কেহ বাঁচে না, কিন্তু এই যে অতীন্দ্রিয়লোকবিহারী শত্রু তাহার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে; ইহা কিসে পুষ্ট হইতেছে? মরিবার নামও ত করে না? পূর্ণিমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন না থামা পর্য্যন্ত ইহাও বিদায় লইবে না।

শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত শরীরে কখন একসময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সারাদিন খাটিত, রাত্রেও ভাল করিয়া তাহার ঘুম হইত না, শ্রান্তিতে তাহার দেহমন যেন সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, হঠাৎ এক একসময়ে এইভাবে ঘুম আসিয়া তাহাকে শান্তি দিত।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, তাহার ঠিকানা নেই, হঠাৎ অস্ফুট একটা কোলাহলের শব্দে চকিত হইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। খাটের উপর উঠিয়া বসিয়াই দেখিল, বাহিরে বেশ চড়া রৌদ্র, বেলা বেশ হইয়াছে। পাশের ঘরে কাহারা যেন উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। শোভার গলার স্বর না? পূর্ণিমার বুকের ভিতরটা

কেমন যেন করিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, তখনই পাশের দরজা দিয়া শোভা, তাহার ছোট ভাই মিণ্টু ও পূর্ণিমার মা আসিয়া ঢুকিলেন। শোভার মুখ লাল, দুই চোখ ছলছল্ করিতেছে, হাতে খাকি রংএর টেলিগ্রামের খাম।

পূর্ণিমার চোখের সামনে জগৎটা যেন কালো ধোঁওয়ায় ভর্ত্তি হইয়া গেল। কোনমতে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

তাহার মা বলিলেন, "এই টেলিগ্রামখানা পড়ে দেখ ত? শোভার বাবা, ছোড়দা দুজনেই বেরিয়ে গেছে, শোভা ছেলেমানুষ, ভাল করে বুঝতে পারছে না। রণজিতের খবর না পেয়ে ওরা সেখানকার এক ভদ্রলোকের কাছে তার করেছিল, তারই জবাব বুঝি?"

পূর্ণিমা শোভার হাত হইতে টেলিগ্রাম লইয়া নিজের চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। ভাল, ভাল, এ খবর শেষে তাহাকেই পড়িয়া শুনাইতে হইবে? এয়ারোপ্লেন দুর্ঘটনায় রণজিৎ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে, সংবাদদাতা বিশ্বম্ভরবাবুকে অবিলম্বে চলিয়া আসিতে আহ্বান করিয়াছেন।

মিণ্টু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বাড়ীর দিকে দৌড় দিল, শোভাও তাহার পিছন পিছন চলিল কাঁদিতে কাঁদিতে। পূর্ণিমার মা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায় হায়, এ কি হল, হে ভগবান, হে ভগবান! বুড়ো বুড়ীর সামনে দাঁড়াব কি করে? কিন্তু গিয়ে দেখতে হবে ত? মা ত এ খবর শুনে প্রাণ আর রাখবে না। ওমা হাসি, তোর কি হল রে? হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এই খবর শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিস্ মা?"

পূর্ণিমা কেমন যেন অদ্ভুতভাবে মায়ের দিকে তাকাইয়া বলিল, "মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে।"

মায়ের তখন মেয়ের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার সময় ছিল না, না হইলে হয়ত কিছু সন্দেহ হইত। তিনি সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "মাথায় একটু জল দে, আর এসে দরজার খিল্টা দিয়ে যা। আমি যাই দেখি ওদের বাড়ী। কি যে করব তা ত ভেবেও পাচ্ছি না। তাতটা চড়িয়ে গেলাম, দেখিস্ একটু।"

তিনি চলিয়া যাইবার পর, পূর্ণিমা খানিকক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়াই রহিল। হাত পা সব এমন অসাড় লাগিতেছিল যে, হাঁটিতে পারিবে কি না তাহাই তাহার সন্দেহ হইতেছিল। কিন্তু সংসার কঠিন শাসনকর্ত্রী, তাহাকে অবহেলা করিবার উপায় নাই, মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া আছে। কাঁপিতে কাঁপিতেই উঠিয়া তাহাকে দরজা বন্ধ করিতে হইল, রান্নাঘরে গিয়া ভাতের জোগারকও করিতে হইল।

এমন সময় তাহাদের চাকর ভজহরি ফিরিয়া আসিল, সে দোকানে গিয়াছিল কি একটা কিনিতে। পূর্ণিমা বলিল, "একটু ভাতটা দেখ ত হরি, আমি স্নান করে আসি। মা বিশ্বম্ভর বাবুদের বাড়ী গিয়েছেন, তাঁর হয়ত ফিরতে দেরি হবে।"

স্নান করিয়া সে একটু সুস্থ বোধ করিল, হাতে পায়ে যেন বল ফিরিয়া আসিল। ও বাড়ীতে কি হইতেছে গিয়া দেখা দরকার, এই দারুণ দুঃসময়ে যদিই তাহাকে দিয়া কিছু উপকার হয়। শুইবার ঘরে তালা দিয়া ও চাকরকে হুঁসিয়ার থাকিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শোভাদের বাড়ীর সদর দরজা হাঁ করিয়া খোলা। রান্নাঘরে শোভার মা মেঝের উপর পড়িয়া আছেন, পূর্ণিমার মা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় মুখে জল দিতেছেন ও পাখা দিয়া হাওয়া করিতেছেন। এক তলার বড় ঘরে মিণ্টু আর শোভা হতবুদ্ধিভাবে বসিয়া আছে। উঠানে চৌবাচ্চার ধারে ঠিকা ঝিটা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাজে ফাঁকি দিয়া পালাইবে না থাকিবে ইহা লইয়াই তাহার মনে দ্বন্দ্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ণিমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওর জ্ঞান হয় নি মা ?"

রণজিতের মা ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, "আমার জ্ঞান যাবে না মা, তা হলেত শান্তি পেতাম। হে ভগবান, এই তোমার বিচার হল !"

পূর্ণিমা বলিল, "শোভার বাবাকে, আর ছোড়দাকেও খবর দিতে হয়।"

"পাড়ার যদি কারো বাড়ী টেলিফোন্ থাকে," পূর্ণিমার কথার বাধা দিয়া ঠিকা ঝিটা বলিল "উই-রাহাদের বাড়ী ফুন্ আছে গো, আমি ওখানে বাসন মাজি কিনা ?"

শোভার দিকে তাকাইয়া পূর্ণিমা বলিল, "শোভা চল আমার সঙ্গে। আমি ত ওদের বাড়ীর কাউকে চিনি না, তোমার সঙ্গে ওদের বাড়ী থেকে একটি মেয়ে স্কুলে যায় দেখি।"

শোভা বলিল, "হ্যাঁ ওদের রেবা ক্লাশ সেভেন্‌এ পড়ে যে।"

পূর্ণিমা তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া চলিল। রাস্তার ওধারেই রাহাদের বাড়ী, খবর দিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহাদের বেশী দেরি হইল না।

পূর্ণিমার মা ইহাদের রান্না শেষ করা, ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো প্রভৃতি না সারিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এসেছিই যখন, তখন এদের নাওয়ানো খাওয়ানোটা করেই যাই। হাসি, তুই বাড়ী যা মা, আমাদেরও ঘরের কাজ ঢের বাকি।"

পূর্ণিমা বাড়ী ফিরিয়া গেল। সংসারে মানুষের জীবনের শেষ প্রতিক্ষণেই হইতেছে কত শত কে তাহার খোঁজ রাখে ? কিন্তু কাজের শেষ নাই, কর্মচক্র ঘুরিয়াই চলিয়াছে।

তাহার মা ঘণ্টা খানিক পরে ফিরিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের সব নাওয়া-খাওয়া হল রে ?"

পূর্ণিমা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল, ঘরের ভিতরটা আধা অন্ধকার, উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা, আমাদের হয়ে গেছে, তুমি স্নান করে খেয়ে নাও।"

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া তাহার খাটেই আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "টেলিফোন্ পেয়েই বাপ-ভাই সব ছুটে এসেছে। তাই যাচ্ছে আজকেরই বিকেলের ট্রেণে, ছেলের একজন বন্ধুও যাচ্ছে, আনবার মত হলে নিয়েই আসবে।"

পূর্ণিমা কিছু উত্তর দিল না, তাহার মা স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

কলিকাতায় পাড়া-প্রতিবেশীর খবর বড় কেহ একটা রাখে না। পূর্ণিমাদের বাড়ীর সঙ্গে রণজিৎদের বাড়ীর আলাপ থাকিলেও যাওয়া আসা তেমন একটা ছিল না। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত বিপদের আঘাতে দুইটা

পরিবার বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। বিকাল হইতে না হইতেই বাড়ীর কাজ খানিক করিয়া, বাকিটা ভক্তহরির উপর ভার দিয়া পূর্ণিমা ও তাহার মা আবার শোভাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপদ যেন একটা আর একটাকে অনুসরণ করিয়া আসে। বিশ্বম্ভরবাবু গম্ভীর বিষণ্ণমুখে পূর্ণিমাকে বলিলেন, "মা, আমাদের দশাত দেখছ। আবার শোভার মাও শুনেছেন, সেই যে খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, সেটা সাধারণ "ফেটিং" নয়, বোধ হয় একটু "ষ্ট্রোকের" ভাবও ছিল। এখন ত আর নড়াচড়া করতে পারছেন না।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার দেখছেন?" বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, "দেখছেন, এখনও কতটা কি দাঁড়াবে তা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্রাম কিছুদিন দরকার। এখন ওকেই বা দেখে কে, সংসারই বা চালায় কে? রবিনসনকে যদি তারা নিয়ে আসতে পারে, তার সেবা শুশ্রূষাই বা কি ব্যবস্থা হবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "চাকরটা রান্নাবান্না পারেনা?" শোভা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "ও খোট্টাভূত আবার রাঁধবে, চচ্চড়িকে বলে কড়কড়ি, বাংলা তরকারির নামই জানে না ও।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমাদের চাকরটার একটার ভাই দেশ থেকে এসেছে, এখনও আমাদের ওখানেই রয়েছে তাকে ডেকে আনব? লোকটা রান্না জানে।"

বিশ্বম্ভরবাবু বলিলেন, হ্যাঁ মা, নিয়ে এস। নইলে বাজারের খাবার খেয়ে আমিই বা ছেলেপিলে শুদ্ধ ক'দিন থাকব, আর এই সব রুগীটুগিদের পথ্যের জোগাড়ই বা কে করবে?"

পূর্ণিমা বাড়ী ফিরিয়া গিয়া চাকর সংগ্রহ করিয়া আনিল। শোভার মা কথাও ভাল করিয়া বলিতে পারিতেছিলেন না, সুতরাং পূর্ণিমার মা আন্দাজেই খানিকটা ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া তরকারি প্রভৃতি কুটিয়া চাকরকে বুঝাইয়া দিলেন। ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় চোপড় গুছান, বিছানা পাতা প্রভৃতি কাজ শোভাকে লইয়া পূর্ণিমাই সারিয়া ফেলিল। রোগিণীর পরিচর্য্যাও খানিকটা করা হইল।

বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন, "আজকের ব্যবস্থাত করে দিলে মা, কিন্তু ক'দিন এ রকম করে চল্‌বে?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমরা রোজ এসে দেখব। চাকরটাও কাজ শিখে যাবে দুতিন দিন করলেই। শোভাকেও বুঝিয়ে দিলে ভাঁড়ার-টাড়ার দিতে পারবে।".....

বিশ্বম্ভর বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই সুজিৎ ও তাহার বন্ধু রওনা হইয়া গেল।

দুই-তিন দিন এই ভাবে জোড়া তাড়া দিয়া কাটিল। পূর্ণিমাকে পড়াশুনা প্রায় ছাড়িয়াই দিতে হইল। শোভা প্রায় কিছুই পারে না, ঝি-চাকর যথাসাধ্য কাজে ফাঁকি দেয়, রোগিণীর সেবাও ভাল করিয়া হয় না। পূর্ণিমার মায়ের এটা আবার ভাল লাগে না। আত্মীয় নয়, বিশেষ বন্ধুও নয়, প্রতিবেশী মাত্র। বিপদের দিন পিয়া পড়িয়া সামলাইয়া দিয়াছেন, ঐ ঢের হইয়াছে। এখন নিজেদের ব্যবস্থা তাহাদের করা উচিত। পূর্ণিমা কতকাল তাহাদের সংসার ঘাড়ে করিয়া বসিয়া থাকিবে, তাহার নিজের কাজকর্ম পড়াশুনা আছে ত? বিশ্বম্ভর বাবু মানুষটা মেন কেমন, দিয়ে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া

বসিয়া আছেন, নিজের আত্মীয় স্বজনকে একটু ডাকিলেও পারেন? আর অত ঘটা করিয়া যে বড় লোকের ঘরে ছেলের বিবাহ স্থির করিলেন, তা শুধুর ভাবীকুটুম্বিনী বা ভাবী পুত্রবধূ কেহও উঁকি মারিয়াও দেখে না? মেয়েকে সোজাসুজি ওখানে যাইতে বারণ করিয়া দিলেন বিনা তাহাই ভদ্র মহিলা ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েগুলির শুকনো মুখ দেখিয়া বলিতে ইতস্ততঃও করিতে লাগিলেন। পূর্ণিমা মায়ের মনোভাব না বুঝিল এমন নয়, কিন্তু যেন কিছু বুঝিতেছে না, এমন ভাবেই সে প্রাণপণে শোভাদের সংসারের জন্য খাটিয়া চলিল।

সুমিতের টেলিগ্রাম আসিল। রণজিৎকে কলিকাতা লইয়া যাইবার অনুমতি পাওয়া গিয়া তাহারা ঐ দিনই যাত্রা করিতেছে।

শোভা আসিয়া বলিল, "বড়দার ঘর থেকে বইটই সব আমাদের সরিয়ে নিতে হবে কালিদি। ও-গুলো কোথায় রাখি বলুন ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "আগে যেখানে ছিল। আচ্ছা চল, আমি দেখছি।"

পূর্ণিমার মা অপ্রসন্ন মুখে ভ্রুকুটি করিলেন, তবে শোভার সামনে আর কিছু বলিলেন না।

রণজিতের ঘর পূর্ণিমাই পরিষ্কার করিল। বাঙালী সংসারের নিয়ম খালি ঘর পাইলেই বাড়ীর সব আবর্জনা সেখানে আনিয়া জমা করা, এ ঘরখানিও তাই প্রায় ভূতের বাথানের রূপ ধরিয়াছিল। পূর্ণিমা সব জঞ্জাল বাহির করিয়া ঘরখানা ফিনাইল দিয়া ধুইয়া ফেলিল। খাট, বিছানা, একটা টেবল্, গোটা দুই তিন চেয়ার আর কাপড়ের আলনা ছাড়া কিছুই সে ঘরে রাখিল না। পুরানো কাপড় জোগাড় করিয়া দরজা জানালাগুলিও আবৃত করিয়া দিল।

শোভা বলিল, "বড়দা এই রকম সাজিয়ে রাখতেই ভালবাসে। কত বকুত আগে আমাদের, তা মা ত সারাদিন রান্নাই করেন, কে এসব করবে? আর ঝিটা যা দুষ্টু তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবার জো নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "কেন তুমি ত করতে পার।" শোভা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বাবারে, আমার সময় কোথা? যা পড়ার ঠেলা!"

পড়াশুনা মেয়ে একেবারে দিয়া দিগ্‌গজ! পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "পড়া ত আজকাল সবাই করে শোভা, কিন্তু তাই বলে কাজ কি আর কেউ করে না? আমিওত ছোট থেকে স্কুলে পড়েছি, কিন্তু তোমার বয়সে সব কাজ আমি পারতাম, রান্না বান্না সব।"

শোভা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

পরদিন সকাল দশটার মধ্যে রণজিৎকে লইয়া সুমিতদের কলিকাতা পৌঁছিবার কথা। পূর্ণিমার মা আজ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া মেয়ের সঙ্গে প্রতিবেশী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বম্ভর বাবু একাই ষ্টেশনে চলিয়াছেন, আজ আর সঙ্গে কেহ নাই। হিমানীর মা একবার ট্রেণের সময় জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন; নিজে আসেন নাই। রণজিৎকে এম্বুলেন্সে আনা হইবে, পাড়ার ডাক্তার বাবু তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ণিমার মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুগী মানুষ আসছে, দুধটুধ বেশী রাখা হয়েছে?"

শোভা সন্দেহাকুলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হবনি বোধ হয়, ঠিক জানি না।"

পূর্ণিমার মা অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "তবেই হয়েছে। ওরে গৌর, যা ত তুলার কাছ থেকে আধ-সের দুধ নিয়ে আয়, যেটা ও-বেলার জন্যে আলাদা জাল দেওয়া আছে, সেইটা আনবি।"

গৌর দুধ আনিতে চলিয়া গেল। ঠিকা ঝিটি এখন বাসন মাজা ছাড়িয়া গৃহিণীর পরিচর্য্যায় লাগিয়াছিল, সে বলিল, "এ্যাই দেখ, এ কথাটি কেউ খেয়াল করে নাই গো। একজন গিন্নী বান্নী মানুষ ঘরে না থাকলে কি কাজ হয়?

ঘণ্টা বাজে। বাড়ীর ছেলেমেয়ে সকলে বাহিরে দাঁড়াইয়া উদ্গ্রীব হইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। পূর্ণিমার মা রান্নাঘরে গৌরকে উপদেশ দিতেছেন। পূর্ণিমা রণজিতের মাথের পাশে নীরবে বসিয়া আছে।

মিণ্টু বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল "এম্বুলেন্স্ গাড়ী এসে গেছে।"

পূর্ণিমা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ দিয়া তখন জল ঝরিতেছে। কয়দিন আগে যে যৌবনের সৌন্দর্য্যের প্রতীকের মত বীরদর্পে এই গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিল, আজ সে ফিরিয়া আসিল, অর্দ্ধমৃত, যন্ত্রণাকাতর নরদেহ মাত্র।

রণজিৎকে ষ্ট্রেচারে করিয়া নামান হইতেছে। তাহার বাঁ হাত ব্যাণ্ডেজ করা, মাথাটাও প্রায় সবটাই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, খালি ডান দিকের চোখটা খোলা।

ষ্ট্রেচারে করিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে উপরের ঘরে তোলা হইল। বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়ার পর সে প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

তাহার বাবা বলিলেন, "তাঁর blood pressureটা খুব বেড়ে গেছে কি না, তাই ডাক্তার শুইয়ে রেখেছেন।"

রণজিৎ বলিল, "আমাকে তবে কেন এখানে আনলে বাবা? ওখানের হাসপাতালে যেমন করে হোক কেটে যেত।"

শোভা গিন্নীপানা করিয়া বলিল, "আহা আমরা যেন কিছু পারি না। হাসিদি দেখিয়ে দিলে আমি সব পারি, করছিও ত সাত আট দিন হল।"

বিশ্বম্ভর বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, এখন দাদার খাওয়ানোর ব্যবস্থা কর। শক্ত জিনিষ ও ত কিছু খায় না। দুধ, ফলের রস এই সব দাও।"

কর্ম্মিষ্ঠা শোভা বিপন্নমুখে বাহিরে গিয়া পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিদি, দাদাকে কি খেতে দেব?

পূর্ণিমা সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "নীচে চল দেখছি।"

ভোগাড় বিশেষ কিছুরই ছিল না। দুধে বিস্কুট ভিজাইয়া নরম করিয়া ও গেলাসে আলাদা করিয়া খানিকটা

দুধ লইয়া শোভা ও পূর্ণিমা উপরে গেল। ঘরে শুধু কর্ত্তা বসিয়া আছেন, সুজিৎও নীচে নামিয়া গিয়াছে, এখুনেদের ভাড়া চুকান প্রভৃতির কাজে সে ব্যস্ত।

শোভা ভীতভাবে বলিল, "কি রকম করে খাওয়াব?

রণজিৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমাকে দেখিতেছিল, বলিল, "একটা ফিডিং কপ্ আছে, ঐ স্যুটকেসটার মধ্যে, ঐটে করে দে।"

শোভার দ্বারা নূতন ধরণের কাজ ঘটিয়া উঠিল না, বিশ্বম্ভর বাবুও জীবনে সেবা কখনও করেন নাই, স্ত্রীলোকে সেবা করে এবং সমাদর পুরুষ তাহা গ্রহণ করে, এই ছিল তাঁহার ধারণা। শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "নীচ থেকে মাসিমাকে ডেকে আনব?"

মায়ের প্রতি গভীর মুখ স্মরণ করিয়া পূর্ণিমা বলিল, "থাক্ আমিই খাইয়ে দিচ্ছি। তুমি তোয়ালে নিয়ে এস, আর এক গেলাস জল নিয়ে এস।"

রণজিৎকে খাওয়ানো, মুখ মোছান, সব শেষ করিয়া পূর্ণিমা নীচে চলিয়া গেল। রণজিৎ বেশী কথা বলিতে পারে না, তবু অস্পষ্টভাবে বাপকে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি পাড়ার রমাপতি বাবুর মেয়ে না?"

বিশ্বম্ভর বাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, ও না থাকলে আমরা সব মারা যেতাম, এ কদিনে। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব কেউ ত এ ঘোর বিপদে আমাদের দিকে চেয়েও দেখিনি, শুধু ঐ মেয়ে বুক দিয়ে আগলে আছে। ওর মাও খুব করেছেন। মানুষের মন কত উঁচু যে হতে পারে, তা এদের দেখে শিখলাম।

রণজিৎ চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। যেখানে যখন তাহাকে নামান হইতেছে, তখন হঠাৎ হিমানীর মা সেখানে দেখা দেন। আলগোছে ঘুরে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর বাবুকে বলিলেন, "কি পরীক্ষাই যাচ্ছে আপনাদের। সেদিন অমন ভাল ছেলে বিদেশে গেল, আর আজ দশা দেখ!"

রণজিতের বাবা বলিলেন, "প্রাণে বেঁচে উঠুক ভগবানের কৃপায়, আর কিছু চাই না।"

হিমানীর মা বলিলেন, তাত ঠিকই, মা বাপের কাছে ছেলের প্রাণ সবার আগে। আচ্ছা, যাই আমি, মেয়েটাকে আবার একলা রেখে এসেছি কিনা? তার ত ফিট্ হচ্ছে খবর শুনা অবধি।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

রণজিতের বক্ষ ভেদ করিয়া তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল, তাহার পর হইতে সে পাথরের মূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া আছে।"

এ দিকে নীচে পূর্ণিমার মা বলিলেন মেয়েকে, "কি রে, বাড়ী যাবি এখন, না আরো কিছু কাজ বাকী আছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "এখনই কি কাজ আর? চল বাড়ী যাই।" বাড়ীর সকলের, রোগীদেরও আহারের ব্যবস্থা করিয়া এবং শোভা ও সুজিৎকে সব বুঝাইয়া দিয়া পূর্ণিমা মায়ের সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন বেলা আটটা, নটার সময় বাড়ীর কাজ খানিক সারিয়া পূর্ণিমা আবার শোভাদের বাড়ী গিয়া

উপস্থিত হইল। সে থাকিতে পারে না, মায়ের খোঁচা দেওয়া কথা, বাপের বিস্ময় মিশ্রিত ক্রোধ কিছুই তাহাকে আটকায় না। গিয়া দেখিল অবস্থা সুবিধার নয়, রোগী বা রোগিণী কাহারও পরিচর্যা ভালভাবে হইতেছে না, ডাক্তার আসিয়া হকাহকি করিতেছেন, দুই জনকেই কোনো হাসপাতালে পাঠাইবার উপদেশ দিতেছেন। বিশ্বম্ভর বাবু স্ত্রীর ঘরে বিপন্ন মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রীর চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। শোভা সিঁড়িতে বসিয়া আছে, সুজিৎ হরলিক্সের ঘরে প্রচুর ঝনাৎকার সহ কি সব করিতেছে।

পূর্ণিমাকে দেখিয়া শোভা যেন কূল পাইল, বলিল, "আমাকে কমলালেবুর রস আর হরলিক্স্ করতে শিখিয়ে দিন্‌ত।"

পূর্ণিমা তাহাকে লইয়া আবার ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া গেল। সুজিৎ উপর হইতে ডাকিয়া বলিল, "যা হোক্ একটা কিছু তাড়াতাড়ি দিয়ে যা, এত বেলা হল, এখনও একবারও খাওয়ানো হল না।"

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি হরলিক্স্ তৈয়ারি করিয়া শোভার হাতে উপরে পাঠাইয়া দিল। সুজিৎ উপরে আছে সে খাওয়াইয়া দিবে এখন। তাহার পর কমলালেবুর খোসা ছাড়াইয়া রস করিতে বসিল।

বাহিরে একটা গাড়ী থামিবার শব্দ শুনা গেল। পূর্ণিমা উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিল, ছোট একখানা মোটর গাড়ী বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ভিতর হইতে হিমানীর মা কন্যা সহ নামিয়া আসিলেন। পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া নিজের আসনে বসিয়া পড়িল।

হিমানীর মা সিঁড়ির মুখের কাছে আসিয়া উঁচু গলায় বলিলেন, "কই বাড়ীর ওরা সব কোথায়?"

পূর্ণিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "সবাই উপরেই আছেন।" তাহার পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে, সে আসন ছাড়িয়া নড়িতেই পারিল না।

কয়েকটা মিনিট কাটিয়া গেল। তাহার পর একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকারে বাড়ীর নীরবতা যেন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙিয়া গেল। একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দও সেই সঙ্গে শুনা গেল।

পূর্ণিমার হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফাইয়া তাহার গলার কাছে উঠিয়া আসিল। হাতের কাজ ফেলিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া উপরে উঠিয়া গেল, ঠিকা ঝি ও চাকরটাও তাহার পিছন পিছন চলিল।

সিঁড়ির মুখের কাছে, মেঝের উপর পড়িয়া হিমানী বিকৃত মুখে হাত পা ছুঁড়িতেছে, তাহার মা তাহার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতেছেন ও তাহাকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাড়ীর মানুষ সব ক'জন এইখানে আসিয়া জমা হইয়াছে, ছোটদের মুখে অবিমিশ্র ভয়, বড়দের মুখে বিরক্তি ও ক্রোধ। হিমানীর মায়েরও চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা রাগে কি দুঃখে তাহা অবশ্য পূর্ণিমা বুঝিতে পারিল না।

পূর্ণিমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "একখানা পাখা এনে দিতে পার বাছা, কাকেই বা আমি কি বলি এখানে?"

শোভাই মায়ের ঘর হইতে পাখা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। মেয়েকে বাতাস করিতে করিতে

তিনি বলিলেন, "ঘাট হয়েছে আমার, একে এ বাড়ীতে আমি এনেছি। এই রকম যে হবে সেই ভয়ই আমি করেছিলাম, কচি মেয়ে আমার ঐ দৃশ্য কি দেখতে পারে? তা মেয়ের জেদেই আমাকে আসতে হল।"

হিমানী হঠাৎ চোখ খুলিয়া চাহিল, আবার তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মা, শীগগির চল এখান থেকে, কি horrible ব্যাপার! আর দুমিনিট এখানে থাকলে আমি মরে যাব।"

বিশ্বম্ভর বাবু এইক্ষণে কথা বলিলেন, "মেয়েকে নিয়ে যান মিসেস্ পাল। সত্যিই ওকে আনা অন্যায় হয়েছে।"

হিমানীর মা কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন। তাহার পর বাড়ীর কোনো লোককে আর একটি কথাও না বলিয়া ঠিকা ঝিটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ধরত বাছা, মেয়ের ডান দিকটা শক্ত করে, আমি বাঁ দিকটা ধরছি। হ্যাঁ, এইরকম করে চল নীচে, আমি তোমায় বক্‌শিস্ দেব। ভগবান, ভগবান, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না।"

ধরাধরি করিয়া তাঁহারা হিমানীকে লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন। মিনিট দুই পরে তাঁহাদের গাড়ী চলিয়া যাইবার শব্দ শুনা গেল।

শোভা হঠাৎ ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার বাবা ধমক দেওয়ায় আবার তেমনি হঠাৎই থামিয়া গেল। পূর্ণিমা আবার ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া নিজের অসমাপ্ত কাজে লাগিয়া গেল।

ফলের রস করিয়া রণজিতের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল সেখানে রোগী ছাড়া কেহই নাই। ভিতরে ঢুকিয়া রসটা ফিডিং কপে ঢালিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এটা খাইয়ে দেব এখন?"

শুধু অস্ফুট কণ্ঠে রণজিৎ বলিল "দিন।"

পূর্ণিমা তাহাকে খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেই রণজিৎ আবার বলিল, "আমার মত জীবকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করাটা আপনার পাপ বলে মনে হয় না?"

পূর্ণিমা এক মিনিটও দেরি না করিয়া জবাব দিল, "নিশ্চয়ই না।"

রণজিৎ আবার সেই রকম গাঢ়স্বরে বলিল, "কেন নয়? আমি ত' এখন একটা বিভীষিকা মাত্র, একটা আবর্জনার স্তূপ।

পূর্ণিমার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত লজ্জা এই দারুণ বেদনার সম্মুখে ভাসিয়া গেল। রণজিতের মাথায় হাত বুলাইয়া সে বলিল "কেন আপনি এ সব ভাবছেন? আপনি কিছু দিনের মধ্যেই সেরে উঠবেন। পীড়িত মানুষকে কখনও কি কেউ বিভীষিকা বা আবর্জনা ভাবে? যার মধ্যে মানুষের প্রাণ আছে সে ত' ভাবে না।"

রণজিৎ আবার কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধর দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। পূর্ণিমা দেখিল তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিজের আঁচলে তাহার চোখ

মুছাইয়া দিয়া, পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সব জায়গায়ই মানুষ, কিন্তু তাহার যে নির্জ্জন স্থানের বড় দরকার। বুক যে তাহার এইবার ফাটিয়া যাইবে একটু কাঁদিতে না পাইলে।

পূর্ণিমার মা রান্নাঘরে বসিয়া তখন ঝিপ্রহস্তে তরকারি কুটিতেছেন এবং মনে মনে মেয়েকে আজ যাহা শুনাইবেন তাহার রিহার্সাল দিতেছেন। না হয় মেয়ে বড়ই হইয়াছে এবং নিজের রোজগারেই খায় তাই বলিয়া মা হইয়া তিনি এমন অনৈসর্গ সহিতে পারিবেন না। এত আদিখ্যেতা কিসের রে বাপু? আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, কোথাকার কে তাহার ঠিকানা নাই। তাও আবার অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির হইয়া আছে। আর নাই যদি বা থাকিত, তাহাতেই বা কি? ঐ কানা খোঁড়া ছেলের সঙ্গে ত আর কেহ মেয়ের বিবাহ দিতে যাইত না।

স্নানের ঘরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। পূর্ণিমার মা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে রে এ সময় চান করতে ঢুকলি? এখনি উনি যাবেন যে?

ভজহরি বলিল, "দিদিমণি এলেন যেন।"

খানিক পরে পূর্ণিমা বাহির হইয়া আসিল। মুখ চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

মায়ের প্রাণ, মেয়ের মনের কথা বুঝিতে দেরি হইল না তাঁহার। এই অবস্থায় ত আর বকুনি আরম্ভ করা যায় না? বলিলেন "বোস্ মেখি এখানে একটু!" চারুকে বলিলেন, "মাছটা চট্ করে নিয়ে আয়, উনি ত এই এসে ভাত চাইলেন বলে।"

ভজহরি চলিয়া গেল।

মা বলিলেন, "এই রকম করে কি লাভ হবে বল ত বাছা শুনি? বুড়ো হয়েছি, দেখেছি শুনেছি ঢের, বুঝি সবই। কেন মিথ্যে শরীরটা মাটি করছিস, নিজের মন নিজে ভাঙছিস্? তারচেয়ে যা চলে তুই দিনাজপুর, সে কাজ খালি আছে, কাল চিঠি পেয়েছি।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার যাবার জো নেই মা।"

মা বিস্মিত মুখে বলিলেন, কেন, জো থাকবেনা কেন? তোমায় কি ওরা কিনে রেখেছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা জানিনা মা। শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছি যতদিন না রণজিৎ সেরে উঠবে ততদিন আমি প্রাণ থাকতে এখান থেকে যেতে পারব না। তারপর যতদূরে খুসি আমাকে পাঠিয়ে দিও।"

পূর্ণিমার মা হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নীলমণির স্বর্গলাভ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[সাঁওতাল পরগণায় জয়ন্তী নদীর-ধারে শুয়া পাহাড়ের কোলে কোলে, বাতাস যেখানে মহুয়ার মধু-গন্ধে মদির...সেখানে ছিল একজনের জন্মভূমি···কিন্তু সে জানতো না...তার জ্ঞান যখন হয় সে তখন শহরের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা...শৃঙ্খলের মধ্যেই তার জীবন গড়ে ওঠে...সব শৃঙ্খলিত জীবের মত তারও হয়ত ধারণা হয়ে যায়, শৃঙ্খল নিয়েই বুঝি সে জন্মেছে...তার পর একদিন এল বন্যা...ভেসে গেল সব...ভেসে গেল সে...সেই সঙ্গে ভেসে গেল তার শৃঙ্খল...সে জাগলো, যেন নতুন জীবনে, আবার সেই জয়ন্তী নদীর ধারে শুয়া পাহাড়ের কোলে, বাতাস যেখানে মহুয়ার গন্ধে মদির...জীবনের পর সেই কি স্বর্গ? কিন্তু তবু সে-স্বর্গ-বাসের মধ্যে অন্তরে কিসের যেন ব্যথা কাঁটার মত ফোটে? কি সে?

ব্যঙ্গনিপুণ শিল্পী ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বেদনায় ভরে উঠে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন··· এ-প্রশ্ন আর তার উত্তর নীলমণির জীবনেও যেমন সত্য···আপনার আমার জীবনেও তেমনি সত্য···

নীলমণি আর আমাদের মধ্যে যদিও অরণ্যের ব্যবধান কিন্তু কতটুকু এ ব্যবধান?]

'ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্'—নীলমণির বাপ পথ দিয়া ডুগডুগি বাজাইয়া চলিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া আসে, গ্রামের কুকুর, ঘেউ ঘেউ করিয়া সাড়া দেয়—কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না, দূর হইতেই প্রতিবাদ জানায়।

ছেলেদের মধ্যে সাহসীরা আগাইয়া আসিয়া বলে—খেলা দেখাও। নীলমণির বাপ একবার তাহাদের হাতে কিছু আছে কিনা দেখিয়া লইয়া বলে—পয়সা কোথায়? কথাটা ছেলেদের ভালো লাগে না—তাহারা চুপ করিয়া থাকে। নীলমণির বাপ একটু অগ্রসর হইয়া যাইতেই তাহারা ছোট্ট করিয়া একটা ঢিল ছোঁড়ে। নীলমণির বাপ জানিতেও পায় না—কিন্তু নীলমণি মুখ ফিরাইয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ওঠে, মুখ ঘুরাইয়া হাঁ করে, কয়েকটা দাঁত দেখা যায়। ছেলের দল ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায়। কুকুরগুলাকে উৎসাহিত করে—কিন্তু কুকুরগুলা যে ছেলের দলের চেয়ে বেশি সাহসী এমন মনে হয় না, তাহারা ডাকিতে থাকে কিন্তু এগোয় না। ততক্ষণে নীলমণির বাপ অনেক দূরে চলিয়া যায়।

সে অঞ্চলের লোকে নীলমণির বাপের আসল নামটা ভুলিয়া গিয়াছিল—ভালুকটার নাম নীলমণি, তাই ভালুকওয়ালাকে নীলমণির বাপ বলিয়া ডাকিত। নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। কাঁধে তাহার ঝুলি, হাতে ডুগডুগি, পিছনে দড়িতে বাঁধা নীলমণি। সে মাথা নিচু করিয়া দড়ির টানে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলে। কিছুক্ষণ পরে পরেই মাটীতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ঘুঁকিতে থাকে—নীলমণি তখন দড়ি ধরিয়া দাঁড়ায়। ধমক মারিলে সে একবার আচ্ছা করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়—নীলমণির বাপ আবার চলিতে সুরু করে।

এক একদিন খেলা বেশ জমে, অনেক রোজগার হয়। নীলমণির উপরে তার বাপ সেদিন খুব খুশী। তাকে একটা উইয়ের ঢিপির কাছে ছাড়িয়া দেয়। নীলমণি ঢিবি ভাঙিয়া মাটি খুঁড়িয়া উইয়ের বাসা উজাড় করিয়া খায়। পাখা-ওঠা উইগুলা উড়িয়া যায়—নীলমণি বৃথা আস্ফালন করে, নীলমণির বাপ কতক কতক ধরিয়া নীলমণির মুখের কাছে ফেলিয়া দেয়। সে দেখিতে দেখিতে সব খাইয়া ফেলে। কিন্তু সবদিন সমান খেলা জোটে না, গাঁয়ের লোক গরীব, প্রতিদিন খেলা দেখিবে কেমন করিয়া। যেদিন সারা দিন ঘুরিয়া কিছু জোটে না, নীলমণির বাপ নীলমণির উপরে রাগ করে। উইয়ের ঢিবি-র পাশ দিয়া গেলেও তাহার উই খাওয়া হয় না। নীলমণি বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে দড়িতে একটু টান দেয়—নীলমণির বাপ তার চেয়ে জোর টান দিয়া দুইজনে অগ্রসর হইয়া যায়। এই ভালুক আর ভালুকওয়ালা ও অঞ্চলের লোকের অতি পরিচিত।

সাঁওতাল পরগণার জয়ন্তী নদীর ধারে গুরাপাহাড়ী গ্রামে নীলমণির বাপের বাস। পূজার সময় হইতে সারা শীতকাল তাহার রোজগারের মরশুম। কাছেই ছোট একটা সহর। এই সময়টাতে সহরের সুদ্ধ বাড়ীগুলি স্বাস্থ্যান্বেষীর ভীড়ে ভরিয়া যায়। নীলমণিকে লইয়া লোকটা তখন বেশ দুপয়সা রোজগার করে। ওই কয় মাসের রোজগারে তাহার সারাবছর চলিয়া যায়। নীলমণির বাপকে একেবারে অবিবেচক বলা চলে না—যার জন্যে তার এত রোজগার তাকে খাতির করিয়া চলে। বড় বড় শাদা কড়ির মোটা মালা নীলমণির গলায় পরাইয়া দেয়, মালার মাঝখানে ছোট একটা ঘুন্টি দোলাইয়া দিতেও ভোলে না, আর সাজিমাটি দিয়া তাহার লোমগুলি পরিষ্কার করিয়া দুইয়া কাঠের কাঁকই দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়। নিজের বেশভূষাতেও একটু পারিপাট্য করে। মালার পাগড়িটা কাচিয়া নূতন করিয়া বাঁধে, হাত-কাটা কালো কম্বলের উপরে লাল-নীল পাথরের মালা পরিয়া নেয়। নীলমণির বাপ সাজ বদলাইতে বদলাইতে ভাবে—ভেক না হইলে কি ভিখ মেলে!

২

'ও ভালুক-ওয়ালা এদিকে এসো।' প্রাচীরে ঘেরা বড় বাড়ীটা থেকে এক বাবু ডাক দেয়। নীলমণির বাপ গেট দিয়া ঢুকিতে ঢুকিতে ভাবে বাবু এখানে নূতন, আমার নাম জানেন না। বাস্তবিক তাই। কলিকাতা অঞ্চল হইতে পূজার সময়ে যেসব বহুল যে-সব ব্যক্তি এখানে স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য আসে—এ বাবু তাহাদের অন্যতম।

নীলমণির বাপ প্রবেশ করিয়া একটা সেলাম করিয়া দাঁড়ায়।

বাবু তখন—খেলা দেখাও, কত নেবে?

সে হাসিয়া বলে—হুজুরের কাছে আর বেশি কি চাইব, পাঁচ সিকে পয়সা দেবেন।

—পাঁচ সিকে—?

অবশেষে এক টাকায় রফা হইলে নীলমণির বাপ ডুগডুগি বাজাইতে শুরু করে। অমনি মহুয়া গাছের তলাটা ছেলেমেয়ে এবং জনতায় ভরিয়া যায়। তখন তালুকওয়ালা নীলমণির ধড়িতে একটা টান দেয়। নীলমণির চমক ভাঙে।

এতক্ষণ সে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করিয়া অতি পরিচিত একটা গন্ধ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মহুয়া গাছের গন্ধ। তাহার মনের মধ্যে বসন্তকালের কুয়াশার মতো অস্পষ্ট একটা অনুভূতি জমিয়া উঠিতেছিল—মহুয়া গাছ—মহুয়ার ফুল—নীল পাহাড়ের কাছে ঘন অরণ্য—যার তলা দিয়া রেখাঙ্কিত মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো কালো পাথর বাহির হওয়া স্বচ্ছ পারার নদী। কিন্তু এভাব বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। তাহার কানে প্রবেশ করে—নীলমণি বড় বাবুকে সেলাম করো, এই বলিয়া একখানা লাঠি নীলমণির মাথে গুঁতিয়া দেয়। নীলমণি খাড়া হইয়া উঠিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়া মোটা বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া লাঠিখানা মাথায় ঠেকায়। নীলমণি বাবুদের আয়তন বিচার করিয়া বড়বাবু, ছোটবাবু চিনিতে শিখিয়াছে। বড়বাবু খুশী হইয়া একটা সিকি ছুঁড়িয়া দেন, তাহার ইচ্ছা করে সিকিটা কামড়াইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে—কিন্তু তখনই মনে পড়ে তাহা হইলে আর আর উইয়ের ঢিবি খুঁড়িয়া খাওয়ার সুযোগ মিলিবে না।

নীলমণির বাবা আবার বলে—নীলমণি বউ কি করে শ্বশুর বাড়ী যায় দেখাও তো বাবা; মাঈ মা শাড়ী দেবেন।

নীলমণি খাড়া হইয়া উঠিয়া ধীরমন্থরগতিতে চলিতে সুরু করে—পিতৃসুহৃত্যাগ করিয়া যাইতে যেন পা যেন চলিতেছেই না।

নীলমণির বাপ হাঁকে—আচ্ছা, নীলমণি এবারে দেখাও তো মেয়ে কি ক'রে বাপের বাড়ী আসে।

নীলমণি অমনি দ্রুতপায়ে তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে। দর্শকগণ উচ্চৈস্বরে হাসিয়া ওঠে।

হঠাৎ নীলমণি উপুড় হইয়া পড়িয়া যুঁকিতে থাকে। সকলে বলিয়া ওঠে ভালুকের অনুকরণে। ছেলেমেয়েরা সাহস পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বারান্দা হইতে রাণী মা নীলমণির বাপকে বলিয়া পাঠান—ভালুকের গায়ের কয়েকটা লোম চাই—জ্বরের ধন্বন্তরি ঔষধ। পয়সার লোভে তালুকওয়ালা নীলমণির লোম টানিয়া ছিঁড়িয়া পাঠাইয়া দেয়।

কিন্তু নীলমণি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারে না। জ্বর আবার কি? তাহার প্রভুকে মাঝে মাঝে কয়েকদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে, তাহাই কি জ্বর? কিন্তু তাহার হইতে যাইবে কেন? সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া অতীত জীবনের কথা ভাবিতে থাকে। স্বপ্নের কুয়াশার মতো অস্পষ্ট

অথচ সতীর একলার ছবি তাহার চোখের সম্মুখ ভাসিয়া যায়। একদিনের কথা মনে পড়ে, সে তখন ছোট, একটা শিয়ালের বাচ্চার চেয়ে বড় হইবে না, মায়ের পিছনে পিছনে যাইতেছিল, এমন সময়ে একটা শিয়ালে তাহাকে তাড়া করে। সে নিরুপায় হইয়া মাকে আহ্বান করিল, মা কয়েক লাফ আগে ছিল। তারপরে যা ঘটল! মা যে এত ছুটিতে পারে—সে কি স্বপ্নেও জানিত! খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া, দাঁত বাহির করিয়া সে কি তাড়া! তোরা শিয়াল বেগতিক দেখিয়া একটা গাছে উঠিয়া পড়িল। সেই হইল তাহার কাল। নীলমণির মা সোজা গাছে উঠিয়া শিয়ালটাকে ধরিল—দুটা জড়াজড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শিয়ালটার ছিন্ন ভিন্ন দেহখণ্ড ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সে আজ কতদিনের কথা। কোথায় সে বন, মহুয়ার ফুলের নেশায় যাহার সমস্ত বুক কিংশুক বর্ণে রক্তিম? কোথায় সেই পাহাড়, রাত্রে যেখানে শুকনো ঘাস আগুনে জ্বলে—আর দিনে যেখানে শিমুল আর পলাশে লাল? আর তাহার মনে পড়ে শীতের শেষে বনের মধ্যে ঝরা-পাতার উপর দিয়া সে চলিত, মচ্‌মচ্‌ শব্দ হইত, প্রত্যেক পদক্ষেপেই শঙ্কা হইত পিছনে যেন কে আছে! মুখ ফিরাইয়া দেখিত কেহ নাই, নিজের পায়ের শব্দ বুঝিয়া হাসিত। ভালুকের আবার হাসি? আচ্ছা মানুষগুলা এত নির্বোধ কেন? তাহারা ভাবে হাসি কান্নায় তাহাদের ছাড়া আর কাহারো অধিকার নাই। নির্বোধ ভালুকের মনের কথা বুঝিবে কি প্রকারে? আর নির্বোধ নয় তো কি? নতুবা তাহার চলাফেরা দেখিয়া এত আনন্দ পায় কেন? তাহার প্রভুকে এত পয়সা দেয় কেন? দেয় মন্দ নয়, তাহার প্রভু খুশী হয়, প্রভু খুশী হইলে তাহারও আহার জোটে ভাল।...কিন্তু আর নয়। এখনি প্রভু খোঁচা দিবে।

নীলমণির বাপ বলে—ওঠো, বাপ, ওঠো।

নীলমণি গা-ঝাড়া দিয়া ওঠে। সেদিনের মতো খেলা সাঙ্গ করিয়া প্রচুর পয়সা, কাপড় লইয়া নীলমণির বাপ নীলমণিকে চালিয়া লইয়া প্রস্থান করে। ছেলেরা কিছুদূর পর্যন্ত পিছনে পিছনে আসে—কিন্তু পাড়ার কুকুরগুলো কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতে চায় না—ঘেউ, ঘেউ, রবে বিরক্ত করিতে থাকে। প্রভু যদি একবার ছাকিয়া দিত, নীলমণি কুকুরগুলাকে সেই শিয়ালের অবস্থা করিয়া ছাড়িত।

'ডুগ, ডুগ, ডুগ।' ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া অজয়ী নদীর ইটু জল পার হইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়।

৩

অজয়ী নদীর ধারে ওরাপাহাড়ী গ্রামে নীলমণির বাপের বাস ইহা আগেই বলিয়াছি। গ্রামখানি ছোট। সাঁওতাল জাতীয় লোকের বাস। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা গাছের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের ঝাড়ও আছে। গ্রামের এক পাশে নীলমণির বাপের বাড়ী। মাটির দেয়ালে খড়ের ছাউনি। এক সময়ে তাহার গোটা দুই গোরু ছিল, এখন সেই গোয়াল ঘরে নীলমণি থাকে। নীলমণির বাপ নীলমণিকে লইয়া সফরে বাহির হয়, এক সঙ্গে দশ বারো দিন বাড়ী-ছাড়া থাকে—ফলে তাহার বাড়ী-ঘর ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। তাহার আর কেহ নাই।

বাড়ীর নীচেই অগভীর নদী। বালি আর পাথরের একদিকে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের ধারা, কিন্তু হঠাৎ সেদিন বন্যা আসে, কোথা হইতে গেরুয়া জলের অজস্র-নদী ও নদীর কূল ডুবাইয়া দিয়া গ্রামখানিকে লোপ করিয়া দিতে চায়। নীলমণির বাপের বাড়ীর মধ্যে জল ঢুকিয়া পড়ে, নীলমণি মায়ের হাত ধরিয়া চালে গিয়া আশ্রয় লইয়া অবিশ্রান্ত-চিত্তে জলের প্রায়-ঢেউ দেখিতে থাকে। এমনি এক বন্যার মুখে ভাসিতে ভাসিতে সে—এই গ্রাম পাইয়া ঠেকিয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন সে শিশু—আর কিছু তার মনে পড়ে না। তাহার প্রভু তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নিজের বাড়ীতে রাখে। গলায় ও নাকে দড়ি পরাইয়া সে। একটু বড় হইলে তাহাকে নানারকম খেলা শিখাইতে আরম্ভ করে। প্রথম প্রথম সে খুব মার খাইত। এ সব কথা তার বেশ মনে পড়ে। এখন আর মার খাইতে হয় না। সব খেলা শিখিয়া লইয়াছে।

ছুটির দিনে সে বাড়ীর উঠানে বসিয়া থাকে। সম্মুখে নদী। নদীর ওপারে মাঠ—তখন উঁচু হইয়া দিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে—সেখানে নীল রঙের একটা পাহাড়। মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে শাল, খেজুর, বন, দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম—এপার হইতে আকাশের গায়ে প্রলম্বিত চিত্রপটের মতো দেখায়। নীলমণি চুপ করিয়া বসিয়া এই ছবি দেখে আর ওই পাহাড়টাকে ভাবে তাহারি মতো একটা কালো ভালুক—বেশ আকারে কিছু বড়ো। ওটারও কি এমনি প্রভু আছে? নিশ্চয়ই আছে। নতুবা কাহার ভয়ে সে একবারে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে? আর ওই বনটা? ওখানে যাওয়া যায় না? ওখানে নিশ্চয় মহুয়া গাছের আর অন্ত নাই। নীলমণি ভাবে একবার ওখানে যাইতে পারিলে খুব মজা হয়, আর লোকালয়ে ফিরিবে না। মহুয়া গাছের তলে তলে, শাল বনের ছায়ায় ছায়ায়, ঝরা পাতার উপরে মচ-মচানি শব্দ তুলিয়া সে সারাদিন কেবল উইয়ের ঢিবি খুঁড়িয়া বেড়াইবে। আঃ একবার যদি কেবল ছাড়া পাওয়া যায়।

নীলমণির বাপ সেদিন যেন কোথায় গিয়াছে। রাত্রেও ফিরিল না। সারারাত্রি অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িল। ফাল্গুন মাসে এমন বৃষ্টি কখনও হয় না। নীলমণি সমস্ত রাত্রি গোয়ালঘরে বসিয়া বসিয়া ভিজিল। সকাল বেলাতেও বৃষ্টি থামিল না। এমন সময়ে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ উঠিল। বন্যা আসিতেছে। জলের শব্দ আর তার সঙ্গে মানুষের আর্তস্বর—দুইয়ে মিলিয়া সে এক আতঙ্কজনক কোলাহল। গ্রামের লোকেরা সে বাত্রির গোরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র লইয়া উঁচু ডাঙার দিকে ছুটিল। নীলমণির কথা কাহারো মনে পড়িল না। তাহার প্রভু বর্ষা-ছাড়া। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রবল বন্যার মুখে নীলমণি ভাসিয়া চলিল। দুই একবার সাঁতার দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষে সে ছাড়িয়া দিয়া অনিবার্যের স্রোতে ভাসিল—অবশেষে এক সময়ে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া গেল। তারপরে যে কি হইল—নীলমণি আর

৪

নীলমণির জ্ঞান হইলে দেখিল সে এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? একি বাস্তব না তাহারি বহুদিনের কল্পনা? গনবন—শাল, মহুয়া, হরিতকির বনস্পতি। মাটিতে শুকনা পাতার সুপ্রাচ্য আস্তরণ বিছানো। ঝরা করা শাল গাছের কয়েকগুলা সারি সারি দণ্ডায়মান। মহুয়ার গাছে অজস্র পাতা খসিয়া গিয়াছে, যে

গোল, মধুর মহুয়ার ফুল, ঘামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে বনদেবীদের নোংরার হাসে দুলিতেছে। পাশেই ছোট একটুখানি নদী, জলের নীচের মাছগুলার প্র যায়। পায়ে পলাশে সিঁদুরে রাঙা। বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে—উইয়ের ঢিবি গায়ে মাথায় মধুর চাক। প্রথমে প্রথমে তাহার ভয় হইত—প্রভু বুঝি এগুলি অ সে ভয়ও ক্রমে তাহার কাটিয়া গেল—আর আসিলেই বা তাহাকে চিরিয়া কো ছোড়ে তাহার লড়াইয়ে, গলায় মালা সব কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নীলমণির সে বাঁচিয়া না মরিয়া আর কোন পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে?

একদিন ঘুম হইতে পরিচিত গন্ধ পাইয়া জাগিয়া উঠিল—দেখে তাহার চারদিকে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গন্ধ শুঁকিয়া তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহারা কি জীবিত না তাহার মতই মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছে? সে আর কিছু না এবং তাহাদের দলে মিশিয়া চলিতে সুরু করিল।

তাহারা এক বনিতকি বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে অনেকগুলি ে ভালুক মাছি চটকাইয়া কলেকটা মৌচাক ভাঙিয়া ফেলিয়া দিল। তখন সকলে খাইল—নীলমণিও একটা খাইল। তারপরে তাহারা মহুয়া গাছের তলে স্তূপে জমিয়া খাইল। তখন সকলের মাথায় মধুর আর মহুয়ার নেশা চড়িয়াছে। মধ্যে বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া নাচিতে সুরু করিল—পায়ের তলাকার শুকনোপাতা নাচের দিতে লাগিল। নীলমণির এবার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হইল সে মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছে—কোথায়? স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে করিতে এক একবার প্রভুর কথা তাহার মনে মরিয়া এখানে আসিতে তাহাকে একবার তাহার ঐশ্বর্যটা দেখাইয়া দিত। কিন্ত ভুলিয়া যাইত—প্রভু মরিলে তো এখানে আসিতে পারিবে না—সে মানুষের স্বর্গে যাবে স্বর্গ। নিজের ঐশ্বর্য দেখাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার একটু দুঃখ হইত, নাচের আর সকলে বুঝিতে পারিত না, সে কেন এমন অন্যমনস্ক হইয়া যায়। তাহারা তাহ দিত। নীলমণি সচেতন হইয়া উঠিয়া আবার নাচে যোগ দিত। মহুয়া পূর্ণ মধুর নেশায় প্রাণে দুঃখ ডুবিয়া যাইত। তবুও পাতা ঝরার দিন, গাছের পাতা বাতাসে সমস্ত রাত্রি দুঃখকে ডুবাইয়া দিতে এত আয়োজন আবশ্যক। স্বর্গের সুখের পাত্রও কি তবে শূন্য

এক

স্কুলের বাড়ির ধার দিয়ে এই পথটা দিয়ে হেঁটে যেতে ভালো লাগে অনুপমার। সোজা রাস্তা, তার মাঝে কুঁজো পিঠের মতো খানিক রাশি রাশি খোয়া আর সুড়কি উঠেছে; একটা খার্ড ক্লাস লোকাল বাস ঘোড়ার মতো নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে, ধুলো উড়িয়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে, ঝনঝন করে টানা রিক্সা, ঘুরে ঘুরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ছেলেরা, এদিক-ওদিক চায়ের দোকান থেকে ভেসে আসছে এঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ, এক সঙ্গে চারটে মুরগি ডেকে উঠছে। ইট বেরকরা পুরোনো বাড়িগুলো থেকে তার সঙ্গে ফুটফাট চুন সুরকি খসে পড়তে থাকে। বয়স্ক বড়ো বড়ো গোগেটেড টিনের চালা থেকে কা কা করে কাক উড়ে যায়, ছাগল চমকে উঠে পাড়ার নেড়ী কুকুরগুলো চীৎকার জুড়ে দেয় আর্তস্বরে। দুপুর কুয়াশায় পলকাট অন্ধকার।

এটা সহরের পুরোনো অঞ্চল। একদিন ছিল বনিয়াদী, এখন বস্তিগুলো। ঝুড়ি নামা আগাছা পুকুরের নীল জল ভাঁড়ি পানা আর জুলে কচুরিতে ঢাকা। শোল আর চাঁদা মাছ ধরবার জন্যে এখানে এখানে বাঁকারির বঁড়শী পোঁতা। ঘাটে স্তূপাকার বাসন আর কাপড়চোপড়। ঝুলে কালো কিষ্টে ঐকতান।

এখানকার মানুষগুলো কাঁধ ছেঁড়া মোটা লংক্লথের গেঞ্জি পরে—পায়ে রেক্সিনের জুতো—মুখে ছ'বার হাফশোল মারা চটি। এখানকার উকিলদের কালো গাউনে ছাই রঙের তালি। পুরোনো খাকি জিন প্যান্টের পেছনে ইলিসমাছ বেঁধে এরা বাজার করে আনে। স্কুলের বা কলেজের বিশেষ বাস যখন এই মনোহরী সকরুণ অঞ্চলের বুকের ওপরে ধুলো ছড়িয়ে যায়, তখন আনাচ-কানাচ থেকে সিনেমার গানের কলি ভেসে আসে।

এই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকের ছোট গলিতে থাকে মাও। সেদিন এসে ঢুকলাম মুসলমানদের কটা বস্তি। তারপরেই দেখবে ইট এবং খোয়ার [illegible] রাস্তা দিয়ে চকচকে মোটরগুলো যেন পাখীর মতো উড়ে চলেছে। সিনেমা হাউসে রঙীন [illegible] চৌরঙ্গীর অঞ্চলে নতুন বাড়ি—কোলাপসিবল্ গেট—মেয়ার কাটিং সেলুন—বৈদ্যুতিন দোকান—কাচের গায়ে সোনালী জলে ডিমটোর ছ' আঁকা ফেস্তোরাঁ। মধ্যবয়স শহরের বয়ঃক্রম।

নতুন শহরের রূপ দেখতে হলে আরো কয়েক পা এগোতে হবে তোমাকে। বড় [illegible] পেরিয়ে আরো কয়েক পা বাঁ দিকে—ভাঙ্গার কারেক্টরী, ট্রেজারি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—আর-এম-এস-এর ঘাট। এইখানে চোখ তুলে তাকাও—চোখ যেন জুড়িয়ে যাবে। টানা পরিচ্ছন্ন রাস্তা, তারই পাশটা দিয়ে নদীর জল চলে আসছে জোয়ারের আবেগে। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো জেগে আছে সবুজ তৃণভূমি। বিচিত্রভাবে ছোট বড় ষ্টীমার আর মোটরলঞ্চ নদীর আধাআধি জুড়ে রয়েছে—গম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে কখনো আসছে ডেসপ্যাচ, কখনো যাত্রীবাহী। বড় বড় বস্তা তুলছে চেইনের সাহায্যে [illegible] ওপাশে লাল ইটের একটা টিনশেডের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতগুলো অক্ষর এখান থেকে পড়া যাচ্ছে: বরফ কল। তার পাশে ছোট ঘর, কেরোসিন, বালতি-ওপর কাঠের সাঁকো আর আকাশে উড়ন্ত কাকের কাঁক।

আর এপারে রাঙা কাঁকরের পথটা এগিয়ে গেছে—যেন মাঠটা শেষ করেছে দূরের কোনো একটা ছোরণে। পীচ রাউয়ের সারি নদীর বাতাসে সারাক্ষণ সাঁই সাঁই করে শব্দ করছে। ছোট বড় গাছের বাগানে বাংলো ধরণের মনোরম বাড়িগুলো—পরস্পরের সঙ্গে অভিজাত-সুলভ দূরত্ব বজায় রেখে মহিমান্বিত হয়ে আছে। সীজন-ফ্লাওয়ারে বসেছে রঙের মেলা—যেন আকাশের ইন্দ্রধনু ফুল হয়ে ফুটেছে বাগানে। তার এপারে ওখানে টেনিস-কোর্টের—মাটির বেড়া ঘিরে উঠেছে আইভিলতা। মাঠের ওপরে এখানে ঘাসফড়িং, কুকুর আর সাপ, ডগ বিকালের ঈষদুষ্ণ আলোয় খেলা করে বেড়ায়। কাঁকড়াচুল চুলের মতো শিশুদের এয়াবুলেটারে ঠেলে নিয়ে যায় লাল শাড়ী পরা আয়ার দল।

ওখানে প্রেজিডেন্ট কুভো—গবর্ণর আর সুপ্রিমকোর্টের পাঞ্জাবী, হেক্সাগন ফ্রেমের সোনার চশমার ঝলক। মোটরে চড়ে যারা অফিসে যাতায়াত করে, তাদের দামী সুটের কীজ নির্ভুল এবং উদ্ধত। পেছনে যেখানে অফিসের বাস্ত বয়ে নিয়ে যায় তকমা-পরা আর্দালীরা। সাইকেলে যারা চলে, তারা গোল্ডেন চাকাটীম থেকে বি-এস-এর নীচে নামে না। কখনো কখনো এক একটা জে-এস-ও, টি-এস-কের কট কট শব্দের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

এই রাস্তায় থাকেন অনুপমার বাবা প্রসন্ন সরকার এবং থাকেন অনুপমার মা শিবানী সরকার, ছোট বড় মিসি বাবা, খোকা বাবা। আর থাকে সোফার, দারোয়ান, আয়া, আর্দালী এবং কুকুর।

দামী অফিসার, অতএব অভিজাত। কোর্টে যাওয়ার সময় প্রসন্নবাবু মোটরে করে অনুপমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দেন। ফেরার পথে হেঁটেই আসে অনুপমা—স্নিগ্ধ বিকালে মর্মরিত ঝাউবীথির তলা দিয়ে হেঁটে আসতে তার ভালো লাগে। নদীর বাতাসে আসে ভিজে সোঁদামাটির সুগন্ধ। সুগঠিত বক্ষদেহ থেকে সিল্কের শাড়ীটা উড়ে যেতে চায়, স্লোচসঞ্চারী অনুপমার ছন্দিত পদক্ষেপে রাঙা কাঁকরগুলো যেন আনন্দে গান গেয়ে ওঠে।

এই পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তারা ব্যর্থ এবং লুব্ধ কামনার বুক থেকে সিনেমার সুর ছুঁড়ে যায় না। সহজভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, পাঁচটা আংটি পরা গোলাপফুলের রঙে রাঙানো আঙুলগুলো নমস্কার করে নমস্কার জানায়। হাসে পরিমিত এবং পরিচ্ছন্ন হাসি।

হাতের বইগুলো বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে অনুপমা বলে, আজ সন্ধ্যেয় আসছেন তো? শঙ্কর-দার গান হবে।

হেক্সাগন সোনার ফ্রেমের ভেতরে চোখ জ্বলে ওঠে।

—আপনিও বঞ্চিত করবেন না মিসস্।

—বলেন কি, শঙ্করদার সামনে আমার গান!

—আপনি নিজেকে চেনেন না মিস্ সরকার। ফুল কি বুঝতে পারে নিজের রূপ আর গন্ধকে। সেটা কিন্তু ধরে রাখবেন।

অনুপমা হাসে। ছোট একটি টোল আবর্তিত হয়ে ওঠে গালের একপাশে। তর্কবিতর্কে রিকাকে আগে ঝিকিয়ে ওঠে।

—তা হলে নিজেকে রসিক বলে মনে করেন আপনি?

—নিশ্চয়! কেন্দ্রাগত চশমার আড়ালে জেনি জলতে থাকে [illegible] পরদের পাঞ্জাবী থেকে একটা ঝাঁঝালো সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে: ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমার নেই। অন্যকে প্রাপ্য মূল্য যদি দিতে পারি, তা হলে নিজের বেলায় অতি নিম্নের কার্পণ্য করব কেন?

অনুপমা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে। জোয়ারের জলে জেগেছে কল-তরঙ্গ—উচু রাস্তার পাশে পাশে কৌতুকভরে আনন্দিত আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। মাউথনের জলপনানির বিরাম নেই। অনুপমার হাসি যেন সেই জল আর বাতাসের সঙ্গে জলতরঙ্গের সুর মিলিয়ে দেয়।

—চমৎকার আত্মপ্রত্যয় আপনার। তা হলে আসছেন তো? মাইও, ঠিক সন্ধ্যে সাতটা—কাঁটায় কাঁটায়।

—আমি এদিক থেকে পাঁচটায়—বাঙালি টাইমিং নিয়ে আমি চলি না। পরদের পাঞ্জাবীর নীচে সোনার ঘড়ী হাতঘড়ি আত্মপ্রকাশ করে।

—আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

প্রেপ-কিড্ জুতোর শব্দ আর গোলাপের ধোঁয়া এগিয়ে যায় সামনে। আর ছন্দোবদ্ধ ললিত পায়ে নির্জন ফাউবীথি দিয়ে এগিয়ে চলে অনুপমা—সিল্কের শাড়ীটা তনুদেহ ছাড়িয়ে যেন বাতাসে উড়তে চায়।

• • •

এ-পাড়া আর ও-পাড়া। এখানে পুরোনো শহরে—চিন্তাধারা কল্পনার প্রাত্যহিক জীবনের বৃদ্ধাতি-বৃদ্ধতার পাঁচশো বছর—হয়তো তারও পেছনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে আছে। উনবিংশ শতকের যে রাষ্ট্রনেতার কর্মপ্রেরণায় এই জেলা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র এবং এই শহর পূর্ব বাংলার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ছিল—পুরোনো শহরের তিনিই আধুনিকতম ব্যক্তি। আজীবন তিনি ভিক্ষুকুমার ছিলেন, তিনি নিজে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং দেশবরেণ্য নেতা হয়েও খালি পায়ে পথ চলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় চূড়ান্ত শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগে ছিল তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। তাই এ-পাড়ার অধিকাংশ প্রবীণেরা টা কে আজো কুলির রক্ত মনে করেন, সিল্কের জামা অশ্লীল বোধ করেন, জীবনে কখনো তাঁরা সিনেমা দেখেন না। ধর্মরক্ষণ-সংঘের গীতা ব্যাখ্যার বৈঠকেও তাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

ও-পাড়ায় নতুন জীবন—অফিসার এবং অভিজাতদের জেলার বড় সাহেবদের স্যানারিজম্‌গুলোকে

আজ ওদের আপ্রাণ চেষ্টা। ফ্রাঙ্ক সেরো, গ্যারী কুপার, ফ্রেড ম্যাকমারেকে এরা স্বপ্নে দেখে; মুভীন ডিট্রিক, নর্মা শিয়ারার, গ্রেটা গার্বোর বৈনন্দিন জীবনে ঈর্ষা করে। কেউ জর্জ র‍্যাফ্‌ট হতে চায়—সেই জীন হার্লো। পলিটিক্স এরা ভাবেনা—কলকাতার অনুকরণে এদের জীবন একাধারে কসমোপলিটান হোয়াইটম্যান। স্বল্প বিস্তৃত গণ্ডীতে বলেই কখনো কখনো তা অভ্রান্ত।

ইট্ এণ্ড্ আর ওয়েষ্ট্ এণ্ড্। এ ওর দ্বিপাক্ষিক। এ-পাড়ার উকিল ও-পাড়ার হাকিমের সামনে 'ইয়োর অনার' বলে সওয়াল সুরু করে এ পাড়ার কৈরাণীরা না এলে ও-পাড়ার সাহেবের সেরেস্তা অচল। এ-পাড়ায় ধর্ম সভায় কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্যের আসরে ও-পাড়ার নাস্তিক এবং সাহিত্যবুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই সভাপতি। মিউচুয়্যাল কো-অপারেশন।

কিন্তু এই দু-পাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একদল দাঁড়িয়ে আছে। তারা সহরের মধ্যবিত্তদের প্রতিনিধি। চিংকুমার নেতার অগ্নিগর্ভ উদ্বোধনের আওতায় তারা বেড়ে উঠেছে, শনি-সত্যনারায়ণের প্রসাদ খেয়েছে—বারোয়ারী দুর্গাপূজার আরতির নাচ নেচেছে—তরুণ ব্যায়াম সমিতি গড়ে শরীরে এবং মনে রেনেসাঁসের আভাসকে রূপ দিবার প্রয়াস পেয়েছে। পুরানো সহরের নিষ্ঠা এবং গভীর দেশাত্মবোধকে [illegible] রূপায় রূপায় রূপ করে বাঁপিয়ে পড়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনে। কলেজে ভর্তি হয়ে পড়েছে বার্নার্ড শ, ওয়াইল্ড, রাশেল, হাক্সলি, এলিয়ট, কার্ল মার্কস আর ফ্রিড্রিশ এঙ্গেল্‌স। এরা হচ্ছে এই দু পাড়ার মধ্যবর্তী সংযোজক—ইট্-এণ্ড আর ওয়েষ্ট্-এণ্ডের সেতু।

এদেরই একজন অরুণ মজুমদার সন্ধ্যার অন্ধকারে বাউ বীথির তলা দিয়ে হেঁটে আসছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার—কিন্তু অন্ধকার নেই। তখন সমস্ত পথটা গলায় বিদ্যুৎ প্রদীপের মালা দুলিয়েছে। জোয়ারে উচ্ছলিত নদীর জলে সে আলোর ছায়া পড়েছে—দূরে দূরে নোঙর করা ছোট বড় ষ্টীমার গুলোর নানা রঙের আলোতে যেন দীপালির উৎসব। তেমনি শন্ শন্ করে বাউবনের অশ্রান্ত কান্না আর পথের পাশের গলগুলো থেকে হাসনুহানা আর রজনীগন্ধার সুরভি।

বিকালের নির্জনতা এখন আর নেই। সন্ধ্যার পরে অন্ততঃ দুটি ঘণ্টা সমস্ত অভিজাত রাস্তাটার আভিজাত্য-টুকু ক্ষুণ্ণ হতে পড়ে। শহরের লোক দিনান্তে এখানকার খোলা বাতাস আর উন্মুক্ত দিগন্তে প্রাণের নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। অভিজাতেরা ইথল ঘরে রেডিয়ো খুলে দিয়ে বি-বি-সি ধরবার চেষ্টা করে কিংবা ষ্টিয়ারিং পেলে তখন এই পথ দিয়ে চলা চলতি করে সমষ্টি জীবনের সর্বস্বতা। নদীর ধারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বিড়ি টানে, গান গায়, কড় মড় করে চীনে বাদাম চিবোয়। কলেজের ছাত্ররা পলিটিক্স এবং ছাত্রীদের আলোচনা করে। আধুনিকা হওয়ার কৃত্রিম চেষ্টায় গৃহস্থ বধূ মেয়েরা ফোঁপাপড়া পায়ে এবং বিকৃত মুখে নতুন জুতো জোড়া পায়ে টেনে টেনে পথ চলে। রাত একটু বেড়ে উঠলে বাউগাছের মিশিমিশি ছায়াতে এক আধটু প্রণয়-কাব্য যে চোখে পড়ে না, এমনও নয়। আর সকলের মাঝখানে ঘুরে বেড়ায় একটি মাত্র—ঘুরে বেড়ায় বিকালের সন্ধানে গণিকা। পাড়ার ধারা বনিয়াদী, ঐ সময়ে এ পথটাকে তারা পরিবর্জন করেই চলে সাধারণতঃ।

নানা স্তরের লোকের ভীড় ঠেলে অরুণ মজুমদার হেঁটে আসছিল। একটা ল্যাম্প পোষ্টের কাছাকাছি আসতে বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট করে চেনা গেল তাকে। বছর কুড়িক বয়স হবে—কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। মাথার কড়া কড়া চুলগুলো উদ্ধত ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে আছে। একসারসাইজ্ করা কঠিন শরীর—শ্যামবর্ণ মুখের ওপর সংক্ষিপ্ত গোঁফের আভাস। গালের একপাশে একটা কাটা দাগ—শিং করতে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল এক টুকরো ইটের ওপরে। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, পড়ে রাজনীতির বই—পড়ে ইকনমিক্সের অনার্স। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির কন্‌ভেনার এবং মফঃস্বল শহরের জাগ্রত তারুণ্য।

একটা সাইকেলে করে উল্‌টো দিক থেকে আসছিল প্রিয়তোষ। মুখে বিড়ি। অরুণকে দেখে ব্রেক কষে নেমে পড়ল।

—তারপর বড়লোকের বাড়িতে যাচ্ছ নাকি?

—হুঁ।

পাশ দিয়ে একজন অধ্যাপক চলে যাচ্ছেন—প্রিয়তোষ বিড়িটা হাতের তেলোয় লুকিয়ে ফেলল। বললে, জে, সি, বি যাচ্ছে। ব্যাটা স্কাউণ্ড্রেল।

অরুণ হাসল।

—খালি খালি গাল দিচ্ছিস যে ভদ্রলোককে?

—জানিস্‌না ব্যাটার চোখ চড়কির মত ঘোরে। ছিট্টির ছানে প্রশ্নি একদম বন্ধ—প্রিয়তোষ বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলে।

—কিন্তু পড়ায় ভালো।

—কচু পড়ায়। গড় গড় করে কেটেন্‌বী মুখস্থ বলে যায় খালি।

—তাই নাকি?—অরুণ আবার হাসল: কী করে জানলি? কেটেন্‌বীর পাতা কোনদিন উল্‌টে তো দেখিস্‌নি।

—থাক থাক যেতে দে। প্রিয়তোষ বিড়িটাকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে: ওসব এখন ভালো লাগে না। তোর খবর বল।

—আমার আবার কী খবর?

মাইরি আর কি।—প্রিয়তোষ একটা অশ্লীল ভঙ্গী করলে মুখের: খবর তো তোমারই চাঁদ। কদ্দূরে এগোলে? কী বলে মিস্ সরকার?

—কিছুই বলে না।

কিছুই না; একেবারে কিছুই না? নিতান্তই শুষ্কং কাষ্ঠং?

—রস নির্ঝরিত হওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না। পয়সা নিয়ে পড়াই—টিউশনি করি, রসজ্ঞ হতে গেলে অর্থচন্দ্র দিবে।

—তুই একটা মরাল কাওয়ার্ড। অমন শাঁসাল বড়লোকের মেয়ে, জোটাতে পারলে বিলেত যেতে পারতিস। আমি যদি হতাম, তা হলে অ্যাদ্দিন—হুঁ:।

একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী করলে প্রিয়তোষ। পকেট হাতড়ে বিড়ি বার করলে একটা। অন্তর্নিহিত তেজস্বিতার প্রেরণায় এত জোরে দেশলাই ঠুকলে যে-হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল জলন্ত কাঠিটা।

—শা-লা আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে প্রিয়তোষ বিড়িতে মুখাগ্নি করলে, খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লে, রণক্ষেত্রের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের মতো। চোয়াল ভাঙা গাল আর আদ্ধির পাঞ্জাবীর নীচে তিরিশ ইঞ্চি বুকের আভাসটা এত স্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলে মনে করা যেত প্রিয়তোষ যে কোনো একটা অসাধ্য-সাধন করে ফেলতে পারে।

—নো রিস্ক নো গেইন। যা থাকে কপালে, একটা প্রোপোজ করে ফেল। cheer up lucky dog—

প্রিয়তোষ সাইকেলে উঠে পড়ল—প্যাডলটাকে একবার উল্টো ঘুরিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। যেন বিরাট একটা কোনো রিস্ক নিতে ছুটল।

অরুণ অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করতে লাগল প্রিয়তোষকে। এর চাইতে কোনো পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না—অধিকাংশ ছেলের কাছ থেকেই নয়। অক্ষম লোভ ওদের আত্মপ্রকাশ করে অবিমিশ্র ইতরতার মধ্যে, কলেজের দেওয়ালে কদর্য প্রেম নিবেদনে। মেয়েদের গাড়ির পেছনে পেছনে নির্লজ্জের সাইকেল চালিয়ে দুবেলা কলেজ এবং কলেজ ফেরত যাতায়াত করে। কি সার্থকতা অর্জন যে করে ভগবানই বলতে পারেন, কিন্তু একনিষ্ঠ সাধনায় বিরাম ঘটতে দেখা যায় না কখনো।

বেশ তো প্রেমেই যদি পড়ে থাকে তা হলে সামনে দাঁড়িয়ে কেন সেটাকে বীরের মতো বলতে পারেনা? কিন্তু সেটা তো দূরের কথা, আড়ালে থেকে যে মেয়ের সম্বন্ধে উৎসাহিত মন্তব্য করে, সেই বিশেষ মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়ালেই যেন নার্ভাস্ ব্রেক ডাউন ঘটে যায় ছেলেদের। একবার নয়, বার বার সেটা লক্ষ্য করছে অরুণ। অতিশয় স্মার্ট বন্ধুদের পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়েই তার প্রমাণ পেয়েছে সে। বার করেক তো-তো করেছে, মুখে-কপালে ঘাম জমে উঠেছে, এলোমেলোভাবে কতকগুলো কথা বলে যেন পালিয়ে বেঁচেছে সামনে থেকে।

কেন এমন হয়? 'কেমাস্' যদি না হয় তো নোটোরিয়াস কেন হতে পারে না? সবদিক থেকে যেন নেউলে হয়ে গেছে ছেলেরা। না শরীরে, না মনে। আগে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা মারামারি করত, কিন্তু এখন তব্য হয়ে গেছে—ভদ্র হয়ে অতি মাত্রায়। জামার আস্তিন গুটাতে ভয় পায়—পাছে ভাঁজ নষ্ট হয়ে যায়।

পাশ দিয়ে কলরব করতে করতে গেল আর একদল। বেশ সোল্লাস কলরব। ইষ্ট বেঙ্গল কী একটা খেলায় জিতেছে—এই মাত্র খবর এলো রেডিয়োতে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাবুদ্ধির আর একটা রূপ। যেমন কুশ্রী তেমনি অর্থহীন মনে হয়।

কাউয়ের বনে বাজছে অশ্রান্ত শনশনানি। জোয়ারের জলে তেমনি আনন্দিত কলোচ্ছ্বাস। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে।

ভোঁ করে একটা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি দিগন্তে প্রসারিত হয়ে গেল। একটা আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে—সন্ধ্যার এক্সপ্রেস ট্রেন। সকালে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেবে। সার্চলাইটের এক ঝলক আলো মর্মরিত কাউবনের উপর বিদ্যুতের মতো চমকে গেল।

বাতাসে হাসনুহেনার গন্ধ। লোহার ফটকের দুপাশে উঠেছে আইভিলতার ঝাড়। উজ্জ্বল আলোয় লনের সীজন ফ্লাওয়ারগুলো নানা রঙের মণিখণ্ডের মতো জ্বলছে। সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে ঢালা কাঁকরের পথ—ভাগ্যবতী কোনো সীমন্তিনীর সীমন্ত রেখার মতো।

সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চললো অরুণ। বারান্দার লোহার চেনে বাঁধা ম্যাস্টিফ্ কুকুর দুটো হারস্বরে চীৎকার করে উঠল বারকয়েক। তারপর চেনা মানুষের ছায়া দেখেই চুপ করে গেল।

বাইরে ড্রয়িং রুমে মুখর হয়ে উঠেছে রেডিয়ো, আর তার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি আর কলহাস্য। আর অনুপমার পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে। অরুণ মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাববার চেষ্টা করে যতখানি মানসিক আত্মস্থতা থাকলে এই কলরব কোলাহলের মাঝখানেও পড়ার বইতে মন বসাতে পারে অনুপমা।

দুই

দেওয়ালে নকল ম্যাডোনার মাথার চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর একদিকের দেওয়ালে একখানা বড় ল্যাণ্ডস্কেপ—তুষিনধবল গিরিশৃঙ্গের নীচে মাথা তুলেছে পাইনের সারি। কিন্তু ম্যাডোনা এখানে যেমন বেমানান, আল্পসের উপত্যকার পাইনেরা সমারোহও এখানে তেমনি একটা পরিহাসের মতো অশোভন।

নীচে অনুপমার পড়বার টেবিল। স্বস্তিকের ভঙ্গীতে মানুষের হাতের মতো একটা ল্যাম্প ষ্ট্যাণ্ড্ টেবিলটাকে আলোকজ্জ্বল করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট একটা শ্বেত-পাথরের মূর্তি টেবিলের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে—বিশ্বার তীর্থে প্রতিহারী আছেন বাণীর বরপুত্র।

অনুপমা লিখছিল। অরুণের অভ্যস্ত পায়ের শব্দে মাথা না তুলেই বললে, আসুন। উল্টোদিকের চেয়ারে ঠিক মুখোমুখি বসল অরুণ। অনুপমা মাথা তুলল না, তেমনি লিখেই যেতে লাগল।

—কী লিখছ?

—বলছি মাষ্টার মশাই, এই এক মিনিট।

অরুণ বসে রইল চুপ করে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে—ল্যাণ্ডস্কেপের ছবিটার ওপর দিয়ে দ্রুত গতিশীল ছায়া আবর্তিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। আল্পসের পাহাড়ে পাইন বন যেন শীতল হয়ে উঠেছে। ম্যাডোনার কোলে তরুণ যীশুখ্রীষ্ট—পীড়িত আর্ত মানুষের প্রতি রূপ—অপমানিতের মুক্তি দেবতা।

কিন্তু ম্যাডোনার রূপোর ফ্রেমটা আলোয় চিকচিক করছে—চোখে ধাঁধা লাগে। দরিদ্রের দেবতা

যাঁরা পড়েছেন ঐশ্বর্যের আবেষ্টনীর মধ্যে। ধনীদের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট? অন্যমনস্ক অরুণ অকারণেই কথাটা মনের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে লাগল; ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু—

চমক ভেঙে গেল।

—মাষ্টার মশাই।

—কী বলছিলে?

একটু অপ্রতিভের মতো তাকালো অনুপমা। আয়ত চোখের কোণে কোণে লজ্জার জড়তা দেখা দিয়েছে। কলমের ক্যাপটা খুঁটতে খুঁটতে বললে, এই লেখাটা একটু দেখে দিন না?—কবিতা লিখেছ?—অরুণ মৃদু হাসল: জানো তো পোয়েটিক সেন্স্ আমার নেই।

—না, না কবিতা নয়। মানপত্র।

—মানপত্র' কী উদ্দেশ্যে?

অনুপমার দৃষ্টি সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। মাষ্টার মশাইয়ের চিন্তাধারার যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে—।

—কিন্তু এ মুহূর্তে পিছিয়ে গেলে চলবে না, কালকের সভাতে এই মানপত্র ওকেই পড়তে হবে, হেড্ মিষ্ট্রেসের এই নির্দেশ।

—ডিভিসনাল কমিশনার কাল ইস্কুল দেখতে আসবেন, তাই—

—ওঃ।

নিরুৎসাহ গলায় জবাব দিলে অরুণ, তারপর কাগজটা কাছে টেনে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পড়তে লাগল। সংক্ষেপে বললে, বেশ হয়েছে।

হঠাৎ একটা বিদ্রোহে ভরে গেল অনুপমার মন। অরুণ প্রাইভেট টিউটার—অর্থের বিনিময়ে পড়াতে আসে তাকে। বেশি কথা বলে না, নীরবে কাজ করে যায়। তবুও মাঝে মাঝে অনুপমা ভাবে তার সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অনুকম্পা পোষণ করে অরুণ।

সে অনুকম্পা তাদের প্রাচুর্যের প্রতি—ঐশ্বর্যের প্রতি। দারিদ্র্যের একটা আভিজাত্যে যেন আত্মসম্পূর্ণ হয়ে আছে—সে সৌভাগ্যে যারা বঞ্চিত, তাদের প্রতি তার সহানুভূতির সীমা নেই।

হিংস্রভাবে একবার ঠোঁট কামড়ালো অনুপমা।

—আজকে আর পড়বোনা মাষ্টার মশাই। তা ছাড়া কালও আপনি আসবেন না—আমাদের একটা টী-পার্টি আছে মিষ্টার সেনের ওখানে।

—বেশ তো। অরুণ মৃদুরেখায় হাসল: আমিও তোমার কাছে ছুটি চাচ্ছিলাম। কালকে জালিয়ান-ওয়ালা ডে—এই দুটো দিন আমাকেও একটু ব্যস্ত থাকতে হবে।

মুহূর্তে একটা ইঙ্গিতময় নীরবতায় সমস্ত ঘরটা গেল আচ্ছন্ন হয়ে। অরুণের কথাটা একটা নিষ্ঠুর

আঘাতের মতো এসে পড়ল অনুপমার মুখের ওপরে। ইচ্ছে করেই কি এই আঘাতটা করেছে অরুণ, অত স্পষ্ট করে টেনে টেনে উচ্চারণ করেছে জালিয়ান-ওয়ালা ডে! মিষ্টার সেনের টি-পার্টি, রেডিয়ো-আর্টিষ্ট শঙ্কর দাস গান, রূপার ট্রেতে সোনালি চা—পেষ্ট্রি, প্যাটি, পাম কেক। আর জালিয়ানওয়ালা। স্বাধীনতার অগ্নিযজ্ঞের নিরপরাধ প্রাণের আহুতি। পঞ্চনদী—বিধৌত জনপদে সিন্ধু—শতদ্রু-বিপাশার জলকল্লোলকে ডুবিয়ে দিয়ে ও'ডায়ারের মেসিনগান গর্জে উঠেছে। শৃঙ্খলিত ক্রন্দনকে পরিহাস করছে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রের অট্টহাসি।

বাইরে বিস্তীর্ণ বীথিপথ থেকে মানুষের কোলাহল শুনা যাচ্ছে। বাঁশীর সুর ভেসে আসছে তেমনি ভাবেই দূরযাত্রী স্টীমারের গম্ভীর আহ্বান। সে আহ্বান শুধু এখান থেকে নয়—আরো দূর থেকে' পাতাবের অনুর্বর মরুসদৃশ ভূমিখণ্ড থেকে। যেখানে গুলী খেয়ে রক্তাক্ত মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বিচ্ছিন্ন রক্ত পদ্মের মতো—যেখানে যূপবদ্ধ পশুর মতো নগ্ন নারীদেহের ওপরে একটার পরে একটা চাবুকের আঘাত এসে পড়ছে।

অনুপমার মনের ভেতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল। কী প্রয়োজন ছিল এমন ভাবে এই শান্ত সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দেবার, কি অধিকার ছিল অরুণের? শঙ্কর দাস গানের যে স্বপ্ন মনটাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল—একটা নিষ্ঠুর আর অতর্কিত আঘাত দিয়ে অরুণ তাকে ছিন্ন আর বিষণ্ণ করে দিয়েছে।

—কিছু যদি মনে না করেন—ঘরের স্তব্ধতাটাকে অরুণ হঠাৎ টুকরো টুকরো করে দিলে: একটা কথা বলতেই চাই।

—বলুন।

—জালিয়ানওয়ালা ডে নিশ্চয় জানেন।

বিদ্রোহে অনুপমার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। নিবিষ্ট চিত্তে একটা কাচের পেপার-ওয়েটকে পরীক্ষা করতে করতে মৃদুগলায় জবাব দিলে, জানি।

—আমরা কত অসহায়, কসাইখানার পশুর মতো কেমন করে নির্বিবাদে শানানো ছুরির নীচে প্রাণ দিতে পারি, সেদিন তার প্রমাণ দিয়েছি। তার ধারা আজো শেষ হয়নি—আজো আমরা তারই জের টেনে চলেছি।

অরুণ যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। কথাগুলো আঘাত করতে লাগল অনুপমার কানে। এর প্রতিবাদ করা উচিত, স্পষ্টাক্ষরে, তীব্র ভাষায় বলে দেওয়া উচিত—এ জন্য অরুণকে এখানে ডেকে আনা হয়নি। কিন্তু অনুপমা কথা বলল না, ইন্দ্রধনু-রঙা পেপার ওয়েটটার দিকে চোখ রেখে তেমনি নীরবে শুনে যেতে লাগল।

ড্রয়িংরুমে রেডিয়োতে রবীন্দ্র সংগীত বেজে উঠল। 'ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর'। রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির ওপরে যেন জীবনের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলো কিসের! তাঁর গানের এই অপূর্ব্ব যাদুময় ধ্বনি ওরফে, না জালিয়ানওয়ালা স্মরণ করে! সেই যেদিন সমস্ত দেশের বাণীমূর্তি হয়ে—বেদনার প্রতীক হয়ে অপমানিত সম্মানের মধুপুষ্প তিনি ধূলোতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন!

অরুণ হঠাৎ সহজ এবং অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে অনুপমার মুখের দিকে তাকালো। বললে, সত্যি কথা, আজকে জিত হয়েছে বঙ্কন বসীর। টী-পার্টি না থাকলে কালকে তোমাকে মিটিঙে যেতে বলতাম। এতক্ষণে কথা কইল অনুপমা।

—কিন্তু বাবা শুনলে কী বলবেন জানেন তো?

অরুণ প্রশান্তভাবে হাসল: জানি। আমার টিউশনিটা যাবে। কিন্তু সেটা বড় ক্ষতি নয়। তার চাইতেও বড় ক্ষতি হবে— যদি তোমরা আজো নেমে না আস। আজ তোমরা যেখানে আছো আমাদের হয়ত সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়নি। কিন্তু সকলেরই দিন একদিন আসবে, বলির খড়্গ সেদিন কাউকে বাদ দেবে না অনুপমা।

মনের মধ্যে যে বিদ্রোহের বেগ ঘনিয়ে এসেছিল সেটা সরে গিয়ে সঞ্চারিত হতে লাগল একটা অপরিসীম বিস্ময়। কী ভেবেছে অরুণ, কিসের জোরে এতখানি সাহস সঞ্চয় করেছে সে? এ বাড়ির আবহাওয়ায় এই বটী কথার অপরাধেই চরম দণ্ডের বিধান—প্রসন্নবাবুর কাণে একবার গেলে কালই অরুণের মুখের সামনে লোহার ফটকটা বন্ধ হয়ে যাবে। রাগ ভুলে গিয়ে অনুপমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

অরুণ বললে, কিন্তু সে যাক। তুমি তো বড়লোক। কিছু চাঁদা দাওনা আমাদের।

অনুপমা তেমনি বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল। আজকে আশ্চর্য লাগছে অরুণকে—মনে হচ্ছে অন্য কেউ, মনে হচ্ছে কোনো নতুন লোক। শুধু গ্রামার নয়, শুধু পড়ার বই, প্রতিদিনের রুটিনে বাঁধা প্রাইভেট টিউটারের কর্তব্য পালনই নয়। অরুণ আজকে এগিয়ে এসেছে অসঙ্কুচিতভাবে, একটা অবাঞ্ছিত অন্তরঙ্গতা করছে, করছে অনধিকার চর্চা। কিন্তু তবু অনুপমার খারাপ লাগল না।

—সত্যি, কিছু চাঁদা দিলে বড় উপকার হয়। পার্টির অবস্থা খারাপ, তোমরা বড়লোকেরা কৃপা না করলে কার মুখের দিকে তাকাই বলো।

চিরদিনের নীরব মানুষটা অপ্রত্যাশিত ভাবে মুখর হয়ে উঠেছে আজকে। রেডিয়োতে তেমনি বেজে চলেছে: "কঠিন মাটির বাঁধা হল ঘুচ, দিকে দিকে হল দীর্ণ, নব অঙ্কুর জয় পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ।" হাসনুহানার গন্ধের মদিরতা—যৌবনের মর্মর। কালকে আলিয়ানওয়ালা দিবস—পরাধীন জাতির রক্তস্নানের স্মরণ-তিথি।

—সত্যিই চাচ্ছেন চাঁদা!

অরুণ হঠাৎ হেসে উঠল প্রবলভাবে। চমকে গেল অনুপমা, পেপার ওয়েটটা হাত থেকে আছড়ে পড়ল নীচের কার্পেটটার ওপরে। রেডিয়োর গানটা অবধি যেন ধমকে বন্ধ হয়ে গেল।

—বাঃ, চাঁদা কেউ মিথ্যে করে চায় নাকি!

—আচ্ছা বসুন একটু।

ঘরের মধ্যে উঠে গেল অনুপমা, বেরিয়ে এল একটা দশ টাকার নোট নিয়ে : বললে, নিন।

অরুণ বললে, সবটাই চাঁদা দিচ্ছ নাকি।

—কেন, নিতে আপত্তি আছে?

—বলো কি, আপত্তি! কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আশীর্বাদ করছি পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাও এবারে—অরুণ উঠে দাঁড়ালো : তা হলে চললাম আমরা। কাল তুমি ছুটি নিচ্ছ তো?

অনুপমা উঠে দাঁড়ালো : আমি ছুটি না নিলেও আপনি ছুটি নিতেনই মনে হচ্ছে।

—তা বটে।—অরুণ প্রসন্নমুখে হাসল, কয়েক পা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর কী ভেবে পেছন ফিরে বললে, কিন্তু কাল তুমি মিটিংএ গেলে সত্যি খুশি হতাম।

—বাবাকে খুশি করা আমার আগে দরকার—সেটা ভুলবেন না।

হঠাৎ যেন মোহ ভেঙে গেল অরুণের। মনে পড়ে গেল অনেক খানি বেশি এগিয়ে পড়েছে সে, এতটা করবার তার অধিকার ছিল না। অরুণ থেমে দাঁড়ালো—দশ টাকার নোটটা যেন হাতের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। শেষ কথাটায় অনুপমা মৃদু একটা আঘাত দিয়েছে তাকে, আঘাত দিয়েছে অভিজাত-সুলভ স্বাভাবিক অবজ্ঞার। এসব কথা বলবার কী প্রয়োজন ছিল অনুপমাকে? এর মূলে কি প্রিয়তোষের অনুপ্রেরণা আছে, একটা সিভালরি করবার—এক ধরণে প্রোপোজ করবার?

অনুপমা ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে—বারান্দার তরল অন্ধকারে অরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। চেনে বাঁধা মাস্টিফ্ কুকুর দুটো সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ্য করছে তাকে—অনুপমার আদরের কুকুর। নোটটাকে পকেটে পুরে অরুণ দ্রুতপদে হাঁটতে সুরু করে দিলে—আইভি-লতায় ঘেরা লোহার গেটটা পার হয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

ড্রয়িং-রুমে রেডিয়োর কাকলি থেমে গেছে—কী একটা উদ্দাম আলোচনায় যেন ঝড় বইতে সুরু করেছে ওখানে। শিবানী দেবী হেসে উঠলেন—তার নীচে চাপা পড়ে গেল নীতীশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু নীতীশের উত্তেজনায় ভাঁটা পড়েনি—তেম্‌নি টেবিল চাপড়ে সে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। সব কিছু সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার দায়িত্ব এবং অধিকার নিয়েই যেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে সে।

কিন্তু অনুপমা ঘরে ঢুকতেই আলোচনার ছেদ পড়ে গেল। নীতীশ বললে, আসুন। বেল্লাগন সোনার ফ্রেমের অন্তরালে চোখ দুটো কথা কয়ে উঠছে তার।

একটা সেটির ওপরে ক্লান্ত ভাবে নিজেকে এলিয়ে দিলে অনুপমা।

বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন প্রসন্নবাবু। ডান পায়ের হাঁটুটার ওপরে একটা মাফলার জড়ানো। বিকৃত মুখে বললেন, অরুণ চলে গেল নাকি? আটটা তো বাজে নি এখনো!

—আমিই বিদায় করে দিলাম। ভালো লাগছে না পড়তে।

নীতীশ ওজন করা হাসি হাসল। বললে, বেশি পড়া ভালো নয় মিস্ সরকার, ওরিজিন্যালিটি নষ্ট হয়।

—ধন্যবাদ।

শিবানীর মেদবহুল পরিষ্কীত গাল দুটো চরিতার্থ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল: অহু আজকাল বেশ কবিতা লিখছে নীতীশ। সেদিন বিশ্ববন্ধুতে ওর 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' বলে যে কবিতাটা ছাপা হয়েছে দেখনি তুমি?

—কই, না তো?—বিস্মিত অভিমানে নীতীশ বললে, এ আপনার অত্যন্ত অন্যায় মিস্ সরকার। স্রষ্টার কাজ শুধু সৃষ্টি করাই নয়—অন্যকেও সে আনন্দের অংশ দেওয়া, একি আপনি জানেন না?

অনুপমার ক্লান্তি লাগছিল। নীতীশ বড় বেশি সাজিয়ে কথা বলে, বড় বেশি পরিমাণে ভালো কথা গুছিয়ে রাখে প্রতিমুহূর্তে প্রয়োগ করবার জন্যে। কেন আর একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না নীতীশ? হঠাৎ মনে হল: বাইরে নদীর ধারে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ কলরব করছে, নীৎকার করে যা খুসি গান গাচ্ছে, তাদের মতো করে নীতীশ যা হোক একটা অশোভন কিছু চেঁচিয়ে উঠলেই যেন তার চেতনার ওপর থেকে ভার নেমে যেত।

—কী করতে বলেন?

—বলি, কবিতাটা পড়ে শোনাতে। কেমন সুন্দর সন্ধ্যাটি, কাব্য-চর্চার এর চাইতে ভালো অবকাশ আর কী আছে বলুন?

—কাব্য-চর্চা?—অনুপমা তীক্ষ্ণভাবে হাসল: কিন্তু এতক্ষণ যা চর্চা করছিলেন সে অফিস-কাব্যের সঙ্গে এর সুর নিশ্চয় মিলবে না। ডার্ক ভেভিল্ আর স্যাটান সাহেবের নাম এ কবিতায় খুঁজে পাবেন না কোথাও।

আক্রমণটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। আহত নীতীশ কিছুক্ষণ নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়ে অনুপমা, কিন্তু এর মধ্যেই রসনা এমন খরধার হয়ে উঠেছে কী করে এবং এই আক্রমণের হেতু কী? এতদিন নীতীশ ছেলেমানুষ মনে করত অনুপমাকে—কথা বলত খানিকটা কৌতুক আর খানিকটা বাৎসল্য বহন করে। একটা চমক খেয়ে মনে হল অনুপমা আজকে বড় হয়ে উঠেছে—এই মুহূর্তে একটা স্বতন্ত্র সত্তা জেগে উঠেছে তার। বালিকা থেকে তরুণী। তীক্ষ্ণভাষিণী এবং তীব্রহাসিনী আধুনিকা।

নীতীশ বোকার মতো হেসে উঠল: আপনার সেন্স্ অফ হিউমার কিন্তু চমৎকার। ডার্ক-ভেভিল আর স্যাটান—অপূর্ব্ব কয়েন্ করেছেন নাম দুটো।

প্রসন্নবাবু বাতগ্রস্ত পা দুটোর পরিচর্যা করছিলেন এবং হাঁটুটা টিপে টিপে পরীক্ষা করছিলেন ব্যথাটা কতখানি চেপে উঠেছে ওপর দিকে। নীতীশের কথায় যেন ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর। খানিকটা নির্বোধ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি: ডার্ক-ভেভিল আর স্যাটান! ইউনিক—ইউনিক।

অসীম বিরক্তিতে চুপ করে রইল অনুপমা। আর বিরক্তির পাত্রটাকে পূর্ণ করে দিয়ে কোথা থেকে শিবানী একটা মাসিক পত্র সংগ্রহ করে আনলেন। ধপাস্ করে নীতীশের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, পড়ো।

বাতের ব্যথা ভুলে গেলেন প্রসন্নবাবু। উৎসাহিত গলায় বললেন, পড়ো, পড়ো। বেড়ে হয়েছে কবিতাটা। আমি তো ওসব বিশেষ কিছু বুঝি-টুঝি না, কিন্তু সত্যি বলতে কি, অনুর কবিতা পড়ে আমারই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

—তাই নাকি? নীতীশ অনুপ্রাণিত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করলে একটা, নিজের অপ্রতিভ অবস্থিটাকে যেন চাপা দেওয়ার জন্যেই এক সঙ্গে খস্ খস্ করে অনেকগুলো পাতা উল্টে গেল। আরবের আর্কিমিডিস যেমন ভাবে ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি গলায় বললে, এই যে—পেয়েছি।

চূড়ান্ত অস্বস্তিতে অনুপমার মনটা ভরে উঠেছে। কালকে জালিয়ানওয়ালা ডে—অরুণের এই একটা কথাতেই এতদিনের সমস্ত সংস্কার আর চিন্তাধারার যেন দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। প্রতিদিন যাকে মনে হত স্বাভাবিক—মনে হত এ ওর সহজপ্রাপ্য, ওর জীবনে অবশ্যম্ভাবী একটা কুৎসিত ফাঁকামীর মতো অনুপমাকে তা পীড়িত করে তুলতে লাগল।

উঠে যাওয়ার প্রেরণা বোধ করেও অনুপমা উঠতে পারল না। দেখাই যাক, নীতীশ কী বলে তার কবিতা সম্বন্ধে। নীতীশের যত দোষই থাক, কবিতা সম্বন্ধে তার একটা রসগ্রাহী মন আছে একথা মানতেই হবে। অরুণের মতো এদিক থেকে সে শুধু নীরস নেসফিল্ডই নয়। নতুন সাহিত্যিকের স্বাভাবিক দুর্বলতা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল অনুপমা।

কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে নীতীশ বললে, পড়বেন আপনি?

—আপনি পড়ুন।

ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে নীতীশ। কবিতার প্রতি মৌখিক যত উৎসাহই থাক, আপাতত: প্রসন্ন বাবুর বাতের ব্যথাটার দিকেই মনোযোগ বেশি, বিকৃত মুখে প্রাণপণে হাঁটুটাকে টিপে চলেছেন তিনি। শিবানী আস্বাভাবিক ভাবে হাঁ করে আছেন—মেঘগ্রস্ত চোখ দুটো আত্মপ্রসাদে মিট্ মিট করছে। কাতলা মাছ যখন টোপ গেলে তখন তার মুখ চোখের ভঙ্গীটা কি শিবানীর মতোই হয় নাকি? যেন কবিতা শুদ্ধ নীতীশকে তিনি সাগ্রহে টপ করে গিলে ফেলবেন। আর অনুপমা কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছে, বড় গোলাপ ফুলটাকে লক্ষ্য করছে না নিজের পায়ের জুতোটাকেই, সেটা ঠিক বুঝা গেল না।

নীতীশ বললে, তা হলে পড়া যাক।

সবলের হয়ে শিবানী এক সঙ্গেই তিনটে গলায় যেন সাড়া দিলেন: পড়ো। চোখের দৃষ্টিটা আরো উৎফুল্ল, মুখটা আরো খানিক বিস্ফারিত। প্রকাণ্ড কাতলা মাছটা টোপ গিলল বলে।

যেমন করে শুদ্ধ এবং শান্তচিত্তে লোকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, তেমনি একটা উদাত্ত ভঙ্গীতে কবিতাটা পড়তে সুরু করলে। নীতীশের গলা সুরেলা, আবৃত্তিও সে চমৎকার করতে পারে, এ কথাটাও অনুপমাকে মানতে হল।

কাজলী নদীর তীরে তীরে দোলে সিক্ত বেতসবন
তরা-বাদরের বয়ে যায় নদী জল,
এপার ওপার বন্দী হয়েছে ধূসর মলিন ছায়ে
জল-তরঙ্গ বেজে ওঠে ছলোছল।

সুদূর বলাকা দেহুর শূন্যে মেলেছে ধবল পাখা।
বিরহী কবির মন্দাক্রান্তা স্বপন-ছন্দ মাখা;
প্রাচীমূলে যেথা শেষ ফলীমন্তী কাঁদিছে যক্ষপ্রিয়া
সন্দেশবাহী চলিয়াছে মেঘ দল—

বাঃ, চমৎকার অ্যাটমসফিয়ার ফুটিয়েছেন তো! মেঘদূতের জগৎটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর কী অপূর্ব শব্দ আর ছন্দজ্ঞান আপনার—ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবেন আপনি!

সলজ্জ দীনতায় মাথা নীচু করে রইল অনুপমা। আর শিবানীর মুখভঙ্গী ক্রমশ অবর্ণনীয় হয়ে উঠতে লাগল—এমনকি বাতের ব্যথাটা অবধি ভুলে গেলেন প্রসন্ন বাবু।

নীতীশ পড়ে চলল:

দূর দিগন্তে হারায়েছে আজ বহিছ পথখানি
যাত্রা পথিক চলেছে সঙ্গীহীন,
হেথায় কাটিছে পথিক-বধূর বিরস প্রহরগুলি
নিরালোক ঘন ব্যথিত দীর্ঘ দিন।
উৎসবহারা সন্ধ্যা ঘনায় প্রান্তর সীমা পারে
কাজলী নদীর কল্লোল-গীতি বাজিতেছে বারে বারে,
স্বপ্ন নেমেছে বেণু-কদম্ব-কেতকীর বনে বনে
কেতস-কুঞ্জ আঁধারে হয়েছে লীন।

কবিতাটা চমৎকার পড়েছে নীতীশ। সমস্ত ঘরটা যেন বিহ্বল আর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে—এমনকি শিবানীর মুখ—বিকৃতিটাও আর অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছেনা। নিজের কবিতাটা যে এত সুন্দর, তার সুর যে এমন করে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, এতখা অনুপমাও কোনদিন কল্পনা করেনি।

মনের ওপর থেকে জানিয়ানওয়ালার মেঘ কেটে গেছে—সরে গেছে একটা দুঃস্বপ্নের মুক্তটক। পাঞ্জাবের মাটিতে যদি অনেক মানুষের রক্ত ঝরে গিয়েই থাকে, তাতে ক্ষতি কী অনুপমার। পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে চলেছে, অনেক অবিচার, অনেক অন্যায়। কী প্রতিকারের ক্ষমতা আছে তার। এই মুহূর্ত সত্য—বাইরের কাউবীথির সঙ্গীত সত্য—এই ছোট কাব্যচর্চার আসরটিও সত্য। এই ভালো—ভুলে যাও পৃথিবীর কোলাহলকে, কলরবকে, ছোট বড় সংঘাতকে।

নীতীশের মুখের দিকে প্রশ্নের ইঙ্গিত দৃষ্টিতে তাকালো অনুপমা। আর রাগ রইলো না—অসহ্য একটা ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল কোথাও। হেমন্তাগন ফ্রেমের আড়ালে একটা বিচিত্র ইঙ্গিত—আনন্দিত রোমাঞ্চে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল অনুপমার।

তিন

এদিকে ইই, এণ্ড্।

ইলেকট্রিকের আলোগুলো এখানে ঘুরে ঘুরে—বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো। শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকারের মাঝে মাঝে যেন ছেদ ফেলেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়িখানা আর বস্তুতির গন্ধ ভেসে বেড়ায়—মানুষের ছায়া দেখে চীৎকার করে নেড়ী কুকুর। খোয়া-ওঠা পথে পায়ে হোঁচট লাগে। কাঠ-বিড়ালে খাওয়া একটা নারকেল ঝুপ করে খসে পড়ে টেলিগ্রাফের তারের ওপর—ছন্দোহীন শ্রীহীন প্রায়-নিঃশব্দ রাতের ওপর দিয়ে যেন ছড়িয়ে যায় একটা বিরাট তারঘন্ত্রে আকস্মিক মীড়ের ঝঙ্কার।

টিনের চালা আর কাঠের বেড়া দেওয়া একটা পুরোনো বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল অরুণ। বাঁ দিকের ঘরের দরজায় মৃদু একটা আঘাত দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

পুরোনো টেবিল আর আধভাঙা শেল্‌ফে রাশি রাশি বই। অনুপমার বইগুলোর মতো নতুন নয়, ঝকঝকেও নয়। বহু ব্যবহারের চিহ্ন তাদের সর্বাঙ্গে—কোনো কোনটার মলাট খবরের কাগজের মলাট পরানো। একটা টেবিল ল্যাম্প মৃদু আলো বিকীর্ণ করছে তার মাঝখানে। আর ঠিক সামনেই আত্মত্যাগী বীর যতীন দাসের বড় একখানা ছবি—বাংলার ম্যাকসুইনি।

ঘরের মাঝখানে একখানা ছোট খাট—ময়লা সতরঞ্চি পাতা। ঘরের মালিক বেলা ছোট খাটো মানুষ—এর চাইতে বড় খাট তার দরকার হয় না। তা ছাড়া মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা বোধও বেলার কম। একরকম করে দিন কাটিয়ে গেলেই তার চলে।

খাটের ওপরে বেলা আর প্রমীলা—একরাশ পোষ্টার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। লাল নীল কালিতে তুলি ডুবিয়ে তারা লিখে যাচ্ছে: পাঞ্জাবের রক্তস্নানে আত্মত্যাগী সহীদদের স্মরণ করুন।

অরুণের পায়ের শব্দে দুজনেই মুখ তুলে তাকালো। গায়ের কাপড়টা তুলে নিয়ে বেলা উঠে বসল, হাই তুললে।

অরুণ বললে, কতদূর হল?

লাল কালি দিয়ে রক্তমঞ্চ কথাটার ওপরে তুলি বুলোতে বুলোতে প্রমীলা বললে, প্রায় শেষ।

প্রায় শেষ?—বেলা ভ্রূকুটী করলে: শেষ মানে? এখনো স্তূপাকারে যা পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছ? —ও হয়ে যাবে।

হুঁ, সারারাত বসে বসে লিখলে নিশ্চয় হয়ে যাবে। তা হলে তুমিই লেখো আমি আর পারব না। আঙুল গুলো টনটন করছে আমার।

অরুণ হাসল: গৃহবিবাদ হচ্ছে সর্বনাশের মূল। সারারাত বসে বসে এভাবে যদি ঝগড়া করতে পারো তা হলে বছর পাঁচেকের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবে ভরসা হচ্ছে।

বেলা বললে, অরুণদা, গালাগালিটা নিশ্চয় আমাকেই দিলে?

—না দুজনকেই।

—উঁহুঁ, ওটা গৌরবে বহুবচন।

—তাতাতর থাক। কাজটা শেষ করে ফেল তো লক্ষ্মীটি।

প্রমীলা বললে, বেলা কেবলি ফাঁকি দিচ্ছে অরুণদা। ষোলখানার ভেতরে মোটে পাঁচ খানা লিখেছে আর সেই থেকে হাই তুলছে।

—এই প্রমীলা ছি, মিথ্যে কথা বোলোনা। পাঁচখানা নয়, সাড়ে চারখানা। বাকী আর্ধেকটা তুমি লিখেছিলে।

—দেখেছ প্রমীলা, বেলা তোমাকে কী রকম ভালোবাসে। আধখানা পোষ্টারের জন্যে প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকেও তোমাকে বঞ্চিত করতে রাজী নয়।

প্রমীলা হাসল: হুঁ, ভালো ভালো কথা ও খুব বলতে পারে। কিন্তু ভালো একটু লিখে দিলে ঢের বেশি কাজ হত।

অরুণ বললে, আমি তা হলে উঠে পড়ি। বসে থাকলে তো তোমাদের ঝগড়াই চলতে থাকবে। কাল সকাল সাতটার মধ্যে পোষ্টারগুলো শেষ করা চাই—সুজিত এসে নিয়ে যাবে।

বেলা লিখতে লিখতে হঠাৎ মুখ তুলল। মৃদু কৌতুকের হাসি ঝিকিয়ে উঠল চোখের কোণায়: বাঃ, যাবে মানে? রাত নটা বাজে, খেয়াল আছে? প্রমীলাদিকে আধ মাইল রাস্তা এগিয়ে দেবে কে শুনি?

—আমি না এলে কে এগিয়ে দিত?

—তুমি যে আসবেই প্রমীলাদির ইনটুইসন সেটা বলে দিয়েছিল। নইলে এত রাত পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতে পারতাম নাকি?

প্রমীলার মুখের ওপরে রক্তোচ্ছ্বাস বয়ে গেল, কালো মেয়েটির কালো চোখের দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ আর মধুর হয়ে উঠল মুহূর্তে: থাক, তোকে আর ইয়ার্কী দিতে হবে না।

প্রমীলা আবার চোখ নামিয়ে নিল পোষ্টারের ওপরে; তুলির মাথাটা মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল। বুকের মধ্যে দুলছে রক্তের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। অকারণে সমস্ত শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। নিজের দুর্বলতাটা নিজের কাছে আর গোপন নেই—বেলাও সেটা ধরে ফেলছে। কিন্তু কী লাভ এতে? যা কখনো

জীবনে রূপ পাবে না, যা কখনো সত্য হয়ে উঠবে না—কি সাধনা তার ব্যর্থ-তপস্যা করে? ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ কখনো হবে না—তার মরজা থেকে ব্যর্থ আর অপমানিত বসন্ত বারে বারেই ম্লান মুখে ফিরে যাবে।

কিন্তু অরুণ কিছু লক্ষ্য করলে না। সংক্ষেপে বললে, থাক, আমি বসছি।

শেল্ফ থেকে একখানা মোটা রাজনীতির বই টেনে নিলে অরুণ। কিন্তু কয়েকটা পাতা উল্টে যাওয়ার পরেই সমস্ত চেতনাটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দৃষ্টির সামনে অকারণেই ভেসে উঠেছে অনুপমার মুখখানা। নিখুঁত সুন্দরী—স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। মার্জিত, পরিচ্ছন্ন—বুদ্ধিতে বিকশিত। ঐশ্বর্য আর কাঁচা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকলেও অনুপমাকে মন্দ লাগে না, ওর সান্নিধ্যটা মাঝে মাঝে উপভোগ্য বলে মনে হয়।

বহুদিন রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পারে নারকেল বীথির কালো পটভূমির ওপারে সীমাহীন আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল মণিমালার মতো জ্বলে, তখন মনে পড়ে অনুপমাকে। একটা নিবিড় সহানুভূতি—একটা বেদনার সূক্ষ্ম সূচীমুখ বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে খচ খচ করে। খানিকটা আগুনের মতো অনুপমা—খানিকটা রঙ্গী বিদ্যুৎশিখার মতো। অরুণ ভাবে: কেন ও নিজেকে চিনতে পারে না, কেন বিকীর্ণ করে দিতে পারে না বহুর মধ্যে, তরঙ্গিত জীবনধারার বিচিত্র বিকাশের মধ্যে?

কখনো কখনো পড়াতে পড়াতে বাইরে হয়তো নেমেছে বর্ষা-সন্ধ্যার ঘন বর্ষণ। মর্মরিত ঝাউবীথি হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে—হয়তো তাদের চেতনার চেতনায় সাড়া দিয়েছে আদিম অরণ্যের আহ্বান। নির্জীব শাখা-প্রশাখায় হয়তো প্রসারিত হয়ে গেছে সেই সমস্ত বহু-বিস্তৃত দিনের স্মৃতি: যেদিন দিক-দিগন্তে শুধু ছিল উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর আর টেরাইয়ের বিস্তৃত বন-ভূমি। পাথরকাটা তোরার জলে হঠাৎ বান নেমেছে, অট্টহাসির মতো আছড়ে পড়ছে, রাশি রাশি জল—পাথরের চাঙাড় ডিঙিয়ে যাচ্ছে তার আঘাতে আঘাতে। আর ওপরে নীচে—সম্মুখে পেছনে—সারি—সারি—ছেদহীন ছেদীতে বাইরের বন উপভোগ করছে, অনুভব করছে, সবল বাহু দিয়ে আহরণ করে নিচ্ছে উদ্যুক্ত উদ্যত জীবনের অকৃপণ আনন্দ।

বাইরে ঝাউবনের সেই গান—নদীর জলে কলোচ্ছ্বাস; বসবার ঘরে রেডিয়োতে কী একটা গান বাজছে তার কথাগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু সুরটা মিশে গিয়েছে বর্ষার জল-তরঙ্গের সঙ্গে। আর অন্যমনে মুখ তুলে জানলার বাইরে তাকিয়েছে অনুপমা। বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্তি তার মুখখানার ওপরে ঝলকের ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছে। পড়ার বই ভুলে অরুণের মনে হয়েছে কী একটা বেদনায় যেন অনুপমা আত্ম-বিস্মৃত; যেন ওই ঝাউবনের মতো নিজের জীবনেও সে বহু মানুষের—অসংখ্য, লাঞ্ছিত মানুষের সত্তাকে অনুভব করেছে। যেন এখানে সে বন্দিনী—ইলেকট্রিকের তারে বাঁধা ওই সাজানো ঝাউগাছগুলোর মতো একটা কৃত্রিম পরিবেশে শৃঙ্খলিত। এই বর্ষার সন্ধ্যায় ওই ঝাউবনের মতো তার মুক্তি কামনা যদি সার্থক হয় তা হলে সে নেমে আসবে সকলের মাঝখানে—সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলবে: আমি তোমাদেরই। বহুদিনের বহু পাপ আর ভুলে ঘুরে সরেছিলাম, আজ সে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছি—আজ তোমাদের প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ মিলিয়েছি!

কিন্তু হঠাৎ অরুণ সজাগ হয়ে উঠল: এর কতটুকু সত্য? তার নিজের মনের এই কাব্য—বর্ষার সেই বিশেষ বর্ণবিন্যাসের মধ্যে নিজের স্বপ্নাতুরতা—তার থেকেই কি এর সৃষ্টি হয়নি? অনুপমাকে যেমন করে সে ভাবতে চায়, অনুপমা নিজেকে কি তেমনি করেই ভাবে? এর অনেকটা—হয়তো সবটাই কি 'ইউশফুল থিঙ্কিং' নয়? হয়তো সেই মুহূর্তে অনুপমা ভাবছে আসন্ন টি-পার্টির কথা, হয়তো বা কোনো নতুন বন্ধুর কথা, আর হয়তো বা কোনো নতুন শাড়ীর কথা—বিশেষ একটা গয়নার কথা! কে জানে, মেয়েদের মনের কথা অরুণ ঠিক বুঝতে পারে না।

বেলার ঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হল। সাড়ে ন-টা। অরুণের হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। প্রমীলা আর বেলা তেমনি নতমুখে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পোস্টারের ওপরে তুলি বুলিয়ে চলেছে।

—হল, প্রমীলা?

—আর পাঁচ মিনিট অরুণদা, আর একটু বসুন।

পোস্টারের ওপরে লাল অক্ষরে লেখা ফুটছে: পাঞ্জাবের রক্তঋণে আত্মত্যাগী শহীদদের স্মরণ করুন—জালিয়ানওয়ালা দিবস পালন করুন—

আবার অনুপমার দিকে ফিরে গেল অরুণের মন। কিন্তু সত্যিই কি সবটা 'ইউশফুল থিঙ্কিং'র মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যাবে? যদি অনুপমা আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকে—কেন সে জেগে উঠবে না সেই বিস্মরণের অবলুপ্তি থেকে? কেন সে স্মরণ করবে না—ভারতবর্ষের আত্মত্যাগী বীরদের—কোটি কোটি লাঞ্ছিত মানুষদের?

অনুপমার কথাটা মনে পড়ে গেল: বাবাকে আগে খুশি করা দরকার, সেটা ভুলবেন না। তখন খোঁচা লেগেছিল, অনুতাপ বোধ হয়েছিল একটু বেশি মাত্রায় ধনিষ্ঠতা করবার জন্যে, চাঁদা চাইবার জন্যে। পকেটে হাত দিয়ে অরুণ দেখল দশ টাকার নোটটা ঠিক আছে সেখানে। এ ঘনিষ্ঠতা করবার প্রয়োজন আছে, আঘাত খেলেও এগিয়ে যাওয়ার দরকার আছে। অনুপমা যদি নিজে না জাগে, জাগাতে হবে তাকে; যদি নিজের শিকল সে ছিঁড়ে ফেলতে না পারে, সেই শিকল ছেঁড়বার সাহস আর শক্তি দিতে হবে। আগুনের মতো অনুপমা—বন্দিনী খানিকটা বিদ্যুৎশিখার মতো অনুপমা। সেই আগুন আর সেই বিদ্যুৎ কেন গণ্ডির মধ্যে বাঁধা হয়ে থাকবে—দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়বে না?

প্রিয়তোষকে ধন্যবাদ। যদিও 'ভাদ্‌গার'—যদিও মেয়েদের সম্বন্ধে ওমন বুঝে কথা বলতে পারে না, তবু ওর কথার মধ্যে সত্যি আছে। খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে—খানিকটা শিভালরাস্ হয়ে উঠতে হবে। সেন অরুণের একার নয়, বেলার নয়, প্রমীলারও নয়। বলির খড়্গ কাউকে বাদ দেবে না। অনুপমা আভিজাত্যের সংকীর্ণ উচ্চাসনে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে কেন এবং কী অধিকারে?

—অরুণদা চলুন!

—হয়েছে? আচ্ছন্ন চোখ মেলে অরুণ উঠে দাঁড়ালো।

—আর খান পাঁচেক বাকী আছে, বেলা শেষ করে ফেলবে। অনেক ফাঁকি দিয়েছে, এবার এটুকু অন্তত: করুক।

বেলা বিরস মুখে বললে, তোমাকে বলাম থেকে যেতে, তুমি কিছুতেই থাকবে না। এই রাত্রিতে গেলে না ফিরলে কী ক্ষতি হত তোমার?

—না, না, কালকে লাস্ট ডে—মার্ক সাবমিট করতেই হবে। অনেকগুলো খাতা বাকী আছে তাই, সকালে কিছুতেই শেষ করতে পারব না।

বেলা রাগ করে বললে, তা হলে মরো গে যাও।

—মরলে তো তোর আর অরুণ দা'র পোষ্টারের হাত থেকে বেঁচেই যেতাম।

—কিন্তু মরতে দিচ্ছে কে তোমাকে। এমন পোষ্টার লিখিয়ে তা হলে আর পাওয়া যাবে কোথায়? অরুণ হাসল: কিন্তু যাবে তো আর রাত করো না। আমারও ঢের কাজ বাকী, এখানে বসে থাকলে চলবে না।

—চলুন—কাঁধের ওপর ব্রোচটা ভালো করে এঁটে নিয়ে পায়ে চটিটা টেনে নিলে প্রমীলা। কীণ দুর্বল শরীরে ময়লা খদ্দরের শাড়ীটাকে কেমন যেন বেমানান বলে মনে হয়—মনে হয় যেন ওটার ভার প্রমীলা আর বইতে পারছে না। বললে, আসি বেলা।

বেলা চোখের কোণায় কৌতুকের ঝলক দিয়ে তেমনি মৃদু হাসল। বললে, এসো।

লক্ষ্য করেও সেটা লক্ষ্য করল না প্রমীলা। অরুণ তখন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ধারান্দাতে। প্রমীলা আসতেই দুজনে পথে নেমে পড়ল।

ইস্ট এণ্ডের অন্ধকার পথ। এখানে ওখানে কুকুরের সতর্ক চীৎকার—এত বেশি সতর্ক আর সন্দিগ্ধ বলেই চোর ধরতে পারে না, ওদের চোখের সামনে দিয়েই সেয়ানে গৃহস্থ বাড়ীর হাঁস চুরি করে সরে পড়ে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীকে বাঁধবার কামনায় তরুণ মানবকের আকুল সারস্বত সাধনা—সেট্ এ বি সি ডী এ ট্র্যাংগেল—

দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। পানা-পুকুরের পাশের ঝোপে ভাহুক ডাকছে। প্রমীলার স্যাণ্ডেলের শব্দ বাজছে খোয়া-ওঠা পথের নুড়িতে নুড়িতে। ঝপাস ঝপাস করে এগাছে ওগাছে উড়ে পড়ছে বাদুড়।

অরুণ সংক্ষেপে বললে, অনেক রাত হয়ে গেল তোমার।

আরো সংক্ষেপে প্রমীলা জবাব দিলে, হুঁ।

কিন্তু বেলার হাসিটা প্রমীলার মনের মধ্যে আলা করছে ক্রমাগত। সব জেনে শুনেও কেন এমন করে ঘা দেয় বেলা? নিভৃত ব্যথার মতো বুকের মধ্যে যেটাকে সে প্রতিক্ষণ বহন করে চলেছে, সেটাকে কেন এমনভাবে উদ্ঘাটিত করে দেয়? অরুণের যে চলার পথ সে পথ কাঁটায় আকীর্ণ, সংকটে বন্ধুর।

সেখানে তার দৃষ্টির সামনে একটি মাত্র আলো জ্বলছে—সে আলো স্বাধীনতার, সে আলো মুক্তির। অপমানিত মানুষের লাঞ্ছনার আগুনে নিজের পাঁজরকে জ্বালিয়ে নিয়েছে মশালের মতো—ভারতবর্ষের মহাশ্মশানে শবাসীন কাপালিক।

সেখানে কোথায় প্রমীলা? কতক্ষণ প্রমীলা তার পথের সঙ্গী! দুর্বল দেহ, দুর্বল মন। একদিন নিঃশব্দে ঝরে যাবে, পিছিয়ে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ক্ষমতা যে তার নেই, সে কথা প্রমীলা নিজেও জানে। তবু এই মোহ—এই আত্মবিস্মৃতি। নিজেকে বার বার জয় করতে চায়, ভুলে যেতে চায়। সব জানে, সব বোঝে বেলা। তবু নিষ্ঠুরের মত আঘাত করে, ইঙ্গিত করে।

অন্ধকার পথ দিয়ে দুজনে চলেছে। এই পথটা যদি কোনোদিন শেষ না হয়—যদি প্রসারিত হয়ে যায় সীমাহীন, লক্ষ্যহীন অনন্ত পর্যন্ত! এমনি নিঃশব্দে হেঁটে যাবে প্রমীলা, অরুণের পিছনে পিছনে চলবে নির্বাক ছায়ামূর্তির মতো। কোন দাবী করবেনা, কোন আকাঙ্খা করবেনা। শুধু চলতে থাকবে, দুজনে চলতেই থাকবে।

অরুণ হঠাৎ মুখ ফেরালো।

—তোমার কাজ কেমন চলছে।

—ভালো নয়।

—কেন?

—ইস্কুল মিস্ট্রেসদের আপনি চেনেন না অরুণদা। ওদের উৎসাহ নেই কিছুতে, আগ্রহ নেই। কোনো মতে দিনের বোঝাটা টেনে চলতে পারলেই খুশি হয়।

—কেন? —অরুণের গলায় বিস্ময়ের সুর ফুটল: ওরা তো স্বাধীন—ওদের তো কারো কাছে কৈফিয়তের দায় নেই। সব চেয়ে বেশি কাজ তো ওদেরই করা উচিত।

—তাই কি? প্রমীলা চিন্তিত হয়ে উঠল: আমার কিন্তু তা মনে হয় না। বেশি স্বাধীনতাই বোধ হয় কাল হয়েছে। স্বাধীনতার ভারও যেন আজ ওদের অসহ্য।

—ঠিক বুঝতে পারছিনা।

—ঠিক বুঝতে আপনি পারবেন না অরুণদা। মেয়েদের মন একটা সীমার বাইরে বোধ হয় আর এগোতে পারেনা। খানিক পরেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে! তখন আশ্রয় চায়, অবলম্বন চায়, হয়তো তখন ভাবে, এই অবাধ স্বাধীনতার চাইতে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে দিলেই সুখী আর পরিতৃপ্ত হতে পারত।

কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই চমকে থেমে গেল প্রমীলা। এ কার কথা বলছে ও? এ কার মন? আজ ওর কী হয়েছে যে নিজেকে এমন দীন ভাবে মেলে ধরছে অরুণের অনুকম্পার সামনে? নিজের ভেতরে কেমন একটা গ্লানি এসে প্রমীলার সমস্ত আবেগকে শান্ত করে দিলে।

আর ঠিক অন্যভাবেই প্রমীলার কথাটা অরুণ চিন্তা করতে লাগল। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল,

ইউনিভার্সিটিতে ওর বড়দির সঙ্গে পড়ত। মেয়েটির রূপ ছিল, অর্থ ছিল, বুদ্ধি ছিল। একদিন নাকি দুঃখ করে বলেছিল: ভাই এমন বিপদেই পড়ে গেছি! এম-এ পড়া মেয়ের জন্যে বাবা যা পাত্র খুঁজতে ভরসা পান না; নিজে কাউকে খুঁজে নেব, তাতেও আত্মসম্মানে বাধে। তা ছাড়া চোখের সামনে এমন কাউকে দেখতে পাইনা যার কাছে নিজের সুপিরিয়রিটি কনশ্লেক্সটা বিসর্জন দিয়ে মাথা নোয়াতে পারি। তাতেও রাজী আছি—কিন্তু তারাও তো কাছে ভিড়তে ভয় পায়। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে—বিয়ের বাজারে দিনের পর দিন ফেউলে হতে চলেছি। কী করা যায় বল্ দেখি?

মেয়েটি শেষ পর্যন্ত কী যে করেছিল সে ইতিহাস অরুণ জানেনা। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে বাঁধা পড়াই মেয়েদের ধর্ম? নতুন যুগের ঝড়ে যারা পাখা মেলে বেরিয়ে পড়েছে, আজ কি ঘরের বাঁপটা তারা সইতে পারছে না? তীক্ষ্ণ গৃহকপোতীর মতো তারা কি নীড়ে ফিরতে চায়?

কিন্তু এর উল্টোটাও কি সমান সত্য নয়? অনুপমা? অনুপমাকে দেখলে মনে হয় না কি, তার একটা বিরাট শক্তি পাথরের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে? সেখান থেকে তাকে মুক্তি দিলে বাংলা দেশে কি খুঁজে পাওয়া যায়না রুপসকায়াকে, ভেরা ফিগনারকে, রোজা লুক্সেমবার্গকে?

দশটাকার নোটটা পকেটের মধ্যে খচ খচ করছে। একটা কথা মনে পড়ে গেল অরুণের। বললে, এই নোটটা রাখো প্রমীলা।

—কিসের নোট?

—চাঁদা।

—কে দিল চাঁদা?

—বড়লোকের মেয়ের কাছ থেকে আদায় করলাম। অনুপমা দিয়েছে। তুমি ত ক্যাশিয়ার, জমা করে নিয়ো।

—আচ্ছা।—নোট নিয়ে প্রমীলা ভাঁজ করে রাখল নিজের ব্যাগটার ভিতরে।

অরুণের গলায় উত্তেজিত আনন্দের সুর পাওয়া গেল: বেশ মেয়ে অনুপমা। এখনো নিজেকে চেনেনি বটে, কিন্তু বেশ আশা আছে ওকে দিয়ে। কয়েকদিন চেষ্টা করলে হয়তো টানা চলে। চেষ্টা করবো নাকি?

—ক্ষতি কি। তেমনি নিরুৎসুক ভাবে জবাব দিলে প্রমীলা। কিন্তু অরুণের গলার স্বরটা কেমন অপরিচিত ঠেকছে। মেয়েদের সম্বন্ধে নির্বিকার অনাসক্তিই ছিল এতদিন ওর বৈশিষ্ট্য—আজ যেন তার ব্যতিক্রম ঘটেছে।

অরুণ বলে চলল, সত্যিই ভালো মেয়েটি। তা ছাড়া গ্র্যাণ্ড বাংলা লিখতে পারে—সেদিক দিয়েও কিছু কাজ হতে পারে বোধ হয়—।

—খুব সম্ভব।

প্রমীলার বিমূঢ় মনটা আরো বিষাদ হয়ে গেছে। মেয়েদের স্বাভাবিক সংস্কার ওর মনে একটা নতুন সম্ভাবনার ছায়া ফেলেছে এসে। সত্যিই কি এতই ভালো অরুপমা? অথবা একটা বিশেষ ভালোর চোখ দিয়ে অরুপ দেখতে শিখছে তাকে!

মাথা ঝিম্‌ঝিম করছে, প্রমীলার মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম করছে। এত ক্লান্ত লাগছে আজকে। নিজেকে এমনভাবে অসহায় বোধ হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে লিখে লিখে আঙুলগুলোও যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তার। পা দুটো টেনে টেনে চলাও মনে হচ্ছে কঠিন পরিশ্রমের মতো।

পথ শেষ হয়ে গেল। একটা বিরাট অব্যক্তির ভার যেন নেমে গেল বুকের ওপর থেকে। একটু আগেই যে পথটা অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে প্রমীলা খুশি হত—সে পথের এতটুকু অংশ পাড়ি দিতেও এখন অসহ্য শ্রান্তি এসে দেখা দেয়—এটা কি ও আগে বুঝতে পেরেছিল।

অরুপ বললে, তোমার মেস। এবারে আমি চললাম। সম্ভব হয়তো তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটু চেষ্টা করে দেখো।

—দেখব।

অরুপ আর দাঁড়ালো না। অন্ধকার পথ বেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল, তার অনেক কাজ। মেসের দরজার পাশে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রমীলা।

বার কয়েক কড়া নাড়তে রুক্ষা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠে এসে দরজা খুলে দিলে। বিরক্ত গলায় বললে, এত রাত অবধি কোথায় থাকো? একটা বিশ্রী কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ঘটবে তোমার জন্যে। হেড্ মিস্ট্রেস শুনলে কী বলবেন জানো?

—সে ভাবনা তুমি নাই ভাবলে—প্রমীলা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

—কিন্তু এত রাত পর্যন্ত তোমার জন্যে জেগে থাকবে কে? একটা ঝি রেখে দিয়ো দয়া করে, আমি পারব না।—বিড় বিড় করে বকতে বকতে চলে গেল রুক্ষা।

প্রমীলা রুক্ষার কথার জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেই—এ প্রায় প্রতিদিনের ইতিহাস। রুক্ষা মানুষ খারাপ নয়—ওকে ভালোই বাসে। কিন্তু কাঁচা ঘুম ভাঙলে ভয়ঙ্কর চটে যায় মেয়েটা। ঘরে ঢুকে সুইচটা টেনে দিতেই প্রথমে চোখে পড়ল অগোছালো বিছানার ওপরে—বিভীষিকার মতো পরীক্ষার খাতাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। এত সম্ভব অসম্ভব ভুল ইংরেজি লিখতে পারে মেয়েরা। এক ঘণ্টা খাতা দেখলে নিজের ইংরেজি জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। বানান—ব্যাকরণ—ইডিয়াম—ফ্রেজ এবং সর্বোপরি বিচিত্র হাতের লেখার একটা মিউজিয়াম যেন।

টেবিলের ওপরে ঠাকুর ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু যেমন অসহ্য মনে হল পরীক্ষার খাতাগুলো, তেমনি খাওয়ার জন্যেও কোনো প্রেরণা বোধ করলে না প্রমীলা। হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলোটা অফ্ করে দিলে, তারপর এসে দাঁড়ালে জানালার সামনে।

গরীবের মেয়ে, আই-এ পাশ করবার পরে আর পড়তে পারে নি পয়সার অভাবে। সংসারের মুখ চেয়ে নিয়েছে এই ইস্কুল মাষ্টারী। কিন্তু এতদিন পরে নিজেকে যেন যে এমন ব্যর্থ আর বঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে, প্রমীলা তা বুঝতে পারল না।

জানালার গরাদের ওপর মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরে কালো রাত্রি ভয়াবহ। কাল খালিয়ানওয়ালা ডে—রক্ত যজ্ঞের আহুতি দিবস। কিন্তু প্রমীলা ভীরু, প্রমীলা দুর্বল—এই দুরূহ ব্রতের যোগ্য নয়। তা হলে কোথায় তার আশ্রয়, কিসে তার সান্ত্বনা? হঠাৎ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বহুদিন পরে বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দু'হাতে বুক চেপে ধরে মাতালের মতো বিছানাটার দিকে এগিয়ে এল, তারপর উবুড় হয়ে পড়ল স্তূপাকার পরীক্ষার খাতাগুলোর ওপরেই।

•

চার

পাশের ঘরে নীতীশ ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে। বসে বসে চেইনের মতো প্রায় আধ টিন সিগারেট শেষ করে ফেলল। ইংরেজি মাসিক পত্রগুলো আগা থেকে গোড়া পড়ে ফেলেছে—সেল্‌ম্যানিজম্‌এর বিজ্ঞাপনটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু কী কাণ্ড! অনুপমা পড়ছে তো পড়ছেই। সোনার হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত দশটা বাজবার উপক্রম করছে।

এতক্ষণ ধরে কী পড়ছে অনুপমা? দুজনে মিলে এমন চাপা গলায় কী পড়া সম্ভব? খানিকটা কালো আর কুটিল সন্দেহে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। নাঃ, অসহ্য করে তুলল।

একা একা কতক্ষণ থাকা যায় এভাবে? অথচ এই একা থাকবার কী চমৎকার সুযোগ নেওয়া যেত আজ। ছেলেপুলেদের নিয়ে প্রসন্নবাবু আর শিবানী কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছেন, অনুপমা একাই ছিল। 'এমন দিনে তারে বলা যায়'—নীতীশ ভেবেছিল আজকেই মনোভাবটা প্রকাশ করে ফেলবে অনুপমার কাছে—একটা চান্স্ নেবে। নিরালা নির্জন বাড়ি—আবেগ-বিহ্বল গলায় মর্মবেদনা প্রকাশ করবার এমন অপূর্ব অবকাশ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

কিন্তু এই প্রাইভেট টিউটরটাই বাগড়া দিয়েছে। রাত ন'টা পর্যন্ত ওর মেয়াদ, অথচ প্রায় দশটা বেজে গেল, কী পড়াচ্ছে এখনো? একটা ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়েকে এত পড়াবার কীই বা আছে?

এতদিন এই ছোকরাটাকে অনুকম্পার চোখেই দেখেছে নীতীশ। গরীবের ছেলে—টিউশনি করে এ বাড়িতে, অতএব নিরীহ জীব। কিন্তু এই নিরীহ মানুষটির মধ্যেই ছদ্মবেশী বৃহন্নলা লুকিয়ে নেই তো? কেমন সন্দেহ হতে লাগল।

রেডিয়োটা খুলে দিতেই পঙ্কজ কুণ্ডু বেজে উঠল: "কলকাতা থেকে বাংলার খবর বলছি। মহামান্য বড়লাট ভারতীয় গো-জাতির উন্নতির জন্যে যে সমস্ত ষাঁড় আমদানী করেছেন, ইতিমধ্যেই

তা থেকে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। শুনা গেল আরো দশটি ষাঁড় সম্প্রতি নয়াদিল্লী থেকে বাংলা দেশে—"

ঘটাং। নীতীশ রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে। শুধু মহামান্য বড়লাটের বাছাই করা ষাঁড় কেন, দিনের পর দিন নয়াদিল্লী থেকে আরো নানা রকম ষাঁড় আমদানি যে হচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কী। অন্ততঃ উপরওলাদের ধরণ-ধারণ থেকে তার প্রমাণ যেন পাওয়া যায়। নিজেও তো আফিসার মানুষ, সুতরাং কার হাঁড়িতে কত চাল—সেটা বুঝতে ওর বড় বাকী নেই।

কিন্তু অনুপমার ব্যাপার কী? মাষ্টারটা কি আজ আর উঠবে না? আর চাপা গলায় ওই আলোচনা যেন কানের মধ্যে বিষের মতো বিঁধছে। অধৈর্য ভাবে নীতীশ কার্পেটের ওপর পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। সময় চলে যাচ্ছে—দামী, দুর্মূল্য, দুর্লভ সময়। একটু পরেই বাতের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে আসবেন প্রসন্নবাবু, কাতলা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখ নিয়ে দেখা দেবেন শিবানী, চীৎকার করতে করতে দেখা দেবে ছোট ছোট মিসিবাবা আর মাষ্টার বাবারা—বিড়ম্বনা বিশেষ।

—রগড়ু সিং!

বেশ চীৎকার করে ডাকল। রগড়ু সিংকে ডাকাটাই শুধু লক্ষ্য নয়—বরং উপলক্ষ, এই সুযোগে অনুপমাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে নীতীশ এসেছে এবং অনেকক্ষণ ধরে ওর জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

বেয়ারা রগড়ু সিং এসে দাঁড়ালো।

—সাহেব কখন আসবে?

—কিছু তো ঠিক নেই হুজুর। এগারো বাজতে পারে, বারোটি বাজতে পারে। আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন?

নীতীশের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল রগড়ু সিংয়ের ওপরেই। ওর কণ্ঠস্বরে আগ্নেয়গিরির আভাস পাওয়া গেল: যতক্ষণ আমার মর্জি।

—জী, সে তো বটেই। রগড়ু সিং সভয়ে বললে: কিন্তু একা একা বসে থাকবেন হুজুর? একটু চা পানি এনে দেব? কোকো?

বীভৎস গলায় নীতীশ বললে, না।

—কী করব তবে?

—কিছুই করতে হবে না।

—সেলাম।

—যাও।

নীতীশ আবার বিলিতী পত্রিকাটা খুলল। প্রাণপণে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল; মেয়েদের পোষাক

সম্বন্ধে একটা সচিত্র প্রবন্ধ। কিসে মেয়েদের বেশি স্মার্ট আর ফ্যাশনেবল দেখাবে, এবং বঙ্গশ্রী একটা পরিপূর্ণ ইঙ্গিতময় আবেষ্টন দিয়ে রোমাঞ্চিত করে তুলবে সে সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সুচিন্তিত গবেষণা। বেয়ারাটাকে একটা কাজ সে করতে বলতে পারত। সে-কাজ ওই মাষ্টারটাকে সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া। কিন্তু সেটা নানা কারণে কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং অসহায় ক্রোধে সে বিলিতী পত্রিকাটার ওপরে একটা ড্রাগন আঁকবার চেষ্টা করতে লাগল পেন্সিল দিয়ে। তার মনোভাবটা এখন প্রায় ড্রাগনের মতোই।

ও ঘরের দরজা খোলবার শব্দ পাওয়া গেল। বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দটা নেমে গেল নীচে। মাষ্টারটা তা হলে এতক্ষণে বিদায় নিয়ে গেছে! উঃ, কী অসাধারণ 'বোর' লোকটা। নাকি চাঁদা নিচ্ছে? বাড়িতে কেউ নেই বলেই—

অনুপমার সাগ্রহ কোমল গলা শুনা গেল: কাল নিশ্চয় আসছেন?

দূর থেকে সাড়া এল: নিশ্চয়।

রাগে নীতীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে কথা বলবার সুর এ তো নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে কেমন একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে অনুপমার। স্বয়ংসম্পূর্ণা হয়ে গেছে—অন্যমনস্কা হয়ে গেছে। কিসের লক্ষণ এসব?

শিথিল মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকেই চমকে গেল অনুপমা। বললে, এখনো আপনি বসে আছেন নাকি?

বেল্লাগন ফ্রেমের আড়ালে আগুন জ্বলছে। কিন্তু আত্ম সংবরণ করলে নীতীশ।—হ্যাঁ, আপনার অপেক্ষাতে।

—সত্যি ভারী দুঃখিত। পড়ছিলাম।

—মাষ্টার খুব মন দিয়ে পড়ায় দেখা যাচ্ছে। যা দরকার, তার চেয়েও বেশি।

খোঁচাটা অনুপমা বুঝতে পারল এবং অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকল কাণে। টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, তাঁর দরকারটা তিনি নিজেই ভালো বুঝেন বোধ হয়।

—বোধ হয়!—নীতীশ বিনীত হাসি হাসল। কিন্তু হাসির ভেতর থেকে যা ঠিকরে পড়ল তা বিনয় নয়। সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবী, গোল্ডফ্লেকের রঙে রাঙানো পাঁচটা আঙুল আর নির্মুত আভিজাত্যের অন্তরাল থেকে মানুষের আদি-প্রবৃত্তিটা আত্মপ্রকাশ করেছে।

—আপনাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম।

—কাল বললে হয় না?—অনুপমা মধুরভাবে হাসল। আজ সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

—আমি এতক্ষণ বসে আছি—

—তা হলে আর একটু বসতে পারেন। বাবা মা—এখুনি আসবেন।

নীতীশের রক্ত আগুন হয়ে উঠল। ইচ্ছে করল সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দেয় এই অকাল

পক্ষ মেয়েটার গালে। কিন্তু আজ যা করতে এসেছিল—তার সঙ্গে এই হিংস্র একটা চুমুও চড়ের সামান্যতম কল্পনাও ছিল না কোনোখানে। বাড়িটা নির্জন ছিল, বাইরে ঝাউবনের গান ছিল, নদীর জলে জোয়ারের উচ্ছ্বাস ছিল। আকাশের কোণায় কোণায় খুঁজলে এক ফালি চাঁদের রেখা পাওয়াও হয়তো অসম্ভব হত না। কিন্তু সমস্ত বৃথা হয়ে গেছে—সব মিথ্যে হয়ে গেছে। আর সেই অপমানিত ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা দিচ্ছে অনুপমা।

—কথাটা মিষ্টার বা মিসেস্ সরকারের সঙ্গে নয়, আপনার সঙ্গেই :

—সত্যি লজ্জিত। আজ্ঞা কাল তবে—এখন হঠাৎ ঘুম পাচ্ছে আমার—অনুপমা হাই তুলল একটা।

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এর পরে আর কোনমতেই বসা চলে না। সমস্ত চেতনার মধ্যে হিংস্র একটা বন্য জন্তুর আক্রোশ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো নীতীশ। নতুন যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল, সেটাকে ছুঁড়ে মারলো য়্যাশ্-ট্রের দিকে।

—আচ্ছা আসি আজ।

অনুপমা স্বচ্ছন্দ ভাবে বললে, আসুন, নমস্কার। বড় কষ্ট হল।

অভ্যাস বশে মুখে আসছিল, না, এমন আর কি—কিন্তু মনের জ্বালায় স্বাভাবিক এই বিনয়টুকু করবার আগ্রহও আজ বোধ করলে না নীতীশ। বড় বড় পায়ে গেটটা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল সে। ঝাউবন আর নদীর ঠাণ্ডা হাওয়াতে উত্তেজনাটা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। ঝাউবীথির অন্ধকারেও লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হল এর ভেতরে নিশ্চয় কোনো একটা ব্যাপার আছে—যা সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। সেটা কী ব্যাপার! অনুপমা ওই ভ্যাগাবণ্ডটার প্রেমে পড়েছে এমন কথা নীতীশ কখনো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তা হলে?—

হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা মিনিট চমকে গেল। অনুপমা যখন ঘরে ঢুকেছিল, তার হাতে ছিল লাল মলাটের একটা বই, অপ্রতিভ হয়ে সেটাকে লুকোবারও চেষ্টা করেছিল শাড়ীর আঁচলে। কিন্তু অন্যমনস্ক উত্তেজনায় নীতীশ তখন সেটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নি। এখন নামটা মনের সামনে রক্তের অক্ষরে জ্বলে উঠল : 'মুক্তি শঙ্খ'।

'মুক্তি শঙ্খ'? নীতীশ থেমে দাঁড়ালো, ভ্রূকুঁচকে চিন্তা করতে লাগল। নামটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে। এই রকম একখানা বই সম্বন্ধে কী একটা সরকারী নির্দেশ খবরের কাগজে দেখেছিল না কি? যতদূর মনে পড়ছে—

নীতীশ আর একটা সিগারেট ধরালো। সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ থাকলে কী করত কে জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সমস্ত চেতনা যেন মশালের মতো শিখায়িত হয়ে উঠছিল। অরুণ মাষ্টারকে বোধ হয় চেনা যাচ্ছে এতদিনে। খাড়া খাড়া চুল, ময়লা জামা, গালের পাশে কাটা দাগ এবং একান্ত স্বল্পভাষী। সবগুলো মিলিয়ে একটা একান্ত অশুভ সূচনা মনের মধ্যে সাড়া দিতে লাগল।

তা হলে মতলব কী অরুণের? অনুপমাকে 'মুক্তি শঙ্খ' পড়তে দেবারই বা অর্থ কী? প্রসন্ন বাবুর মতো সন্ন্যাসী অফিসারের ঘরে রাজনীতি? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা?

নীতীশ একটু হাসল। অরুণ মাষ্টারের দিন ঘনিয়েছে। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিল, ফিরে চলল তার উলটো দিকে। ষ্টিমারঘাটের কাছাকাছি আই বি ইনস্পেক্টরের বাসা। তাঁর ওখানে গিয়ে একবার পুরোনো পুলিস গেজেটটা দেখে আসা দরকার।

• •

যথানিয়মে আজও রাত বেশী হয়ে গেল।

সঙ্গে আজ আর অরুণ আসেনি—সুজিতই এগিয়ে দিলে যেন পর্যন্ত। ইস্কুলের ছেলে, বেশ উৎসাহী, রক্তটাও একটুকু বেশীমাত্রায় গরম। তাই মেয়েদের সম্পর্কে একধরণের পৌরুষ বোধ করে সব সময়ে। পথ চলতে চলতে দু তিনটে কুকুরকে তাড়া দিলে, ঢিল ছুড়ল একটা বাদুড়কে।

—প্রমীলা দি, ভয় করছে না তো?

—না।

—বড্ড অন্ধকার রাস্তা। আপনার অসুবিধে হচ্ছে না?

প্রমীলা মৃদু সস্নেহ হাসি হাসল: এ পথে আমি তো রোজই চলি ভাই। তোমার ভয় করো না তো?

—আমার ভয়! ইস্। জানেন প্রমীলাদি, একা একা শ্মশানে গেছি ক'বার, গোরস্থান থেকে মড়ার খুলি নিয়ে এসেছি।

—মড়ার খুলি! প্রমীলা বিস্মিত হয়ে বললে, মড়ার খুলি কি জন্যে? তান্ত্রিক সাধনা শুরু করেছিলে নাকি?

—না, না।—মেয়েদের মতো সলজ্জ গলায় সুজিত বললে: ওসব না। সাহস হওয়া চাই তো। মনে জোর না পেলে কাজ করব কি করে বলুন।

—তা তো বটেই। কিন্তু একা একা যে শ্মশানে যেতে, কবরখানায় যেতে, ভয় পাওনি কখনো, ভূত-!—ভূত!—সুজিত অবজ্ঞার হাসি হাসল: ও সব বাজে কথা। কত ছিঁচকে জিনিসে মানুষ যে ভয় পায়। আমার একবার তারী মজা হয়েছিল, জানেন?

—বলো শুনি।

—আমবস্যার রাত্তিরে বাড়ী থেকে রাজসাহীর এক শ্মশানে গিয়েছি। কী অন্ধকার—সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কথা ছিল শ্মশানের ঠিক মাঝখানে একটা নিশান পুঁতে আসব। মরা নদী—ওপারে বন জঙ্গল, তিন মাইলের মধ্যে লোক নেই। পায়ে মড়ার হাড় লাগছে, পোড়া কাঠ ঠেকছে—ছায়ার মতো শেয়াল সরে যাচ্ছে, অন্ধকারে জ্বলছে তাদের চোখ গুলো। ভয় করছিল, তবু বুক ঠুকে শ্মশানের ঠিক মাঝখানে নিশান পুঁতে ফেললাম।

ফিরতেই মনে হল কে যেন প্রাণপণ জোরে আমার কাপড়টা টেনে ধরছে। যত ছাড়াতে যাই, ছাড়াতে আর পারি না। কাপড় ধরে তেমনি টানছে তো টানছেই। তারপর বুঝতেই পারেন আমার অবস্থা। ভয়ে মাথার মধ্যে রক্ত চড়ে গেল—ফিট হয়ে যাব আরকি!

প্রমীলা বললে, সর্বনাশ!

—শুনুন না মজার কথা। যা থাকে কপালে বলে ফিরে দেখতেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। নিশানের সঙ্গে কোঁচার খানিকটাও মাটিতে পুঁতে ফেলেছি—তাইতেই ওই কাণ্ড। জানেন প্রমীলাদি, এমনি করেই লোকে খালি খালি ভয় পায়। কখনো ভূতে বিশ্বাস করবেন না প্রমীলাদি।

—না। তোমার কথা শুনে ভরসা পেয়ে গেলাম। প্রমীলা হাসল।

মেসের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সুজিত বললে, আমি যাই তা হলে।

—এসো! কিন্তু দেখো, সত্যি সত্যিই কেউ পেছন থেকে কোঁচা টেনে না ধরে।

—ইস্, আমার?

বীরের মতো পা ফেলে ফেলে সুজিত চলে গেল। চমৎকার ছেলেটা—নিজের ছোট ভাই বলে ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু এই বয়সেই যে-পথে নেমে এসেছে, তাতে একদিন হয়তো দমকা হাওয়া এসে অকালেই ঝরিয়ে দেবে ওকে। প্রমীলার মাঝে মাঝে মনে হয় বড় নিষ্ঠুর এই পথ—বড় বেশি নির্মম। ক্ষমা নেই, করুণা নেই। কারো মুখের দিকে সে তাকাবে না—যা তার প্রয়োজন—দু'হাতেই ছিনিয়ে নেবে তাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা কড়া নাড়ল। আবার সেই পুরানোর পুনরাবৃত্তি। আধ ঘণ্টা ধাক্কা ধাক্কির পর মেঘের মতো মুখ করে আসবে কৃষ্ণা—কতগুলো অশ্রিয় মন্তব্য করবে, তারপর টলতে টলতে গিয়ে পড়বে বিছানায়। আর এদিকে নির্জন নিরানন্দ ঘর প্রমীলার, অগোছালো বিছানা, অগোছালো বই পত্তর, টেবিলের ওপরে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত।

কিন্তু আশ্চর্য, কড়া নড়তেই সাড়া এল, দাঁড়াও।

কৃষ্ণা জেগে আছে এখনো? ন'টা না বাজতেই তো ঘুমে ঢুলে পড়ে, অদ্ভুত ঘুম-কাতুরে মানুষ। আর এখন সাড়ে দশটার সময়েও সজাগ গলায় সাড়া দিচ্ছে। ব্যাপার কী?

খিল খুলে গেল, দেখা গেল কৃষ্ণার মূর্তি। নিদ্রোত্থিতা নয়—বেশে-বাসে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। যেন তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছে।

—ব্যাপার কী, এখনো জেগে আছ তুমি?

—হুঁ। আষাঢ়ের জমাট মেঘের মতো কৃষ্ণার মুখ।

—কী হয়েছে তোমার? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি?

—ভেতরে চলো। গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বড়দি এতক্ষণ বসে বসে এইমাত্র চলে গেলেন।

—বড়দি—হেড্ মিষ্ট্রেস? নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে প্রমীলা থেমে দাঁড়ালো: পরিস্থিতি তা হলে তো বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে।

—নিজেই যদি জটিল করে তোল, তা হলে কার কি বলবার আছে!

—তাই নাকি? প্রমীলা ভ্রূ দুটো বিস্তীর্ণ করে তাকালো কৃষ্ণার মুখের দিকে। বারান্দার আলোটার জোর কম, কৃষ্ণার মুখের এ পাশটাতে খানিকটা ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণাকে দেখে মনে হল যেন ও ফাঁসির আসামীর রায় দিতে যাচ্ছে: He will be hanged by neck till death—

প্রমীলা আঁচ করে নিলে ব্যাপারটা। এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়—এই জাতীয় একটা কিছু ঘটবেই বহুদিন আগেই সেটা টের পেয়েছে সে। ঘর খুলে আলো জ্বালালে, বললে, বোসো।

বিছানার একপাশে বসে কৃষ্ণা বললে, তুমি খেয়ে নাও আগে।

—পরে খাবো। আগে কথাটা তোমার শুনি।

জানলা দিয়ে খানিকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণা। একটা কাঁচা ড্রেনের দুপাশে ঘন জঙ্গল, তার ভেতরে ডাহুক ডাকছে। খোয়াওঠা রাস্তা দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছে—নির্জন অন্ধকারে তার জুতোর শব্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক ভাবে। শুধু অস্বাভাবিক নয়, অস্বস্তিকর।

শাড়ীটা বদলে নিয়ে প্রমীলা কৃষ্ণার পাশে এসে বসল। কী—বলছিলে বলো।

—আজ বিকেলে পুলিস এসেছিল।

—বেশ, ভালো কথা।

—কেন এসেছিল, জানো?

—তুমিই বলো।

—তোমার খোঁজ নিতে।

প্রমীলা বিরক্তভাবে হাসল: বাক, আমার কিছুটা দাম বেড়েছে তা হলে। পুলিসেও খবর নিচ্ছে আজকাল। খুশি হওয়া উচিত, কি বলো?

কৃষ্ণার সমস্ত মুখটা জ্বরে ম্লান হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ নির্বাক নিষ্পলক চোখে প্রমীলার মুখের দিকে তাকালো: ইয়ার্কী করো না। এ সব পথ ছেড়ে দাও প্রমীলা। আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না।

বিষণ্ণ কৌতুকের হাসি প্রমীলার মুখের ওপর তেমনি ভাসতে লাগল: কোন্ পথ ধরেছি যে ছাড়ব।

—সে তুমি নিজেই জানো। গরীবের মেয়ে, চাকরী করতে এসেছ। দেশ স্বাধীন করা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কী হয়েছে?

—তা হলে কথাটা এই যে, গরীবের স্বাধীনতা নিয়ে কোনো দরকার নেই?

—তোমার সঙ্গে আমি গণিকের তর্ক করতে চাই না—কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে বললে, হেড্ মিস্ট্রেস তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই এতদিন কিছু বলেন নি। কিন্তু যা তুমি করে তুলছ, এর পরে তোমাকে ইস্কুলে রাখাই শক্ত হবে

—রাখার দরকার কি?

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো: ওভাবে যদি জবাব দাও তা হলে তোমার সঙ্গে কথাই বলা চলে না। কিন্তু নিজের ভালো নিজে ছেবে দেখো। তা ছাড়া কাল বড়দি যা বলবার তা নিজেই বলবেন তোমাকে।

—তাই শুনব।

—হুঁ—দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল কৃষ্ণা। বললে, কিছু মনে করোনা ভাই। তুমি ভাবছো হয়তো খানিকটা অনধিকার চর্চা করলাম। কী রাজনীতি তুমি করছ জানি না, আমার কিন্তু মনে হয় কারো প্রেমে পড়ে গেছ।

ধক্ করে বুকের মধ্যে ঘা লাগল। মনের কথাটা কি সত্যি সত্যিই ধরে ফেলেছে কৃষ্ণা? দুর্বল দেহ, দুর্বল মন—একান্ত অসহায় বলেই বোধ হয় নিজেকে। গৃহকপোতীর মতো তীরু আর নীড়সন্ধানী। তবু এই দুর্যোগের মধ্যে সে যে পথে নেমে পড়েছে, সে কি শুধু মৃঙ্খলিতা দেশমাতার কান্না শুনেই? নাকি আর কোন মোহ আছে—মদের মতো তীব্র আর কোনো নেশার আকর্ষণ আছে, যার জন্যে একটা বিশেষ রাজনীতির মতবাদকে উপলক্ষ্য মাত্র ধরে নিয়ে যেন স্বপ্নের মধ্যে পথ হেঁটে চলেছে সে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। পাণ্ডুর মুখের ওপর রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিচিত্র দ্রুত স্পন্দন—যেন ছোট ছোট পা ফেলে কে সেখান দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণা বললে, তাই যদি, তা হলে এ সব না করে বিয়ে করে ফেলো।

—কি করব?

—বিয়ে।

—কাকে?

প্রমীলার স্বপ্নাতুর আত্মমগ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার আশ্চর্য লাগতে লাগল: কেন যার প্রেমে ঘর ছেড়েছ তাকেই!

—তাকেই?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। বাইরে নারকেল গাছের পাতায় বাতাস বাজছে। অন্ধকার আকাশে জেগেছে নক্ষত্রের সভা। ঈথার ঘাট থেকে গম্ভীর বাঁশীর সুর—যেন কোনো সুদূর দিগন্তের আহ্বান। এখানে নয়, এখানে নয়। এই সীমা ছাড়িয়ে চলে এসো, ভেঙে এসো এই ঘর, এই দুর্বল মোহ। ডাক আসছে পাঞ্জাব থেকে, সিন্ধু থেকে, গুজরাট থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে, অন্ধ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রাগজ্যোতিষ থেকে। ডাক পাঠিয়েছে বালেশ্বরের অরণ্য, চট্টগ্রামের পাহাড়, সবরমতীর নীল জল, আন্দামানের শিলাতটে প্রতিহত বঙ্গোপসাগরের অশ্রু-ভরঙ্গ। কোথায় অরুণ, কোথায় কে। নিরুদ্দেশ যাত্রার যারা পথের সঙ্গী, সঙ্কট পঞ্জিল তিমিররাত্রে আলোকের তীর্থযাত্রায় তারা কে কোথায় ঝরে পড়বে কে জানে। আরও বহু প্রাণের রক্তঋণের অর্ঘের সঙ্গে প্রমীলার হৃৎপিণ্ডও একদিন ডালি সাজাবে—সেদিন সামগ্রিক আহুতির মধ্যে নিজের জন্যে কোনো কিছুই তো অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রমীলা হেসে বললে,

যাবো না বাসরকক্ষে বহুবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী, —
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অগ্রগামিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য লবো একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণ দীপ্তি গোধূলিতে।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কৃষ্ণার। বললে, না, সে-লগ্নের আর দেরী নেই। বীরহস্তে বরমাল্য তোমার আসছে হাতকড়ির রূপ নিয়ে। এবার লোহার বাসর জাগবার পালা।

—তাহলেই ধরা নখীশ্বরকে জীইয়ে তুলব।

কৃষ্ণা আর দাঁড়ালো না। দরজাটা ধড়াস করে আছড়ে ফেলে চলে গেল।

আরো দিন কয়েক পরে ভোররাত্রে ঘুম ভেঙে গেল প্রমীলার। বাইরে বুটের শব্দ—মেসের চারদিকে শুকনো পাতার ওপর দ্রুত পদসঞ্চারণ।

দরজায় পরুষ গলার সাড়া: কৃষ্ণা চৌধুরী আছেন? সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

কাঁপতে কাঁপতে বেরুল কৃষ্ণা। পুলিস।—কী চান?

—মেস সার্চ করব। আপনারা পাঁচমিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে পাশের বাড়িতে চলে যান। দয়া করে সঙ্গে কিছু নেবেন না।

ভয়ে কৃষ্ণার দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে বাজতে লাগলো। দু তিনটি মেয়ে কেঁদেই ফেলল একেবারে। পুলিস মেস সার্চ করলে, সব চাইতে তন্নতন্ন করে খুঁজলে প্রমীলার ঘর। দু ঘণ্টা ধরে অনুসন্ধানের পরেও বোমা-পিস্তল যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন প্রমীলাকে বললে, আপনাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে অ্যারেষ্ট করবার অর্ডার আছে। এই ওয়ারেণ্ট।

প্রমীলা বললে, চলুন।

দরজার গোড়ায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা। সাদা কাগজের মতো রক্তহীন বিবর্ণ মুখের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

ভেতরে উঠতে উঠতে প্রমীলা কৃষ্ণার দিকে তাকালো। মৃদু হেসে বললে, কাঁদিস নে ভাই, লোহার বাসর জাগতে চললাম। তোর কথাই সত্যি হল। ধরা নখীশ্বর বাঁচবে কিনা, এখনো জানি না অবশ্য।

কৃষ্ণা জবাব দিলে না। সকালের আলোয় যেন গভীর একটা মৃত্যুশোক বহন করে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল প্রমীলার বিশৃঙ্খল ঘরটা। টেবিলের ওপরে রাত্রির ভাতটা তখনো ঢাকা দেওয়া—বুকে ব্যথা ওপ্রাতে প্রমীলার আর খাওয়া হয়নি।

পাঁচ

রবিবারের ছুটি। ঈশ্বরের বিশ্রাম দিবস। মানবপুত্রের মুখে সে বাণী ঘোষিত হয়েছে ইয়োরোপে এবং ইয়োরোপীয় তথোপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে। গীর্জায় যাওয়া হয় না বটে কিন্তু সারা দুপুর তাস খেলা চলে। বাজার থেকে মাংস আসে, কেরাণীর বাড়িতে রান্না হয় মাছের কালিয়া। অল-ডে টিকিটে অবাধ বিচরণ এবং আত্মীয় স্বজনের কুশল বিনিময়। সিনেমার হাউস ফুল হয়ে যায় সন্ধ্যার আগেই কেরাণী বউদের রান্না শেষ। আর পল্লী বিশেষের ভীড়টা একটু বেশি মাত্রাতে বেড়ে ওঠে।

ওয়েষ্ট এণ্ড এর ইতিহাসও মোটামুটি একই রকম। চায়ের টেবিলে আড্ডাটা অনেকক্ষণ ধরে জমাট হয়ে থাকে। তর্কের ঝড় ওঠে। দৈনিক কাগজের বিশেষ পাতাগুলো চিন্তার খোরাক জোগায়। মাছের কালিয়া একধাপ এগিয়ে রূপায়িত হয় 'দুর্গ মুসলাম' আর বিরিয়ানী পোলাওতে। অকালের ল্যাংড়া আম রসনায় রসসঞ্চার করে।

চায়ের টেবিল থেকে উঠে এল অনুপমা। এল বাইরের ঘরে। আজ আর পড়তে ভালো লাগছে না। বাইরের টেবিলে পড়ে আছে আধোলা ষ্টেট্‌সম্যান, দু তিনখানা রঙীন্ সাপ্তাহিক। বাতের পরিচর্যা শেষ করে প্রসন্ন বাবু এখনো বাইরে আসেন নি। তাই বোনেরা একটা নতুন ট্রাইসাইকেল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। গলদা-চিংড়ীর কী একটা বিশেষ ডিশ রান্নার পদ্ধতি সংপ্রতি আয়ত্ত করেছেন শিবানী—বেয়ারাকে বাজারে পাঠাবার আগে সেই উপলক্ষে তিনি একটা তর্ক তৈরী করছেন।

খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা উলটে অনুপমা সেটাকে সরিয়ে রাখলে। বাইরের পৃথিবীতে শরতের রোদ আনন্দিত উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়েছে। নদীর জল জোয়ারে যেখানে এসে খেলা করে যায়, সেখানে আধো জাগ্রত তৃণভূমির ওপর লালফুল ফুটেছে। সকালের শিশিরে রাঙা কাঁকরের রাস্তাটা যেন আরো রাঙা হয়ে উঠেছে।

নিজের কথা ভাবছিল অনুপমা। একমাস আগেও ভাবতেও পারত না যে, জীবনের গতি কোনোদিন ঘুরে যাবে এই বিচিত্র বিপর্যয়ের মধ্যে। অরুণ ওর মনের একটা নতুন চোখ যেন খুলে দিয়েছে। তাকাও—তাকাও—একবার চোখ মেলে তাকাও। চারদিকে যখন আগুন জ্বলেছে—তখন তার মাঝখানে বসে কোন্ বসন্তের স্বপ্ন দেখছ তুমি? যখন দাবানল জ্বলেছে অরণ্যে—তখন বন গোলাপের কোন্ নিভৃত নিকুঞ্জ ছায়ায় হরিণী আত্মবিস্মৃত হয়ে আছে?

আজ যারা বুকের রক্ত বরিয়ে দিল—তারা, কারা? দুঃখের রাত্রে কেন-সমুদ্রে যারা নৌকা ভাসাল, কোন্ তীর্থে গিয়ে তারা পৌঁছুবে? দ্বীপান্তরের পার থেকে যার কান্না ভেসে আসছে, সে কে? আত্মতৃপ্তির স্বর্গলোকে যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, মাটির তলায় যখন বাসুকীর ফণা টলে উঠেছে, তখনো কি তারা জাগবে না?

পুরোনো সহরের পথ ঘাট আর খারাপ লাগে না। ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে দুদিন সে খেলা-

দি'র বাড়ী হয়ে এসেছে। নানা ধরণের মেয়ে আসে ওপানে, নানা রকমের আলোচনা করে তারা। তাদের চোপ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ বিশ্বাসী তাদের মন, সাজিয়ে কথা বলতে পারে না, মাত্রা ছাড়িয়ে তারা যায়ে। আর এত সহজভাবে আলাপ জমিয়ে নিতে পারে যে, প্রথমটা আশ্চর্য লাগলেও কেমন একটা আত্মীয়তা অনুভব করা যায়।

পৃথিবীর নানা জায়গার খবর রাখে তারা। চীনের ডাক্তার শান্-ইয়াৎ-সেন—মহাচীনের নবজীবনের জন্মদাতা—কুয়োমিন্টাং; আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন্‌ফিন্' আন্দোলন—মিচেল কলিন্স্, ডি ভ্যালেরা—ইংরেজী শাসনের বাহুপাশ থেকে মুক্তি। আমেরিকার ওয়াশিংটন—মন্‌রো ডক্‌ট্রিন। স্পেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আল্‌ফান্সোর পদচ্যুতি। মিশরের বীর জগলুল—নতুন তুর্কীর মুস্তফা কামাল—মারাম হালিদা এদিব। মুরনেতা আবদার রহিম—অশিক্ষিত পর্বতচারী সেনাদলের অপরিসীম আর লোকোত্তর বীরত্বের ইতিহাস। সর্বোপরি রাশিয়া—লেনিন-ষ্টালিন-ট্রটস্কি। নিহিলিষ্ট্ আন্দোলন—নার্দিষ্ট সন্ত্রাসবাদ—১৯০৫ সালের জাগরণ, অক্টোবর বিপ্লব। দিকে দিকে মানব-মুক্তির বেদমন্ত্র।

কোন্ জগৎ থেকে কোথায়! এই লাল কাঁকড়ের পথ, ওই কাউবন—ওই নদী, আইভিলতায় বেড়া দেওয়া, সীজন ফ্লাওয়ারে মণ্ডিত আর ফুলের গন্ধভরা ডাক বাংলো। শঙ্কর দা'র গান, নীতীশের সাজানো কথা, প্রসন্ন বাবুর অফিসতত্ত্ব। মুহূর্তে ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়। আসমুদ্র হিমাচল মন্ত্রিত করে প্রতিধ্বনি তোলে নিখিল বিশ্বমানবের কলকল্লোল।

একি ভালো? ভালো এই ঝাঁপিয়ে-পড়া? সত্যিই কি এর প্রয়োজন ছিল? কিন্তু অত কথা বুঝতে পারে না অনুপমা, বিচার করতে পারে না। নেশা ধরেছে মনে। গতানুগতিক আর নিত্য নিয়ন্ত্রিত জীবনের গতি ছাড়িয়ে একটা নতুন জগতে প্রবেশ। সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে অসাধারণে।

আর অরুণ। কী আশ্চর্য মানুষ। কত জানে, কত ভাবতে পারে। কত কঠিন জিনিস মুহূর্তে সূর্যের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়—অবারিত রৌদ্রে প্রসারিত ওই বীথিপথটার মতো সহজ আর সংশয়হীন হয়ে ওঠে। এত ভালো ছেলে সুস্মিত, এমন মিষ্টি মেয়ে বেলা দি!

নীতীশ এসে ঢুকল।

—নমস্কার!

—নমস্কার!

অনুপমার মনটা মুহূর্তে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। কদিন থেকেই যেন কেমন করে তাকায় নীতীশ, দৃষ্টিটা ভাল লাগে না। চোখের চকিত কটাক্ষগুলো যেন হিংসায় আর লোভে মুখর। উঠবার ইচ্ছা সত্ত্বেও অনুপমা উঠে যেতে পারল না। বসলে, বসুন।

নীতীশ বসল এবং ভালো করেই জাঁকিয়ে বসল। পকেট থেকে বার করলে একটা ছোট কাগজ—

'জয়যাত্রা'। ওপরে অগ্নি-নয়না রক্তবসনা এক নারীর মূর্তি—দুহাতে তার শৃঙ্খল, আর পেছনের পটভূমিতে চলেছে একটা শোভাযাত্রা—দিগন্তে ঝকে উঠছে শত শত রক্তাক্ত তলোয়ার।

বিনাভূমিকায় নীতীশ কাগজটার পাতা উল্টে গেল। বললে, এই কাগজে একটা কবিতা দেখছি। লেখিকা কুমারী অনুপমা সরকার। আপনি লিখেছেন?

—আপনার কী মনে হয়?—অনুপমার শুকনো গলাটা আরো শুকনো হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠল সংশয় ও সন্দেহ।

—আমার মনে হয়—জোর দিয়ে নীতীশ বললে, এ আর কেউ। এমন কবিতা আপনি কখনো লিখতে পারেন না।

—কেন, কবিতার অপরাধ?

—অপরাধ এই যে, মানুষের রক্ত গরম করে তোলা ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুনুন আমি পড়ছি। কবিতাটার নাম: শহীদ।

নীতীশ পড়ে চলল:

ললাটে পরিয়া ঘৃণার বহ্নি
রক্ত বিভূতিটিকা,
ফাঁসির মঞ্চে যাহারা জ্বালালো
জীবনের দীপশিখা—
মিথ্যাচারের বন্ধন-ডোর
দুঃখরাত্রের তমিস্রা-ঘোর
করিয়া ছিন্ন করিয়া দীর্ণ
যাহারা আসিলো দ্বারে
আজি কি তাদের ফিরাইয়া দিবে
বিফল অহঙ্কারে!

নীতীশ বললে, এ শুধু সিডিসন। এর মধ্যে আর্ট নেই।

অনুপমা হাসল, জবাব দিল না।

ঈশান গগনে জাগে ধূর্জটি
প্রলয়-পিনাক-পাণি,
ভীরুতার বাঁধ ভেঙে দেবে সব
রুদ্র-আঘাত হানি।
ভারত-শ্মশানে মহা-কাপালিক
উচ্চারে তারি' আবাহন-মন্ত্র,

প্রাণের সন্ধিৎ শোণিতের ছবি
আজিকে ঢালিল যারা,
পরশে তাদের হল কৃতার্থ
মৃত্যু-পাষাণ কারা।

—নাঃ, এ কবিতাই নয়। নীতীশ হতাশভাবে পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

—কেন, কবিতাটার অপরাধ?

—বলেছি তো, আর্ট নেই।

—আর্ট বলতে কী বোঝেন আপনি? জীবনের যা সত্যিকারের দাবী সেটাকে এড়িয়ে চলাই কি আর্ট? তা হলে সে-আর্টকেও এড়িয়ে চলাই ভালো।

—তাই নাকি!—বিস্ফারিত চোখে নীতীশ অনুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তর্ক করতে পারত, অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারত আর্ট-সম্বন্ধে, কিন্তু ম্যাট্রিক-পড়া একটা মেয়ের কাছে সে কথাগুলোর অপব্যয় করে লাভ নেই। শুধু অনুপমার স্পর্ধা দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

অনুপমা বললে, হাঁ। তা ছাড়া স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে ও কবিতাটা আমিই লিখেছি।

নীতীশ সোজা হয়ে বসল: আপনি?

—নিশ্চয়।

—কেন লিখলেন?

—লিখতে ভালো লাগল বলে।

—কিন্তু এসব জিনিস লিখবার ধার জানেন? জানেন, এর জন্য মিষ্টার সরকারকে শুদ্ধ বিদেয় দেলতে পারেন?

একমুহূর্তে অনুপমার মুখখানা পাংশু হয়ে গেল কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলে পলকের মধ্যেই। শান্ত-গলায় বললে, সে ভাবনা আপনি নাই ভাবলেন।

—ওঃ!—নীতীশের চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগল: যাক অরুণবাবু তা হলে ভালোই পড়াচ্ছেন আজকাল। দুধকলা দিয়ে কাল সাপ পুষছেন মিষ্টার সরকার।

অনুপমা কঠিন ভাবে বললে, অন্য একজন ভদ্রলোকের অসাক্ষাতে এই ভাবে তাঁর সমালোচনা করাটা ভদ্রতার কোন্ পর্যায়ে পড়ে বলতে পারেন?

—ভদ্রতা! হেমাঙ্গন জেমের সোনার চশমা আর গরদের পাঞ্জাবী সত্ত্বেও নীতীশ যে মুখভঙ্গী করলে, তার মধ্যেও কোনো আর্ট নেই: কার সঙ্গে ভদ্রতা করব? একটা অ্যানার্কিষ্ট—একটা টেরোরিষ্টের সঙ্গে?

—আপনি কি করে জানলেন, তিনি অ্যানার্কিষ্ট কি, কি?

—আমার জানবার কোন দরকার নেই! মিষ্টি করে হাসতে গিয়ে, নীতীশ অত্যন্ত কুশ্রীভাবে হাসল: যাদের জানবার দরকার, তারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে এবং সকলকে জানিয়েছেও এখন আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আজ সকালেই অরুণ মজুমদার অ্যাণ্ড কোং অ্যারেষ্টেড হয়েছে।

—কী বললেন? - অনুপমা প্রায় চীৎকার করে উঠল।

—হাঁ পাকা খবর। স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন। আজ শেষ রাত্রে সমস্ত শহর স্যানসাক করা হয়েছে, ধরা পড়েছে হোল গ্যাং। আর একটু ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেলে আপনিও বাদ যেতেন না মনে হচ্ছে।

—ধন্যবাদ।

অনুপমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তারপরে দ্রুতবেগে চলে গেল পাশের ঘরে।

নীতীশ বোকার মত বসে রইল। এতক্ষণে যেন চমক ভেঙেছে তার। এ কী করল সে! এই কি অনুপমাকে পাবার পথ! রাগে হিংসায় আর অন্ধ বিদ্বেষে ঠিক এর উল্টো ফলটাই কি ফলল না? সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরের খবর জানতে পারলে অনুপমা কি তাকে কখনো এক বিন্দু শ্রদ্ধা করতে পারবে?

শিবানীর উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল, বাইরের ঘরের দিকে আসছেন তিনি। সিগারেটের টিনটা নিঃশব্দে পকেটে পুরে নীতীশ বারান্দায় চলে এল, নেমে এল পথের ওপর। আর বসবার ঘরের মেঝেতে পড়ে রইল 'জয়যাত্রা' পত্রিকাটা—হাওয়ায় তার পাতাগুলো উড়তে লাগল।

• • • • •

কিন্তু অনুপমাকে শেষ পর্যন্ত যে ভয় করল সে অরুণ মজুমদার নয়, নীতীশ মল্লিকও নয়। তার নাম সোমনাথ দত্ত।

নিজের ঘরটির মধ্যে একান্তভাবে নিজেকে সংকুচিত করে নিয়েছে অনুপমা। পড়ার মন নেই—লিখতে ভালো লাগে না। মিশতে ইচ্ছে করে না কারো সঙ্গে। প্রতিদিনের জগৎটা বিস্বাদ হয়ে গেছে, নতুন জগৎটা ধরা দিয়েই সরে গেল দূরে। একটা নিরুৎসাহ অনাসক্তির জাল ঘিরে দিনগুলোকে ঘিরে দিয়েছে কেউ।

কোথায় গেল অরুণ—কোথায় গেল বৃহত্তর মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন! লেনিন—ষ্ট্যালিন—মুস্তাফা কামাল—ডি ভ্যালেরা, নব জাগ্রত চীন—প্রাণস্পন্দিত ভারতবর্ষ। ঝাউবনের মর্মর যেন কান্নার সুর হয়ে বাজে; নদীর কলোচ্ছ্বাস দ্বীপান্তরের পার থেকে বন্দিনীর আর্তনাদ বয়ে আনে। রেডিয়োর গান যেন নির্লজ্জ পরাধীনতাকে বিকৃত মুখে উপহাস করে যায়।

ভাল লাগে না অনুপমার—উৎসাহ আসে না। নীতীশ যেন কেমন হয়ে গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে তার। আজকাল আর তেমন আসা-যাওয়া

করে না। যখন আসে প্রসন্ন বাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, শিবানীর সঙ্গে বাঁধা ভদ্রতা বিনিময় করে। শুনা যায় এখান থেকে ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা করছে সে।

অনুপমার সঙ্গে দেখা হলে যেমন অপ্রতিভ, তেমনি বিপন্ন বোধ করে।

—নমস্কার।

—হ্যাঁ, এই যে নমস্কার। নীতীশ যেন চমকে যায়। সন্ত্রস্তভাবে তাকায় অনুপমার মুখের দিকে। ব্যাপারটা কিছু টের পেয়েছে নাকি অনুপমা!

অনুপমা বলে, আজকাল তো আর বিশেষ আসেন টাসেন না।

—না, ইয়ে তেমন সময় পাই না।

ওঃ!

তারপর দুজনেই চুপ করে থাকে। অর্থহীন অস্বস্তির একটা বোঝা চেপে থাকে সমস্ত ঘরটার ওপরে, চেপে থাকে দুজনের মনের ওপরে। সাপ্তাহিক-পত্রিকাটার পাতায় চোখ রেখে অখণ্ড মনোযোগে নীতীশ হোয়াইটওয়ে-লেডলর ক্রিস্‌মাস সেলের বিজ্ঞাপনটা মুখস্থ করবার চেষ্টা করে।

—ওরনাম ট্রান্সফার নিচ্ছেন আপনি।

—চেষ্টা করছি তো। এখানে আর ভালো লাগে না।

—ওঃ।

আবার স্তব্ধতা। কাগজটা থেকে মুখ তুলে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, আপনার পড়াশুনো কেমন চলছে?

—ভালোই।

—বেশ।

নীতীশ উঠে দাঁড়ায়। গরমের পাঞ্জাবীর নীচে সোনার হাত ঘড়িটার দিকে তাকায়। বলে, আচ্ছা, তা হলে আজ আমি আসি। নমস্কার।

—নমস্কার।

এ আর সহ্য হয় না অনুপমার। মনের সুর কেটে গেছে, ছন্দোপতন হয়ে গেছে। মুহূর্তগুলো যেমন দুর্বহ, তেমনি ক্লান্তিকর। একটা নতুন কিছু চাই—নতুন একটা তরঙ্গ। যা অনুপমাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, এই অর্থহীন আচ্ছন্নতার নাগপাশ থেকে, এই পুঞ্জীভূত অবসাদ থেকে।

কিন্তু নতুন তরঙ্গ এসেছিলই তো। সন্ধ্যায় পড়ার বই নিয়ে বসলেই মনে পড়ে মাষ্টার মশাইকে। মাথায় খাড়া খাড়া চুল, ময়লা জামা, গালের ওপরে কাটা-দাগ। সমস্ত পৃথিবী প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে তার তীক্ষ্ণ দুটি চোখের শাণিত দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। বলে, এখনো সময় আছে। এখনো নেমে এসো, যারা প্রাণ দিতে চলেছে, দাঁড়াও তাদের পাশে। তোমরা ছাড়া কে তাদের শক্তি দেবে, কে দেবে প্রেরণা? 'কোনোকালে একা হয় নাই জয়ী পুরুষের তরবারি'—

কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে অরুণের ওপর একটা অভিমান বুকের মধ্যে ঘা দিতে থাকে। মনে হয়, ওকে ঠকিয়েছে অরুণ, একান্ত একটা মিথ্যাচার করেছে ওর সঙ্গে। যদি জানিয়ে দিয়ে গেল, পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এ পার যদি মিথ্যে হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ওপারে যাওয়ার উপায় কোথায়?

ঠিক এমনি সময়ে এল সোমনাথ। অনুপমার দীর্ণ-সংকুচিত মনের দুয়োরে এল জোয়ারের কল-কল্লোল। দেহে-মনে সম্পূর্ণ একটি মানুষ।

এল যেদিন, সঙ্গে দুটো রাইফেল। একরাশ বাঘ আর হরিণের ছাল, কুমীরের দাঁত। পায়ের জুতোটা পাইথনের চামড়ায় তৈরী, ডুয়ার্সের জঙ্গলে নিজের হাতেই সোমনাথ শিকার করেছিল বিরাট অজগরটাকে।

প্রসন্নবাবুর বন্ধু পুত্র। শিকার করে এল সুন্দরবন থেকে।

ব্রীচেসের ওপর টপ-বুট। চকচকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—মাথার চুলগুলো পর্যন্ত লাল। কবজী দু'হাতে মুঠো করে ধরতে হয়।

ভারী ভারী সুটকেস্ দুটো নিজের হাতে করেই নিয়ে এল। এক মুখ হেসে বললে, কাকাবাবু, আমাকে চিনতে পারলেন?

বাতের ব্যথা ভুলে প্রসন্নবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

—আরে সোমনাথ যে। কোত্থেকে এলে?

—সুন্দরবন থেকে। শিকারে বেরিয়েছিলাম। ফেরবার পথে ভাবলাম আপনারা তো এইখানেই আছেন; তাই এই ঊঁকে দেখা করে যাই।

—এসো এসো, বোসো—কী ভাবায় যে অভ্যর্থনা করবেন ভেবে পেলেন না প্রসন্নবাবু: একেবারে এমন বীর বেশে এসে হাজির হয়েছ যে—

শক্তিমান শরীরের চাপে একটা চেয়ারের সর্বাঙ্গে সপক্ষ আলোড়ন তুলে সোমনাথ বসে পড়ল। উচ্চ হাসি হেসে বললে, বনে-জঙ্গলে ঘুরতে গেলে আদ্দির পাঞ্জাবী আর আট চল্লিশ ইঞ্চি কোঁচায় চলে না কাকাবাবু। জোঁক আছে, কাঁটাবন আছে, বেতের ঝোপ আছে, খানা-খন্দল আছে। বাবু সেজে বনে যাওয়া যায় না। ওখানকার যারা বাসিন্দা, তারা ভদ্রতার ধার ধারে না, কাজেই ওদের কাছে ওদের মতো করেই সেজে-গুজে যেতে হয়।

—বেশ, বেশ।—বোকার মতো অট্টহাসি করে উঠলেন প্রসন্নবাবু: বড় ভালো কথা বলেছ। তা কী শিকার করলে?

—একটা ডোরাদার পেয়েছিলাম, আর দুটো হরিণ। কুমীরও একটা মেরেছি, তা ওর চামড়াটা আর আনলাম না, প্রেজেন্ট্ করে এসেছি ওখানকার ফরেস্ট্ অফিসারকে।

—ডোরাদার কী জানোয়ার? বেত্রা?

—নাঃ। সোমনাথ হাসল: ওটা টেক্‌নিকাল টার্ম। ওর মানে হচ্ছে সুন্দরবনের রাজা রিয়েল রাইনেস্ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বেশ বড় জানোয়ার—লেজশুদ্ধ প্রায় বারো ফুট। যা লাফ মেরেছিল—

আর একটু হলেই মাচাং ধরে ফেলত। তাক বুঝে ঠিক সেই সময় কপালে মেরে দিলাম—ব্যাস, একটা রিভলভিং শেলেই ঠাণ্ডা।

প্রসন্নবাবু তেম্‌নি তাকিয়ে রইলেন।

—সে থাক, সে গল্প পরে হবে। আপাততঃ এই বস্তা-টুড়ো গুলো ছেড়ে ফেলা দরকার। ভদ্রসমাজে যখন এসেই পড়েছি, তখন একটু ভদ্রলোক হওয়া দরকার তো।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। প্রসন্নবাবু অবহিত হয়ে উঠলেন: ওরে অপদ্ধু, এই বদমাস! ওগো অনঘ—ওরে অঘ—

সমস্ত বাড়িটায় একটা বিরাট বিপ্লবের মতো এসে দেখা দিলে সোমনাথ। ওজন করা পরিমিত হাসির ধার ধারে না, অট্টহাসিতে সব মুখরিত করে তোলে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাঙা ক্রস আর আইস্ ক্রিস্‌মাস নিয়ে গল্প জমায় না, তাদের ধরে নাড়াচাড়া করে, ক্রিকেট বলের মতো লোফালুফি করে। বলে, হাড় শক্ত হয়েছে তো? মাস্‌ল? স্পোর্টসম্যান হওয়া চাই, হেল্‌দি হওয়া চাই। নামমাত্র বসনহীনেন লজ্জাঃ।

শিবানী সগর্বে অনুপমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—এই আমার মেয়ে। অঘ। ম্যাট্রিক পড়ছে।

সোমনাথ বললে, বেশ।

—আর চমৎকার কবিতা লিখতে পারে। নানা কাগজে লেখে, 'বিশ্ববন্ধু'তে, 'কল্লোলিনী'তে। ওর কবিতা তুমি পড়োনি?

—নাঃ।—সোমনাথ অসংকোচে বললে, কবিতা আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো পড়ি না। হেয়ে মনে ওই একটি শক্তিমান পুরুষ—যিনি বাইরের জগতের সঙ্গে মনোজগতের মিল খাটিয়েছেন। আর পড়ি রবার্ট ব্রাউনিং—যিনি সাইবেরিয়ার মরু-প্রান্তরে দু' হাজার মাইল ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছেন, কবিতা লিখেছেন: লাষ্ট্ রাইড্ টুগেদার।

শিবানী কিছু বুঝলেন না, অতএব হাসলেন। তাঁর মনে হল ছেলেটি বড় গোঁয়ার, কথাবার্তা বড় বেশি কাটখোট্টা। এর সঙ্গে বসে সময় নষ্ট না করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ানো ভালো, বাবুর্চি হয়তো গলদা চিংড়ির নতুন প্রিপারেশনটাই মাটি করে দেবে।

সোমনাথ অনুপমার দিকে অসংকোচে তাকালো। বললে, দেখুন, অপরাধ নেবেন না। আপনার কবিতা সম্বন্ধে কোনো রায় দিতে পারলাম না। কিন্তু একটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে কম্‌প্লিমেণ্ট্ না দিলে অপরাধ হবে। সে আপনার ফিগার। যেমন নীট, তেম্‌নি স্পোর্টস্‌ম্যান্‌লি।

অনুপমা আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনো মেয়ের সামনে তার ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা, অন্ততঃ প্রথম পরিচয়ের পরেই রীতিমতো বিস্ময়কর। স্থূল মনের শক্তি আর শুচিতা না থাকলে এ অসম্ভব।

লজ্জারুণ মুখে অনুপমা মাটির দিকে তাকালো।

—না, না বিব্রত হবেন না। স্বাস্থ্য আমার ভালো লাগে। আজকালকার মেয়েরা রিকেটি হতে ভালোবাসে। কিন্তু ওই 'সঞ্চারিণী পল্লব-লতের' আমার কেমন বরদাস্ত হয় না। অলডাস্ হাক্সলি এক জায়গায় বলেছেন, আধুনিক মেয়েরা স্বাস্থ্যটাকে একটা ইন্-আর্টিস্টিক ব্যাপার বলে মনে করে: They like to be drain-pipes! আপনি যে তার ব্যতিক্রম এটা দেখে আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল।

সোমনাথের কথাবার্তার ধরণটা একটু অমার্জিত। কিন্তু ওই রকম একটা শক্তিমান শরীরের ভেতরে নীতীশের মতো কথাবার্তাই যেন কল্পনা করা যায়। অনুপমা আরক্তমুখে তেমনি তাকিয়েই রইল, জবাব দিল না।

—টেনিস্ খেলতে পারেন?

অনুপমা এবারে মুখ তুলল। পারি সামান্য সামান্য।

—গুড্। আজ বিকেলে খেলব আপনার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে? আমি পারব?

—পারবেন! পারবেন কে বলেছে? সিভালরি করেও আপনাকে জিতিয়ে দেব না। Sport is sport after all!

সোমনাথ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল, সে হাসিতে যোগ দিলে অনুপমা।

বাইরে প্রসন্ন বাবুর দামী মোটরটা। সোফার ঘষে মেজে গাড়িটাকে ঝকমকে করে তুলছিল। সোমনাথ বললে, কী গাড়ি ওটা?

প্রসন্ন বাবু কৃতার্থভাবে বললেন: হিলম্যান।

—নট ব্যাড। স্পীড্ কেমন?

—তা ভালোই। বেশ দাম নিয়েছিল।

—আই সী।—সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো; ভালো গাড়ি আর ভালো ঘোড়া দেখলে আমি আর থাকতে পারি না। চালিয়ে দেখব?

প্রসন্ন বাবু হাসলেন; তা বেশ তো। সোফার!

—না, না, সোফার দরকার নেই। নিজেই পারব আমি। আমার লেসিংকার আছে। তীব্র দৃষ্টিতে সোমনাথ হঠাৎ অনুপমার মুখের দিকে তাকালো: আসুন না, একটা রাইড্ দিই আপনাকে।

—আমাকে?—অনুপমা দ্বিধাবোধ করতে লাগল।

—আসুন, আসুন।—সোমনাথ উজ্জ্বল ভাবে হাসল। ওর গলায় একটা প্রচ্ছন্ন আবেগের সুর, একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের আভাস। অনুপমার মনে হল সোমনাথ ওকে সম্মোহিত করে ফেলছে—বন্দী করে ফেলেছে—শক্তিমান প্রচণ্ড একটা ইচ্ছার জালে।

প্রসন্নবাবু বললেন, যাও না অনু, বেড়িয়ে এসো।

অনুপমা এড়াতে পারল না। মন্দ লাগছে না। একটা বহু-প্রত্যাশিত নতুনত্বের—বহুকাম্য একটা দুর্ধর্ষ আবেগের তরঙ্গ নিয়ে এসে সোমনাথ ঘা দিয়েছে দ্বারে। অরুণ আর নীতীশের দুঃস্বপ্ন থেকে অনুপমা যেন মুক্তি পেয়েছে। সোমনাথ অমার্জিত—সোমনাথ স্থূল। কিন্তু অরুণের ধূর বিস্তৃত জগৎ যেমন বন্ধুর আর সংশয়গ্রস্ত, নীতীশের লোভ আর সৌজন্য তেমনি দুর্বহ। হঠাৎ অনুপমার মনে হল, এদের দুজনের চাইতে সোমনাথ অনেক ভালো, অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।

মোটর বেরিয়ে পড়ল।

সোমনাথ বললো, স্পীড্ ভালোবাসেন আপনি?

—মন্দ কি!

—গুড্ গুড্। আপনার সঙ্গে আমার টেম্পারামেণ্ট মেলে—খোলা লাল কাঁকরের রাস্তার ওপরে সোমনাথ মোটরটাকে যেন উড়িয়ে দিলে।

—করছেন কী, অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটাবেন নাকি!

—ভয় নেই।—সোমনাথ শান্তহাসিতে অনুপমার মুখের দিকে তাকালো। লাল চুলগুলো উড়ছে, পাঞ্জাবীর নীচে ফুলে উঠেছে কঠিন পেশী—সমস্ত শরীরে আত্মপ্রতিষ্ঠ দৃঢ়তা যেন রূপায়িত।

এবার অনুপমাও হাসল: আপনাকে বিশ্বাস করলাম।

—ধন্যবাদ।

সোমনাথের মোটর ছুটতে লাগল। ছিটকে পড়তে লাগল ঝাউবীথি, ছিটকে সরে যেতে লাগল পৃথিবী। আর গতির সেই বিরাট ছন্দের মধ্য দিয়েই সোমনাথ জয় করলে অনুপমাকে।

ছয়

তারপর সাতটা বছর যেন উড়ে গেল গতিশীল মোটরের সঙ্গে সঙ্গেই।

কাহিনীর ওপর দিয়ে যবনিকা উঠল একটা অপরিচিত পটভূমিতে। ইষ্ট্ এণ্ড নয়, ওয়েষ্ট্ এণ্ড্ও নয়। শবরপল্লী। যারা ভ্রাত্য, যারা মন্ত্রহীন, তাদের দেশ। এখান থেকে রেল-ষ্টেশন ষোলো মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে কোথাও কোথাও হাঁটু সমান কাদা আর গলা সমান জল জমে ওঠে—এক ঈশ্বরের মতো সর্বগামী গোরুর গাড়িই সে-পথ দিয়ে চলতে পারে তখন। গরমের দিনে ধূলোর ঝড় ওঠে—বাতাসে যেন 'গু'য়ের কাপটা বয়ে যায়, এক আধটা ছোটখাটো ঝাঁধি পর্যন্ত দেখা যায়।

সামনে তাকাও—পেছনে তাকাও, মাঠ, মাঠ আর মাঠ। শস্য শ্যামল নয়। লাল কঠিন মাটি।

হাতে করে তুলে নাও, ধরিত্রীর কোমল স্পর্শে চরিতার্থ বোধ করবেনা, কঠিন কাঁকরে হাত কেটে রক্ত পড়বে। মাঝে মাঝে ঘাস উঠেছে কিন্তু সে ঘাস কুশ—তলোয়ারের ফলার মতো ধারালো। কোথাও বিন্না, কোথাও শন। বরেন্দ্রভূমির পুরোণো মাটি—রাঢ় আর বঙ্গ যখন সমুদ্রের তলায়, সেই যুগে গৌড়ীয় সভ্যতার আদি কেন্দ্র। পুরোনো পৃথিবী বয়সের জীর্ণতায় আজ রসহীন, প্রাণহীন—শুধু বিন্না আর শন বাতাসে বুড়ির বিশৃঙ্খল চুলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেয়ে যাচ্ছে।

পুরোণো পৃথিবী। গৌড়ের হিন্দু যুগ। সিংহাসনে পঞ্চ গৌড়াধীশ রাজন্য কুল-মুকুট-মণি পরম ভট্টারক সেন-কুল-কমল বিলাস নৃপতিবৃন্দ। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ছত্রধারণ করে; পদবন্দনা করে গুর্জর-দ্বারাবতী; দ্বারে রাষ্ট্রকূট দৌবারিক, চোল-বংশজ সেনাপতি।

সে যুগের রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, সাধ্যায়নীন বেদজ্ঞকে উপচার উপহারে কৃতার্থ করেন। তাম্রপট্টে, স্বর্ণপট্টে তাঁদের দানশীলতার খ্যাতি অক্ষয় হয়ে থাকে। পৌণ্ড্রবর্ধনের তথা উত্তর বাংলার অনুর্বর ভূমিখণ্ডকে শস্যশ্রীতে মণ্ডিত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন জলাশয়—ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে রোপণ করেন বটবৃক্ষ। এখানে ওখানে ছোট গ্রাম, বড় বড় দীঘি, পাথর বাঁধানো সোপান শ্রেণী। ছোট বড় সংখ্যাতীত দেবালয়ে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি আকীর্ণ। কোথাও মহালক্ষ্মী, কোথাও বাসুদেব, কোথাও মহিষমর্দিনী, কোথাও পুরন্দর, কোথাও বা পদ্মযোনি ব্রহ্মা। চতুর্ভুজ শিব, অষ্টভুজা কালিকা।

সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, ধূপধূনার গন্ধে আকাশ আকুল হয়ে ওঠে। অশ্বারোহী সৈন্য ভেরী নিনাদে জানিয়ে যায় মহারাজ-চক্রবর্তীর আদেশ। তখন মেয়েদের কারো নাম চারুনেত্রা, কারো নাম মদালসা, কারো নাম মুকুলিকা। যারা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তাদের নাম পাচু নয়, হাঁদু নয়—কেনারাম নয়। তারা কেউ বহুভূতি, কেউ ইন্দ্রপাল, কেউ বা সোমসেন।

হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ আবার হিন্দুযুগ। তারপরে বিপ্লব। বৌদ্ধ-হিন্দু একই আগুনে আহুতি হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গ হল শ্মশান। বর্ণহিন্দুরা পালিয়ে বাঁচলেন কিরাতদের দেশ রাঢ়ে, হিংস্রজন্তু আর বাঘাবনের দেশ পদ্মা পরপারের বঙ্গে। যাঁরা রইলেন কেউ কেউ অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করলেন, নিম্নবর্ণেরা কতক প্রাণ দিলে, কতক ধর্মান্তর গ্রহণ করলে।

কোথায় রইল মহাকাল আর পুরন্দর, অবলোকিতেশ্বর আর বজ্রাসন সিদ্ধার্থ। মন্দির ভেঙে গেল, বিচূর্ণ দেবতারা লুকালেন মাটির তলায়, দীঘির কর্দম শয়নে। বড় বড় দীঘির চারপাড় ঘিরে ঘন জঙ্গল মাথা তুলল—রাজত্ব করতে লাগল শঙ্খিনী এবং গোলাঘ-গোক্ষুর। অষ্টভুজা কালিকা ভাঙা থানে অধিষ্ঠিতা হয়ে ডাকাতে-কালিতে রূপান্তরিতা হলেন।

উত্তর বঙ্গে জন-বসতি ক্ষীণ হয়ে এল—ধূ ধূ করতে লাগল মরা মাটি। আর একটা বিরাট অঞ্চল ঝোপে মাথা তুলল দুর্ভেদ্য দুর্গম জঙ্গল—চোর-ডাকাতের আস্তানা। আত্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা আর করতোয়ার জলে ডাকাতে-নৌকা হানা দিয়ে ফিরতে লাগল।

মুসলমান যুগ। গৌড় থেকে পাণ্ডুয়া। সাহসুদ্দীন ইলিয়াস সাহ। আবার গৌড়। তারপরে মহামারী—গৌড়-পাণ্ডুয়া জনহীন ধ্বংস-স্তূপ আর অরণ্যে পর্যবসিত হল। বাংলার রাজধানী চলে গেল মুর্শিদাবাদে—বরেন্দ্রভূমির শেষ-শিখা নিবে গেল। সেই বরেন্দ্রভূমি। ধূ ধূ মাঠের এখানে ওখানে লাল মাটির টিলা, মজা-দীঘি, মাটিতে পাথর আর গেরি-মাটি রঙা বিবর্ণ ইটের গুঁড়ো।

সময় পেয়ে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয় আজকাল। খরবাহিনী গভীর নদীগুলোর গর্ভে জমেছে বালির পাহাড়—অদূরে হিমালয়ের ঢল-নামা-বান সে বিশাল জলরাশিকে আর বইতে পারে না। দু' পাশের চালু মাঠ বা 'টাল' ডুবিয়ে দিয়ে সে জল সমুদ্রের আকার ধরে।

উত্তর-বাংলার এই সব অঞ্চলে ভরা-বর্ষার সে রূপের তুলনা নেই। মাইলের পর মাইল জুড়ে জল থই থই করছে। বিল আর দামঘাস মাথা তুলে আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় এক হাঁটুর বেশি জল হবে না। কিন্তু নৌকো বাঁধতে চাও—বারো হাত পাঁশি ডুবিয়ে যাবে। এখানে ওখানে জেগে থাকা হিজল-বনের মাথা, কাছে গিয়ে দেখবে গাছে পাতা নেই, সব সাপ। বিশ হাত জলের নীচে গোরুর গাড়ির পথ—তার ওপর দিয়ে চলে নৌকো। উঁচু টিলার ওপরে স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে, কখনো কখনো দু একটা কুমীরের ডিমও দুর্লভ নয়।

এই বিলে যদি ঝড়ে পড়ো, তা হলে আর আশা নেই। নৌকো ডুবলে সাঁতরাতে পারবেনা, দাম-ঘাস তোমার পা জড়িয়ে নীচে টেনে নেবে। একশো হাত দূরে পাড়ে যদি লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তবু তার সাধ্য নেই তোমাকে টেনে তোলে। সাঁতরাতে নামার অর্থই নিজের নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। অতএব—

এর একটা উল্টো দিকও আছে। সেটা বর্ষায় নয়—বর্ষার অব্যবহিত পরে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন বিলের বা টালের জলে টান ধরে, তখন। এত বড় সমুদ্র তখন ছোট হয়ে গিয়ে খণ্ড খণ্ড জলাধারের রূপ নেয়। আর তাদের মধ্যে যোগ-সাধন করে ছোট ছোট অসংখ্য খরস্রোতা নালা—সেই নালাগুলোর ভেতর দিয়ে তীর বেগে জল নামে। জলের স্রোত! না—মাছের স্রোত। এদেশী লোকে বলে, "জোতা" লাগল।

তোমরা শহরের মানুষ। কলকাতার বাজারে চালানী মাছ কেনো—বরফ দেওয়া মাছের টুকরো খুশি হয়ে বাড়িতে নিয়ে যাও। খুলনের বাজারে বারো আনা দিয়ে এক পোয়া মাছ কিনে আনো। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের নিয়ে একবার এই সময়ে সেই সব নালা বা 'ভাঁড়া'র পাশে দাঁড় করিয়ে দিই।

অন্তহীন আকাশ—অনন্ত বিচিত্র জল-বিস্তার। রাশি রাশি শঙ্খচিল, কানি বক, বড় বক, শামকল, গাইপ। সারি দিয়ে সব দাঁড়িয়েছে 'ভাঁড়ার' পাশে। চারদিক থেকে উঠছে কাদার গন্ধ—পচা ঘাসের গন্ধ—আর মাছের ঝাঁঝটে গন্ধ।

খরস্রোতা জলে হাত ডুবিয়ে যাও একবার। মুঠি ভরে তোলো—আর কিছু নয়, মাছ। চাঁদা, খলসে চাপলি, পুঁটি, চ্যালা, বান, কালবোসের ছানা। মাছ, মাছ, মাছ। একটা খেপ্‌লা জাল ফেললে আর

টেনে তুলতে পারবেনা, মাছের ভারে তোমার জাল ছিঁড়ে যাবে। নৌকো করে যাও—দুপাশ থেকে মাছ লাফিয়ে উঠে তোমার নৌকো ভরিয়ে দেবে।

এত মাছ—অথচ বে-ওয়ারীশ বল্লেই হয়। যাদের জমিদারী, তখনো সময় তারা ছোট ছোট বিলে জলকর বসায়। পশ্চিম থেকে আমদানী 'বিন' আর 'মালা' সম্প্রদায় ভেসাল ফেলে মাছ ধরে। কিন্তু এই সময়টা সমাব্রত। "জোভা"র মাছের ওপরে জমিদার লোভ করেনা। তার অনেক আছে। চেক আছে, দাখিলা আছে, দোর্দণ্ড-প্রতাপ নায়েব গোমস্তা আছে, সার্টিফিকেট আছে, কারো কারো লাঠিয়ালও আছে। সব দিক থেকে নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার ব্যাপারে তার ত্রুটি নেই। কিন্তু এই বিশেষ সময়টা সে প্রসন্ন উদারতায় 'ডাঁড়ার' যারে আর লাঠিয়াল বসায় না। সম্বৎসরে যাদের পেটের ভাত জোটেনা, এই সময়ে মাছ খেয়ে তারা পেট ভরায়।

কিন্তু দিন বদলে গেছে। যারা সাধারণীল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্র দিত, স্বর্ণপট্টে ভূমিদান করত, তাদের বংশধরেরা আজ ভুলতে বসেছে সামন্ত-তন্ত্রের বিরাট আভিজাত্যকে। ধনতন্ত্রের সংঘাতে দিনের পর দিন তারা ক্ষীণপ্রাণ হয়ে আসছে আর সেই জন্যে আত্মরক্ষার অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরছে ধন-তন্ত্রের বিকৃত লোলুপতাগুলো। অবসিত জমীদারীর যেটুকু আছে তার ভেতর থেকেই যতখানি পারে চুষে-নিংড়ে নিতে চায় তারা। ফলে এখন এই ডাঁড়ার মাছগুলোর ওপরেও নজর পড়েছে তাদের। কেন এত মাছ বারোভূতে লুটে খাবে, কেন যাবে অভুক্ত প্রজাদের পেটে? অথচ ওই মাছ যদি বিক্রী করা যায়, তাহলে অন্তত পাঁচশো টাকা ঘরে আসতে পারে।

সুযোগ-সন্ধানী লোকেরও অভাব নেই। পশ্চিমের আমদানী 'মহলদারেরা' সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নামকরা মাছ-ব্যবসায়ী সিপাই মহলদার কালীর 'ডাঁড়ার' জমিদারকে জানিয়েছে যে এবার "জোভা"র সময় ওই ডাঁড়া সে ইজারা নেবে—পাঁচশো টাকা নজরানা দেবে জমিদারকে।

আর সেই জমিদার সোমনাথ দত্ত।

নীচে চাষ্ জমি বা টাল যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তার থেকে মাইল খানিক সরে এলে একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। গ্রাম বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের বসতি নেই। দু চার ঘর ওঁরাও তুরী আর মুণ্ডা। আর আশে পাশে যে সব তালবনে ঘেরা রাঙা মাটির টিলা, সেগুলো সাঁওতালদের আস্তানা।

মহা-পৃথিবী—বিশাল পৃথিবীর একটা খণ্ড রূপ। এখানকার যারা মানুষ—তারা মানুষ নয়, মানুষের ভগ্নাংশ; অথবা মানুষের অপূর্ণতা। তারা মাদল বাজায়, মহুয়া আর ধান পচিয়ে মদ তৈরী করে। যোগ-অঙ্কে এখনো তারা ঠিক দিতে শেখেনি, কাজেই জমিদারের আমলারা তাদের ঠকায়, ঠকায় মহাজনেরা। মাটির বেশি কাছাকাছি বলেই মাটিকে ভোলেনি; নাচবার সময় তাদের খোঁপাতে জড়িয়ে নেয় কচি-কিশলয়ের মঞ্জরী। হরি-সংকীর্তনে যোগ দেয়, মুর্গী বলি দেয় 'বোঙা'র পুজোতে।

যেদিন পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রভূমি মৃত-অতীতের কঙ্কাল বুকে করে পড়েছিল মজা-দীঘিতে বিশৃঙ্খল অরণ্যে আর উষর মৃত্তিকায়—সেদিন ওরাই এসে এখানে আস্তানা বেঁধেছিল—ঘরছাড়া যাযাবরের দল। সেদিন কোনো

জমিদার তাদের কাছে খাজনা চায়নি, পত্তনির জন্যে নজরাণা দাবী করেনি। কিন্তু মরা-মাটি যখন ওদের লাঙলের ফলায় প্রাণ পেল, যখন অনাবাদী জমিতে ফলতে লাগল আউ-আমন-বোরো, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লোভও এল এগিয়ে।

তাই ওদের গ্রামের মাঝখানে আজ জমিদার-বাড়ি আকাশে স্পর্ধিত মাথা তুলেছে। অবশ্য ঠিক আজই নয়। এই বাড়ি করেছিলেন সোমনাথের বাবা গিরিশনাথ। শহরের কোলাহলের বাইরে মাঝে মাঝে এখানে এসে তিনি থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর ভালো লাগত এখানকার দিক-চিহ্নহীন প্রান্তর—ভালো লাগত বর্ষার ভরা টালে সমুদ্রের মতো রাশি রাশি জলের উদ্দাম-নৃত্য। খুব সম্ভব খানিকটা কাব্যধর্মী ছিল গিরিশনাথের মন।

কিন্তু তার চাইতেও বেটা বড় কথা ছিল—এই সাঁওতালদের অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন গিরিশ-নাথ। জমিদারের চিরা-চরিত পদ্ধতি অনুসারে খাজনা তিনি নিতেন, কিন্তু সেজন্যে কড়াকড়ি তাঁর ছিল না। কলা, মূলো, আখের তামাক কিংবা দুটো বুনোশুয়োরের দাঁত পেলেও খুসি হয়ে যেতেন তিনি। সাঁওতালদের সঙ্গে করে তিনি কুমীর মারতে বেরুতেন, বেরুতেন বাঘের সন্ধানে। শোনা যায়, তাদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে পচাই খেতেন, সাওতালী নাচও উপভোগ করতেন। এই নির্বোধ অথচ সদানন্দ সরল প্রজাদের ওপরে অকৃত্রিম একটা অপত্য-স্নেহই তাঁর ছিল।

তাই এখানে বাড়ি করেছিলেন গিরিশনাথ। বাড়িটা অবশ্য জমিদারের নাম-রাখবারই মতো। পাঁচিলে ঘেরা মস্ত তিন-মহলা বাড়ি। সামনে সিংহ-দরজা। আশে পাশে অন্তহীন মাঠ—আর অনেক দূরে চিক চিক করছে নদীর একটা রুপালি রেখা। নদীটা অবশ্য আগে অনেক কাছেই ছিল, কিন্তু বছর দশেক আগে থেকেই দূরে সরতে সুরু করেছে। পাহাড়ী নদীর যা স্বাভাবিক নিয়ম—সেই ভাবেই বদলে নিয়েছে নিজের গতি-পথ। শুধু অনেকটা জুড়ে খানিকটা মাটি-মেশানো বালির রিক্ত শয্যা বিকীর্ণ হয়ে আছে, তার ওপর গজিয়েছে এলোমেলো আকন্দ আর বন-তুলসীর ঝাড়।

এখানে সোমনাথ সচরাচর কখনো আসে না। ছেলেবেলায় দু একবার এসেছিল, নদীতে নৌকো ভাসিয়েছিল আর এয়ারগান্ দিয়ে শঙ্খচিল শিকার করবার চেষ্টা করেছিল, এই পর্যন্তই মনে আছে। কিন্তু তারপরে এখানে আসবার আর কোনো প্রয়োজন বা প্রেরণা বোধ করেনি। শিকারে তার ঝোঁক আছে, কিন্তু অরণ্যের সে রোমান্স্ বা অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জাতের জিনিস। শহরের জীবন সে ভালোবাসে, ভালোবাসে সেখানকার মুখর জন-যাত্রা, অনাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে বীথি-পথ দিয়ে ঝড়ের গতিতে রেসিং কার চালিয়ে যাওয়া, রেসের ঘোড়ার বাজী ধরা।

সে নাগরিকতার নেশা—সে নেশা সভ্যতার।

তবু কেন আসতে হল এখানে?

বলা বাহুল্য, একেবারেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নয়। প্রয়োজন। বাস্তব এবং বিরক্তিকর প্রয়োজন। রেসিং কার আর রেসের খরচ, নতুন রাইফেলের খরচ, এগুলো শহরের পথঘাট থেকে কুড়িয়ে পাওয়া

যায় না। নাগরিক জীবনযাপনের ইন্ধন এই সমস্ত পল্লী এবং অনাবৃত জায়গাগুলো থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। যেখানে কোমল, অনাবরণ আর স্নেহস্নিগ্ধ পৃথিবী—যেখানকার মানুষ ধুলো-কাদার মধ্য থেকে সোনা কুড়িয়ে তোলে শহরের পাথর বাঁধানো কঠিন পথে ছড়িয়ে দেবার জন্যে এবং নিজেদের জন্যে রিক্ততার করপুট ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—বাধ্য হয়েই সোমনাথকে সেখানে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে।

আর সঙ্গে এসেছে অনুপমা। কিন্তু তার কথা পরে বলব।

নীচের তলার বসবার ঘরে কথা বলছিল সোমনাথ আর সিপাই মহলদার।

বাইরে ঘনিয়ে আসছে বিকালের ছায়া। দূরে তালবনের পটভূমিতে সূর্য রক্ত ছড়িয়েছে—বিলের জল রাঙা হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বুনো হাঁস।

মহলদার লম্বা চেহারার লোক। মুখে বসন্তের দাগ। বাসন্তী রঙের ধুতির ওপরে ময়লা কুর্তি পরা—দু হাতে প্রাণপণে খৈনী ডলছিল সে।

মহলদার বললে, এতো ঠিক কথাই বাবু। এত টাকার জিনিস আপনার—কেন এভাবে বরবাদ হয়ে যাবে? যদি ভরসা দেন তো কাল থেকেই আমি বাঁধ দিয়ে ফেলি।

সোমনাথ একটা চুরুট ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগল, জবাব দিল না।

—টাকার জন্যে ভাববেন না আপনি। পাঁচশো না হয় সাতশো নিন। ঘোট কথা ওই বিল আর ডাঁড়া ছেড়ে দিন আমাকে—তারপরে যা হয় তা হবে।

সোমনাথ চিন্তিত মুখে বাইরের দিকে তাকালো। আধো-অন্ধকারে সাঁওতাল পাড়াটা দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে আসছে—শুধু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাদলের শব্দ। সোমনাথ বললে, যা হয় তা হবে নয়। সাঁওতালদের তুমি চেন না মহলদার। একবার ক্ষেপে গেলে ওদের সামলানো মুস্কিল।

—ক্ষেপবে? কেন ক্ষেপবে? মুঠিভরা খৈনী মুখে পুরে দিয়ে মহলদার উৎসাহিত হয়ে উঠল: ওদের ক্ষেপবার কী আছে হুজুর। আপনার জমি, আপনার জল—আপনি যা খুশি তাই করবেন। এতে কার কী বলবার আছে।

—তুমি বুঝছ না মহলদার। চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে সোমনাথ বললে, এতদিন ধরে ওরা ডাঁড়ার মাছ ধরে খাচ্ছে কোনোদিন কেউ বাধা দেয়নি। সেই থেকে ওদের একটা দাবী দাঁড়িয়ে গেছে। সে দাবী সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে কর নাকি?

—বেশ তো, জোর করুন না হুজুর।

—সেটা কি বিশ্রী হয়ে উঠবে না?

মহলদার অনুকম্পার হাসি হাসল।

—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি হুজুর।

—বাঙ্গালি জমিদার বড় ভদ্রলোক। খালি দুধ-ঘিউয়ের শ্রাদ্ধ করতে পারে, আর কিছু পারে না। সোমনাথের চোখে ঝক্ করে আগুন জ্বলে গেল। অপরিসীম স্পর্ধা লোকটার। এক চড়েই মহলদারের মাথার খুলিটা দশহাত দূরে উড়িয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সোমনাথ কিছু বললে না, শুধু নীরবে চুরুট টেনে চলল।

মহলদার অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, হুজুর, তা হলে?

—তুমি যাও, আমি ভেবে দেখব। কাল খবর নিয়ো।

—হুজুর।

সেলাম করে বেরিয়ে গেল মহলদার।

টেবিলটার ওপরে পা তুলে দিয়ে সোমনাথ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। ব্যাপারটা নিজের কাছেও খুব বেশি ভালো লাগছে না। হাঙ্গামা বা মারামারিটাকে সোমনাথ খুব বেশি ভয় করে না, নতুন রাইফেলটা যতক্ষণ হাতে আছে, তখন পাঁচশো হোক বা পাঁচহাজার লোকই হোক, সেজন্যে কিছু দুশ্চিন্তা নেই সোমনাথের। আসলে যেটা বাধছে সেটা নিজের মনের ভেতর। গিরিশনাথ তাঁর সাঁওতাল-প্রজাদের বড় বেশি ভালোবাসতেন, সন্তান বলে মনে করতেন। আজকের এই অপ্রীতির সঞ্চারটা যেন কেমন—

অথচ উপায় নেই। চারদিকে দেনা। সোমনাথ যখন রেসিং কার কিনেছে, কিংবা র‍্যাক্ করেছে রেসের ঘোড়াকে, তখন দিনের পর দিন জমিদারীও রেস্ দিয়েছে সর্বনাশের অভিমুখে। এখন টাকা চাই, প্রচুর টাকা, রাশি রাশি টাকা। পাঁচ-সাতশো টাকায় বিশ্বগ্রাসী প্রয়োজনের শাকতি যে খুব বেশি মিটবে তা নয়—তবু যতখানি হয়।

ঘরে অন্ধকার ঘনালো। ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে বাইরে, ডাকছে ব্যাং, ডাকছে নানা জাতের পতঙ্গ। দিনের আলোয় যাদের চোখে দেখা যায় না, লুকিয়ে থাকে ভয়ে এবং সংকোচে—সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা নিজেদের আনন্দিত-কলরব দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরটা আলো দিয়ে গেল, দিয়ে গেল এক কাপ চা। অন্যমনস্কভাবে সোমনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে চলল।

—প্রাতঃ পেন্নাম।

সোমনাথের চমক ভাঙল।—কে হরেন? এসো। কিন্তু এই ভর-সন্ধ্যেবেলাতে প্রাতঃ পেন্নাম কিসের হে?

হরেন অপ্রতিভ হয়ে বোকার মতো দাঁত বের করে হাসল।

—আজ্ঞে, বুঝলেন না, ওটা মুখের পর্‌জো' হয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলতে গেলেই ফস্ করে প্রাতঃ পেন্নাম বেরিয়ে যায়—সামলাতে পারি না। অভ্যেস্।

—বহু-অভ্যেস।

হরেন তেমনি দাঁত বের করে হাসল।

—তারপর খবর সব বলো দেখি। বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—আজ্ঞে এই বসছি—একপাশে ছোট বেঞ্চটার ওপরে আসন নিলে হরেন। প্রথম দৃষ্টিতেই বেটা মনে হয় সোমনাথের ঠিক একটা বিপরীত রূপ লোকটা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু অতিরিক্ত রোগা বলেই ঠিক বোঝা যায় না। কানের পাশে চুলগুলো সাদাও নয়, কালোও নয়, সোমনাথের মতো লালচেও নয়—তামাকের রঙের মতো পাটকিলে, অর্থাৎ কলপ-ব্যবহারের নিদর্শন। ছোট ছোট চোখ দুটো ধূর্ততার উজ্জ্বল—শুকনো মুখ আর চিমসে চামড়ার আড়াল থেকে সে চোখ যেন আত্মপ্রকাশ করেনি, উঁকি দিচ্ছে। এ সেই লোক যে শুভঙ্করের নামতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে, কড়া—ক্রান্তি—কাগ—তিলের যোগ চক্ষের নিমেষে করে ফেলতে পারে এবং জমিদারীর পক্ষে অপরিহার্য ফৌজদারী আর দেওয়ানী কার্যবিধির মূল্যবান অংশগুলো যার ঠোঁটাগ্রে। নেকড়ের মতো সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে সে চলা ফেরা করে এবং চলতে পারে খরগোসের মতো দ্রুত-গতিতে।

একটা ছোট ডিবে থেকে এক টিপ নস্যি নিলে হরেন। বললে, আর সব ঠিক আছে কর্তা। সাঁওতালদের একটা মস্ত গুণ এই ওদের জমিদারে অচলা-ভক্তি। জমিদার যা বলবে হাজার অন্যবিধে হলেও তা মাথা পেতে নেবে। এক মেয়েদের গায়ে হাত না পড়লে ওদের রক্তে সহজে আগুন জ্বলে না।

—সে তো বেশ কথা।

—বেশ কথাই তো ছিল এতদিন। কিন্তু হালে একটু গণ্ডগোল বেধেছে হুজুর।

—গণ্ডগোল? কী গণ্ডগোল?—সোমনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

—আজকাল যে ওরা অন্ধকার থেকে আলোকে আসছে হুজুর।—হরেন কোঁচার খুঁটেই নস্য-সিক্ত নাকের লালা-নিঃস্রাবটা মুছে ফেললে।

—কেন, পাদ্রীরা এসেছে নাকি এখানে?

—না, পাদ্রী নয়। একজন লেখাপড়া জানা বাঙালীবাবু, বছর পাঁচেক জেল-খাটা স্বদেশী মানুষ। সঙ্গে একটা অন্ধ বউ। এখানে এসে আশ্রম করেছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে সাঁওতালদের। তাঁত বসিয়েছে পাঁচ সাত খানা।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে সোমনাথ চোখ বিস্ফারিত করলে।

—বাঙালীবাবু? সঙ্গে অন্ধ বউ?

—আজ্ঞে। সাঁওতালেরা গুরু বলে থাকে। শুনেছি সেই ওদের উপদেশ দিয়েছে ডাঁড়ার বাঁধ দিতে দিয়োনা, নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়োনা। তোমাদের মাছ তোমরা খাবে তাতে কার কি বলবার আছে!

—বটে। বটে। There are more things in heaven and earth।

—আজ্ঞে সেই যতো গণ্ডোগোলের গোড়া। সাঁওতালেরা আজকাল কী বলা সুরু করেছে জানেন? জমি যারা চাষ করে, তারাই জমির মালিক। মাটিতে যে কখনো পা দেয়নি, এক কাঠা জমিতে যে কখনো লাঙল ঠেলল না সে কিসের জমিদার? তাকে খাজনা দিই বলা করে।

—এতদূর?—সোমনাথের চোখে আগুন জ্বলে উঠল: আমার জমিদারীতে বসে?

—আজ্ঞে।—হরেন আর এক টিপ নস্যি নিলে: এভাবে চললে আর বেশীদিন জমিদারী করতে হবে না—মানে মানে তল্পী-তল্পা গুটোতে হবে।

—তাই দেখছি।

রাগে সোমনাথের সমস্ত মনটা জ্বলতে লাগল। এইসব স্বদেশী-করার দল, দেশটাকে রাতারাতি রাশিয়া বানাবার দল! ঘরে এরা যা খুশি চীৎকার করুক, কাগজের পাতায় যত খুশি লিখে যাক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখানে এসব কী? এতখানি বরদাস্ত হবে না—যেমন করে হোক এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—ওই সাঁওতাল গুরুকে কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলতে পারো? আসবে?

—আজ্ঞে তা আসবে। মুখে মিষ্টি আছে, বিনয়ে গলেই থাকে সব সময়ে। কিন্তু আসলে ঠিক আছে, নোয়াতে পারবেন বলে মনে হয় না।

—সে আমি বুঝব। নিজে থেকে না নুইলে নোয়াতে আমি জানি। সোমনাথ হঠাৎ অধৈর্যের মতো উঠে দাঁড়ালো—বারকয়েক অস্থিরভাবে পায়চারী করলে ঘরের ভেতর। চুরুটের রাশি রাশি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঘরটা।

রক্তের মধ্যে যেন শিকারের ডাক শোনা যাচ্ছে—হৎপিণ্ড ছুটোয় দোলা লেগেছে সোমনাথের। কিন্তু এবার আর সুন্দরবনের বাঘ নয়, ডুয়ার্সের গণ্ডার নয়। মানুষ। মানুষের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এই স্বদেশীবাবুদের সোমনাথ জানে, ব্যাপারটা সহজ হবে না।

সোমনাথ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। আচ্ছা তুমি যাও। সাঁওতাল গুরুকে খবর দিয়ো।

—আজ্ঞে। নেকড়ের মতো সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে এবং খরগোসের মতো দ্রুতগতিতে হরেন বাইরের অন্ধকারে নেমে গেল।

সাত

উপরের ঘরে অনুপমা চুপ করে বসে ছিল।

এতবড় বিরাট বাড়ি—দিগন্ত-বিস্তৃত এই মাঠ। বিরল-বসতি রিক্ততা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই অনুপমার।

আজ ছয় বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অনুপমা নিঃসন্তান। মনটা কেমন উদাস আর নিরাসক্ত হয়ে

গেছে। কলকাতার জীবন দুর্বহ—আর অনেকটা জোর করেই সোমনাথের সঙ্গে চলে এসেছে এখানে—মাস তিনেক হাওয়া বদলে যাবে। কিন্তু কলকাতার কোলাহল যেমন খারাপ লাগছিল, এখানকার অতিরিক্ত স্তব্ধতা তার চাইতেও বেশি খারাপ লাগছে।

অবশ্য সোমনাথের চেষ্টার ত্রুটি নেই। রাশি রাশি বই আনিয়ে দিয়েছে, এনে দিয়েছে গ্রামোফোন, তু'পাবারে রেকর্ড। এমন কি ছাই-ব্যাটারী দিয়ে একটা রেডিয়ো পর্যন্ত।

তবু সময় কাটে না। তবু মন ভরে না। আসল কথা—সোমনাথের জীবনের সঙ্গে ছন্দ মেলেনি অনুপমার। প্রথম পরিচয়ে সোমনাথের যে ব্যক্তিত্ব আর পৌরুষকে সে শ্রদ্ধা করেছিল, যা তাকে আকর্ষণ করেছিল অগ্নিসূক্ত পতঙ্গের মতো—তাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমনাথের এত শক্তি যে অনুপমা সেখানে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না; প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন না দিয়ে স্বামীর কাছে এগোবার উপায় নেই।

সাত বছর আগেকার কথা—ছায়ার মতো অস্পষ্টতায় ভরা। অনেক বিস্মৃতি তার ওপরে কুজ্ঝটিকার জাল রচনা করেছে, অনেক ধুলো ছড়িয়েছে সেদিনের চিত্রপটের ওপরে। তবু একজনের কথা মনে পড়ে। সে মাষ্টার মশাই।

মাষ্টার মশাই কলেজের ছাত্র—বয়েস অল্প। সাহস, শক্তি, অর্থ, রূপ—এমন কি বিদ্যার দিক থেকে বিচার করলেও সে সোমনাথের সামনে দাঁড়াতে পারে না। তবু সোমনাথের চাইতে সহস্রগুণে সম্পূর্ণ। একটা নতুন জগৎ—নতুন পৃথিবীর বাণী নিয়ে এসেছিল। অপমানিত লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ। কাঁটা মারা বুটের তলায় দেশের হৃৎপিণ্ড কাদার ডালের মতো দলে যাচ্ছে—পিষে যাচ্ছে। আর পদদলিত মানুষের মুক্তির বাণী আসছে চীন থেকে, রাশিয়া থেকে, নব জাগ্রত তুরস্কের প্রাণ থেকে।

কী জীবন হতে পারত—অথচ কী হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে হয় অরুণকে—সে কি ভালোবেসেছিল? কিন্তু ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই। তার চাইতে যা ঘটেছে তাই ভালো। তাকে মেনে নাও—ক্ষোভ কোরো না, অভিযোগ কোরো না।

কিন্তু তাই কী?

জানলা দিয়ে অনুপমা তাকিয়ে রইল।

ভরা ঝিলে টান ধরেছে। আকাশ ভরে নানা জাতের পাখী। এদিকে সোনার রঙ ধরা ধানের জমির এখানে ওখানে কলা আর তালবনে ঢাকা সাঁওতাল পাড়া। দূরের নদীটার জলরেখাটা বেশ পুষ্ট আর পরিস্ফীত।

মনে পড়ল এককালে কবিতা লিখত সে। বিয়ের পরেও বছর দুই লিখেছিল, অল্প-স্বল্প নামও করেছিল বাজারে। কিন্তু একদিন সোমনাথের একটা প্রচণ্ড অট্টহাসিতে সে কবিতা হাওয়ায় উড়ে গেল।

—কী লিখেছ, 'জ্যোৎস্না-বাসর'? আচ্ছা চাঁদের আলো দেখলেই এমন একটা অদম্য স্যাকামি তোমাদের মগজে ঠেলে ওঠে কেন বলতে পারো?

অনুপমা জবাব দেয়নি।

—এগুলো ইন্‌ডাইজেশনের লক্ষণ—ষ্টমাক ঠিক থাকলে ওসব ব্যাধি কাছে এগোয় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গদাই যা বলেছে তার সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

—হুঁ।

—তুমি রাগ করছ হয়তো—চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে উদাসভাবে কথা ছুঁড়ে দিলে সোমনাথ: কিন্তু সেটিমেন্টের দোহাই আমি সব সময়ে মেনে যে চলতে পারি না, নিজের এই দুর্বলতাটাকে স্বীকার করি। বী হেল্‌দি—শরীরে এবং মনে। সুস্থ কবিতা লেখো, সুস্থ জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করো।

মাসিক-পত্রের পাতাটা উলটে সোমনাথ পড়লে:

চাঁদের আলোয় দুধের সায়রে পাখা মেলে উড়ে যায়
মযূরপঙ্খী নায়ের নতুন অচেনা বিভল্ মন—

—নন্‌সেন্স অ্যাণ্ড্ অ্যাবসার্ড। যেমন দুধের সায়র, তেমনি মযূরপঙ্খী, আর মনের ডানার ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম অপরূপ বস্তু একটা। কবিতা লিখতে চাও—লিখতে পারো ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের মতো? "I sing the body electric"—?

সেই থেকে বাইরের কাগজে লেখা ছেড়ে দিয়েছে অনুপমা। অন্তত: সোমনাথের চোখে না পড়ে। বয়স্কা, বুদ্ধিজীবী সোমনাথ। মেয়ে মনে প্রচণ্ড বলশালী আভিজাত্য। যেন মনশ্চক্ষে মণ্ডলেশ্বর হওয়ার জন্যে ভগবানের কৃপাদাস দিয়ে তৈরী। তার বিরাট শক্তি আর বিরাটতর শক্তির দম্ভের কাছে, কবিতা বলো—জীবনের যা কিছু ললিত আর কোমল বলো, সবই silly আর অর্থহীন।

অথচ নীতীশ। কী চমৎকার রসগ্রাহী মন। কেমন দরদ তার গলায়, কেমন গভীর উপলব্ধি তার পড়ার ভেতরে। হঠাৎ ছন্দপতনের মতো অরুণ এসে না পড়লে তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা নিতান্তই অসম্ভব ছিল না অনুপমার। খুব কি খারাপ হ'ত? কে জানে।

কিন্তু নীতীশও থাক। যা হয়ে গেছে, তাই সত্য। অভিযোগ করে লাভ নেই। সোমনাথের সঙ্গে তার মন হয়তো মেলেনি—কিন্তু এমন একটা দিক সেই সঙ্গে আছে যার মূল্য কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। নির্ভর করতে পারে, নিশ্চিন্ত হতে পারে। সহস্র সংকটের মধ্যেও একা বুক পেতে দাঁড়াবে সোমনাথই। বজ্রধর ইন্দ্রের মতো সে একচ্ছত্র এবং একক। কোনো দুর্বল মুহূর্তেই অনুপমার কাছে এসে অসহায় গলায় বলবে না: এখন কী করা যায় বল তো অনু?

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত নিদ্রা। মৃত্যুর মতো। ভয় নেই, ভাবনা নেই—অতএব প্রাণও নেই। তা ছাড়া যা তাকে হয়তো খানিক পূর্ণ করে তুলতে পারত, সেই সন্তানের আশীর্বাদেও বঞ্চিত অনুপমা। একটা অসাড় আচ্ছন্নতায় সে যেন তলিয়ে আছে, তলিয়ে আছে হিমাচ্ছন্ন একটা শীতলতার মধ্যে।

আজ কিন্তু এই বিকালের বিষণ্ণ-ছায়ায়, দূরের নিঃসঙ্গ প্রান্তর আর জল-বিস্তারের পটভূমিতে বহুদিন পরে একটা ছোট কবিতা লিখে ফেলেছে সে। বলা বাহুল্য, নিতান্তই রোম্যান্টিক ব্যাপার, সোমনাথের অতি-প্রিয় 'পাস্ট্ রাইড্ টুগেদার' নয়, হুইটম্যানের I sing the body electric-ও নয়। এ কবিতা তার অবসরের সঙ্গী, নিভৃত-মনের ডাইরী, গানের কলির গুঞ্জনের মতো খানিক ছন্দোচ্ছ্বাস।

কবিতাটির ওপরে চোখ বুলালো অনুপমা :

মোর বালুচরে ফোটে না তো ফুল,
নাচে শুধু মরুশিখা,
দিয়ে যাও তুমি দিয়ে যাও লেখা
শ্রাবণ মেঘের লিখা।
দূর বন-মাঝে কেকা উতরোল
নীল নদী-জলে ওঠে কল্লোল,
আজো কি দেবেনা চরণ-চিহ্ন
ওগো মোর অ-নামিকা ?

জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সোমনাথ উঠে আসছে ওপরে। মুহূর্তে অনুপমার কবিতাটা বুকের ভেতর ব্লাউজের নিভৃত আশ্রয়ে চলে গেল। সব সহ্য হয়, কিন্তু যে-কবিতা প্রাণ দিয়ে লেখা তাকে নিয়ে কুশ্রী শ্লেষ—ব্যাপারটা কেমন বরদাস্ত করা যায়না।

চিন্তিত মুখে সোমনাথ ঢুকল। কিছুদিন থেকেই অনুপমা লক্ষ্য করছে সোমনাথের মধ্যে ঘুণ ধরেছে কোথাও। সেই সুস্থ বলিষ্ঠ হাসি নেই, নেই তার স্বাভাবিক উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে চুরুটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগল সোমনাথ। ঘরের আলোতে দেখা গেল তার মুখের ওপর তিন চারটে কালো কালো রেখা পড়েছে।

অনুপমা বললে, সারাদিন কোথায় ছিলে ?

সংক্ষিপ্ত জবাব এল : বাইরে।

—বাইরে বাইরেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছ দিনরাত।

—কী করব।

—কেন বিশ্রাম করতে পারোনা একটু ?

বাইরের দিকে চোখ মেলে সোমনাথ বললে, দরকার হয়না।

ব্যাস্—এই পর্যন্তই শেষ। অনুপমা জানে সোমনাথের মন এখন কথা বলবার জন্যে তৈরী নয়। কথাবার্তাটা আরো কিছুক্ষণ টানবার চেষ্টা করলে এমন রূঢ় একটা জবাব আসবে যাতে যে কোনো লোকের অপমান বোধ করা উচিত।

দু'রকমের লোক আছে পৃথিবীতে। একদল আছে যারা নিজেদের সামান্যতম অসুখ আর অসুবিধের ব্যাপার-টাও নিজের ভেতরে পুষে রাখতে পারেনা, চেঁচায়, ছটফট করে, দশজনকে ডেকে সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ, বিশ্বাস নেই নিজের ওপরে—অথবা সেই সব বিশেষ মুহূর্তে বোধ করে একান্ত একটা অসহায়তা। তখন অন্যের কাছে আশ্রয় চায় তারা—সহানুভূতি কামনা করে।

কিন্তু আর একদল আছে যারা ঠিক এর উল্টো। নিজের দুঃখ, নিজের ব্যথাটাকে তারা যতটা সম্ভব নিজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে ভালবাসে। বিকৃত মুখে তীব্রতম যন্ত্রণাকেও বহন করে যায়।

কেউ শুশ্রূষা করতে এলে বিরক্তি বোধ করে, কেউ সহানুভূতি জানাতে এলে সহ্য করতে পারে না। যেন মনে করে তার অসহায় বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে করুণার ছদ্মবেশে আরো দশজনে তাকে অপমান করছে। সজ্ঞাগভাবে না হলেও অবচেতন ভাবে তারা আত্মকেন্দ্রিক—হয়তো অত্যন্ত বেশি স্বার্থপর।

সোমনাথ এই দলের মানুষ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপমা বুঝতে পারছে যে এই মুহূর্তে একটা দুশ্চিন্তার পাথর ওর মনের ওপর চেপে বসে আছে। কিন্তু অনুপমার মতামত চায়না সোমনাথ—সহানুভূতিও চায়না। বেচে সহানুভূতি জানাতে গেলে সেটাকে অসহ্য অনধিকার চর্চা বলে মনে করবে।

সোমনাথ প্রথমে কথা বললে, কেমন লাগছে তোমার?

—ভালো লাগছে না।

—কেন?—সোমনাথ জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো: এত উৎসাহ করে তো এলে। বললে, চারদিকের নির্জনতা তোমার মনের পক্ষে রিক্রিয়েশান হবে, কলকাতার হট্টগোলে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ।

—কিন্তু এখন নির্জনতাই হাঁপিয়ে তুলছে।

—আই সী!—চুরুটের খানিকটা ছাই টোকায় উড়িয়ে দিয়ে সোমনাথ বললে, হাউ কিউরিয়াস্! তোমাদের কবিমনকে বোঝবার উপায় নেই সত্যি। আমি ভাবলাম এখানে এসে তোমার কবিতার খোরাক মিলে যাবে আর তুমি প্রাণ খুলে আকাশের নীলিমা আর বনের শ্যামলিমা পান করতে থাকবে! অপর কিছু না হয় একটা মহাকাব্য তো আরম্ভ করে দিতে পারো।

অনুপমা চুপ করে রইল।

সোমনাথ বোধ হয় খানিকটা স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছে। কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বলে যেতে লাগল: অবশ্য মহাকাব্য মেয়েরা কখনো লিখতে পারেনা। সে নার্ভ কিংবা ছন্দের সে ওজস্বিতা তাদের নেই। তা ছাড়া লিখবার মতো উপাদানই বা কোথায়?

অনুপমা মৃদু গলায় বললে, কেন, তুমিই তো আছো।

—গ্রেট স্কট! ঠিক ধরেছ তো—সোমনাথ খুশি হয়ে উঠল: হ্যাঁ আমি একটা মহাকাব্যের নায়ক নিঃসন্দেহ। একেবারে রামচন্দ্রই বটে। অতটা পিতৃভক্তি নেই সত্যি, কিন্তু রাক্ষস-মারবার যোগ্যতা নিশ্চয় আছে। আর রামধনু আছে আমার নতুন রাইফেলটা—একেবারে অমোঘ। আর তাহলে তুমি নিশ্চয় সীতা?

—তোমার অনুগ্রহ!

—কিন্তু সীতা? ভ্রূকুঞ্চকে খানিকক্ষণ চিন্তা করতে লাগল সোমনাথ।—তোমাকে বোধ হয় স্বর্ণসীতা বলা উচিত। তুমি আছো, অথচ নেই। সোনার প্রতিমার মতো অপরূপ হয়ে আছো, কিন্তু প্রাণ নেই কেন বলতে পারো?

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো, তারপরে হঠাৎ হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো।—সাড়ে আটটা বেজেছে। হরেন রাফেল্‌কে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু এলো নাতো! আচ্ছা তুমি বোসো অনু, আমি নীচে যাই।

—নীচে থেকে এই মাত্রই তো এলে।

—কী করবো নিরুপায়।—সোমনাথ হাসল: তুমি বড় একা একা আছো। তা এক কাজ করোনা, একটা 'বিরহ-শতক' লিখতে সুরু করো—বেশ জমাতে পারবে।

সোমনাথ বারান্দায় চলে গেল, তারপরে নেমে গেল সিঁড়িতে।

কিন্তু সোমনাথের একটা কথার জবাব নিতে পারত অনুপমা—অন্তত জবাব দেবার অধিকার তার ছিল। স্বর্ণসীতাকে প্রাণ-সঞ্চার করে জীবন্ত করবার যে দায়—তার কতটুকু পালন করেছে সোমনাথ? সোমনাথ ঐশ্বর্যের উপাসক আর অনুপমার রূপ সেই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত একটা সম্পদ মাত্র। অশ্বমেধ যজ্ঞে রামচন্দ্র যে স্বর্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার বেশি কিছুই নয়।

•

এইবার ফাঁকা মাঠটা পাড়ি দিয়ে চলো এসো সাঁওতাল পাড়াতে। এরা সোমনাথের প্রজা। সভ্য শিক্ষিত আধুনিক জমিদারের আধুনিক প্রজাবৃন্দ।

চেহারা মিশকালো—ওঁরাও কিংবা কুরীদের মতো কটা রং এদের মধ্যে সহজে চোখে পড়বে না। কারখানায় বা খনিতে যারা চাকরী করে তাদের কথা আলাদা—কিন্তু গ্রামে যারা থাকে, তাদের মধ্যে নৈতিকতার একটা সহজ মানবও আছে এবং সে অপরাধের বিচার করে এরা নির্মম ভাবে। সেইজন্যে আর্যরক্তের বর্ণশঙ্কর এখনো এদের মধ্যে ঘটতে পারেনি।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল—কারো কারো কোঁকড়ানো। হাতে কেউ কেউ চাঁদির বালা পরে। মাদলে সেই চাঁদির বালার ঘা দিয়ে উদ্দাম নাচের ছন্দ জাগিয়ে তোলে। বড় বড় নির্বোধ চোখে শিশুর মতো তাকায়—কোনো কোনো মুহূর্তে সে চোখে যুগো বাঘ হিংসা-বর্ষণ করে যায়। দেহে মনে চিরন্তন সাঁওতাল।

সোমনাথের বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে এসে নেমে পড়ে। আলোর পথে। আলোর পথ—কোথাও সোজা টানা রেখায়—কোথাও বা সমকোণ নিয়ে বেঁকে গিয়েছে। দুধারে ধান—"থুলন' লেগে পথের ওপরে ঝুঁয়ে পড়েছে। ভালো করে তাকালে দেখা যাবে মাঝে মাঝে নানা রঙের বাসের ফুল—সাঁওতাল মেয়েদের মতোই অনাদৃত অথচ অপরূপ।

ক্ষেতগুলো ঠিক সমতল নয়। ঢেউয়ের মতো তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে—এক এক টুকরো ক্ষেত যেন এক একখানা সিঁড়ির মতো পাতা। এই সমস্ত টিলা-জমির মেশে ধানের ক্ষেতগুলো প্রায়ই এম্‌নি ঢেউ খেলানো, হঠাৎ দেখলে অনভ্যস্ত চোখে কেমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলে মনে হয়। আর ঢেউয়ের মতো উঠতে উঠতে ক্ষেতের সীমানাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে যেন পাহাড়ের চূড়োয় সারি সারি তালগাছ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে। ওইখানে লাল মাটির দাওয়া—লেপা ছোট ছোট খোড়ো ঘর—পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। সাঁওতালদের গ্রাম। মাটি-লেপা উঠোনে ছোট ছোট মরাই; উদুখল। কোথাও কোথাও ঢেঁকি। খাঁচায় শালিক আর ময়না। তেরী শিকারী কুকুর—লেজগুলো ছাঁটাই করা। যাযাবর মানুষেরা পুরোপুরি সংসারী হওয়ার চেষ্টায় আছে।

এইখানে—এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বদেশীবাবুর আশ্রম। ছোট এক খানি

ঘর—সামনে একটুকরো ফুলের বাগান; এই অনার্জিত মানুষের দেশে এসেও শিক্ষিত ভদ্রলোক নিজের স্বাভাবিক রুচিবোধটুকু বিসর্জন দিতে পারে নি।

ঘরটি অল্প আয়োজনের মধ্যে সাজানো। দেওয়ালে দু চারজন দেশনেতার ছবি—তাদের ওপরে শুকনো ফুলের মালা দুলছে। কাঠের তাকে—এখানে ওখানে রাশি রাশি বই। ঘরের তুলনায় বারান্দাটা অনেক বেশি লম্বা, তার একপাশে একখানা তেপায়া বেঞ্চি এবং ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েক টুকরো মাদুর বিছানো। আর একধারে চারখানা তাঁত বসানো।

প্রথম সকালের আলোয় সাঁওতাল গুরুর আশ্রমে ক্লাশ বসেছিল।

আট দশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসেছে মাদুরে—তাদের সঙ্গে তালপাতার খাতা; শ্লেট কেনবার পয়সা নেই, এদিক থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার রীতি নীতিই এরা অনুসরণ করে চলেছে। প্রাথমিক অক্ষর পরিচয়ের ব্যাপারে বইয়ের প্রশ্নও এখনো ওঠেনি।

যে পড়াচ্ছিল সে সাঁওতাল গুরু নয়, একটি মেয়ে। বছর চব্বিশেক বয়স হবে। রঙ কালো, রূপ নেই। তার চোখ দুটির ওপরে দুটি সাদা পর্দা টানা—অন্ধ। সীমন্তে সিঁদুরের দাগ, হাতে শাঁখা, পরনে ময়লা লালপেড়ে শাড়ী।

সাত বছরের যবনিকার ওপার থেকেও মেয়েটিকে চেনা যায়—সে প্রমীলা।

কিন্তু তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রমীলা বড় বিপন্ন বোধ করছিল। 'র' আর 'ড়'র উচ্চারণটা এরা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। কেউ আর 'র' বলতে পারে না—সব 'ড়'।

প্রমীলা হতাশ হয়ে বললে, কেউ পারছ না? ড় নয়, র—র। কেউ বলতে পারো না?

একটি ছোট মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হামি পাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে আরো তিন চার জন দাঁড়িয়ে উঠল: হামি পাড়ি।

—পাড়ি নয়, পারি।

—হাঁ হাঁ, পাড়ী নয়, পাড়ী। পাড়্-ী।

—থাক, আর পারতে হবে না কাউকে। ওই ড় ই থাক।

বেলা বেড়ে উঠেছে। বাপেরা গেছে ক্ষেতে কাজ করতে, মায়েরা গেছে শাকড়ি কুড়োতে আর শাক সংগ্রহ করতে। ছেলেমেয়েরা এখন ক্ষেতে বাপেদের খাবার দিয়ে আসবে। ভাত, লঙ্কা আর একটু শাকের তরকারি। ওই খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করবে ওরা। ধান পাকবার উপক্রম করেছে, সেদিক থেকে বিশেষ কিছু করবার নেই। কিন্তু আরো আট দশটা টুকি-টাকি কাজ আছে, গোরু-মোষ চরানো আছে। বুনো ওল সন্ধান করবার দরকার আছে, বাজের সন্ধানে বিলে পলুই নিয়ে যাওয়া আছে।

প্রমীলা বললে, আচ্ছা যাও, এখন ছুটি।

ছেলেমেয়েরা কলরব করতে করতে উঠে গেল। কোমরে ঘুমশী বাঁধা কালো কালো ছেলেমেয়ে। কিন্তু দিনের পর দিন ওদের প্রাণ-চাঞ্চল্যও যেন ঝিমিয়ে হয়ে আসছে। ওদের রক্তে বিষ ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া,

আরো দশটা আধি-ব্যাধি। বাইরের জগৎ সবদিক থেকে ওদের ওপর ভেঙে পড়ছে নিষ্ঠুর আক্রমণে—ওরা এত ছোট বলেই ওদের ওপর কারো করুণা নেই—পৃথিবীরও না।

অরুণ তাঁতে কাজ করছিল খট্ খট্ করে। উঠে এল। পায়ের শব্দে প্রমীলা বুঝতে পারল, হাসল ম্লানভাবে।

বললে, বসো।

অরুণ পাশে কাঠের বেঞ্চটার ওপরে বসল। গায়ে মলো খদ্দরের বেনিয়ান, পরণে খাটো খদ্দরের কাপড়। মাথার খাড়া খাড়া চুলগুলো বড় হয়ে কান আর ঘাড়ের পাশ দিয়ে নীচে ঝুলে পড়েছে। তামাটে রঙ, রোদে-জলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আর চোখের কোণে কোণে দেখা দিয়েছে কালো ছায়া, কিছুটা ক্লান্তি আর কিছুটা বয়সের দ্যোতক।

অরুণ বললে, তারপর উভয়-ভারতী, বিদ্যাদান কেমন চলছে?

প্রমীলা বললে, ভালোই। কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের তত্ত্বমন্থন শেষ হল?

—মোটামুটি। তোমার জন্যে ভালো একটা শাড়ী তৈরীর চেষ্টা করছি। চাঁপারঙের জমি, নীলকেশর ফুলের পাড় বসানো।

—কিন্তু ভালো শাড়ী নিয়ে কী করব আমি?

—কেন, পরবে? শাস্ত্রমতে স্বামীর দায়িত্ব তো জানো। স্ত্রীর অসন-বসন অলংকরণ সবই সে পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্গত। বসন মোটামুটি যা হোক চলছে, কিন্তু অলংকার দিতে পারছিনা—সে অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করেছ।

—অলংকার। প্রমীলার অন্ধ চোখ সপ্রেম কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল। অরুণের একখানা হাত সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলে, টেনে নিলে কোলের মধ্যে। বললে, আমার সব চাইতে বড় অলংকার সাতরাজার ধন মাণিক তোমাকে পেয়েছি। এর চাইতে বেশী নিয়ে কী করব? অরুণ স্নিগ্ধ ভাবে হাসল: ওটা পতিব্রতা নারীমাত্রেই বলে থাকে। কিন্তু গয়না দিতে না পারা স্বামীর পক্ষে ঐতিহাসিক ডিস্‌কেয়ালিফিকেশন—আশা করি স্বীকার করবে।

—না।- আরো শক্ত করে প্রমীলা অরুণের হাতখানা চেপে ধরলে: স্বীকার করবনা। তোমার আর দুষ্টুমি করতে হবেনা। কিন্তু লক্ষ্মীটি, এখন ছাড়ো আমাকে। রাঁধতে হবে যে।

—বাঃ আমি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি? তুমিই তো ধরে রেখেছ আমাকে।

—বেশ করেছি।

প্রমীলা চুপ করে রইল। আনন্দে আর আবেগে বুকটা ভরে উঠেছে—দুলে উঠেছে সমুদ্রের মতো। যেদিন ভেবেছিল নিজের আর কিছুই নেই, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সব মিথ্যে হয়ে গেছে, সেইদিন এল অরুণ, উদ্ধার করল ওকে। আজ ভালোবাসা ছাড়িয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমানই বেশী হয়ে গেছে। অরুণের কাছে নিজেকে মনে হয় দুর্যোগের রাতে বাসা-ভাঙা একটা ছোট পাখীর মতো; যেদিন দুর্বল পাখনা আর নিজেকে বইতে পারছিলনা, মনে হচ্ছিল আর অপঘাতের দেরী নেই, সেদিন কেমন করে এই বিরাট বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে আশ্রয় পেল সে। অরুণ বললে, ছাড়ো, ঘড়ি নেই বোধ হয়। আমি কিছু কাঠ চ্যালা করে আনি।

—এই রোদে কুটুল নিয়ে যাবতে হবে না তোমাকে। কাঠ-কুটরো যা আছে, তাই দিয়ে চালিয়ে নেব কোনমতে।

—না, না, তোমার কষ্ট হবে।

অরুণ চলে গেল।

দূরের মাঠের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে দিয়ে প্রমীলা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। ওই মাঠ নয়, বিলের চিকচিকে জল নয়—রৌদ্রের আলোতে সমুদ্ভাসিত সোমনাথের বিরাট বাড়িটাও নয়। বাইরের জগৎ আজকে রুদ্ধ হয়ে গেছে প্রমীলার।

মনে পড়েছিল সাতবছর আগেকার কথা।

রাজবন্দিনী। বাংলা দেশের কত জেলে ঘুরল। দু মাস, এক বছর, তিন মাস—পনেরো দিন। নানা ধরণের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হল, পরিচয় হল নতুনতর আর বিচিত্রতর বহু তরঙ্গিত চিন্তাধারার সঙ্গে। কোনো কাজ নেই, করবার কিছু নেই। পড়াশুনোয় মন দিলে। তিনটা বছর নিরবচ্ছিন্ন লেখা পড়ার মধ্যে তলিয়ে রইল প্রমীলা।

তারপর কোথা থেকে কী হল—চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু করল। জেলের ডাক্তার এসে বললেন, লক্ষণ খারাপ। ভালো ট্রীটমেণ্ট নইলে শুধু চোখ কেন, প্রাণও বিপন্ন হতে পারে। হাসপাতাল—নানারকমের চিকিৎসা। সরকারের যত দোষই থাক, চিকিৎসার কোনোখানে এতটুকু ত্রুটি যে হয়নি এ কথা কৃতজ্ঞ-চিত্তেই স্মরণ করবে প্রমীলা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। প্রাণ নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিল না বটে, কিন্তু সে অন্ধ হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তার ওপর থেকে। সাড়ে তিন বছর পরে জেল থেকে খালাস পেল প্রমীলা, অন্ধ আর অসহায়।

আরো প্রায় এক বছর পরে অরুণ। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখল এই সাড়েচার বছরে সমস্ত দেশের রাজনৈতিক বদলে গিয়েছে। নতুন পথ ধরেছে, নতুন মত। যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে মন নিয়ে তারা ভাবে—সেগুলো সবই তার কাছে অপরিচিত ঠেকল।

বাধল সংঘর্ষ। চিন্তার কর্মপ্রণালীর। নতুন যুগের যারা নতুন কর্মী, তারা ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে, রেনিগেড্!

লজ্জায় অপমানে অরুণ ম্লান হয়ে রইল। অনেকগুলো বিনিদ্র রাত্র কাটল উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে, চিন্তার বোঝা টেনে। তার পরই দেওয়ালে চোখ পড়ল একখানা ছবির ওপর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি-ত্যাগব্রত ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ।

কিছু নেই, তবু অনেক করবার আছে। যারা ব্রাত্য—যারা সমাজের গোড়া বাঁধে অথচ সমাজ যাদের ভুলে আছে, অনন্ত নাগের মতো মাটির তলায় থেকেও প্রসারিত সহস্র ফণায় যারা ধারণ করে আছে পৃথিবীকে, তাদের জাগিয়ে তোলো, তাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে নিজে ধন্য হও। গণ-জীবনের একেবারে নিভৃত পদ্মে সেইখানেই গণ-নারায়ণ শুয়ে আছেন অনন্ত-শয্যায়—অপমান আর অবহেলার বিষে কালো

তরঙ্গ মিশ্রিত সমুদ্রে। তাঁকে বোধন করবার দায়িত্ব আজ নিতে হবে। নিছক বুদ্ধির পথে নয়, কতগুলো রাজনীতির বাঁধা আইন-কানুনের ভেতর দিয়েও নয়। অন্তর দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, একাত্মতায়।

বন্ধুরা বললে, এস্‌কেপিজম্, বাস্তবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা।

কেউ বললে, তা হলে সোজা পণ্ডিচেরিতেই চলে যাও—গ্রামে আর কেন?

কিন্তু অরুণ কোনো কথার জবাব দিলে না। সত্যি, অনেক করবার আছে। তোমরা যা দেখতে পাও, যা ভাবো, তার বেশি কি কিছুই নেই, তার বাইরে কি কিছুই নেই? দেশকে ভালোবাসবার, দেশের জন্য আত্মনিবেদন করবার দাবী সকলেরই আছে। এবং তার অসংখ্য পথ—কোনো বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির কণ্টকে তাকে আকীর্ণ করবার অধিকার কারো নেই।

ঠিক এই সময় অরুণের সঙ্গে প্রমীলার দেখা হল।

মেয়েদের একটা ছোট প্রতিষ্ঠান—অরুণকে তারা আমন্ত্রণ করেছিল কিছু বলবার জন্যে। সেইখানে অন্ধ এই নিরুপায় মেয়েটিকে দেখা গেল। এখানে সে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সামান্য মাইনে পায়, কায়ক্লেশে চলে। কিন্তু পুলিশ পিছে লেগেছে হয়তো এখানেও তার বেশিদিন জায়গা হবে না। তারপরে কোথায় যাবে! জগদীশ্বর জানেন।

অরুণ প্রমিলাকে বললে, চিনতে পারছ?

প্রমীলা উঠে দাঁড়ালো, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড আছড়ে পড়ছে—চোখমুখ দিয়ে যেন সোডার কাঁচের মতো ঝাঁ ঝাঁ করে বাইরে ছিটকে পড়ছে রক্তের কণিকা। বহুদিনের মরে-যাওয়া গাঙে আবার এমন করে জোয়ার এল কেন?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন? চোখ কী হল?

প্রমীলা জবাব দিতে পারল না, শুধু অন্ধ চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল নেমে এল।

অরুণ বললে, যাক, যা হয়ে গেছে সেজন্য দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই কথাগুলো বলবার জন্যে কাউকে খুঁজছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না। যাক এ ভালই হল যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বহুদিন পরে আবার দুটো কক্ষচ্যুত জীবনের মধ্যে যোগসূত্র বাঁধা পড়ল।

অরুণ বললে, এই আশ্রমে কি তোমার ভালো লাগবে?

প্রমীলা বললে, ভালো মন্দ লাগার তো প্রশ্ন নেই। কোথাও একটা আশ্রয় তো চাই—তাই এখানে মাথা গুঁজতে হয়েছে।

—হুঁ। অরুণ ভাবতে লাগল। প্রমীলার অবস্থাও ঠিক তারই মতো ব্যর্থ আর অসহায়। জীবনে পথ পাচ্ছে না—দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না কোথাও। বরং আরো বেশি করুণ তার অবস্থা—দৃষ্টিহীন সামর্থ্যহীন। তা ছাড়া বয়স আছে, তার অকর্ষ দেহের ওপরে সুযোগ নেবার মতো লোকের অভাব নেই, অভাব হয়ও না কখনো।

অরুণ বললে, আমার সঙ্গে কাজ করবে তুমি?

প্রমীলা তেমনি বিষণ্ণ হাসল: সে আপনার দয়া।

—বিনয় করতে হবে না। আমার অবস্থাও তোমার সঙ্গে মিলছে প্রমীলা। এদের সঙ্গে আমার আর থাপ খাচ্ছে না। দেশ যে পথে চলেছে, সে-পথে আমি চলতে পারলাম না। কিন্তু সে ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে। আমি ভেবেছি গ্রামের একেবারে নগণ্যতম অঞ্চলে চলে যাব, ঘর বাঁধব সেখানে। আত্ম-বিস্মৃত যে সব মানুষ আছে তাদের গড়ে তোলবার ভার নেবো। এই কাজে তুমি যদি আমার সাহায্য করো—

এতক্ষণ চুপ করেছিল প্রমীলা, সহ্য করেছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু আর পারল না। অসহায় একটা কান্নার বাঁধ ভেঙে সে অরুণের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। বললে, তুমি নাও—তুমি নাও আমাকে। আমি আর পারছি না।

অরুণ বিহ্বল গলায় বললে, কী হল?

অশ্রু-সিক্ত মুখখানা তুলে ধরল প্রমীলা। অরুণের মনে হল তার অন্ধ চোখের মধ্য দিয়ে উদ্বেলিত প্রাণটাও যেন বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে। বললে, এতদিন তোমার জন্যে পথ চেয়ে ছিলাম। আজ তুমি এসেছ—তুমি আমাকে তুলে নাও। যেখানে হয়, যত দূরে হয়। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

অরুণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তার পায়ের ওপরে টপ টপ করে প্রমীলার অন্ধ চোখের জল পড়ছে। নির্জন দুপুর—বাইরে থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, দোলা দিয়ে যাচ্ছে বাতাস: আকাশে 'ছটিক জল' পাখীর কান্না। পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

অরুণ প্রমীলাকে তুলে নিলে বুকের কাছে। কানে মুখ রেখে বললে, তাই হবে, আজ আমি তোমাকে তুলেই নিলাম সারা জীবনের মতো। এখানে আজ তুমিও অনাবশ্যক, আমিও রেনিগেড্ সুতরাং তোমার আমার ছাড়া আর কার ভালো বিল ঘটবে বলো?

তারপর—

তারপর থেকেই এই গ্রাম। স্বামী স্ত্রীর শান্ত স্নিগ্ধ জীবন। তপস্যাচরণের মতো পবিত্র, প্রাণহীন। সাঁওতালেরা ওদের ভালোবাসে, ওদের শ্রদ্ধা করে, একান্তভাবে আপনার জন বলে জানে। সে প্রীতি, সে বিশ্বাসের তুলনা নেই।

বুক ভরে গেছে প্রমীলার। অভাব নেই, দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই। 'সব পেয়েছির দেশ' যদি কিছু থাকে সে তো এই। সামান্যতম প্রয়োজন—প্রচুরতর তৃপ্তি। এতদিন পরে প্রমীলা যেন পৃথিবীতে নিজের সত্যিকারের জায়গাটিকে খুঁজে পেয়েছে।

আর অরুণ। অরুণ সম্বন্ধে কী বলবে সে? মহাসাগরের জলে নিজেকে নিঃশেষে নিমগ্ন করে দিয়ে কেউ কি বিচার করে তার ব্যাস, তার পরিধি? শুধু তার তরঙ্গের দোলা, তার স্পর্শ মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত শান্তিতে অনুভব করতে হয়।...

হঠাৎ সামনে অপরিচিত পায়ের শব্দ। সংযত হয়ে উঠে বসল প্রমীলা: কে?

—আমি হরেন। হরেন পাল। জমিদারের নায়েব।

—কী চাই?

—একটা খবর আছে। অরুণবাবু কোথায়?

—ঘরে নেই, কাজে গেছেন একটু।

—ওঃ! অন্ধ দৃষ্টি সত্ত্বেও প্রমীলা অনুভব করতে পারছিল হরেন পালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন গিলে খাচ্ছে: কখন ফিরবে?

—বলতে পারি না।

—ওঃ!—হরেন তেমনি চুপ করে রইল আর প্রমীলা তেমনি অনুভব করতে লাগল হরেনের দৃষ্টির আগুন। তারপর অসহ্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কী দরকার আপনার।

—ইয়ে!—হরেন একবার বলল; তাই বলতে যাচ্ছিলাম। জমিদার সোমনাথবাবু ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চান, কী সব কথাবার্তা আছে। আপনি একটু যেতে বলবেন বিকেলে।

—বলব। আচ্ছা, আপনি তা হলে আসুন।

—আচ্ছা।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল—হরেন চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে তাকাচ্ছে পেছন ফিরে। কিন্তু হঠাৎ জমিদার অরুণকে ডেকে পাঠালো কেন? কী উদ্দেশ্য? শঙ্কিত একটা সংশয় আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্তে প্রমীলার সমস্ত মনটা ভারি হয়ে উঠল।

আট

বুড়োমতন একজন সাঁওতাল এল বিকেলের দিকে। হাতে তার গোপীযন্ত্রের মতো একটা কাঠের বাজনা। তারে ঘা দিলেই গুম্ গুম্ করে বেজে ওঠে। সেইটি বাজিয়ে জমিদার বাড়িকে সে খুসি করবে খুব সম্ভব এই আশা নিয়েই এসেছিল।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতেই অনুপমার কাণে গেল বিচিত্র গানের সুর। প্রথমটা মনে হল কেউ যেন সুর করে কাঁদছে। কিন্তু ভালো করে কাণ দিতেই বোঝা গেল, ওটা কারো কান্না নয়—গান।

"আইস কুটুম, বইস কুটুম,
শালি-ধানের চিঁড়া কুটুম খাও—"

বাঃ। অনুপমা কৌতূহলী হয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালো। নীচের কাছারীর পাঁচ সাতজন দারোয়ানও বেশ মন দিয়ে গান শুনছে। হঠাৎ লোকটার নজর গেল ওপরের দিকে আর উৎসাহও পাঁচগুণ বেড়ে চলল। নেচে নেচে গাইতে সুরু করলে সে:

"আকাশে দেও ডাকে,
নদীতে বান ডাকে
কেমনে যিবা কুটুম
নদী পারের গাও—
শালি-ধানের চিড়া কুটুম খাও—"

আকাশে দেওয়া ডাকছে, নদীতে বানের জল ফেঁপে উঠেছে, হে কুটুম, এমন নদী পার হয়ে আর কেমন করে যাবে। অতএব আমার ঘরে এসো, শালি-ধানের চিঁড়ে আছে, তাই চারটি খেয়ে যাও। অশিক্ষিত গ্রাম্য-মানুষ, তাই নব-নীলের মালা আর সদ্যোবিকশিত কেয়া মঞ্জরী দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি, নিতান্তই স্থূল উদরের দিকেই মনোযোগটা সীমাবদ্ধ রেখেছে। অনুপমার মন্দ লাগছিলনা।

খট্-খট্-খট্। দেউড়ির সামনে বিস্তৃত মাঠের ওপার থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে আসছে। প্রথমটা কিছু দেখা যায়না—শুধু মনে হয় মাঠের ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে ধূলোর ঘূর্ণি। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘূর্ণির মধ্যে দেখা যায় একজন ঘোড়সোয়ার। ঊর্ধশ্বাসে সাদা ঘোড়াটা ছুটে আসছে, তার সোয়ার সোমনাথ।

খট্-খট্-খট্। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল—থামল দেউড়ির সামনে। আর মুহূর্তে দারোয়ানের দল দুপাশে ছিটকে সরে গেল। সজাগ এবং সচেতন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের রূপটা তারা বুঝতে পেরেছে।

বুড়ো সাঁওতাল তখনো কিছু বুঝতে পারেনি। সে তখনও ঊর্ধনেত্র হয়ে অনুপমার দিকে তাকিয়ে নানা মুখভঙ্গি করে গান গেয়ে চলেছে, তার কাঠের যন্ত্রটা বেজে চলেছে ভাব বিহ্বল শব্দে :

"আইস কুটুম, বইস কুটুম,
শালি-ধানের চিঁড়া কুটুম খাও—"

ব্রীচেস-পরা সোমনাথ বড় বড় স্পর্ধিত পা ফেলে ভেতরে ঢুকল, তারপর দেউড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা আসতেই তার চোখে পড়ল এই অপূর্ব দৃশ্য। লোকটা পাগলের মতো নাচছে, পাগলের মতো গান গাচ্ছে—অথচ জনপ্রাণী নেই। ব্যাপার কী!

সোমনাথ এগিয়ে এল পেছন থেকে, রাইডারের চাবুক ঘা বসালো লোকটার পিঠের ওপরে। আর্তনাদ করে লোকটা লাফিয়ে উঠল, হাত থেকে যন্ত্রটা পড়ে গেল মাটিতে। অনুপমার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে পাংশু হয়ে গেল—যেন এই আঘাতটা তারই গায়ে এসে পড়েছে।

সোমনাথকে দেখেই আহত লোকটা পিঠের ব্যথা ভুলে গেল। একগাল হেসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে একটা।

—কী হচ্ছে?

—রাণীমাকে নাচ দেখাচ্ছিলাম হুজুর।

—নন্‌সেন্স। বেরো এখান থেকে। পচাই টেনে মাতলামো করবার আর জায়গা পাওনি।

কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা এতটুকু দমে গেলনা। তেমনি হাসিমুখে বাদ্যযন্ত্রটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল হুড় হুড় করে। যেন নিজের প্রাপ্যই সে পেয়েছে।

অনুপমা ঘরের মধ্যে চলে এল। কালো বিদ্বেষ আর তীব্র ঘৃণায় সমস্ত মনটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। কী প্রয়োজন ছিল এই নিষ্ঠুরতার—এই নিরীহ লোকটাকে এমন ভাবে আঘাত করবার। একটা অহেতুকী বিষাদে যেন সব সময়ে সোমনাথের মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে—যারা দুর্বল, তাদের সম্বন্ধে অনুমাত্রও সহানুভূতি তার নেই।

সিঁড়ি কাঁপিয়ে সোমনাথ এল ওপরে। অনুপমার ঘরে ঢুকল, তারপর লম্বা হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিলে একখানা আরাম কেদারাতে। বহু দূর থেকে বোড়া ছুটিয়ে এসেছে, সমস্ত মুখে ধুলো জমেছে। রুমালে একবার মুখটা মুছে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল। তার মেজাজ এখন প্রসন্ন নেই, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায় সেটা।

অনুপমা একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সোমনাথের মুখের দিকে তাকাতেও যেন তার খারাপ লাগছে। সকাল থেকে মনটা খুশিই ছিল আজকে, কিন্তু এই মুহূর্তে কী বিষাদ আর বর্ণহীন হয়ে গেল!

সোমনাথ বললে, কী দেখছ!

—মাঠ।

—তা মন্দ নয়। কিন্তু এসব আমার পছন্দ হয়না।

—কী সব?

—এই যাকে তাকে ধরে গান শোনা, নাচ দেখা। তোমার নিজের একটু আত্ম-সম্মান থাকা উচিত।

আত্মসম্মান! অনুপমা শাণিত দৃষ্টিতে তাকালো সোমনাথের দিকে: ওই লোকটার গান শোনাটাও কি আত্ম-সম্মানের প্রতিবন্ধক নাকি।

—নিশ্চয়। তুমি যেখানে আছো, সেখান থেকে নীচে তাকাতে পারবে না। নীচে তাকালে ওদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নীরব বিদ্রোহে অনুপমা চুপ করে রইল। সোমনাথের কথাবার্তা গুলো মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য বলেই মনে হয় তার। আভিজাত্যের সীমারেখাটা সব সময়ে ধরতে পারেনা সে। কিন্তু যত দিন যায় ততই মনে হয় সে রেখাটা সংকীর্ণ—বড় বেশী সংকীর্ণ। এবং সংকীর্ণ হতে হতে এমন দিন কি আসতে পারেনা যেদিন ফাঁসের দড়ি হয়ে তা গলায় এঁটে বসতে পারে!

অনুপমা চোখ তুলে বললে, আমাকে কী করতে বলো?

—কিছুই করতে বলিনা। তোমার বই আছে, গ্রামোফোন আছে, এমনকি এই জংলী-দেশে ডাই-ব্যাটারী দিয়ে একটা রেডিয়োর পর্যন্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তা ছাড়া তোমার নিজের লেখবারও অভ্যেস আছে। সুতরাং সময় কাটাবার অসুবিধে তোমার নেই।

তা ঠিক। সোমনাথের যুক্তিগুলো নির্ভুল। বই আছে, গ্রামোফোন আছে, রেডিয়ো আছে।

ব্যাস—আর কিছুই চাই না। কিন্তু আরো অনেক জিনিসই আছে, যার কথা সোমনাথ বলেনি, হয়তো বিনয় করেই বলেনি। ভালো ভালো শাড়ী আছে, দামী দামী গয়না আছে। সর্বোপরি সোমনাথের মতো লোকোত্তর স্বামী আছে। অতএব আর কী চাই?

অনুপমার ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি দেখা দিল।

—আদেশ পালন করব।

সোমনাথ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল। বুঝতে পেরেছে অনুপমার সংক্ষিপ্ত হাসিটুকু, বুঝতে পেরেছে এই সবিনয় আনুগত্যের অর্থ। ঠাট্টা করছে অনুপমা।

কিন্তু সোমনাথও হাসল—হঠাৎ দেখলে মনে হয় অত্যন্ত স্নিগ্ধভাবে হাসছে।

—তা বেশ, আদেশ পালন করলেই আমি খুশি হই।—সোমনাথ তেমনি চাইছে: আমার বড় ঘোড়াটা দেখেছ অনু, বড় আরবী ঘোড়াটা?

—দেখেছি।

—প্রথম যখন কিনেছিলাম—শান্ত স্নিগ্ধ গলায় সোমনাথ বললে: ভারী বেয়াদবী করত। চলতে চাইত না, সোয়ারীকে পিঠ ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করত। তারপরে কি হল বলতো? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুপমা তাকিয়ে রইল। কী বলতে চায় সোমানাথ?

—আমার এই রাইডারটা দেখতে পাচ্ছ? এই ঘোড়ার চাবুকটা? বহুদিনের সঙ্গী আমার—এরই ঘায়ে ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করে দিয়েছি। আজ ওর চাইতে বিশ্বস্ত অনুচর আমার আর কেউ নেই—বুঝতে পেরেছ?

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো অনুপমা।

—কী বললে তুমি?

সোমনাথ তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে চেয়ারটার উপরে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। শান্ত স্বরে জবাব দিলে, আমার বড় ঘোড়াটার গল্প বললাম।

—তুমি কি বলতে চাও যে দরকার হলে ওই ভাবে তুমি আমাকে সায়েস্তা করবে?

—কিছুই বলতে চাই না।

অনুপমার ঠোঁট দুটো অসহ্য অপমানে থর থর করে কাঁপতে লাগল: তুমি মনে করো তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারিনি?

সোমনাথ চোখ বুজেছে—যেন ঘুমোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে সে। মৃদু গলায় বললে, কবিতা লিখতে চাও, আবার মল্লিনাথও হতে চাও নাকি? সে বেশ কথা। আর চাবুকটার দরকারের কথা বলছিলে? ছ বছর পরে সত্যিই যদি তেমন দরকার দাঁড়ায় তাহলে আন্তরিক দুঃখিত হবো আমি। এতদিনে আমাকে তোমার চেনা উচিত ছিল অনু। কিন্তু অনুপমা আর দাঁড়ালোনা। দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাইরে।

—শোন শোন চটে যেওনা। কাজ না থাকে রেডিওটা খুলে দাও—সময়টা কাটবে ভালো।

অনুপমার জবাব এলনা।

সোমনাথ চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। অনুপমা ভয়ঙ্কর চটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। চটুক, আর পারা যায়না। পুতুল খেলবার মতো অপরিমাণ সময় বা অতিরিক্ত উৎসাহ এখন তার নেই। চারদিক থেকে সমস্যা মাথা তুলেছে—এমন কি নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে পর্যন্ত ঘা লেগেছে এসে। দেনা—দেনা—দেনা। বন্দুকের গুলি খেয়ে বাঘ যখন লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়েছে মাটিতে, তখন সেই সাফল্যের সঙ্গে দেনার অঙ্কে আর একটা দাগ পড়েছে নতুন করে। রেসিংকারের স্পীডোমীটারে মাইলের পর মাইল উঠেছে—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে ঋণের অঙ্ক। এখন কোনো দিকে যেন আর কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছেনা।

বিলের জল প্রায় শুকিয়ে এল—"জোতা" লাগতে আর দেরী নেই। সাতশো টাকার প্রলোভন নিয়ে সিপাই মহলদার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে—একটু কষাতে পারলে আরো কিছু বাড়বে সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে-ও 'তাতল-সৈকতে বারি বিন্দু' মাত্র। তা ছাড়া তাতেও বিড়ম্বনা। ওই সাঁওতাল গুরুটা—

মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে একটু বোঝাপড়ার দরকার হবে—ব্যাপার নিতান্ত সহজ হবে না। যার স্বার্থ আছে, তার সঙ্গে রফা করা চলে। কিন্তু নিঃস্বার্থ হিতৈষণা যার উদ্দেশ্য—সে সহজে যে পথ ছেড়ে দেয় না এ সোমনাথের বাস্তব এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই লোকগুলো। সোমনাথ হঠাৎ ক্ষেপে উঠল: এরাই যত গণ্ডগোলের গোড়া। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এরা শান্ত শিষ্ট নির্বোধ লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, সঙ্ঘবদ্ধ করে দিচ্ছে। হরেনের সেই কথাটা মনে পড়ল: যে কখনো মাটিতে পা দিল না, হাল ঠেলল না এক কাঠা জমিতে, সে কিসের জমির মালিক! তাকে যে খাজনা দিই সে তো দয়া করে।

দয়া করে! তাই বটে। সোমনাথের চোখ জ্বলে উঠল। দয়ার পরিমাণটা তার কতখানি সেটা একবার পরখ করে দেখতে হবে।

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো, ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। নতুন রাইফেলটা ঠিক আছে, দরকার হলে কয়েকটা গুলি বোধ হয় খরচ করতে হবে। নাঃ, পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় মানুষের জায়গা নেই দেখা যাচ্ছে। যদি শিকারী না হতে পারে, শিকার হতে হবে। কিল্ অর বী কিল্ড।

দূরে বিলের জল দিনান্তের আলোয় ঝলক দিচ্ছে। জল নয়—সোনার খনি, সাতশো, আটশো, হাজার টাকা। আর শুধু টাকাই নয়—সোমনাথের অধিকার, সোমনাথের প্রতিষ্ঠা। সেইটাই সব চাইতে বড় কথা। এক কাঠা জমির জন্যে মামলা করে বিকিয়ে যায় এক লাখ টাকার জমিদারী!

অনুপমা ঘরে এল। সোমনাথ লক্ষ্য করলে দেখতে পেত তার গালের পাশে চোখের-জলের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করলে না।

—আবার কি চাই?

—আমার এখানে আর ভালো লাগছে না।

—সে তো অনেকবারই শুনেছি। নতুন কিছু বলবে?

—না। তুমি আমাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দাও।

—সোমনাথ জবাব দিল না—নীরবে পায়চারী করতে লাগল।

—আমাকে পাঠিয়ে দাও। আর আমি থাকতে পারছি না।

—নিরুপায়। আমার সঙ্গে যখন এসেছ আমার সঙ্গেই ফিরে যেতে হবে। পারা না পারার তো প্রশ্ন ওঠে না।

অনুপমার চোখ ভরে আবার জল নেমে এল। কিন্তু সোমনাথের কাছে তার চোখের জল যেমন অর্থহীন, তেমনি মূল্যহীন। সাধারণের মানুষের কাছে যা স্নিগ্ধ, যা সুন্দর, যা পবিত্র, তাকে অপমান করে চলাই সোমনাথের কাজ। হয়তো এই হচ্ছে শক্তিমানের প্রথা—বলবানের দস্তুর।

অনুপমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমনাথ হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসেছে। অনুপমার কাঁধের ওপর সস্নেহে একখানা হাত রাখলে। কিন্তু স্নেহ—না কৌতুক?

সোমনাথ বললে, রাগ করেছ? মিথ্যে সেন্টিমেন্টাল হয়োনা অনু। পৃথিবীটা অনেক বড়ো—অনেক কাজ সেখানে। তোমার যদি কিছু কাজ না থাকে, তা হলে স্বচ্ছন্দে কবিতা রচনায় বসে যেতে পারো। আজ কী তিথি জানো তো?

—না।

—কবি মানুষ, জানা উচিত ছিল। আজকে পূর্ণিমা। একটু পরেই দেখবে তালের বন আলো করে দিয়ে চাঁদ উঠেছে, বিলের জলে ঝলমল করছে জ্যোৎস্না। কান পেতে থাকলে চাই কি কোকিলের—নয় তো পাপিয়ার ডাকও শুনতে পাবে দু'চারটে। আর তো ভাবনা নেই, এখন থেকেই কবিতার 'মুড্' আনবার চেষ্টা করো গে।

অনুপমা ছিটকে সরে গেল।—থাক, অপমান আর নাই করলে।

—অপমান? কে বলে অপমান? তোমাকে আমি অপমান করতে পারি, এ কথা বিশ্বাস করো তুমি? শাস্ত্রমতে তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী। অতএব—অতএব রবীন্দ্রনাথ পড়ো নি?—

তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজ অপমান মানে!

এ বর্বরতার উত্তর দেওয়া অর্থহীন। অপরিসীম গ্লানিতে চুপ করেই রইল অনুপমা।

ঠিক এই মুহূর্তেই মেঘ কেটে গেল ঘরের মধ্যে থেকে। চাকর এসে খবর দিলে, নীচে হরেন এসেছে সাঁওতাল পাড়ার বাবুটিকে সঙ্গে করে—সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সোমনাথ চাবুকটা হাতে তুলে নিলে। বললে, চলো।

পেছনে অনুপমা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল।

নীচের ঘরে বসে ছিল অরুণ আর হরেন। হরেনের উদ্দেশ্য ভালো, কোনো একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে তা চায়না। অত্যন্ত শুভার্থীর মতো অরুণের পাশ ঘেঁষে বসলে সে। বললে, বাবু কিন্তু বদমেজাজী লোক।

অরুণ মৃদু হেসে বললে, শুনে রাখলাম।

—তা ছাড়া তাঁর বন্দুক পিস্তল রাইফেল—সব কটারই লাইসেন্স আছে।

—বেশ ভালো কথা। কিন্তু আমি অত্যন্ত নিরীহ জীব—কাজেই ওসবে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই তো।

—তা বটে, তা বটে।—সম্পূর্ণ সমর্থন করে হরেন মাথা নাড়ল। ছোট ছোট চোখ দুটো কোটরের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে গেল: আপনি অতি সাদাসিধে ভালো লোক, সে কি আমি জানি না? কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন? আপনি নিরীহ বিনা সেটা বিচার হয় অন্যের স্বার্থের ওপর দিয়ে। বোধ হয় বুঝেছেন কথাটা।

অরুণ হাসল: না বুঝিনি।

বাইরে জুতোর শব্দ। মুহূর্তে হরেন সরে বসল।

ব্রীচেস্-আঁটা সোমনাথ ঘরে ঢুকল। মুখে ঘুমায়িত চুরুট—আর এক হাতে তার রাইডারটা। প্রথম দৃষ্টিতেই অরুণের মনে হল যেন একটা সংঘর্ষের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে সোমনাথ। তার লাল চুলে, লাল মুখে, প্রসারিত কঠিন বুকে আর হাতের চওড়া কব্জীতে একটা সুস্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যঞ্জনা।

পরে সোমনাথও মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিলে তার শত্রুকে। বয়সে তার চাইতে চার পাঁচ বছরের ছোটই হবে। কোথাও এতটুকু অসাধারণত্ব নেই। শান্ত চোখ মুখ—একটা নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে কঠিন। ইচ্ছে করলে একটা চাপ দিয়েই সোমনাথ লোকটাকে গুঁড়ো করে দিতে পারে। কিন্তু মন? সোমনাথের সন্দেহ হল।

অভিজাত সুলভ ভঙ্গিতে দু হাত জড়ো করে সোমনাথ কপালে তুলল: নমস্কার।

অরুণ উঠে দাঁড়ালো: নমস্কার।

—বসুন, বসুন।—সোমনাথ সৌজন্যে অভিভূত হয়ে গেল: আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তা আপনি যে দয়া করে আসবেন—

—দয়া? দয়া করবার কী আছে। আপনার জমিদারীতে থাকি, আপনার প্রজাই তো আমি।

—যাক, যাক, সে সব যাক। কিন্তু হরেন, তুমি এখন যেতে পারো। অরুণবাবুর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে।

—আজ্ঞে আসি—প্রাতঃপেন্নাম—হরেন বেরিয়ে গেল।

ঘরে রইল দু'জন। সোমনাথের ভারী শরীরের চাপে আর্তনাদ করে উঠল রিভলভিং চেয়ারটা। সোমনাথ আস্তে আস্তে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

—যে জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম। আপনি কতদিন আছেন এখানে?

—প্রায় দু' বছর।

—আই সী। সাঁওতালদের সঙ্গেই আছেন?

—কী করা যায় বলুন? ওদের কাছেই আশ্রয় পেলাম।

—যাক, ভালোই মিলন আপনার। ওদের উন্নতি হওয়া দরকার।

—নিশ্চয়। আর সে দায়িত্ব আপনাদের—বিশেষ করে আপনাদের মতো এখন হাইলি এডুকেটেড্ জমিদারদের। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা যে সে দায়িত্ব আপনারা নেন না।

—হিয়্যাসি! টোকা দিয়ে সিগারের ছাই ঝেড়ে সোমনাথ বাঁকা চোখে অরুণের দিকে তাকালো: আপনি বেশ আউটস্পোকেন দেখা যাচ্ছে। গুড্—আই লাইক ইট।

—ধন্যবাদ।

—সোমনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার আকাশের অর্থাৎ কড়িকাঠের দিকে তাকালো। যাক আই মাষ্ট্ বী ব্রীফ্। যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম। এবার "ভোটা"র সময়—শুধু ভোট্ কেন—গোটা বছরই আমি আমার বিলগুলো ইজারা দেব। কিন্তু শুনেছি আপনি তাতে আপত্তি করেছেন।

—আমি আপত্তি করবার কে? যাদের এতোদিনের দাবী, তারাই আপত্তি করবে।

—ডোণ্ট্ বী—সোমনাথের প্রসন্ন মুখের তলা থেকে মেঘ ঘনিয়ে আসতে লাগল: আপনিই এখন সব—ওরাই আপনাকে দেবতা বলে মনে করে। আপনি যা বলবেন তাই শুনবে। কিন্তু দাবী? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ইট! আমার জমি—আমার জল—

—সে তো ঠিক কথা। আইনও তাই বলবে। কিন্তু আইনের ওপরেও আর একটা জিনিষ আছে—সেটা হয়তো মানবেন আপনি। আপনার তো অনেক আছে—কোনোখানে কোন কিছুর অভাব নেই। কিন্তু দুটো দিন ওরা যদি মাছ খেয়ে বাঁচে—ওরা গরীব, কেন এটুকু দয়া করবেন না? সোমনাথ শেষ কথাটার জবাব দিলে না।—অভাবটা রিলেটিভ্ টার্ম। কেউ আধ পেটা খেয়েই পেট ভরায়, কারো বা পৃথিবী গ্রাস করেও খিদে মেটে না। আমার অভাব অভিযোগ কী আছে না আছে সে বিচার আপনি নাই করলেন।

—কিন্তু সব সময়েই বিশ্বগ্রাসী খিদেটা কি ভালো?—অরুণ লঘু ভাবে হাসল: বেচারা বিশ্বের তাতে সামান্য আপত্তির কারণ থাকতে পারে।

সোমনাথের চোখ জ্বলে উঠল: দেখুন, আপনার সঙ্গে ন্যায়ের তর্ক আমি করব না। আমার কথা হচ্ছে এবার ওই বিল আমি ইজারা দেবই এবং তাতে কারো আপত্তিই শুনবনা। অরুণ শান্ত গলায় বললে, তাতে হয়তো খানিক অশ্রীতিরই সঞ্চার হবে। সেটা কী ভালো?

—অশ্রীতি! ধৈর্যচ্যুত হয়ে সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো: কতগুলো সাঁওতালের অশ্রীতিকে আমি ভয় করিনা—আই নো হাউ টু ডিল্ উইথ্ দেম।

—বাট ইট্ উড্ বী এ কোয়ার্-ি

—কোয়ার ডিল্!—সোমনাথ বাঘের মতো গর্জে উঠল: ওই সাঁওতালদের সঙ্গে কোয়ার ডিলের কথাটাও আমাকে ভাবতে হবে নাকি? কিন্তু আমার কথাটা শুনে রাখুন। যদি বাধা দেন—হয়তো সেটা খুব সুবিধে হবে না।

—অসুবিধে! কত আর হবে। কিন্তু একটা কথা আপনার জানা উচিত মিষ্টার দত্ত। পৃথিবীতে

অনেক মানুষ—তাদের ক্ষতিও অনেক। আজকে তাদের ওপর ডুপিটারের মতো বহুবাণ ছুঁড়তে গেলে তারা সহ্য করবে না।

—রিয়্যালি?—সোমনাথ থমকে দাঁড়ালো—চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়তে লাগল আগুন। যেন এখুনি সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে অরুণের ওপর। মুখোমুখি দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ছন্দোপতন ঘটে গেল নাটকীয় ভাবে। হঠাৎ ঘরে ঢুকল অনুপমা।—একি মাষ্টার মশাই, অরুণদা!

—সে কি অনুপমা যে!

—সোমনাথ বললে, তার মানে?

অনুপমা বললে, মানে আবার কী? ইনি আমার মাষ্টার মশাই যে। ইস্কুলে ওর কাছে পড়তাম—চমৎকার লোক।

—রিয়্যালি! রিয়্যালি!—স্তম্ভিত সোমনাথ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললে, অত্যন্ত দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারিনি তো। কিন্তু অনু, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন। মাষ্টার মশাইয়ের জন্যে চা করতে বলো।

নয়

জীবন নাটক নয়—তবুও নাটক।

এইভাবে সকলে এমন করে বৃত্তাকারে এসে মিলবে এমন কথা কে ভাবতে পেরেছিল! বরেন্দ্রভূমির এই গ্রামে—দিক-চিহ্নহীন আকাশ-পৃথিবীর এই দেশে আশ্চর্য ভাবে এসে জড়ো হল সোমনাথ, অরুণ, প্রমীলা আর অনুপমা। অঙ্ক-বিধাতা এলোমেলো আঁচড় কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে হয়তো ভুল করেই গল্প-রচনা করে বসেন।

সবটা শুনে সোমনাথ বললে, রিয়্যালি—রিয়্যালি! বসুন অরুণবাবু, চা খান। আপনি তা হলে তো আমাদের বন্ধু—একেবারে ঘরের লোক।

বাইরের ঘরে চায়ের আসর বসল। অরুণ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, নিশ্চয়, তাতে আর কথা কী! কিন্তু আমার আসল কথাটা তুলিনি মিষ্টার দত্ত। ওই বিল আপনি কিছুতেই মহলদারকে দিতে পারবেন না।

সোমনাথ কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলল। মানবতার দিক থেকে নয়, শুধু আভিজাত্যের প্রশ্ন থেকেও নয়। ওই বিল যে আজ সোমনাথের কতবড় জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে-কথা সে বোঝাবে কেমন করে! আজ দেনার দেনার যে অবস্থা তার হয়েছে—

কিন্তু সে স্বীকারোক্তি সোমনাথ কিছুতেই করতে পারলনা। বাধে মর্যাদায়, বাধে নিজের দৃঢ়—কঠিন আভিজাত্যে। নতি বা দীনতা তার চরিত্রে কখনো ঠাঁই পায়নি। সোমনাথ তাই খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসল।

—আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু প্রজাগুলো বড্ড ইম্পার্টিনেন্ট—

—কিছু না মিষ্টার দত্ত, কিছু না। ওরা একেবারে শিশুর মতো। একটুতে যেমন ক্ষেপে ওঠে, আদরেই

আবার তেমনি শান্তও হয়ে যান। আপনি দু দিন একটু ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করুন, দেখবেন আপনার কথা ছাড়া একটি পা ও নড়বেনা।

—আই সী!—সোমনাথ আবার হাসল: আপনি তা হলে অনুর সঙ্গে একটু গল্প করুন অরুণবাবু। ও এখানে বড্ড একা একা থাকে—সঙ্গী পায়না।

—কেন—অরুণ সকৌতুকে বললে: এই নিরালা কাব্যময় অবকাশে আপনিই তো ওকে সব চাইতে বেশি সঙ্গদান করতে পারেন।

এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি অনুপমা। এইবারে হঠাৎ সে চোখ তুলে তাকালো। আর তার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে মুহূর্তে চমক লেগে গেল অরুণের। এ কি অনুপমা না ভাপানী পুতুল! আয়ত কালো চোখের মধ্যে দৃষ্টি স্থির আর নিস্তরঙ্গ হয়ে আছে—যেন সমস্ত মনটা কোথায় গুছতার একটা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেছে অনুপমার।

দৃষ্টিটা কি সোমনাথও লক্ষ্য করেছিল? দু আঙুলের মধ্যে চুরুটটাকে শক্ত করে চেপে ধরলে সে। তারপর দেওয়ালে লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির নকল একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, আমি চাষাভুষো লোক—মাঠে-বাটে ঘুরে বেড়াই। রোম্যান্টিক্ অবকাশ আমার হয় না।

অরুণ বললে, অন্যায়। আর অনু কবি মানুষ।

—কবি!—সোমনাথ হঠাৎ হেসে উঠল হো হো করে। প্রবল হাসির শব্দে দেওয়ালের গা থেকে খপাস্ করে মেঝেতে পড়ে গেল মোটা-সোটা একটা টিকটিকি। আর অরুণের মনে হল এই হাসির ভেতর দিয়েই সোমনাথের মনটা তার কাছে যেমন স্পষ্ট, তেমনি প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। সোমনাথের দাঁতগুলো অত্যন্ত বেশি সাদা, অত্যন্ত বেশি নির্মমতার দ্যোতক।

সোমনাথ বললে: হাঁ, কবিতা ও লেখে বটে।

এতক্ষণ পরে প্রতিবাদ করলে অনুপমা: না, আমি কবিতা লিখি না।

—লেখো না? কেন, সেই যে—

চাঁদের সাগরে দুখের পক্ষী বন্ধুরের মতো লেজ?—

অনুপমা উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

অরুণ সবিস্ময়ে বললে, কী হল?

—ভগবান জানেন।—নিরুদ্বিগ্ন মুখে সোমনাথ চুরুটের ধোঁয়া ছড়ালো: ওকে বোঝবার চেষ্টা করবেন না অরুণবাবু। কথায় বলে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—তার ওপরে উনি আবার স্ত্রী রত্নং—অথবা স্ত্রী ভূতে বস্তু কিনা।

সোমনাথের কথার ভঙ্গিটা যেমন অশোভন, তেমনি বর্বরোচিত। অরুণের মনে হল যেন এতক্ষণে সে অনুপমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারছে।

—না, না, ওকে একটু খুশি রাখবার চেষ্টা করবেন।

—খুশি!—সোমনাথ ভ্রুভঙ্গি করলে: তার চাইতে এভারেষ্ট, ডিমালো সহজ ব্যাপার বলতে পারেন।

স্ত্রী-চরিত্র আমার বুদ্ধির অগম্য। মেয়েরা সবাই এমন কেন বলুন তো? এত Sensitive—এমন unpractical—

—কারণ মেয়ে বলেই।

—নাঃ—বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে যাচ্ছি। এ ধরনের মেয়েলি মেয়ে যে কোনো শক্তিমান পুরুষের পক্ষেই দুর্বহ। আমার ডার্লিং শেখভের প্রিয়া নয়—I dream of an Amazon!

সোমনাথের মুলত্ব যেমন দুঃসহ, তার সাহিত্যালোচনা আরো পীড়াদায়ক। অরুণ এবারে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সহাস্যে বললে, তা হলে চলি মিষ্টার দত্ত। মাঝে মাঝে আসব।

—আচ্ছা নমস্কার।

—কিন্তু আমার অনুরোধটা ভুলবে না—মানে ওই বিষয়টা সম্বন্ধে।

সোমনাথের মনটা যতখানি রসস্থ হয়ে আসছিল মুহূর্তে তা যেন তীব্র একটা তিক্ততায় কালো হয়ে দাঁতের গোড়ায় চুরুটটা চিবিয়ে বললে, আমি ভুলব না।

—ধন্যবাদ—অরুণ বেরিয়ে এল।

টিলার ওপরে সিঁড়ি-কাটা ধানের ক্ষেতে বিকালের রোদ। তামাক-পাতা খস খস করছে হাওয়ায়। আলের ওপর এখানে-ওখানে উঠেছে বুনো-ভাঙের অবত্ন-বর্ধিত রাশি রাশি মঞ্জরী। দূরে বিলের জল ঝকঝক করছে আয়নার মতো।

অরুণ আল্ বেয়ে হেঁটে চলল। মাথার ওপরে এক ঝাঁক টিয়া উড়ছে—ধানের শত্রু ওরা। অকারণে ক্ষেতে নেমে পড়ে ধারালো ঠোঁটে ধানের শীষ কেটে নিয়ে ছত্রাখান করে দেয়। একটা কালো উলঙ্গ সাঁওতাল ছেলে গুলতি বাগিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ঝাঁকটাকে লক্ষ্য করছিল—সুবিধে পেলেই একটাকে পেড়ে ফেলবে।

অরুণ ভাবছিল অনুপমার কথা। কী আশ্চর্য একটি মেয়েকে দেখেছিল কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে—দেখেছিল তার মধ্যে তার চাইতেও আশ্চর্য সম্ভাবনা। কী স্বপ্ন দেখেছিল সে অনুপমার সম্বন্ধে, কী মোহ তাকে ক্ষণিকের জন্যে আচ্ছন্ন করেছিল? সব ভালো মনে নেই। দীর্ঘদিন কারা-প্রাচীরের অন্তরাল—জীবনে নানা বিচিত্র বিপর্যয়, বিচিত্র ঘটনা। প্রমীলা অন্ধ হয়ে গেল—তার সঙ্গে বাঁধা পড়ল অচ্ছেদ্য বন্ধনে। আর মফঃস্বল শহরের সেই পরিবেশ। বাউবন-মর্মরিত বীথিপথ—রাঙা সুরকির রাস্তা। পাশে নদী, জোয়ারের স্ফীত আনন্দে একেবারে রাস্তাটার নীচে চলে এসেছে, খেলা করছে ঘন-শ্যামল ঘাসগুলোর সঙ্গে। গ্রীষ্মের আকাশ-কাঁপানো গম্ভীর বাঁশি। প্রসন্ন সরকার, শিবানী সরকার, কুকুর, আয়া, সোফার, মোটর গাড়ি। ননসীজন ফ্লাওয়ার। সেদিনের সেই পটভূমিতে সেই তরুণী স্কুলের ছাত্রীটি—অরুণের নতুন রিক্রুট। সে কি এই—জমিদার সোমনাথ দত্তের গৃহিণী?

কিন্তু অনুপমা সুখী হয়নি। সুখী হয়নি যে এর মধ্যে এতটুকু সংশয় নেই কোনখানে। বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়শীল সোমনাথ—বড় বেশি দাম্ভিক। সে কাউকে ভালবাসতে পারেনা, কাউকে মর্যাদা দিতে পারেনা একমাত্র নিজেকে ছাড়া। অনুপমা আজ বড়লোকের বউ হয়েছে বটে, কিন্তু সে আজ আর বেঁচে নেই। সোমনাথের হাতে পড়লে কেউ বাঁচতে পারেনা।

ক্যাচ্—চ্—চ্—

একটা আর্তনাদ। কালো সাঁওতাল ছেলেটা গুলতি ছুঁড়েছে। একটা টিয়া পাখী ছটপট্ করতে করতে ঠিকরে গিয়ে ধান-ক্ষেতের মধ্যে পড়ল। বাকী গুলো প্রচণ্ড চিৎকারে উড়ে পালাচ্ছে। ছেলেটা শিকারের সন্ধানে ক্ষেতের মধ্যে ছুটল।

অনুপমার জন্যে একটা অসীম সহানুভূতিতে অরুণের মনটা কোমল হয়ে গেল। যেন ওই টিয়া পাখীটার মতোই মুক্ত আকাশ থেকে একটা নিষ্ঠুর আঘাত বেয়ে সে আছড়ে পড়েছে মাটিতে। তার দৃষ্টির ভেতর দিকে কি সেই মৃত্যু-যন্ত্রনার আভাষ দেখতে পেয়েছে অরুণ? কিন্তু কী করা উচিত তার, কীইবা করতে পারে সে।

আশ্রমের বারান্দায় ছোট মাদুর পাতা। একদল সাঁওতাল ছেলেমেয়ে জোগাড় করে নিয়ে তাদের গল্প শোনাচ্ছে প্রমীলা। দেশের গল্প, স্বাধীনতার গল্প। মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওহরলাল। ভারতের মুক্তিকামী সৈনিকেরা। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে প্রাণ দিয়ে তিল তিল তপস্যা। অরুণ একটু হাসল, চলে গেল ঘরের মধ্যে।

প্রমীলা বলে চলেছে: এঁরা কাউকে ভয় করেননা। যা সত্যি বুঝলেন, তার জন্যে লড়াই করলেন। সরকার এঁদের ধরে ধরে হাজতে পাঠালো, একজন নয়, দুজন নয়—হাজার হাজার মানুষকে। তাদের মধ্যে কে নেই? পুরুষ আছে, মেয়ে আছে, তোমাদের মতো—এমনকি তোমাদের চাইতেও ছোট ছোট ছেলেপুলে আছে। কত দুঃখের ভেতর দিয়ে যে তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার—

প্রমিলা ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যাদান করছে। লম্বা বারান্দার একপাশে লেখার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বসল অরুণ। তারপর সবে লেখায় মন দেবার উপক্রম করছে এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো প্রমীলা। ছাত্রদের বিদায় করে এসেছে।

অরুণ হেসে কলম বন্ধ করলে।

—কী খবর?

—'নিবেদন আছে শ্রীচরণে'।

—'কভু কি অপূর্ণ রয় প্রিয়ার প্রার্থনা'?

কোমল উজ্জ্বল গলায় প্রমিলা হেসে উঠল।—কাব্যচর্চ্চা থাক রাজবাড়ীর খবর বলো।

—রাজবাড়ীর খবর?—আমি তো রাজা নই।

—তুমি রাজা নও, রাজবন্দী—সে আমি জানি। তোমার অনুপমার খবর বলো।

—আমার অনুপমা?—একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলেও সপ্রতিভ গলায় অরুণ জবাব দিলে, পুরোণো কথাটা এতদিনেও তোলনি দেখছি। তোমার ভেতরেও ঈর্ষাপরী আছে নাকি মিলা?

—আছেই তো।—দু হাতে প্রমীলা অরুণের গলা জড়িয়ে ধরল: তুমি যে একদিন ওকে ভালো-বাসতে সে খবর বুঝি আমি জানিনা?

আর একটা দীর্ঘশ্বাসকে অরুণ সংযত করে নিলে।

—কিন্তু সে একেবারে তো আর নেই মিলা। পরস্ত্রী-সম্বন্ধে এই ধরণের পরিহাসেও অপরাধ আছে।

প্রমীলা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। যে-লঘু পরিহাসে কথাটাকে সে তুলতে চেয়েছিল, অরুণ সে-ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। কোথায় ওর নিজের মধ্যে একটা অনক্ষ্য কাঁটা রয়ে গেছে—সামান্য আঘাতেই সেটা খচ খচ করে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা সরে বসল।

অরুণের খেয়াল হল কথাটা যেন একটু রূঢ় হয়ে গেছে। শেষ কথাটা না বললেও চলত—সহজ পরিহাসের মধ্যেই জিনিষটাকে অনায়াসে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আজ সমস্ত মন ওই সহজ হওয়ার ক্ষমতাটাকেই হারিয়ে ফেলেছে। অনুপমা দোলা দিয়েছে মনে—স্মৃতির সামনে স্বপ্নের আলোয় প্রতিফলিত করে তুলেছে সেই যাউবন—সেই কল্লোলিত নদী। কী হতে পারত—কী হয়ে গেল। রোজা লুক্সেমবার্গ আর ক্রুপ্‌সকায়াকে যার মধ্যে একদিন রূপায়িত করে তোলবার কামনা করেছিল সে—আজ সে সোমনাথের—এবং ব্যক্তি-সচেতন অতি-দার্শনিক সোমনাথের স্ত্রী!

প্রমীলা বললে, চা খাবে তুমি!

—নাঃ, ও বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

—ওঃ।—প্রমীলার গলায় অনাশক্তি। মনের মধ্যে আর একটা খোঁচা লেগেছে। এ স্বাভাবিক—সহজ ভদ্রতার কথা। তবু আজ প্রমীলার ভালো লাগলো না। মনের দিক থেকে সে কি বড় বেশি ছোট হয়ে গেছে—বড় বেশি সংকীর্ণ? কিন্তু সেটা কি একান্তই সজ্ঞান ও সচেতন অপরাধ! বাইরের আলো নিবে গিয়েছে তার—বাইরের দৃষ্টি অবরুদ্ধ। এতবড় পৃথিবী—এত বহুধা বিচিত্র এবং বিস্ময়বিপুল—তার কাছে তা তলিয়ে গিয়েছে সীমানাহীন কৃষ্ণতার অন্ধকারে। আর সব কিছু ছোট-একান্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে একটি মাত্র ব্যক্তি-মানবের মধ্যে—সে অরুণ। তাকে হারানো, তার কাছ থেকে অনুমাত্র সরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আজ প্রমীলার জীবনে কঠিনতম দুর্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জন্যেই কি এত ভয়, নিজের মধ্যে এই ক্লেদাসির আক্ষেপ?

দুজনেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

অরুণ বললে, তুমি যদি একটু চায়ের ব্যবস্থা করে দাও তা হলে খেতে পারি।

—থাক, বারে বারে চা খেয়ে লিভার নষ্ট করতে হবেনা তোমাকে। তা ছাড়া গুড়ের চা—সে তো তোমার ভালো লাগবেনা।

—গুড়ের চা!—অরুণ যেন হঠাৎ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠল: চিনির চা রোজ আমার কোথায় জোটে বলতে পারো? মিলা, এভাবে আক্রমণ করে তোমার কি কোনো লাভ আছে? নিজেকে এমন ভাবে ছোট করে ফেলোনা।

প্রমীলার অন্ধ চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। অরুণকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্য তার ছিলনা—তবু কোথা থেকে কী হয়ে গেল। তা ছাড়া যে অরুণ অত্যন্ত কঠিন দুঃখ-সংকটের মধ্য দিয়েও নিজেকে হারায়নি কোনোদিন, আজ এত সামান্য ব্যাপারে এই জাতীয় বিকলতা আর কেন।

ক্ষমা কোরো—

প্রমীলা হঠাৎ উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

—মিলা, শোনো শোনো—

জবাব পাওয়া গেল না।

অরুণ একা বসে রইল। আজ বিকালের এই আলোয়—দিনান্তের সোনা-ঝরানো বিলের ওই আখনার মতো প্রসারিত বিশালতায়—সিঁড়িকাটা টিলা জমির ধান-ক্ষেতের অনাবরণ মুক্তিতে তারও চেতনার সত্য স্বরূপ কি অকৃত্রিম উদারতায় উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে? প্রমীলাকে কেন সে গ্রহণ করেছিল? ভালো বেসেছিল কি? খেলঘরের অবরোধের ভেতরে যেখানে দেখা যেত এক ফালি আকাশ—দুধের ফেনার মতো হালকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া নিশ্চিন্ত মেঘ, হংসবলাকা, চিল, হলদে পাখী, বকীলালার বার্নিশে বন্ধনহীন চঞ্চুই পাখী আর দূরে আলোড়িত তাল-নারিকেলের বীথি—সেখানে নিভৃত অবকাশে কাকে মনে পড়ত—মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিত কে? সে প্রমীলা নয়। তবু প্রমীলাকে গ্রহণ করলে সে। দয়া—অনুকম্পা। অন্ধ—অসহায়। গ্রহণ নয়—আশ্রয় দেওয়া। আজ অরুণের হঠাৎ মনে হল দয়া-অনুকম্পাই শেষ কথা নয়—তার একটা ভার আছে, এমন একটা অলক্ষ্য বৃশ্চিক আছে যা মাঝে মাঝে বেদনার মতো বেজে ওঠে।

—অরুণদা!

অরুণ চমকে দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের দৃষ্টিকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছেনা। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুপমা—অনুপমাই তো। রাণীর মতো দেহের বন্ধুরী। যেন আকাশ থেকে নেমে এল হঠাৎ। সবুজ শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। মরাল-গ্রীবার নীচে সোনার হারের সঙ্গে মিনে-করা ব্লেট বুকের ওপর একখানা মণির মতো জ্বলছে। তার চার দিকে সোনা জড়ানো রোদ যেন উদ্ভাসিত—জ্যোতিঃসিক্ত।

—আরে অনু যে! তুমি এখানে কোত্থেকে।

অনুপমা ধুলোভরা মাদুরটার ওপরে বসে পড়ল।—কেন, আসতে নেই নাকি?

—বাঃ, তুমি জমিদারের বউ। এই গরীব মাষ্টারের আশ্রমে! তা ছাড়া কার সঙ্গে এলে? সঙ্গে তো লোক-লস্কর সোনা-চৌদোলা কিছুই দেখছিনা।

—ঠাট্টা কোরোনা অরুণদা। মাঝে মধ্যে ওসব বড় মর্মান্তিক লাগে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—তা যেন হল। কিন্তু সত্যি বলো তো ব্যাপার কী? এইভাবে একা একা তুমি এখানে চলে এলে? সোমনাথ বাবু কী বলবেন!

অনুপমার স্বর হঠাৎ চোখা হয়ে উঠল: একা হাঁটবার শিক্ষা বা অভ্যেস আমার আছে। তা ছাড়া সোমনাথবাবু কী বলবেন না বলবেন তা নিয়ে সব সময়ে ভাবতে গেলে আমার চলেনা। আমারও একটা স্বাধীন মন—স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অরুণ। কিন্তু ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে এল প্রমীলা। ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো তা নয়—দরজার কাছে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সে। তার অন্ধ চোখে তীব্র আকাঙ্ক্ষার একটা জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করে সে অনুপমাকে দেখবার চেষ্টা করছে

প্রমীলার মুখের দিকে অরুণ একবার সন্দিগ্ধভাবে তাকালো। অবচেতনা থেকে ক্রমাগত মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখা দিয়েছে বিস্ফোরণের একটা সম্ভাবনা।

—আমার স্ত্রী প্রমীলা—অবশ্য অন্ধ। প্রমীলা, অনুপমা এসেছে।

প্রমীলা মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ। বসুন।

—আপনি বসবেন না? দাঁড়িয়ে রইলেন?

—আমি তো দিনরাত বসেই আছি। দাঁড়াবার শক্তি আর আছে কোথায় বলুন।

গভীর সহানুভূতি ভরে অনুপমা বললে, সত্যি, ভারী দুঃখের কথা।

সত্যই দুঃখের কথা এবং অনুপমার পক্ষে সহানুভূতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—শুধু যতটা হওয়া উচিত, সেই পরিমাণ সহানুভূতি সত্যিই কি বোধ করল অনুপমা? বরং কোনো একটা সূক্ষ্ম এবং অনায্য ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সে আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে প্রমীলার। এই কি অরুণের সহধর্মিনি এবং সহকর্মিনী হওয়ার যোগ্য মেয়ে? এমন বিরাট শক্তি—এতবড় বিরাট প্রাণ—তার পাশে রূপহীন এই অন্ধ মেয়েটা! একি তার চলবার সহায় না পায়ের শিকল?

অনুপমা আবার বললে, আপনাকে বোধ হয় চিনতাম আমি?

প্রমীলা হাসল: বোধ হয়।—কিন্তু তার সমস্ত সত্তা যেন অনুভব করছে অনুপমার অবজ্ঞাতীক্ষ্ণ দৃষ্টিটাকে বুঝতে পারছে সে। চোখ নেই বলেই অন্যান্য যা কিছু অনুভূতি অত্যন্ত স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে একটা অসহ্য ক্রোধে আর অন্ধ-হিংসায় প্রমীলার সারা গায়ে যেন আগুন জ্বলে গেল।

অরুণ বললে, কিন্তু অনু, তুমি এই ময়লা মাদুরটার ওপরেই বসলে।

—তাতে ক্ষতি কী।

প্রমীলা হঠাৎ ব্যঙ্গ ভরে বলে ফেলল, গরীবের মাদুর থেকে ময়লা লেগে আপনার অমন দামী শাড়ীটা যে নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুপমার চোখ হঠাৎ ধপধপ করে উঠল: আরো শাড়ী আমার আছে।

প্রমীলা নিষ্ঠুর—বিষের মতো তিতো গলায় বললে, তা ঠিক। যখন বাংলা দেশের শতকরা নব্বুইটি মেয়ের ইজ্জৎ রাখবার মতো একটি কাপড়ের কালি অবধি জোটেনা, তখন এই খানার জায়গায় দশখানা কাপড় নষ্ট করবার অধিকার আপনাদেরই আছে বটে!

কথাটা পড়ল বজ্রাঘাতের মতো। অরুণ অস্ফুট শব্দ করলে একটা—কিন্তু ততক্ষণে দরজার গোড়া থেকে প্রমীলা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

—এর মানে কী, অরুণদা?

লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে অরুণ বললে, কিছু মনে কোরোনা অনু। প্রমীলার শরীর আজ বড় খারাপ—কী বলতে কী বলে ফেলেছে। ওর কথা গায়ে পেতে নিয়োনা তুমি।

—তাই বোধ হয়।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। বিকালের রঙ ঘন হয়ে আসছে—আকাশের মতো স্বচ্ছ

বিস্তারিত বিলের জলে নামছে দিনাবসানের ম্লানিমা। ধানের ক্ষেত থেকে কেমন একটা গন্ধ উঠে আসছে—শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রাণ সুরভি।

অনুপমার দৃষ্টি পড়ল অরুণের তাঁতের ওপর। একখানা চাপা রঙের সুন্দর শাড়ীর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অনুপমা খুশি হয়ে উঠল: বাঃ, চমৎকার কাপড়খানা হচ্ছে তো।

—হাঁ, আমি তৈরী করছি।

—বাঃ! তুমি!—সপ্রশংসবিস্মিত চোখে অনুপমা বললে: তাঁতেও কী চমৎকার ভালো লাগছে। আচ্ছা অরুণদা, তোমার ওই কাপড়খানা দেবে আমাকে?

—তুমি জমিদারগিন্নী—তাঁতের কাপড় দিয়ে কী করবে?

—ঠাট্টা নয়। আমি কিনব। কতদাম?

—দাম?—অরুণ হাসল: দামের জন্যে নয়। ও কাপড়টা মিনার জন্যেই তৈরী হচ্ছে কিনা।

—ওঃ।—অনুপমা যেন নিবে গেল।—বৌদির ভাগ্য ভালো।

কিন্তু ক্রমাগতই মনে হচ্ছে অরুণের এই প্রেম—এর যোগ্য কি প্রমীলা? কোনো দিক থেকেই কি সে এই বিশাল শক্তি—বিরাট ব্যাপ্তির পাশে এসে দাঁড়াতে পারে? তার চলার পথে দিতে পারে কতটুকু পাথেয়? ভীরু, দুর্বল, কুরূপ, অসহায়। আর আগুনের মতো অরুণের মন—প্রখর, প্রচণ্ড। তার জীবনে কি প্রমীলা একটা দুঃসহ বন্ধন মাত্রই নয়?

অরুণ বললে, সব হোম-ইণ্ডাষ্ট্রী। নিজের হাতে কেমন তরকারী ক্ষেত করেছি দেখবে অনু? একটা কুমড়ো হয় প্রায় দশসের।

অনুপমা কী বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি চলে গেল দিগন্তে। সোমনাথের শুভ্র-প্রাসাদ উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদ নয়—কারাগার। সোমনাথের ঐশ্বর্য আছে, প্রতিপত্তি আছে, জন্ম আছে। সুতরাং শিক্ষিতা স্ত্রী তার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ ঐকতান মাত্র। প্রয়োজন নয়—স্বতঃসিদ্ধ। আত্মস্তরিতার দম্ভে স্বর্ণলীতা। যত নিষ্প্রাণ হয় ততই ভালো—প্রতিবাদ করতে পারবে না, বাধা দিতে পারবে না।

আর অরুণ। কী মন্ত্র নিয়ে এসেছিল—মিনে এসেছিল কী বিরাট আদর্শ। মুক্তি। সর্বাঙ্গীন শৃঙ্খল থেকে—সর্ববিধ দাসত্ব থেকে। স্বাধীন দেশ—স্বাধীন মানুষ।

অনুপমার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল।

—অরুণদা, একটা কথা বলব?

—বলো।

আমাকে মুক্তি দাও।

—মুক্তি? তার মানে?—বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে উঠল অরুণের।

—আমি আর পারছিনা। সাত বছরের এই জীবন আমার বিষের মত লাগছে—যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার।

অরুণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে: কেন বিচলিত হচ্ছ। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করো। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছো—কেন নিজের ইচ্ছাকে প্রমাণ করতে পারোনা? কেন বার বার স্বামীর কাছে হার মানো?

অনুপমা যেন অকারণেই উচ্ছ্বসিত উত্তাল হয়ে উঠল: না অরুণদা, সে অসম্ভব। আমার স্বামী অসাধারণ শক্তিমান—অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব। তার ইচ্ছার ওপরে কোনো জোর আমি করতে পারি না—করবার ক্ষমতা আমার নেই।

অরুণ চুপ করে রইল। হয়তো অনুপমার কথার মধ্যে সত্য আছে। সোমনাথকে যতটুকু সে দেখেছে তাতে একথা সত্যিই মনে হতে পারে যে তার শক্তি অপরিসীম—দুর্বার এবং প্রবল। তাকে রোধ করবার ক্ষমতা অনুপমার আয়ত্ত নয়।

অনুপমা পাগলের মতো বলে চলল, আমাকে বাঁচাও অরুণদা। তোমার কাজের অংশী করে নাও।

—কী রকম?

—তোমার কাছে এসে থাকব আমি। তাঁত চালাব, সাঁওতাল ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব—ক্ষেতের মাটি নিড়িয়ে দেব। আমাকে তোমার পাশে টেনে নাও। অনুপমার হাত অরুণের পায়ের ওপর এসে পড়ল।

সাপের ছোবল লেগেছে—ঠিক এমনি করে ছিটকে তিন হাত সরে গেল অরুণ। ছিঃ ছিঃ এ কী করছ তুমি! পাগল হয়ে গেল নাকি? ঘরে ফিরে যাও অনুপমা। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে—মিস্টার দত্ত কী ভাববেন বল তো।

—যা খুশি ভাবুক—আবেগে অনুপমার গলা কাঁপতে লাগল: আমি চলে আসব আমার ঘর ছেড়ে। থাকব তোমার কাছে।

—কী সর্বনাশ! অরুণ এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল: তোমার শরীর নিশ্চয় খারাপ হয়েছে অনু—চলো, তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি।

—না, আমি বাড়িতে যাবোনা।—অনুপমা এবার ছেলেমানুষের মতো মাথা বাঁকাতে লাগল: আমি তোমার কাছে থাকব—তোমার কাছেই থাকব।

—কী মুস্কিল। কী সব যা তা বলছ। মিষ্টার দত্ত থাকতে দেবেন কেন?

—না দিন। আমি জোর করে থাকব।

অরুণ এবার পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। কঠিন গলায় বললে, ছেলেমানুষি করোনা অনু। বাড়ি ফিরে যাও।

—কেন? প্রমীলা বৌদিকে কাছে থাকতে দিয়েছ আর আমি থাকতে পারি না?

—না, তুমি পরস্ত্রী।

পরস্ত্রী! অনুপমার চোখের দৃষ্টিতে এবারে কোনো বিকার বা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না: কিন্তু আমি যদি বলি আমার স্বাধীন সত্তা আছে—যে স্বামী আমার মনের কেউ নয় তাকে আমি স্বীকার করব না?

—অনু!

—না, বলতে দাও আমাকে, তা হলেও কী প্রমীলা বৌদি যে অধিকার পেয়েছে তার এতটুকু আমি দাবী করতে পারব না?

এবারে তীব্র গলায় অরুণ বললে, না—তবুও না। প্রমীলা অন্য ধাঁচের মেয়ে। কিন্তু সে সব থাক। তুমি যে কী বলছ নিজেই জানো না। এবারে বাড়ী যাও অনুপমা।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল—এবারে অনুপমা উঠে দাঁড়ালো। অনু—দীপ্ত—যেন বিদ্যুৎশিখা ঝলকে উঠল অরুণের দৃষ্টির সামনে। কাঠে কাঠে সংঘর্ষে জ্বলল আগুন, চকমকি পাথরে পাথরে স্ফুলিঙ্গ।

অনুপমার চোখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল অরুণ।

একটা অসহ্য উত্তেজনায় বুনো জানোয়ারের মতো নিশ্বাস ফেলতে লাগল অনুপমা। বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়ল—সে দিকে লক্ষ্য রইলো না তার। কর্ণাভরণে দু খানি পান্না বিকালের আলোয় চকচক করতে লাগল।

—নিজেকে তুমি কী ভেবেছ অরুণদা! এত অহঙ্কার? আমি ছোট হয়ে এসেছিলাম—তাই তুমি আমাকে এ ভাবে অপমান করবার সাহস পেলে।

—তার মানে?

—তার মানে? অনুপমার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল: তার মানে তুমি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জানো। শুধু নিজে নয়—আসবামাত্র তোমার স্ত্রীকে দিয়েও তুমি আমার অপমান করিয়েছ। কিন্তু আমিও জানিয়ে যাচ্ছি এ আমার স্বামীর জমিদারী—তোমার কত ক্ষমতা আমি দেখে নেব।

—অনু! বিহ্বল অরুণ এ ছাড়া কোনো কথাই বলতে পারল না।

—না, অনু নয়—মিসেস দত্ত। আমার শক্তি তুমি টের পাবে। আমি স্বর্ণসীতা নই। নিজেই যদি বাঁচতে না পারি—তা হলে মরবার আগে উড়িয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দিয়ে যাব—হাঁ—এই তোমাকে শেষ কথা বলছি।

অনুপমার তীব্র চীৎকারে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল প্রমীলা। কিন্তু ততক্ষণে অনুপমা নেমে গেছে আশ্রমের বারান্দা থেকে। বিকালের আলো নিবে আসছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধকার। আর সেই প্রায়ান্ধকারে ধান ক্ষেতের আল্ পথ ভেঙে ঝড়ের গতিতে চলে যাচ্ছে অনুপমা।

আশ্চর্য হয়ে প্রমীলা বললে, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

অপসৃয়মান ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মাথা বাঁকিয়ে অরুণ জবাব দিলে, ভগবান জানেন। বড়লোকের মেজাজ তো!

কিন্তু মনের মধ্যে খচ করে একটা খোঁচা বাজল। মিথ্যা বলল না তো? সত্যিই কি অনুপমাকে সে এতটুকুও বুঝতে পারে নি?

প্রমীলা বললে, একা একা এসেছিল, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় একাই আবার ফিরে যাচ্ছে। তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে নাকি ওকে?

—থাক, দরকার নেই।

দশ

সহিসের হাতে ঘোড়াকে জিম্মা করে দিয়ে নীচের ঘরে চলে এল সোমনাথ। ক্লান্ত—ভয়ানক ক্লান্ত। সোমনাথও আজকাল ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, অবসন্ন বোধ করছে। এটা সুলক্ষণ নয়। বাইরের দিক থেকে যাচ্ছে সে কি মনের ভেতরেই—না, তারই মন মরে আসছে বাইরের সংঘাতে?

ঘরের মধ্যে সোমনাথ অন্যমনস্কের মতো পায়চারী করতে লাগল। একটা অত্যন্ত প্রবল, গুরু ভারের মতো অবসাদ এসে যেন দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার। ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সে চিন্তাতেও মনটা বিরক্ত হয়ে উঠছে। বড় বেশি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে অনুপমা—অত্যন্ত বেশি অভিযোগ করে। সব সময়েই যেন একান্ত করে নিজের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়—জীবন নিয়ে পুতুল খেলতে ভালোবাসে। এই জিনিসটাই বরদাস্ত করতে পারে না সোমনাথ। বলিষ্ঠ হও—নিরঞ্জন নির্ভীক হও। বীরমাতা না হলে বীর-সন্তানের জননী হবে কেমন করে?

ওপরের ঘরে রেডিয়ো বাজছে। সোমনাথ কান পেতে শুনলে কয়েক মুহূর্ত:

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়,
শ্রান্ত তালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়—

নাঃ—বিরক্তিকর। শুধু অর্ধেক ঘুম—অর্ধেক স্বপ্ন, চুম্বন আর যূথীর মালা। এ ছাড়া কি আর গান নেই? এই গান যারা গায় এবং এই স্বপ্নের মধ্যে যারা তলিয়ে থাকে তাদের বোধ হয় পেট, হাত, পা বলে কিছু নেই—শুধু সবুজ রক্তের দুটো হৃৎপিণ্ডই তাদের সর্বস্ব আর সেই হৃৎপিণ্ড থেকে নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুধু রজনীগন্ধার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনে যখন এত অভাব—এত প্রয়োজন—এমন দুর্বিষহ সংঘাত—তখন এই "সব-পেয়েছির দেশে" এরা পৌঁছে গেল কী করে? সোমনাথ কেন গড়তে পারে না এমন একটা 'ফুলস্ প্যারাডাইজ্'—একেবারে তলিয়ে যেতে পারে না আত্ম-বিস্মৃতির মোহান্ধকারে?

—হুজুর?

—কে?

—আমি হরেন। মহলদারকে নিয়ে এসেছি।

—এসো। কী খবর?

মহলদার আর হরেন ঘরে ঢুকল। দু'জনে বসল একটা বেঞ্চের ওপর। মাথার হলদে পাগড়ীটা খুলে সিট বাঁধা টিকিটার একবার হাত বুলিয়ে নিলে মহলদার—যেন সেখান থেকে আত্ম-বিশ্বাসের খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চয় করে নিলে।

—হুজুর, সেলাম।

সোমনাথ রিভল্‌ভিং চেয়ারে আসন নিয়ে একটা চুরুট ধরালে। বললে, সেলাম তো আগেই দিয়েছ—বারে বারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করলেও আমি রাগ করবো না। এবারে তোমার বক্তব্য বলো।

মহলদার ঠিক সোমনাথের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারল না। হাতের ছেতর খৈনীর ডিবেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে: আমার কী করলেন হুজুর?

—বিল?

—জী।

—হবে না। বিল ইজারা দেওয়া চলবে না।

—চলবে না! হরেন আর মহলদার এক সঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠল দুজনে। হরেনের ছোট ছোট চোখ দুটো সাপের মতো এমন ভাবে চিক চিক করে উঠল যেন সে সোমনাথকে একটা ছোবল মেরে বসবে। আর মহলদারের হাত থেকে ঠন্ করে খৈনীর কৌটোটা নীচে পড়ে মেজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল।

মহলদার খানিকটা ধাতস্থ করে নিলে নিজেকে। পাগড়ীটা পরলে মাথায়। বললে, কেন হুজুর? টাকা কি কম হয়েছে? যদি বলেন তো আরো বেশি দিতে রাজী আছি।

টাকা! সোমনাথের মনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। চারদিকে সংকটের আসন্ন প্রতিচ্ছবি। দেনা, দেনা আর দেনা। রিভলভিং শেল আর রেসিংকার সর্বস্ব ডোবাতে বসেছে। কিন্তু তবু—

সোমনাথ বললে, না।

এবারে হরেনের চোখ আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। আর্থিক ক্ষতি শুধু সোমনাথের নয়। তার দিক থেকেও যথেষ্ট আশা ভরসা ছিল—সেলামী এবং পেশকারী বাবদ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগও ছিল। হরেন মহলদারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ পকেটস্থ করেছিল এবং ভরসা দিয়েছিল যেমন করেই হোক ওটা সে মহলদারকে পাইয়ে দেবে। সুতরাং এ পরাজয়—এ ক্ষতির অংশ তারও সমান।

হরেনের মনের মধ্যে জ্বালা করতে লাগল। জালিয়াৎ-মামলাবাজ লোক। কখনো সহজে হার মানে নি—আইনের কূট ব্যাপারে কখনো কেউ ছুঁতে পারে নি তাকে, সহজে তার চালে ভুল হয় না। না হলে এতকাল এমন সাধু আর বিশ্বাসী সেজে থেকে সে কিছুতেই ভেতরে ভেতরে মহলটাকে ফোঁপরা করে ফেলতে পারত না।

হরেন সাপের মতো হাসল।

—হুজুর, আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

—কেন?

—বুড়ো কর্তার কথা ভেবে। তিনি থাকলে আজ অন্তত কতগুলো সাঁওতাল প্রজা আর একটা স্বদেশী বাবুর কাছে কিছুতেই হার মানতেন না।

—ক্লিক্—

একটা তীব্র শব্দ করে রিভলভিং চেয়ার ঘুরে গেল। লাল চুল আর পিঙ্গল চোখ ঝিকিয়ে উঠল কেশর ফোলানো ক্রুদ্ধ সিংহের মতো।

—তার মানে?

—মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। নিজের প্রজার চোখ রাঙানিকে ভয় করলে কর্তাবাবু এতবড় জমিদারী রেখে যেতে পারতেন না। ঢের আগেই তাঁকে ফকিরী নিতে হত।

আর কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই মহলদার হেসে উঠল। অত্যন্ত রূঢ়—অতিশয় কর্কশ। অন্ধকারে বনবনের ভেতরে বাঘের পেছনে পেছনে হায়না যেমন করে হাসে—তেমনি দীর্ঘ এবং নির্মম টানা টানা ভাবে সে হাসলে।

—বাঙালি জমিদার এমনিই আছে। পরজার ভয়ে মাথা গুটিয়ে থাকে। হইতো আমার দেশের জমিদার তো এমন পয়জাকে কাটিয়ে গঙ্গাজীমে ভাসিয়ে দিতো।

কিন্তু শুধু হায়না নয়—বাঘও ছিল। বিদ্রোহকের পশিতার লাগল আগুন। সোমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠল। একটা কাতর শব্দে কোঁ করে রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে গেল একপাক।

—কী বললে?

নৈরাশ্য ক্ষুব্ধ মহলদার নির্ভীক হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ তিক্ত গলায় বললে, ঠিকই বলছি। বাংলা দেশের জমিদারের মধ্যে জোয়ান নেই মানুষও নেই।

—তাই নাকি!

দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে এল সোমনাথ। থাবার মতো প্রকাণ্ড মুঠিতে মহলদারের একটা হাত ঝাঁকড়ে ধরলে, আঙুলগুলো একসঙ্গে মড় মড় করে উঠল।

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে মহলদার বললে, হাঁ-হাঁ-হাঁ—

—বাঙালি জমিদারের গায়ে জোর নেই বলে মনে হচ্ছে?

—হাঁ-হাঁ—হুজুর। কসুর মাপ কীজিয়ে হুজুর। আমার হাড্ডি চুরমার হয়ে গেল···উঃ উঃ। সোমনাথ মুঠি খুলে দিলে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে রাইডারটা তুলি নিয়ে বললে, গেট্-আউট্। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আর কোনোদিন এখানে পা দেবে তো মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

—হুজুর—

—গেট্আউট—সোমনাথের হাতে রাইডারটা উদ্যত। হলদে পাগড়ীটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে চাবুক খাওয়া কুকুরের মতো নতমস্তকে মহলদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাস্কেল—ইডিয়েট!

হরেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাঁটুটা ঠক ঠক করে কাঁপছে তার। সোমনাথের সর্বাঙ্গে প্রলয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। এবার তারই পালা পড়বে নাতো?

—হরেন?

—হুজুর?

—কী করা যায়?

—আমি আর কী বলব হুজুর?

—শাট আপ!—সোমনাথ যেন একটা চড়ই বসিয়ে দিলে হরেনের মুখে: ন্যাকামি কোরোনা—ন্যাকামি আমি সহ্য করতে পারি না। এতক্ষণ তো দিব্যি বুলি ফুটছিল দাঁড়ের ময়নার মতো—আর এখন একেবারে ভালো মানুষ বনে গেলে?

বেকিটার সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করলে হরেন। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে বললে, কী করতে বলেন?

মহলদার কী ভেবেছে? আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি?

হরেন বললে, আপনি ভয় পাননি হুজুর। কিন্তু প্রজারা তাই মনে করবে।

—বটে!

হরেন আস্তে আস্তে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল: তা ছাড়া আর কী বলুন? সাঁওতালে গুরু এল—দুকথা বললে আর আপনি হুড় হুড় করে তার কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন! যে জমিদার ভালো মানুষ, প্রজার কথা শোনে, দয়া করে, আড়ালে তাকেই ওরা ঠাট্টা করে ভীরু বলে। জুতো মারতে না জানলে ছোটলোকের শ্রদ্ধা পাওয়া যায়না হুজুর।

—হুঁ।

চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে সোমনাথ ঘরময় পায়চারী করে এল—জুতার আর ব্রীচেসে মচ মচ করে শব্দ বাজতে লাগল। ওই অরুণ মাষ্টার। সব কিছুর গোড়াতেই ওই লোকটা। সাঁওতালদের গুরু হয়ে লোক গুলোকে সব একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে। তা ছাড়া কী ইম্পার্টিনেন্ট—কী দুঃসাহসী লোক—সোমনাথের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দাবীকে অসংকোচে প্রতিষ্ঠা করে যায়! ওই মাষ্টারটাকে কচমচ করে চিবিয়ে খেতে পারলে যেন সোমনাথের আক্রোশ মিটত।

তা ছাড়া—হরেন বলে চলল: টাকার দিকটাও তো দেখতে হবে। যে অবস্থা হয়েছে, হাজার খানিক টাকা এই সময়ে হাতে পেলে তবু কিছুটা রক্ষা করা যেত।

আচ্ছা তুমি যাও। আজ রাত্রে দরকার হতে পারে—সোমনাথের গলার স্বরে একটা নিশ্চিন্ত কিছুর আভাস লাগছিল: কোথাও বেরিয়োনা—হয়তো ডেকে পাঠাতে পারি।

—যে আজ্ঞে।

যাও দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—আজ্ঞে তাহলে মহলদারকে—

—হেল্! সোমনাথ গর্জে উঠলো: আমার সামনে এলে ওই মেড়োটার মগজ আমি উড়িয়ে দেবো। ইম্পার্টিনেন্ট—উল্লুক।

শেষ গালটা তাকে না মহলদারকে—হরেন সেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারল সে এখন বুদ্ধিমানের মতো তার এঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

—আজ্ঞে প্রাতঃপেন্নাম।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দেউড়ির পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের মনেই হাসল হরেন: ওষুধ ধরেছে। সোমনাথের দুর্বলতা সে ধরতে পেরেছে—ঠিক কোন্ জায়গায় সময় মতো এবং যুৎমত ঘা দিতে পারলে সোমনাথ ঝন ঝন করে নড়ে উঠবে সে রহস্যও তার আর অজানা নেই। ওই মহলদার আবার আসবে—টাকার অঙ্ক বাড়বে এবং হরেন যে শেষ পর্যন্ত তার হস্তের ধন থেকে বঞ্চিত হবে না—কোনো সন্দেহই নেই এ বিষয়ে।

আর সোমনাথ জুতোর আর ব্রীচেসে তেমনি শব্দ তুলে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—যেন করে যন্ত্রী সিংহ পায়চারী করে সার্কাসের লোহার খাঁচার মধ্যে। চলার তালে তালে হাতের হাউণ্ডারটা দিয়ে ঠুকতে লাগল ব্রীচেস্‌টা।

ওই অরুণ মাষ্টার। অনুপমার মাষ্টার। যেমন ছিচ্‌কাঁদুনে অনুপমা—তেমনি একটা মাষ্টার এসে জুটেছে তার। মাষ্টার আছিস—সহরে গিয়ে ছেলে চরা, তবু দুটো পয়সা পকেটে আসবে। কী দরকার বাপু তোর এখানে নিঃস্বার্থ পরহিত ব্রত নিয়ে? দেশ স্বাধীন! যেন সহরে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন করলেই তো হয়—সেখানে সোমনাথ আপত্তি করবে না, আপত্তি করবার দরকারও নেই তার। সব ভালো ভালো জায়গা ছেড়ে দিয়ে, কংগ্রেসের সভ্য, ট্রেড ইউনিয়ান—কলকাতার পার্কে মাইক্রোফোন ফাটানো বক্তৃতা, সব কিছু পেছনে ফেলে, এখানে এসে নাক না ঢোকালেই কি হচ্ছে না! যেন দীনা হীনা ভারত-মাতার মুক্তি শুধু এই কটা সাঁওতালের ছেলেই আটকে আছে! আর সে-মুক্তি সাধনার পথটা কী? জোতার সময় আমরা প্রাণপণে বিল থেকে মাছ ধরে খাবো, আর সঙ্গে সঙ্গেই ফটাস্ করে পরাধীনতার শৃঙ্খলটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। অর্থাৎ মাছ খাওয়া আর দেশ স্বাধীন করা—এ দুটো একেবারে অঙ্গাঙ্গী।

—ইডিয়ট্—ননসেন্স—ফুল!—সোমনাথ চুরুটে টান দিতে ভুলে গিয়ে চিবুতে লাগল চুরুটের গোড়াটা। নাঃ আর চলবে না। প্রজারা তাকে ভাববে কাপুরুষ—তাকে ভাববে অপদার্থ। তাকে—সোমনাথ দত্তকে! জীবনে যে কখনো কাউকে ভয় করেনি—সেই তাকে। নাঃ অসম্ভব। বাস্তব কাম্য নয়—অরুণ মাষ্টারকে আর খাতির করা চলবে না—কিছুতেই না।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনো বাকী ছিল খানিকটা। ঝড়ের মতো বেগে ঘরে ঢুকল অনুপমা। চাকর একটা টেবিল ল্যাম্পের আলো আড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সেই আলোতে অনুপমার একটা আশ্চর্য মূর্তি সোমনাথ দেখতে পেল। দৃষ্টি দিয়ে আগুন ঝরছে—সমস্ত শরীর তার বিস্রস্ত—পড়ছে বড় বড় শ্বাস আর দ্রুত নিশ্বাস।

—কী হয়েছে, কী হয়েছে অনু?

অনুপমা দুহাতে মুখ ঢেকে একটা সোফার ওপরে বসে পড়ল।

—কী হয়েছে—এমন করে ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এলে?

মুখ না তুলেই অনুপমা ভাঙা গলায় জবাব দিলে: আমাকে অপমান করেছে।

—অপমান করেছে! তোমাকে! কে অপমান করেছে?

—অরুণ দা!

—অরুণ দা!—বজ্রাহতের মতো সোমনাথ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সমস্ত চেতনা যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে—নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না।—কী বলছ তুমি? তোমার অনুপমা, তোমার মাষ্টার মশাই?

—কেউ না, আমার কেউ না!—হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অনুপমা আর্তনাদ করে উঠল: তোমরা

সবাই সমান—মেয়েদের অপমান করা ছাড়া তোমাদের কারো কোনো কাজ নেই। তোমরা তাদের স্বীকার করতে চাও না—তাদের মর্যাদা দিতে চাও না, কিন্তু অনুপমা হঠাৎ জ্বলে আর আগুনে ভরা দুটো অসুস্থ চোখ মেলে ধরল সোমনাথের মুখের ওপরে: কিন্তু কেন? কেন তোমার প্রভা আমাকে অপমান করবে? তুমি আমার স্বামী—এখানকার জমিদার, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারোনা? কেন শিখিয়ে দিতে পারো না ওই সব অরুণ মজুমদারদের, যে তারা ছাড়া পৃথিবীতে আরো অনেক বেশি শক্তিমান মানুষ আছে?

আত্মস্থ হয়ে সোমনাথ সামনে এগিয়ে এল। বললে, কী অপমান অরুণ মজুমদার তোমাকে করেছে আমি জানি না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো অনু—অরুণ মজুমদারকে শেখাবার ক্ষমতা আমার আছে। তার পরিচয় তুমি আজই পাবে।

উঠে দাঁড়ালো অনুপমা। তারপর দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল অন্তঃপুরের দিকে—সে অত্যন্ত—অত্যন্ত বেশি অসুস্থ বোধ করছে।

হাতের রাইডারটা তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সোমনাথ বাইরে নেমে গেল।

• • • • • •

সাঁওতাল পাড়ার কার ছেলের খুব বেশি অসুখ করেছে। সন্ধ্যার পরেই লোক এসে গেছে কয়েকবার তাই খানিক আগে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে অরুণ। বলে গেছে, ফিরতে রাত হবে। আর যদি অসুখের খুব বাড়াবাড়ি দেখে তাহলে আজ রাত্রে আদৌ না ও ফিরতে পারে।

একা ঘরে অন্ধকার বিছানায় চুপ করে শুয়েছিল প্রমীলা। তার কাছে এখন সবই অন্ধকার—ঘরে আলো জ্বেলেও কোনো লাভ নেই তার। পৃথিবীর আলো নিবে গেছে সে জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু তার আলো আছে অরুণ—তার মনের আলো, ভালোবাসার আলো। প্রমীলা তাইতেই ধন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কেবল যেন অস্বস্তি লাগছে আজকে। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দোলা লেগেছে তার। অরুণ সত্যিই কি ভালোবেসেছে তাকে, না দয়া করেছে! যেমন লোকে দয়া করে রাস্তার ভিখারী দুঃস্থকে, রেল ষ্টেশনের অন্ধ সুরদাসকে?

আজ অনুপমা কেন এসেছিল এভাবে? কেন ঝগড়া করে গেল অরুণের সঙ্গে? প্রমীলা কিছু বুঝতে পারেনি। অরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু অরুণও ভালো করে কোনো জবাব দেয়নি তার কথার। প্রমীলার মনের মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছে। সত্যিই কি অরুণের জীবনে সে অনাবশ্যক! অনুপমাই কি বাস্তবিক তার যোগ্য সহধর্মিণী হতে পারত!

বাইরে রাত বাড়ছে। বাতাসে ধান-ক্ষেতের গন্ধ—মাটির গন্ধ, অরুণের সবজী বাগান থেকে কুমড়ো ফুলের গন্ধ। এক রাশ সুতো থেকে কোরা গন্ধ। শেয়াল ডাকছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ঘরের খুঁটি কোথাও ঘুণে খেয়ে চলেছে—শব্দ হচ্ছে কুট্ কুট্ কুট্। টিক টিক শব্দে গোটা দুই ছুঁচো জরুরি একটা আলোচনা করতে করতে দৌড়ে গেল।

নিজেকে অত্যন্ত শূন্য মনে হতে লাগল প্রমীলার। নিজের ফাঁক ভরছে, কিন্তু সেইজন্যে অরুণকে

কাকি দেয়নি তো! অরুণ কি আজ অসুস্থ—তাকে বয়ে চলতে চলতে ক্লান্ত এবং পীড়িত! কথাটা ভাবতে গিয়েও প্রমীলার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল—যেন একটা কী সেখানে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অন্ধ চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিন্তু ও কী? হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রমীলার। সমস্ত শব্দ আর গন্ধকে ছাড়িয়ে ঘরের চালে পট পট করে ওটা কিসের আওয়াজ? ঘর পুড়ছে নাকি? একটা পোড়া গন্ধ—একটা তীব্র উত্তাপ!

প্রমীলা বিছানার ওপর উঠে বসল।

ধোঁয়ার দম আটকে আসছে। তীব্র উত্তাপ লাগছে গায়ে। অন্ধ চোখেও যেন প্রমীলা দেখতে পাচ্ছে চারদিকে নেচে চলেছে রাঙা আগুনের শিখা—অরুণের আশ্রয়টাকে গ্রাস করবে।

তীব্র চীৎকার করে দরজার দিকে ছুটে গেল প্রমীলা। অভ্যাস বশে দরজাটা ধরে প্রাণপণে টানল সে। দরজা খুলল না—কিসে আটকে গিয়েছে।

ঘরের চালে সোঁ সোঁ করে গর্জাচ্ছে আগুন। বেড়া ধরেছে—আড়া জ্বলছে। প্রমীলার আর্ত চীৎকার কেউ শুনতে পেলনা। ধোঁয়া আর আগুন তার চারদিকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল মৃত্যুবেষ্টনী হয়ে। অন্ধ দৃষ্টির সামনে অন্ধ পৃথিবী নিশ্ছিদ্র আঁধারে মিলিয়ে গেল…

…ওদিকে অনুপমা ঘুমুচ্ছে অকাতরে। ঘুমের মধ্যেই বলছিল ক্ষমা করো অরুণদা, ক্ষমা করো। অন্যায় বলেছি তোমাকে। কিন্তু আর কাকে বলব? মানুষ যখন দুঃখ পায় তখন সব চাইতেই প্রিয়জনকে যে সে আঘাত করে, একি তুমি বুঝতে পারোনা?

দ্রুত গতিতে ঘরে ঢুকল সোমনাথ। অনু, অনু!

অনুপমা চমকে উঠে বসল—কে? কে?

—ভয় পাচ্ছ কেন? আমি।

—এখন ডাকাডাকি করছ কেন?

—অনু, ওঠো, দেখে যাও।

—কী দেখব?

—দেখে যাও সোমনাথ ঘরের শক্তি আছে কিনা। দেখে যাও অরুণ মাষ্টারকে সাহায্য করতে আমি জানি। আমার স্ত্রীকে যে অপমান করে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি না কখনো।

অনুপমার মাথাটা সংশয়ে এবং আশঙ্কায় বোঁ করে ঘুরে গেল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল একটা পৈশাচিক উল্লাসে সোমনাথের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

—কী হয়েছে, কী করেছ তুমি?

—এসো, জানলার কাছে দাঁড়াও।

অনুপমা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঘাউ ঘাউ করে জ্বলে যাচ্ছে আগুন—অন্ধকারের বুক কেটে যেন রক্ত উছলে পড়ছে। অরুণের আশ্রয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আগুনের তীব্র আভায়

ছায়ামূর্তির মতো কতগুলো মানুষ সেব ছুটোছুটি করছে—চীৎকার করছে। ফট্ ফট্ করে বাঁশ ফাটবার শব্দ। দূরাগত জলকল্লোলের মতো আগুন গর্জে উঠছে।

—এ কী!

—যা হওয়া উচিত, তাই। তুমি খুশি হয়েছ অনুপমা?—সোমনাথ রাক্ষসের মতো হাসছে:

রক্ত মাখা হাতে
এইবারে দিব বাঁধি' পাকাণীর বেণী—

—তুমি আগুন লাগিয়েছ?

—নিশ্চয়!—উচ্ছল গলায় সোমনাথ বললে: সবে সুরু। আর বেশিদিন অরুণ মাষ্টারকে মোড়লি করতে হবে না এখানে। ও ব্লকহেড্। আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসে! নীচে থেকে কে যেন চীৎকার করছে—হুজুর, হুজুর?

—কে?

—আমি হরেন?

—কী বলতে চাও?

—একটা বড় অন্যায় ব্যাপার হয়ে গেছে। ওরা দরজায় দরজায় শিকল লাগিয়ে দিয়েছিল, অরু বৌটা আগুনে পুড়ে মরেছে।

—অ্যাঁঃ!—সোমনাথের মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরুল।

আর জানলার নীচে মেজের ওপর মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল অনুপমা।

•

প্রমীলা মরেনি, কিন্তু মরতে আর দেরী নেই। অনুপমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় সে। কী অন্যায় কথা বলেছে, কী অপরাধ করেছে তার কাছে। সে জন্যে ক্ষমা চাইবে।

সকলের আলোয় সোমনাথ আর অরুণ দুজনেই অনুপমাকে খুঁজতে চলেছে। পাশাপাশি ওরা হেঁটে চলেছে—কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। হয়তো অতবড় একটা আগুনের পরে ঘণ্টা খানেক পৃথিবীকে জুড়িয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ করে তোলবার জন্যে নেমেছিল খানিকটা ঘন বর্ষণ।

সোমনাথের বাড়ির খিড়কি পথ পেরোলেই ওপারে খানিকটা ধূ ধূ বালি বিস্তার। প্রায় এক মাইল এগিয়ে সে বালুশয্যা কালোজলা মহানন্দার গিয়ে নেমেছে। এই রিক্ততার ওপর দিয়ে মানুষ তো দূরের কথা—গোরু পর্যন্ত হাঁটে না। একগুচ্ছ ঘাস নেই এখানে—শুধু কন্টিকারীর কাঁটাগুলো পৃথিবীর বুক নিংড়ানো বেদনাতে আনন্দের মতো জেগে আছে।

এই ভিজে বিশাল বালুবিস্তারের ওপর এক জোড়া ছোট ছোট পায়ের ছাপ। নরম মাটিতে আরো নরম পায়ের ছাপ লক্ষ্মীর পদলেখার মতো কোমল বিষণ্ণ চিহ্ন রেখে এগিয়ে গিয়েছে। সে পদচিহ্ন আবাহনের নয়—বিসর্জনের। তার মাঝে মাঝে জল জমে রয়েছে—সকালের আলোয় জমাট অশ্রুচিহ্নের মতো সে জল ঝলমল করছে।

শেষ রাত্রে কোন অবসরে এই পথ দিয়ে চলে গিয়েছে অনুপমা। দুজনে তেমনি এগিয়ে চলেছে। পদচিহ্ন কখনো ক্ষীণ—কখনো স্পষ্ট। কখনো সোজা—কখনো আঁকা বাঁকা। কখনো বালির মধ্যে অনেকখানি গভীর হয়ে বসেছে, চলতে চলতে কখনো কি কোনো কারণে থেমে দাঁড়িয়েছিল অনুপমা? ভেবেছিল যাকে ফেলে এসেছে তার কাছেই ফিরে যাবে!

সম্মুখে সংকেত দিচ্ছে পদ চিহ্ন। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে দুজন—অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তারপর খানিক এগিয়ে আর কিছু নেই। শুধু মহানন্দা তীব্র ছন্দে বয়ে যাচ্ছে—প্রখর স্রোতে ওপার থেকে ঝুপঝাপ শব্দে ভেঙে পড়ছে বালির চাঙাড়।

অনুপমার যাত্রা কোথায় শেষ হয়েছে! এই মহানন্দার জলে! সকালের আলোয় উদ্ভাসিত এই বিস্তৃত খরধারার মধ্যে! না না, এ বিশ্বাস হয় না। সোমনাথ ভাবে: এত অভিমান করতে পারে না অনুপমা। তার তো অভাব নেই কিছু। গয়না আছে, শাড়ী আছে, ড্রাই ব্যাটারী দিয়ে রেডিও আছে—সোমনাথ তাকে তৃপ্তি দেবার আয়োজন অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেনি এতটুকুও। আর অরূপ ভাবে: এ অসম্ভব। আশ্চর্য্য মেয়ে অনুপমা—স্থির বিদ্যুতের মতো শিখাদ্বিত। তার মধ্যে যে রুদ্রমূর্ত্তির অসুর আছে—তার রক্তে জেগে উঠতে পারে ভেরা ফিগনার। না, না—এ বিশ্বাস করা অসম্ভব।

তা হলে! তা হলে কি নদী পার হয়ে? ওই অন্ধকার বনরেখা আর দিগন্ত প্রান্তরের অলক্ষ্য পথে? যেখানে চক্রবালে হাঁসের ঝাঁক উড়ে চলেছে—ওর থেকেও দূরে, ওরও সীমা ছাড়িয়ে?

রহস্যময়ী নদীর কলোচ্ছ্বাসে কোনো জবাব মেলেনা। সকালের আলোয় নদীর চরে সোনালি বালি চিক্ চিক্ করে। যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই স্বর্ণ-সীতার বিসর্জ্জন হয়ে গেছে—সোনালি বালিতে আর সোনা-মাখানো নদীর জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গিয়েছে সে।

—শেষ—

অনধিকার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[ছায়াচিত্রলোক আজ শৈলজানন্দকে গ্রাস করেছে—সাহিত্যিক হিসাবে এই খেদ, মনে হয় প্রত্যেক বাংলা সাহিত্যিকের মনে আছে। বাংলাদেশে ছোটগল্প-লেখকরূপে তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, হয়ত সে-অনুপাতে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি···তাই অসুন্দরী ভার্য্যার মতন তাকে পরিত্যাগ করে, সে-কালের কুলীন ভর্ত্তার মতন তিনি অন্য শিল্পের গলায় বরণমালা দিয়েছেন এবং নতুন শিল্প-লক্ষ্মী তার সঙ্গে সঙ্গে বহু-আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যও নিয়ে এসেছে···তবুও নির্ব্বাসিতা প্রথমার পক্ষ থেকে আমরা সকাতরে আহ্বান করছি, হে শিল্পী, কুলিন-প্রথা অনুসারে, প্রথমাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করবেন না! পাঠকবর্গকে আমরা জানাচ্ছি যে, তিনি এই আবেদনে সম্মতি জানিয়েছেন—এই গল্পটী সেই সম্মতির প্রথম নিদর্শন।]

সুনামগঞ্জই বোধহয় বর্দ্ধমান জেলার সব-চেয়ে বড় শহর।

বর্ষা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাদ্র মাস। বিকেল থেকেই আকাশটা অন্ধকার করে' মেঘ উঠেছে। সন্ধ্যে হয়ে এলো। যে-কোনো মুহূর্ত্তে বৃষ্টি নামতে পারে।

এমন সময় দেখা গেল একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে Modern furniture কোম্পানীর কাঠের গুদোমটা পেরিয়ে হারাধন চক্রবর্ত্তীর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীটার সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

গাড়ীটা দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার ওপর। গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক নেমে বাড়ীর ফটক পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বললে, হারাধনবাবু আছেন?

হারাধন নিজেই তখন ঘরের এক কোণে বসে বসে খেরো-বাঁধা একটা খাতায় বোধকরি তার কাঠের গুদোমের হিসেব লিখছিল। মুখ তুলে বললে: কে? কি চাই?

লোকটি ইতস্তত করছে দেখে হারাধন ভাবলে বুঝি নতুন খদ্দের, কাঠ খরিদ করতে এসেছে। বললে: বসুন।

—আজ্ঞে না, বসবো না! এসেছি বিশেষ প্রয়োজনে।

হারাধন বললে: বুঝেছি। কিন্তু মশাই আগেই বলে রাখি—বাকী টিক্ দিতে পারবো না।

লোকটি বললো : আজ্ঞে না, বার্মা টিকের জন্তে আসিনি।

—তাহ'লে কি জন্তে এসেছেন বলুন।

লোকটি আম্‌তা আম্‌তা করে' বললে : এসেছিলাম বরদা কোবরেজের কাছে। আমার স্ত্রীর ভয়ানক ব্যারাম, তারই চিকিৎসা করাতে।

—হ্যাঁ বরদা কোব্‌রেজ ভাল কোব্‌রেজ, নাম-ডাক আছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনে অনেক দূর থেকে এসেছি।

—বেশতো, আসল কথাটা বলুন না, শুনি।

—কোব্‌রেজ্‌-মশাই বললেন, পাঁচ-ছ' মাস ধরে' ওষুধ খেতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোব্‌রেজি ওষুধ একটু বেশিদিন ধরেই খেতে হয়।

—তাই ভাবছি আর বাড়ী ফিরে যাব না। এইখানেই থাকবো। স্ত্রীর চেঞ্জও হবে, ওষুধ খাওয়াও হবে। কোব্‌রেজ-মশাইই বলে দিলেন—কেঠো হারাধন—আজ্ঞে এই—মানে—

হারাধন একটু হেসে বললেন : বলুন—লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমি কাঠের ব্যবসা করি কি-না, তাই আমাকে সবাই কেঠো-হারাধনই বলে। আমি সব বুঝতে পেরেছি, একখানা বাড়ী আপনার চাই, কেমন? এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

হারাধন বললে : তা বেশ। আমার এই পাশের বাড়ীটা খালি আছে, ওইতেই থাকুন।

—ভাড়া কত?

—পনেরোটি টাকা দিতে হবে।

লোকটি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। বললে :

বাঁচালেন মশাই, একে বর্ষাকাল, স্ত্রীর শরীর খারাপ, তার ওপর ছোট একটা মেয়ে—সকাল থেকে বাড়ী খুঁজে খুঁজে শেষে—

হারাধন বললে : বাড়ীর জিনিষপত্তর, মানে এই রান্নার আসবাব, বাসন···বিছানা···

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু কিছু সঙ্গে আছে, বাকি সব এইখানেই কিনে নেবো।

এই বলে' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো। অর্থাৎ দয়া করে' এবার শুধু বাড়ীখানি দেখিয়ে দিলেই হয়।

হারাধন বললে : কিন্তু দেখুন, রান্নাবান্নার আসবাবপত্র কিনতেই রাত্রি হয়ে যাবে, রাঁধবেনই-বা কখন, আর খাবেনই-বা কখন? তার চেয়ে এক কাজ করুন। আপনার স্ত্রীকে আর মেয়েকে আমার বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিন, আপনি বরং বাড়ীখানা দেখেশুনে সব ঠিকঠাক করে' নিন।

লোকটি যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

কোচ্‌ম্যানের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে গাড়ী থেকে তার জিনিসপত্র নামালে, স্ত্রীকে নামালে, মেয়েটিকে নামালে।

দেখা গেল, স্ত্রীর বয়স বেশি নয়, সুন্দরী এবং শীর্ণা। হয়ত' আগে এরকম ছিল না, রোগে ভুগে

ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছে। মেয়েটি তিন-চার বছরের। মায়ের মতই দেখতে সুন্দর। গায়ের রং সাদা ধপ্ ধপ্ করছে। রেশমের মত কোঁকড়া কোঁকড়া একমাথা চুল!……

লোকটির নাম রণজিত, স্ত্রীর নাম মালতী আর মেয়েটির নাম বুলা। জাতিতে ব্রাহ্মণ। হারাধনের স্বজাতি।

হারাধনের স্ত্রী কামিনীতো ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে অবধি পাগল!—আহা, কেমন সুন্দর মেয়েটি!… তার যদি এম্নি একটা মেয়েও থাকতো!……

বুলাকে কোলে নিয়ে সে হারাধনকে ডেকে দেখালে।

হারাধন তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে: বাঃ, বেশ মেয়ে!

কামিনী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে' রইলো।

• •

রণজিত অনেক টাকা খরচ করে' সংসারটিকে তার বেশ পরিপাটি করে' সাজিয়েছে। স্ত্রী তার কাজকর্ম করতে পারবে না বলে' রাঁধবার জন্যে একজন রাঁধুনী বামুন রেখেছে।

ছোট্ট বাড়ীখানি হারাধনের বাড়ীর পাশেই। এবাড়ীর দোতলার জানলা খুললে ও বাড়ীর উঠোন দেখা যায়।

কামিনীর কি যে হলো কে জানে। বুলাকে দেখবার জন্যে সময় নেই অসময় নেই, বারম্বার সে রণজিতের বাড়ী যেতে আরম্ভ করলে।

রাত্রে এক-একদিন দোতলার জানলা খুলে কামিনী ডাকে: বুলা!

বুলা যদি জেগে থাকে তো সাড়া দেয়, আর ঘুমিয়ে যদি পড়ে তো মালতী উঠোনে বেরিয়ে এসে ক্ষীণকণ্ঠে বলে: ঘুমিয়ে পড়েছে দিদি।

সেদিন রাত্রে আর কামিনীর ভাল করে' ঘুম হয় না। সকালে উঠেই সে কিকে পাঠিয়ে দেয় বুলাকে আনবার জন্যে।

বাড়ীর ভাড়া মাত্র পনেরো টাকা, এসেছে মাত্র সাতদিন, এরই মধ্যে কামিনী বুলাকে যে-সব জিনিসপত্র দিয়েছে তার দাম অন্তত দশ টাকা।

মালতীকে এমনি দেখলে বুঝবার যো নেই যে, তার কোনও অসুখ করেছে। রুগ্ন দুর্বল মালতী বরদা কোব্‌রেজের ওষুধ খায় আর উঠে হেঁটে বেড়ায়।

রণজিত বলে: ভালোর লক্ষণ তো এখনও কিছু দেখছি না কোবরেজ।

কোব্‌রেজ বলে: অনেকদিনের পুরনো ব্যামো, সারতে একটু সময় লাগবে।

কিন্তু মানুষের কখন কি যে হয় কিছুই বলা যায় না। ডাক্তার কোব্‌রেজও অনেক সময় টের পায় না।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, মালতী বিছানায় শুয়েছে, উঠে হেঁটে বেড়াবার ক্ষমতাটুকুও আর নেই।

কামিনী গিয়ে দেখে এলো, পেটের যন্ত্রনায় মালতী ছট্‌ফট্‌ করছে, মুখখানি গেছে শুকিয়ে, ক্ষীণ কণ্ঠ আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, আর বেচারি বুলা দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রের কাছটিতে!

কামিনীর দুঃখ কিন্তু যত-না তার মার জন্যে—তার চেয়ে বেশি ওই মেয়েটার জন্যে। বললে: মেয়েটাকে আমি নিয়ে যাই মালতী, আমার নিজের কাছে রাখিগে।

মালতী বললে: হ্যাঁ দিদি, ওর বড় কষ্ট হচ্ছে।

এই বলে মালতী তার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। দুটি চোখ জলে ভরে' এসেছে। হাত বাড়িয়ে কামিনীর একখানি হাত চেপে ধরে' অত্যন্ত ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে বললে: আর-জন্মে তুমি আমার সত্যই দিদি ছিলে। বুলাকে তুমি নিজের কাছে রাখো দিদি। যদি মরে' যাই—বুলা তোমারই হ'লো।

কামিনীরও দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এলো। বুলাকে পাওয়ার আনন্দে না মালতীর দুঃখে, কে জানে।

বুলাকে কোলের কাছে টেনে এনে কামিনী জিজ্ঞাসা করলে: পারবি থাকতে আমার কাছে?

হুঁ। বলে' ঘাড় নেড়ে বুলা তার সম্মতি জানালে।

কামিনীর অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

বুলাকে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ী ফিরেই কামিনী ডাকলে: ওগো, শুনছো?

হারাধন বাড়ীতেই ছিল। বললে: কি?

—এই ছাখো, কাকে নিয়ে এলাম।

—ওকে তো দিবারাত্রিই আনছো, ও আর দেখবো কি?

কামিনী বললে: না না, বুলার মা বললে: আজ থেকে ও আমার কাছেই থাকবে।

এই বলে সে তাকে কোল থেকে নামিয়ে আনন্দের সংবাদটা স্বামীকে আর না বলে থাকতে পারলে না। চুপিচুপি—বললে: মালতী বললে, ও যদি মরে যায়—মেয়েটী আমার।

হারাধন বললে: বেশ তাহলে আজ থেকে ওর মৃত্যু কামনাই কর তুমি।

কথাটা শুনে কামিনী নিজেই শিউরে' উঠলো। বললে: ওমা, সে কি কথাগো!

বুঝলে—কথাটা বলা তার ভাল হয়নি। হাজার হোক্, বুলার মা তো!

মানুষের রোগ-ব্যাধির কথা কিছু বলবার জো নেই।

বদ্যি কোব্‌রেজ ওষুধও দেয়, আশ্বাসও দেয়, রণজিত ঠিক সময়-মাফিক ঘড়ি ধরে' অনুপান সহযোগে ওষুধগুলি মালতীকে খাওয়াতে থাকে, কিন্তু রোগিনী আরোগ্য লাভ করছে বলে মনে হয় না।

মালতী আরও দুর্বল হয়ে গেছে। সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি কিছু হয় না। অথচ মাসের পর মাস চলে যায়। মালতী যে-কে সেই।

বুলা কামিনীর কাছেই থাকে। কামিনীর কাছেই খায়, কামিনীর কাছেই শোয়। প্রত্যহ বিকেলে শুধু একবার সে নিজে গিয়ে মাকে তার দেখিয়ে নিয়ে আসে।

মালতী সেদিন বললে: ও তোমার কাছে বেশ আছে, না দিদি?

কামিনী বললে: হ্যাঁ ভাই, কোত্থেকে এসে কি মায়া যে বসিয়ে দিলি—

বুলাও আজকাল কামিনীর কাছছাড়া থাকতে পারে না। কামিনীও বুলাকে ছাড়া থাকতে পারে কামিনীকে প্রথম প্রথম সে মাসীমা বলতো, আজকাল বলে মা।

হারাধন জিজ্ঞাসা করে: কে শেখালে ওকে মা বলতে?

কামিনী একটু হেসে বলে: আমিই শিখিয়েছি।

হারাধন আজকাল রণজিতকে তুমি বলে।

সেদিন বললে: ছ'মাস হয়ে গেল, এখনও কিছুই যখন হলো না, তখন এক কাজ কর। ভাল একজন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার দেখাও। আর নইলে একবার কলকাতায় নিয়ে যাও।

রণজিত বললে: এ্যালোপাথী ওষুধ ও কিছুতেই খেতে চায় না দাদা, নইলে আমার তো ইচ্ছে ছিল ওকে একবার মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে দেখাই। তা কি বলে জানেন? বলে—আমার জন্যে তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আমি মলে তুমি শুধু একটি বিয়ে কোরো।

এই বলে' সে হাসতে লাগলো।

হারাধন বললে: আমার মনে হয়—কলকাতা নিয়ে গেলেই ভাল করতে।

রণজিত বললে: প্রথমে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পেরেছি ওর ক্যান্সার হয়েছে।

—বুঝেও তুমি চুপ করে' আছ?

—উপায় নেই দাদা।

হারাধন বললে: আমার স্ত্রীকে দিয়ে একবার বলাব।

বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন হলো না। প্রাণের দায় বড় দায়।

মালতী বললে: বলছো যখন, তখন একবার ফিরেই আসি কলকাতা থেকে। কিন্তু বুলা তোমার কাছে থাকবে দিদি, তোমার কষ্ট হবে না?

কামিনী ম্লান একটুখানি হাসলে। যার চেয়ে বড় সুখ তার আর নেই, তাকেই বলছে কষ্ট!

মালতী তার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বললে: তাগ্যিস্ তুমি ছিলে দিদি, নইলে ওর আর কষ্টের সীমা থাকতো না।

বলতে বলতে তার দু'চোখের কোণ বেয়ে দর দর করে' জল গড়িয়ে এলো। ধীরে ধীরে বললে: কিন্তু আমি আর বাঁচবো না দিদি, আমি বুঝতে পেরেছি।

কামিনী তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে:

ও-কথা বলতে নেই। চুপ কর।

মালতীর কলকাতা যাওয়া সব ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু যেদিন যাবার কথা, হঠাৎ দেখা গেল, রণজিত সেদিন গেল না।

হারাধন জিজ্ঞাসা করলে: কি হ'লো? গেলে না যে।

রণজিৎ বললে : দেশ থেকে কিছু টাকা আসবার অপেক্ষা করছি দাদা, কাল-পরশু এসে যাবে।

হারাধন বললে : টাকার কথা তুমি আমাকে বলনি কেন ?—এই বলে সে তাকে জোর করে' টেনে নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে। বললে : কত টাকা চাই ? টাকা আমি দেবার মত লোক পাই না রণজিৎ, আমার টাকা কি হবে বল তো ?

বলতে বলতে সিন্দুক খুলে সে পাঁচশ' টাকা রণজিতের হাতে দিয়ে বললে : আর চাই ?

রণজিত অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার নির্বন্ধ।

সেদিন বিকেল থেকে মালতীর পেটের বেদনা এত বেশি বাড়লো যে—সে-অবস্থায় কোনও ডাক্তারই তাকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা দিতে পারলে না। শহরের বড় বড় দু' তিনজন ডাক্তারকে হারাধন নিজে ডেকে আনলে। ইন্‌জেক্‌শান দেওয়া হলো, ওষুধ দেওয়া হলো, একজন নার্স সমস্ত রাত্রি জেগে তার সেবা করতে লাগলো, বুলাকে ঘুম পাড়িয়ে কামিনী বসে রইলো শিয়রের কাছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হ'লো না। পরদিন সন্ধ্যায়, ঘরে তখন সবেমাত্র আলো জ্বালানো হয়েছে, বুলার একখানি হাত কামিনীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মালতী বললে : একে দিয়ে গেলাম দিদি, ও তোমারই মেয়ে। কলকাতায় গেলে এটি আর হয়ে উঠতো না।

ক্ষীণকণ্ঠে এই ক'টি কথা বলে সে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। কামিনী বললে : বুলার বাবাকে ডেকে দেবো ?

মালতী বললে : হ্যাঁ।

রণজিত কাছে এসে বসলো। কিন্তু ঠিক এই সময়েই কথা বলার অত্যধিক আগ্রহে কি-না জানি না কথা তার বন্ধ হয়ে গেল। গলাটা ঘড় ঘড় করতে লাগলো। চোখ দুটো বারকতক কেমন যেন করলে। আবার জল এলো চোখের দুকোণ বেয়ে। তারপর সব শেষ হয়ে গেল।

কোত্থেকে কি যে হলো, ঠিক যেন ভোজবাজির মত।

বুলাকে বুকের ওপর চেপে ধরে' কামিনী তার স্বামীকে বললে : একটা ছেলের জন্যে কি কাণ্ডই না করেছিলাম! ভগবান কেমন করে জুটিয়ে দিলেন দ্যাখো। কোথাকার কে, আলাপ নেই, পরিচয় নেই, মেয়েটাকে দেবার জন্যেই যেন এখানে এসে হাজির হ'লো।

হুঁ। বলে হারাধন বারান্দার ওপর পায়চারি করতে লাগলো। মনে হলো—কি যেন সে ভাবছে।

কামিনী বললে : কথা বলছো না যে ?

হারাধন বললে : বেশ তো। মানুষ কর, তারপর ভাল দেখে একটি বিয়ে দাও, শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে।

কামিনী বললে : শ্বশুরবাড়ী যেতে দেবো কেন ? মেয়ে-জামাইকে আমরা নিজের কাছে রাখবো। আমাদের যা কিছু, ওরই তো সব।

—হ্যাঁ। তা রাখতে পারো।

কামিনী বললে : নিশ্চয়ই রাখবো। এই আমার মেয়ে, এই আমার ছেলে, এই আমার সব।

এই বলে' বুলাকে সে আদর করে' আরও কাছে টেনে আনলে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই রণজিত দেশে গেছে। জিনিসপত্র এইখানেই সব পড়ে আছে। যাবার সময় ব'লে গেছে—যখন হোক্ একসময় এসে নিয়ে যাবে।

ছ'সাত মাস পেরিয়ে গেল। রণজিত আর এলো না।

হারাধন বললে: সে বোধ হয় আর এলো না। এবার তুমি ভাবতে পারো—মেয়েটা তোমার।

কামিনী হাসতে হাসতে বললে: তোমার বুঝি সন্দেহ ছিল?

হারাধন বললে: হ্যাঁ।

হারাধনের সংসারে অভাব কিছু নেই। কাঠের কারবার করে' প্রচুর অর্থ সে উপার্জন করেছে। এই সবের মালিক হবে ওই পরের একটা কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে। ভেবে ভেবে পাড়াপ্রতিবেশীর চোখে ঘুম নেই। কিন্তু হারাধন বেশ আনন্দেই আছে। যেখানে যায়, সাজিয়ে-গুজিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। যে জিজ্ঞাসা করে, তাকেই বলে, আমার মেয়ে।

•

•

সে বছর পুজোর ঠিক আগেই, একদিন সকালবেলা বুলাকে সঙ্গে নিয়ে হারাধন বাজারে গিয়েছিল। শহরের সবচেয়ে সেরা জামাজুতো তার জন্যে কিনেও তার তৃপ্তি হ'লো না।

বুলাকে চমৎকার করে' সাজিয়ে কামিনীর কাছে নিয়ে গিয়ে বললে: ভাখো কেমন মানিয়েছে!

আনন্দে কামিনীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। একদৃষ্টে সে তাহার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

চাকর এসে খবর দিলে: দু'জন বাবু এসেছেন।

হারাধন নীচে নেমে গিয়ে দেখে, একজন রণজিৎ, আর একজন বোধকরি তার বন্ধু।

রণজিত একগাল হেসে বললে:

কেমন আছেন দাদা?

ভাল। বলে, হারাধন তাদের আপ্যায়িত করে' বসালে। দেখে মনে হলো—স্ত্রীর শোক সে ভুলে গেছে।

হারাধন বললে: জিনিসগুলো নিতে এলে বুঝি?

রণজিত বললে: না তা ঠিক নয়। জিনিস আর এমন কিই-বা আছে……

হারাধন ভাবলে বুঝি লজ্জায় বলতে পারছে না। সেই ঘরেরই একটা কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে: ওই ভাখো, আমি যত্ন করে' বেঁধেছেঁদে রেখে দিয়েছি। এলে যখন, খাওয়া-দাওয়া কর, আজকের দিনটা থাকো, কাল সকালে যাবে।

রণজিত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হারাধন বলতে দিলে না। চাকরকে বললে: বুলাকে আন্ এইখানে। ভাখো তোমার মেয়ে কিরকম হয়েছে।

বুলা এলো। তারই কিনে-দেওয়া পোষাক-পরিচ্ছদে একেবারে কল্‌মল্ করে' এসে দাঁড়ালো হারাধনের গা ঘেঁসে। রণজিতকে যেন সে চেনেই না এমনি ভাবে, সলজ্জ সঙ্কোচে। কিন্তু মনে হ'লো সে একা আসেনি। দরজার ওপারে পর্দার আড়ালে কামিনীও এসে দাঁড়িয়েছে।

বুলার মাথায় হাত রেখে হারাধন বললে: যাও, তোমার বাবার কাছে যাও।

রণজিত নিজেই হাত বাড়িয়ে তাকে তার কোলের কাছে টেনে নিলে। বললে: দেখুন হারাধনবাবু, জিনিসপত্র নিতে আমি আসিনি, আমি বুলাকে নিতেই এসেছি।

কথাটা ধক্ করে' হারাধনের বুকে গিয়ে বাজলো।

জবাব দিতে পারলে না। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

রণজিত কিছু বুঝলে কিনা কে জানে। আবার বললে: ওর মা ওকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে।

হারাধন চম্‌কে উঠলো। বললে: মা! মা কে?

রণজিত মাথা হেঁট করে' বললে: আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আবার বিয়ে করেছি কি-না!

হারাধনের জবাব পাবার আগেই রণজিত বুলাকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে: আমরা এক্ষুনি চললুম দাদা। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললে: জিনিসগুলো গাড়ীতে তুলে নাও, বাঁধাই তো আছে।

জিনিসপত্র গাড়ীতে তোলবার ব্যবস্থা হ'লো।

রণজিত বললে: আপনি আমার কি উপকার যে করলেন···মেয়েটাকে দয়া করে' এতদিন রাখলেন, তার জন্যে···কি আর বলবো···আমি তাহ'লে।

হারাধন পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

বুলা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকাতে লাগলো একবার হারাধনের দিকে, আর একবার দরজার দিকে।

হঠাৎ পর্দা সরিয়ে কামিনী এসে দাঁড়ালো।

নিশ্চয়ই কিছু তার বলবার ছিল, নইলে এমন নির্লজ্জের মত সকলের সুমুখে এসে দাঁড়ালো কেন?

কিন্তু মুখ দিয়ে তার একটি কথাও বেরুলো না, শুধু চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে' জল গড়াতে লাগলো।

কাঁকর-পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী সশব্দে বেরিয়ে গেল।

মুক্তপুরুষ হরিদাস

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিবাবু আমাদের গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ ভাবে পরিচিত, তাই তাঁর প্রত্যেক লেখার মধ্যে বাংলার পল্লী-শ্রীর একটা না একটা রেখা ফুটে ওঠে। ইদানীং কতকগুলি ছোট গল্পে তিনি তুলির বদলে অক্ষরে "স্কেচ" আঁকছেন। গ্রাম্য স্কুলের মাষ্টারটীর এই বিরল-রেখা স্কেচটী আমাদের শিক্ষায়তনের গোড়ায় টাঙিয়ে রাখা দরকার, কারণ, তা দেখলে মনে পড়বে, আমরা শিক্ষাকে—শিক্ষা কার্য্যকে কতখানি গৌরবের আসন দিয়েছি! সত্যিই তাঁদের আমরা মুক্তপুরুষ করে তুলেছি।]

এটি মুক্তপুরুষ হরিদাসের জীবনী।

হরিদাস চক্রবর্ত্তী বি, এ; বি, টি এখানকার স্কুলে অনেকদিন ধরিয়া মাষ্টারি করিতেছেন। সম্প্রতি মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একে দিনে রাতে চোখের অসুখে তিনি রীতিমত ভুগিতেছেন, তাহার উপর হেডমাষ্টারের কড়া তাগাদা—হাজিরার খাতাগুলো আর ক'দিন ফেলে রাখবেন মশাই? সব মাষ্টারদের খাতা দেওয়া হয়ে গেল, আর আপনি কাইণ্ড্ উইক্‌স্ খাতা নিয়ে বসে আছেন—একখানাও দেখলেন না—এতে করে স্কুলের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।

হরিদাস বাবু বিনীত ভাবে বললেন—চেষ্টা তো করচি স্যর, চোখের জন্যে পড়তে পাচ্ছি না, দিচ্ছি যত শিগগির হয়—

আবার তিনদিন গেল। আবার হেডমাষ্টার কড়া তাগাদা দিচ্ছেন—কি মশাই? এখনো আপনি খাতা দিচ্ছেন না?

—দিচ্ছি স্যর, আর দু—পাঁচটা দিন—

—না মশাই, তা হবে না। আপনি পরশু নিশ্চয় খাতা দেবেন, নয়তো ষ্টেপ নিতে বাধ্য হবো। আমি কোনো অনপ্লেয়্যাণ্ট্ ব্যাপার করতে চাইনে, কিন্তু—

তার ওপর বাড়িতে একপাল ছেলেমেয়ে দিন রাত খাই খাই করিতেছে তাহাদের খাওয়ার আকাঙ্খা মিটাইতে পারে, জিভুবনে যেন বাপ মা আরও জন্মগ্রহণ করে নাই। সামান্য বিয়াল্লিশ টাকা বেতনের স্কুল মাষ্টার হরিদাস বাবু এই যুদ্ধের বাজারে আর কত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন?

খাতা একটি গাধা। সকালে উঠিয়া টিউশনি করিতেই সময় কাটিয়া যায়, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলিবার পর্য্যন্ত সময় হয় না। বাজার করিতে হয় টিউশনি করিয়া ফিরিবার পথে। বাড়িতে গিয়াই শুনিতে হয়, গিন্নি বলিয়া বসেন, আজ একখানা শাড়ি আনো, যেখানেই হোক, মেয়েটা কি ন্যাংটো হয়ে থাকবে? তোমার না হয় গা ছিম করে বসে থাকলে চলে, আমার তো তা চলে না?

কাপড় কোথা হইতে আসে সে জ্ঞান যদি বাড়ির মেয়েদের থাকিত। তাহা ছাড়া দু-এক মাস হয়, লোকে পারে। এই ব্যাপার চলিতেছে কি আজ? কতকাল হইতে এই অবস্থায় তিনি কালযাপন করিতেছেন বা আরও কতকাল করিতে হইবে, তাহা কে জানে?

কিন্তু উপায় কি? উপায়ও তো কিছু দেখেন না।

এই সময় আর একদিন হেডমাষ্টারের কড়া কথা শুনিতে হইল, পরীক্ষার খাতা ভাল করিয়া দাগ দিয়া না দেখার দরুণ। হেডমাষ্টার বলিলেন—খাতাগুলো কি অমন করে দেখে? ওতে ছেলেদের কি সুবিধে হবে মশাই? আপনি আজকাল কাজে বড় অমনোযোগী হয়েছেন, খাতাগুলো ফেরৎ নিয়ে যান, ওতে কাজ চলবে না। সেদিন টিফিনের ছুটিতে স্কুলের সম্মুখের মাঠের গাছতলায় বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে হরিদাস বাবুর মনে হইল এ বিষম বিপদ হইতে কবে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। এই বন্ধন দশা চলিতেছে কতকাল। এমন কি কোনো উপায় নাই, যাহাতে তিনি এই দুঃখ দারিদ্র্য ও ক্রীতদাসত্বের বন্ধন এড়াইতে পারেন?

ভগবান এ প্রার্থনা শুনিলেন।

কি ভাবে তাহা বলি। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা।

থার্ড ক্লাসের শ্রীপতি বুধু বেঞ্চির তলায় লুকাইয়া একখানা কি বই পড়িতেছে হরিদাস বাবু দেখিতে পাইলেন। ছবার বারণও করিলেন—এই কি হচ্ছে? অঙ্ক কসো—তাড়াতাড়ি কসো—

কিন্তু শ্রীপতি অঙ্ক কসিবে কেন, ভগবান যে অঙ্ক তাহাকেই দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সংসারক্লিষ্ট হরিদাসের নিকট। এরূপ অলৌকিক ঘটনা আপনারা মহাপুরুষদের জীবনীর মধ্যে অনেক পাঠ করিয়াছেন, মনে করিয়া দেখুন। শ্রীপতি আবার লুকাইয়া সেই বইখানি পড়িতে লাগিল। এবার হরিদাস বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া গিয়া তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া তাহার কাণ সজোরে মলিয়া দিলেন। পরে চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। কৌতূহল বশতঃ বইখানি খুলিলেন। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোনো নাটক নভেল হইবে—অন্ততঃ ভূতের গল্প। কিন্তু তা নয়, বইখানার নাম 'দেব বাণী'; স্বামী বিবেকানন্দ রচিত। হরিদাস বাবু ধর্ম্মের ধার কখনো ধারিতেন না, তবে বিবেকানন্দের নাম তাহাও জানিতেন। বইখানি একবার পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া হাতে করিয়া রাখিয়া দিলেন।

পরদিন রবিবার। টিউশানি ছিল না। বাড়িতে চা খাইয়া হরিদাস বইখানি লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলেন। এসব কি কথা। আমিই সেই। আমিই ভগবান। অহং ব্রহ্মাস্মি সোঽহং।

কি মহান, বিরাট আইডিয়া! কি হিমালয়ের মত উদার গগনচুম্বী বাণী। হরিদাস মাষ্টার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মাথা গিয়া মহাব্যোমে ঠেকিল, সমস্তের অনুভূতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া গেল, তিনি আজ অজর, অমর, শাশ্বত আত্মা, ভগবান আর তিনি হাত ধরাধরি করিয়া যুগ যুগ পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন অনন্তকাল ধরিয়া, চলিবেন অনন্তকাল ধরিয়া। তিনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাবীর। জগৎকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্ত, এই পরম সত্য প্রচার করিবার জন্ত তিনি লীলাদেহ ধারণ করিয়াছেন—ক্রমে একথাও ধীরে ধীরে হরিদাসবাবুর মনের নিভৃত কোণে বাসা বাঁধিতে লাগিল।

হরিদাস মাষ্টার ব্রহ্ম।

এক আধদিন নয়, সাতদিনে বইখানি অন্ততঃ পাঁচবার পড়িলেন। খাতা দেখিবার জন্ত ফোর্থ ক্লাসের দুকড়ি হকের নিকট হইতে যে নীল পেন্সিলটা আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া দাগ মারিয়া পড়িলেন, ছেলেদের পরীক্ষার কাগজ হইতে সংগৃহীত সাদা কাগজে অনেক ভালো ভালো কথা টুকিয়া রাখিলেন, রাত্রি জাগিয়া বইখানার মধ্যে উদ্ধৃত অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিলেন, মোটের উপর বইখানি লইয়া মজগুল হইয়া রহিলেন।

বন্ধু শ্রীপতি কুণ্ডু! তুমি বাণকমাত্র, তুমি জানো না একজন দুঃস্থ, হতভাগ্য শিক্ষকের জীবনে তুমি কি জিনিস দিলে। এ অনেকটা সেই ঘটনার মত। হরিদাসবাবু ও তাঁহার এক বন্ধু পায়ে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটি বেড়াইতে গিয়াছিলেন, দুপুর ঘুরিয়া গেল, দুজনেই অভুক্ত। অবশেষে কোথাকার বাজারের এক অপকৃষ্ট হোটেলে তাঁহারা পিতলের থালায় মোটা চালের ভাত খাইতে বসেন। তখন দুপুর অনেকক্ষণ ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহার বন্ধুটি দারুণ ক্ষুধার মুখে ভাত পাইয়া মহা খুসি, খাইতে খাইতে গদগদকণ্ঠে বার বার বলিতে লাগিল—হরিদাস, তুমি জানো না সিষ্টেমকে তুমি কি দিলে!

হরিদাসবাবুর বড় মনে ছিল কথাটা।

শ্রীপতি কুণ্ডু, তুমিও জানো না, হরিদাসবাবুকে তুমি কি দিলে।

এই সাতদিনে হরিদাস বাবু সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। এমন সব বাণী পৃথিবীতে আছে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। তিনিই বা কি করিয়া জানিবেন?

স্কুলে গিয়া শ্রীপতি কুণ্ডুকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে ও বই কোথায় পেলি?

—আজ্ঞে ও দাদার বই।

—কোথায় পেলেরে তোর দাদা ও বই?

—কোত্থেকে এনেছিল স্যার। আরও আছে ওইরকম দু'তিনখানা বই।

—আছে? আজ টিফিনের সময় নিয়ে আসবি। অবিশ্যিকরে আনবি—বুঝলি?

টিফিনের ছুটির পরে শ্রীপতি কুণ্ডু আরও দুখানা বই আনিয়া দিল। বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং স্বামী অভেদানন্দ গিরির "অধ্যাত্ম দর্শন"।

হরিদাসবাবু যেটুকু সময় পান, বই দুখানি পড়েন। দুদিন টিউশানি কামাই করলেন। হরিদাস বাবুর স্ত্রী তাগাদা দেন—তুমি এ দুদিন ছেলে পড়াতে যাওনি যে? আজও তো স্থির হয়ে বসে আছ। টুইশানি আছে তো?

—থাকবে না কেন?

—হবে যাওনা কেন? ঐ দশটা টাকা আসে তাই দুধটা হয়। সকালের ছেলে পড়ানটা চলে গেলে দুধ ছাড়িয়ে দিতে হবে। দাম জোগাবে কোথা থেকে। আজও যাবেনা নাকি?

—আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই।

—এই তো দিব্যি চা খেলে, মুড়ি খেলে। যাও একবার বেড়াতে বেড়াতে। লালমোহন ঘোষ বড়ো লোক, সেবার সেই জানো তো? বেহুর বিয়ের জন্যে তিন দিন কামাই হয়েছিল বলে ছাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আজ বসে থেকো না যাও।

লালমোহনের তাগাদার চেয়েও গৃহিণীর তাগাদা কড়া। হরিদাস বাবু স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলেন! অগত্যা বই লইয়াই চলে। ছাত্রের বাড়ি। ছাত্রের বাবা লালমোহন ঘোষ বড় আড়তদার ব্যবসায়ী। ধুর্ত লোক। লালমোহন বাড়ি ছিলনা তাই রক্ষা। হরিদাস বাবু আর আগের মত ভয়ও করেন না। যা বলে বলিবে। পুস্তকের অর্জিত জ্ঞান যদি দৈনন্দিন কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারা গেল, তবে আর জ্ঞানের মূল্য রইল কোথায়।

স্বামী মহেশ্বরানন্দ গিরির পুস্তকেই আছে, "যে ব্যক্তি শুধু বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে অথচ একবারও আত্মচিন্তা করে না, ভগবানের সহিত একাত্মবোধ তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছে। সেবা ধর্মের উৎকর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ অনেক রচনা করিয়াছে, পাঠ করিয়াছে, কিন্তু কখনো ভিখারিকে একটা পয়সাও দেয় নাই, ভগবানকে চিনিতে বা বুঝিতে তাহার এখনো বহু বিলম্ব।"

হরিদাস বাবু ছাত্রকে ডাকিলেন—কেশব?

ছাত্র বাহিরে আসিয়া বলিল—কাল পরশু এলেন না স্যার?

হরিদাস বাবু আগে আগে এক্ষেত্রে বলিতেন, অসুখের জন্য আসিতে পারেন নাই। কিন্তু এবার তিনি সে লোক নহেন। এত ভয় কিসের। লালমোহন ঘোষের তিনি ধার ধারেন না। সত্য কথা বলিবেন, ইহাতে ভয় করিলে চলে না। অতএব বলিলেন—এমনি একটু অসুবিধে ছিল।

—বাবা বলছিলেন তাই বলচি স্যার।

—কি বলছিলেন?

—বকছিলেন। জানেনতো বাবাকে। ওই রকম লোক।

—তা কি হবে এখন? বাড়ীতে অন্য কাজ ছিল। পড়ো।

ছেলেকে অঙ্ক কষিতে দিয়া হরিদাস মহেশ্বরানন্দ গিরির বই পড়িতে লাগিলেন।

"বিচারবলে কেহ কেহ জানিতে পারেন যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বহু সাধনবলে সংস্কার সকল দূর হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তবে আপনাকে ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে দর্শন হয়।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ সংস্কার বর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাকে ও বহুরূপী জগৎকে ব্রহ্মরূপেই দর্শন করেন।"

হরিদাসবাবুর দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, জ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব সংস্কারের একটি সংস্কারও তাঁহার নাই। ব্রহ্ম ও তিনি যে এক, এ জ্ঞান তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে ঢুকিয়াছে।

কি ভয়ানক কথা!

এত সহজে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়ানো যায়, কেহ এতদিন তাঁহাকে বলে নাই কেন?

পুনরায়—"মুক্ত পুরুষগণ উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া উত্তমপুরুষ ব্রহ্মে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েন।"

সাধন তো তাঁহার হইয়া গিয়াছে। তিনি সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধন না হইলে দিব্যজ্ঞান হয়? দিব্যজ্ঞান তাঁহার হইয়া গিয়াছে অথবা যদি বাকি থাকে, সামান্যই বাকি।

"তদবস্থায় গুণাতীত আত্মস্বরূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট স্বতঃই প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।"

উঃ, এ সব কথা এতদিন কোথায় ছিল!

পুনরায়—"সময় না হইলে তত্ত্বসমূহ জীবের নিকট প্রকাশ করা হয় না। যে উপযুক্ত পাত্র, যত্ন-পুরুষ বাক্যের সম্পূর্ণ অনুকূল, শুধু তাঁহারই নিকট গভীর শাস্ত্রতত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়া থাকে।"

ধন্য মহেশ্বরানন্দ গিরি! ধন্য শ্রীপতি কুণ্ডু!

আজ সময় হইয়াছে বলিয়াই তাহা হইলে এ তত্ত্ব তাঁহার চোখের সামনে ভগবান মেলিয়া ধরিয়াছেন।

দিন কুড়ি কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, হরিদাসবাবু বুঝিতে পারিলেন না। আগের সে হরিদাসবাবু একেবারেই নাই। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করে, সে কি আর সাধারণ মানুষ থাকে? হরিদাস বাবুর সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, আগের মত ভীরু তিনি আর নাই, টুইসানির ছাত্রের পিতাকে আর তত গ্রাহ্য করিবার আবশ্যক কি? কিসের ভয় তাঁর? তিনি অজর অমর আত্মা। দুদিনের জন্য লীলাখেলা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। এতদিন বুঝিতে পারেন নাই তাই ছোট হইয়া ছিলেন।

হরিদাসবাবু স্বাধীন হইবেন।

সর্ব্বপ্রথমে চাকুরী ছাড়িতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

সেদিন তাগিদেন, স্ত্রীকে সব খুলিয়া বলেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। ঘণ্টার সময় আহারাদি সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া প্রতিদিনের মত বাহির হইলেন কিন্তু স্কুলে গেলেন না।

পথের মধ্যে আলতাপোলের খালের ওপর যে পুল আছে, তাহার নিচে ঘাসের উপর ছায়ায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। সঙ্গে দুখানা অধ্যাত্মতত্ত্বের পুস্তক। একপ্রকার লুকাইয়াই রহিলেন এইজন্য যে স্কুলের ছেলেরা স্কুলে যাইবার পথে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। স্কুলে গিয়া হেডমাষ্টারের কাছে বলিয়া দিবে অথবা বাড়িতে তাঁহার স্ত্রীর নিকট। চুপচাপ থাকিয়া বই পড়িতে পড়িতে বিড়ি টানিতে লাগিলেন। বিড়ি ফুরাইয়া গেল। অসুবিধা হইতে লাগিল। বাজার স্কুলেরই কাছে। সেখানে বিড়ি কিনিতে গেলে কেউ না কেউ টের পাইবে। কি করা যায়?

রাস্তা দিয়া একটা লোক বিড়ি টানিতে টানিতে যাইতেছে। কে লোকটা? হরিদাসবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন। একটা বিড়ি কি চাহিবেন? নাঃ, লোকটা কি মনে করিবে।

হরিদাসবাবু ডাকিলেন—ওহে শোনো—

লোকটা রেলিং হইতে নিচের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবু?

—নেমে এসো। বাজারে যাচ্ছ কি? দুপয়সার বিড়ি আমার জন্যে আনবে?

—দাঁড়ান বাবু।

সে নামিয়া আসিল। বলিল—এখানে কি করছেন বাবু?

—এই—এই—ইয়ে কাঠের গাড়ি আসছে কিনা, তাই বসে আছি। কাঠ কিনবো।

লোকটি চলিয়া গেলে হরিদাস বাবুর মনে অনুতাপ হইল। ছিঃ, বিড়ির আসক্তিতে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন? আর বিড়ি খাইবেন না। বিড়ি ত্যাগ করিলেন আজ হইতে। অবশ্য এই দুই পয়সার বিড়ি খাইয়া লইবেন আজকার মত।

বেলা চারটার পর হরিদাস বাবু স্কুলের তলা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি আসিলেন। দিব্যি চা খাইলেন, খাবার খাইলেন, যেমন স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রতি দিন খাইয়া থাকেন।

আবার পরদিনও সেই রকম। তবে এবার স্কুলের তলা নয়, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। অন্য একটি বাবিশ বিড়ি বসিয়া বসিয়া পুড়াইলেন।

এমনি ভাবে সাত দিন কাটিয়া গেল। দশটায় বাড়ি হইতে রোজ বাহির হন, আবার ঠিক সাড়ে চারটায় বাড়ি আসিয়া পৌঁছান। কোনো হাঙ্গামা নাই, মুক্ত মন মুক্ত জীবন। এতদিনে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বোধহয় ভগবান অধ্যাত্ম সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করেন, সাধককে আরও উন্নত করিবার জন্য। সেদিন বাড়ি ফিরিতেই গৃহিণী বলিলেন—আজ মাইনে হয়েছে?

হরিদাস বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন—মাইনে?

—হ্যাঁ গো মাইনে হয়নি?

—না।

—কেন হয়নি? আজ তো ইংরেজী মাসের সাত তারিখ। পাঁচ তারিখে তো তোমাদের মাইনে হয়।

—আজও হয়নি।

—ইদিকে তো আর চলে না। হাজরী মেথুনি রোজ তাগাদা আরম্ভ করেছে, গায়ের মাংস খুলে খাচ্ছে। দুধওয়ালী আজ সকালেও তাগাদা দিয়েছে—তাদের বলে রেখেছি তুমি আজ মাইনে আনবে।

—তা আজ না দিলে আমি কি করবো?

—চালও বাড়ন্ত। কাল কি হবে তার ঠিক নেই। কি খেয়ে কাল ইস্কুলে যাবে? কাপড় একজোড়া না কিনলে এমনে বাড়ি থেকে আর বেরুনো যাচ্ছে না।

—না যায়, বেরিও না—

এই কথায় গৃহিণী ক্ষেপে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া দুজনার ঝগড়া সুরু করিলেন।

বড় মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, আমার বই এনে দিলে না?

—কি বই?

—কবিতা সোপান, দ্বিতীয় ভাগ। না কিনলে বুড়ো মাষ্টার রোজ বকে। তুমি কালই কিনে দাও বাবা।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে। এখন যা।

গৃহিণী ওঘর হইতে গলা চড়াইয়া বলিলেন—কাল থেকে তোর স্কুলে যেতে হবেনা। যতদিন না বই কেনা হয়, ততদিন ইস্কুলে যাবি নে, খবরদার বলচি।

সংসার অসার তো বটেই, ঘোর অশান্তিময়। এসব তিনি গ্রাহ্য করেন না। স্ত্রী বকিতেছে, বকুক। নারীজাতির স্বভাবই ওই। তাঁহার মন ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থায় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এসব সাংসারিক ঝগড়া দ্বন্দ্ব অতি তুচ্ছ জিনিষ, তিনি এসবের ঊর্দ্ধে আছেন। চিরকাল তো তোমাদের দাসত্ব করিলাম, এখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, চোখ রাঙাইয়া আর সংবেক পথে ফিরাইতে পারিবেনা। বকিতেছে বকিয়া মরুক।

মানুষ কত সহজে দেবতা হয়, তাঁহার জানা ছিলনা। দেবতা কে, না যে সংসারের মধ্যে থাকিয়া ও নির্লিপ্ত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণপথে উদিত হইল। জয় ও পরাজয়, লাভ ও ক্ষতিতে যে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে পারে সে-ই তো অধ্যাত্ম রাজ্যের একজন বড় গাঁতিদার বা তালুকদার। তিনি আজ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আছেন। কিসের বলে? জ্ঞানের বলে। ব্রহ্মোপলব্ধির বলে। আত্মসাক্ষাৎকার লাভের বলে। অতএব তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি দেবতা।

পর দিনের প্রভাতটি যেন তাঁহার কাছে তাঁহার নবজীবনের প্রভাতের মত ঠেকিল।

কি সুন্দর শরতের ঝলমলে আলো গাছে পালায়। কি সুন্দর বিমল কাকলী। এ সব যেন নতুন চোখে আজ দেখিতেছেন। কিন্তু এ দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি, আত্মহারা জ্ঞানীর দৃষ্টি নয়। হরিদাস বাবু যে সে কথা বুঝিলেন না তা নয়, তবু ভাল লাগিল এই শরতের আলো, সবুজ গাছপালা, নীল আকাশ।

কবির দৃষ্টি তাই কি, কবি কি জ্ঞানী নয়?

সবে আসিয়া বাইরের ঘরে বসিয়াছেন, এমন সময় হাজরী মেছুনি আসিয়া বলিল—বাবা ঠাকুর উঠেচেন? দুদিন আসি, আপনার দেখাই পাইনে। পেন্নাম হই। ইয়ে গিয়ে আমার ও মাসের সেই চিংড়ি মাছের দরুণ সাতসিকে পয়সা বাকি। আজ না দিলে চলবে না। মহাজনের টাকা বাকি, আজ তাদের দেনা শোধ দিতে হবে।

হরিদাসবাবু বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা এখন যা—বেলা হোলে আসবি।

—কত বেলা হ'লি?

—আঃ বিরক্ত করলে! এই বেলা ন'টা দশটা।

—বাবা ঠাকুর, আপনি ব্যাজার হবেন না, ব্যাজার হ'লি চলে? আমরা হচ্চি গরীব লোক। আপনার দোর থেকে নিয়ে গিয়ে তবে খাব। একটু বেলা হ'লি আসবো এখন, দামটা চুকিয়ে দেবেন এখন।

মেছুনি চলিয়া গেল।

হরিদাসবাবু সকাল দশটার আগেই ভাতে ভাত খাইয়া গিয়া পুলের তলায় বসিলেন। মুস্কিল এই যে, বিড়ি ফুরাইয়াছে। নগদ পয়সার অভাব। যে কয়টি খুচরা আনি দুয়ানি পকেটে ছিল, স্ত্রীকে দিয়া আসিতে হইয়াছে।

থাকগে। আশাতে আসক্তির বন্ধন? সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত না তিনি? তিনি না অজর, অমর, আত্মা? বিড়ি না টানিলে কি হয়? বিড়ি ছাড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গীতার ভাষ্য পড়িলেন। কৃষ্ণানন্দ স্বামীর এই ভাষ্যখানি সম্প্রতি পাড়ার রামতারণ মুখুয্যের কাছে চাহিয়া লইয়াছেন। বুড়ো রামতারণ ঘুঘু লোক, হুদখোর মহাজন, গীতার মহিমা সে কি বুঝিবে? টাকায় আণ্ডিল, একটা পয়সার সম্বায় নাই। গীতা অত সহজ জিনিস নয়।

আরও একদিন এভাবে কাটিল।

তাগাদার চোটে পথে ঘাটে বাহির হওয়ার যো নাই। বাড়ীতেও,তিষ্ঠিবার যো নাই। গত মাসের মাহিনা দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, স্কুলের হরিদাস বাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, আজ ইংরাজি মাসের এগার তারিখ। চার তারিখে মাহিনা হওয়ার দিন। এদিকে আর চলে না। একরাশ দেনা, দুধওয়ালী দুধ বন্ধ করিবে কাল হইতে।

বাড়ীতে গৃহিণী বলিলেন—হ্যাগা, আর তো চলে না। এবার কি তোমাদের মাইনে হবে না? এত দেরী করচে কেন এবার? আজ ইস্কুলে গিয়ে ভালো করে বলো পোড়ার মুখো হেডমাষ্টারকে।

তেরোদিন অনুপস্থিতির পর হরিদাস বাবু আজ স্কুলে গিয়া, ওটি ওটি হাজির হইলেন।

তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। হরিদাস বাবুর পা কাঁপিতেছে। জিব শুকাইয়া গিয়াছে। এতদিন কামাই করিবার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? বড় কড়া হেডমাষ্টার।

হেডমাষ্টারের আফিসে কম্পিত পদে দুরু দুরু বক্ষে ঢুকিতেই হেডমাষ্টার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—এত দিন কি হয়েছিল আপনার?

ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ হরিদাস সে চশমা পরা চোখজোড়ার তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আত্মজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—স্যর, ইয়ে—বাড়িতে বড্ড অসুখ। তলপেটে যন্ত্রনা। তাই নিয়ে আজ এ ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেচে। তার ওপর হাত জোগে নার্স করতে হচ্চে; আর তো দ্বিতীয় লোক নেই বাড়ীতে। কি কষ্টে যে যাচ্চে স্যর। একে পয়সার অভাব তাক্তারে—ওষুধেই বিশ পঁচিশ টাকা ব্যয় হয়ে গেল—বড় বিপদে পড়ে গিয়েচি স্যার—

হেডমাষ্টার বলিলেন—বুঝলাম। আপনার একটা খবর দিতে কি হয়েছিল? অসুখ বিসুখ হতে পারে সেটা আশ্চর্য্য নয়—বাট ইউ অট টু হ্যাভ ইনফর্মড্ মি—স্কুলের ইন্টারেষ্ট সাফার করচে, এ জ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। আপনি না পুরনো টিচার? না, একরম হোলে হরিদাস বাবু, আই অ্যাম সরি টু টেল ইউ, আমাকে সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করতে বাধ্য হোতে হবে আপনার নামে—

—এবারটা স্যার এক্সকিউজ করুন দয়া করে। আমার মাথার একদম ঠিক ছিল না এ ক'দিন, সে কি কষ্ট আর যন্ত্রনা রাত্রে, যদি দেখতেন স্যর তবে আপনারও কষ্ট হোত—এগারো দিন রাত্রে ঘুমুই নি, তার শিয়রে জেগে বসে আছি স্যর—চোখে দেখা যায় না সে যন্ত্রনা—

হরিদাস বাবু কাঁদো কাঁদো হইলেন।

দাঙ্গা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[কবি আজ হয়েছেন, যাযাবর রাজ-কর্মচারী অর্থাৎ মুনসেফ : মুনসেফ হওয়া মানে বাংলা-দেশটাকে "চরে" দেখে নেওয়ার সুবিধে পাওয়া : হয় ত সকলের কাছে এ-টা সুবিধে না-ও হতে পারে···এক জেলা থেকে আর একজেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো···কিন্তু সাহিত্যিকের কাছে, কষ্ট-দায়ক হলেও, এর একটা আলাদা মূল্য আছে। তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি, অচিন্ত্য-কুমারের গল্পে...বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার রূপ...বিভিন্ন ভাষা...স্থানীয় বৈচিত্র্য...

কিন্তু পটভূমি বিভিন্ন হলেও, মানুষ সে-ই এক...সেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী... গুণে স্বতন্ত্র...দোষে সব এক।]

শিশেখাল। এপারে আদমপুর, ওপারে ঘুলেশ্বর। দুই গ্রাম। মাঝখানে অনেক আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পুল ছিল একটা। তার কাঠ আর লোহা দুই গ্রামের লোক চুরি করে নিয়েছে। এখন শুধু একটা দুই-বাঁশের সাঁকো বাঁশের রেলিং আছে উপর দিকে। হেলে-বেঁকে।

কাঁকালে কলসী, চলেছে যমিনা। তাড়াতেকা সাঁকোর উপর দিয়ে। রেলিং না ধোটা-দড়ি, চলেছে জেয়াতালি, তেমনি নয়ড়ে সাঁকোর উপর দিয়ে। তেমনি রেলিং না ধরেই।

এপারে পুকুর, ওপারে গোবাট। গরু আগেই হেঁটে পার হয়ে গেছে খাল, জলের থেকে নাদুসনুদু তুলতুলে ডগাটা উঁচুতে তুলে ধরে। নদীর জল নোনা, পুকুরের জল ছাড়া খাওয়া যায় না। গরুকে খোঁটায় বেঁধে না রাখলে কার ক্ষেতের ফসল কখন তছরূপ করে।

যমিনা আর জেয়াত। ঘুলেশ্বর আর আদমপুর। দক্ষিণ আর উত্তর।

দু'জনে দেখা হল মুখোমুখি।

যমিনা বলে, 'পথ দাও।'

জেয়াত বলে, 'পিছু হটো।'

যমিনা বলে, সে মেয়ে, তার দাবি সকলের আগে। জেয়াত বলে, তার দাবি যমিনার আগে, কেন না সে আগে এসে সাঁকো ধরেছে। পথ এগিয়ে এসেছে আঙ্কেকেরও বেশী। এখন সে আর ফিরে যাবে না। এমন কোনোই ঘটিল টাঙানো নেই যে যেয়ে দেখলেই সাঁকোর থেকে জলে ঝাঁপ দিতে হবে।

'হাঁ, দিতে হবে। আগুনে পর্যন্ত দিতে হবে।' চেঁচে খিলখিলিয়ে বললে যমিনা। কলসীটা চলে পড়ছিল, কোমরের খাঁজের উপর তুলে ঢেলে ধরল আঁট করে। কাঁকা বাহুর বঙ্কিমতে কোটালে বা একটু নববৌবনের ছড়িছে।

'আগে আগুনে ঝাঁপ দিই, পরে না-হয় পানিতে যেব।' জেয়াতালি বললে।

'পথ ছাড়ো বলছি। রাগ-রঙ্গের জায়গা নয় ঝলসে উঠল মমিনা: 'যদি না ছাড়ো তো বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলে দেব।'

'আমিও বাড়ি ফিরে গিয়ে বাজানকে বলতে পারি।'

'কি বলবে তুমি?'

'বলব মকবুল মুহুরির মেয়ে মমিনা বলছে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'ওমা, কখন বললাম!'

'ঘরে নয়, বলেছে, আমার মুখে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

'সেই তো একশো বার। ছুড়ো মেলে দেব।'

'তাই বাজান-কে বললে লাভ হবে না, দাদা বেধে যাবে দুই গাঁয়ে। আমার মুখে অমুক ছুড়ো, কেউ নেই, কিন্তু তোমার মুখে একটু হাসি ফোটাও, মমিনা।'

মমিনা চোখ নামাল। বলল, 'হাসির গল্প নেই, তবু হাসি কি করে? শুধু শুধু কার ফরমায়েসে হাসা যায়?'

'চাঁদ কি কার ফরমায়েসে হাসে? আর যার অমন চাঁদমুখ—'

মমিনা হেসে ফেলল। ছলছলে জলে চিকচিক করে উঠল কপুলি চাঁদের টুকরো। খালের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল ঝিলাৎ। বাকি জলটুকু পার হয়ে গেল সাঁতরে।

শিকস্তি-পয়স্তির দেশ। নতুন চর উঠেছে। যে নদী কেড়েছে সেই নদীই দিয়েছে ভরাট করে।

জিন্নাতের বাপের নাম ফকুরালি। সে বলে, আমার জোতা জমি আবার ভেসে উঠেছে। শিকল-কবিলা করে জমি ভাগিয়ে নিলেই সোজা যাবে ঠিকঠাক।

মিথ্যে কথা। বলে মকবুল। মমিনার বাপ। বলে, নতুন চর, যখন আমার জমির দখল, তখন আমার স্বত্ব।

প্রথমে ঝগড়া-বচসা। তর্ক-বিতর্ক। মন-কষাকষি। খটাখটি। পক্ষাপক্ষি।

দু' পক্ষের জমিদার দু'পক্ষের পিছে এসে দাঁড়াল। ঠিক করলে প্রজাদের দিয়ে মামলা বলিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বত্ব বর্তিয়ে নেবে। পিছনে থেকে উস্কে দেয় ঘন-ঘন।

কিন্তু মামলা বসানো মুখের কথা নয়। তার অনেক তোড়জোড় লাগে, অনেক কাঠখড়। অনেক দলিল-দাখিলা। বাদী হওয়া সুবিধে না বিবাদী হওয়া এই নিয়ে সলা-পরামর্শ চলে। খালি দিন গোনে। চরে ঘাস গজায়। গজায় বনবাউ।

এক দিকে আমপুর, অন্য দিকে ধুলেশ্বর। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। এওয়ানি আদালতের কেরকার আর গলিঘুঁজির মধ্যে তারা যেতে চায় না। তারা ল্যাঠা-লাঠির ফয়সলা করে। আমি হারি হব, বলে ফকুরালি। মকবুল বলে, আমি হারি হব। লাঠিতে ভেঙে যাবার, ল্যাজার মুখে শান পড়ে। সুরু হয় বুঝি ধামসা-দামসি।

পলিমাটি শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলেছে উড়ি ধান। সবুজ হয়ে উঠছে আবাদের জমি।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল দু'দিকে। গাজী-গাজী। ঢাল-সড়কি, বর্শা-বল্লম, ল্যাজা-লাঠি, কোঁচা-টাঙ্গি, ঘা-কুড়ুল দু'দিকেই ঝকঝকিয়ে উঠল। চরের হকল নিয়ে বাধে বুঝি লাঠালাঠি।

আদমপুরের মোড়ল গফুরালি, ঘুলেঘরের মোড়ল মকবুল। দু'জনেরই হাল-হালুটি বিস্তর, পাকা ভিতের উপর টিনের ঘর অনেকগুলি। টাকা-পয়সার অভাব নেই। মোকদ্দমে-মোকদ্দমে ঝগড়া, কিন্তু দেখতে-দেখতে ছেয়ে পড়ল তামাম গ্রামে। এ-ও এককাট্টা, ও-ও এককাট্টা।

অকু হলে হোক। কুছ পরোয়া নেই। মারপিট, খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা। হয়ে যাক হয়-নয়। এসপার কি ওসপার। আগে থেকে পুলিশে এত্তেলা দেবেনা কেউ। পরে জেল-ফাটক হয় তো হবে। দ্বীপান্তরেও রাজি। বুকের মাংসের চেয়ে দামী যে জমি, সেই জমির চেয়েও মান বড়। ক্ষয়ের চেয়েও বড় হচ্ছে ধর্ম।

উলু ঘাঠ কেটে চাষ সুরু করে দিল জিয়াত। সাতদিনেই খড় কেটে-কেটে যায়। মাটি কেটে-কেটে পড়ে। এক চাষ দিয়েছে, দুয়ারে-তিয়ারে দরকার নেই, আদমপুরের লোকেরা ছুটে এল দলে-দলে, পাখা-মেলা বাদুড়ের ঝাঁকের মত।

গফুরালি হুকুম দিলে, কোট-এলাকা বজায় রাখতে হবে। যখন যখন নিয়েছি একবার, বেদখল হতে পারব না। ওরা হটে গিয়ে আদালত করুক। থানায় গিয়ে এজাহার দিক। আমরা আবাদের গায়ের কাদার মত জমি কামড়ে পড়ে থাকব।

উঠল রৌদ্রে ঝলসে উঠল অনেক পালিশ-করা শানানো লৌহমুখ, উড়ল অনেক ধুলোমাটি, কিনিক দিয়ে ছুটল অনেক কাঁচা রক্তের তোড়। যার আর্তনাদ করার কথা সেও উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ উল্লাস করছে। অস্ত্র ফেলে দিয়ে যার মাটি নেবার কথা সেও লাথি ছুঁড়ে মারে।

থেমে গেল গফুরালির দল। ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেল দেখতে-দেখতে। চল্লিশ বিঘা ধান-বোনা সাঁতরে। কিন্তু জিয়াতালি ফিরল না।

জিয়াতালি আটক পড়েছে শত্রুর কব্জার মধ্যে। আর ছাড়াছাড়ি নেই। কয়েদ-খালাসী মোকদ্দমা করতে চাও তো করো গে, কিন্তু তার আগেই খুন হয়ে যাবে।

মুচলেকা দাও, এই চর মকবুল মুচলিয়ে। দাও মুক্তিপত্র। একটানা দখল করতে দাও বারো বছর। রাজি হও তো, ফিরিয়ে পাবে ছেলে। না হও তো, কচুকাটা করে ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়।

হাতে-পায়ে-কোমরে দড়ি বাঁধা, জিয়াত শুয়ে আছে নাকড়ি-ঝরে। শুকনো হোগলার উপর।

রাত গহিন, ঝিঁঝি ডাকছে। জ্যোৎস্নায় মোহা-মোহা অন্ধকার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিয়াতের। তার অবো কপালের উপর কার ঠিণ্ডা হাতের ছোঁয়া।

'কে?'

'আমি গো আমি। রহিমা।'

ঘরের মিঠানিতে জ্বর ছড়িয়ে গেল গায়ের। কে যেন দেখছে, যেন শুনছে জিয়াত।

'খবর হয়েছে তোমার?'

'লাঠি লেগেছে ডান হাতে, বাঁ কাঁধের উপর। বাঁধায় ছিঁড়ে পড়ছে দু'হাত। বেতাগী ন্যাজা ফসকে গেছে, বিঁধতে পারেনি বুকের মধ্যে।'

'এইখানে লেগেছে?' হাতের মিঠানি কপালের থেকে চলে আসে বাহুর উপর।

'এখন আর ব্যথা নেই। শুধু দড়ির বাঁধনটাই যা ফেলেছে বেকায়দায়।'

সত্যি, সমস্ত জ্বর-জ্বালা ব্যথা-বেদনা যেন উবে গিয়েছে এক পরশে। ক্ষুব্ধ গায়ের রক্ত ঝিমিয়ে পড়ল। চোখে লাগল যেন ঘুমের আমেজ। নতুন-ফোটা কদমের গন্ধ পাচ্ছে মৃদু-মৃদু।

দড়ির গিঁট খুলে দিতে লাগল মমিনা।

'এ করছ কি মমিনা, বাঁধন খুলে দিচ্ছ যা থেকে?'

'হ্যাঁ,' ছোট-ছোট আঙুলে কিন্তু-কিন্তু শব্দের শিশির ঢেলে-ঢেলে মমিনা বললে, 'এ বাঁধন যে আমাকেও বেঁধে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। প্রথম রাতে সর্দার-চাইয়া হানা-সুতি করেছে। তবেদখল তো করেইছে, হটিয়ে দিয়েছে বিলকুলবে। তার উপরে কয়েদ করেছে ও দলের সাজোয়ানের ছেলে। কিন্তু আমি শুধু কেঁদেছি!'

'এ কি, ছেড়ে দিচ্ছ আমাকে? জানতে পারলে তোমার কী সর্বনাশ হবে জানো?'

'জানতে পারবে না।'

'পারবে না মানে?'

'মানে, জানতে পারলেও কিছুই করতে পারবে না আমার।'

'তা কি করে বলছ?'

'বলছি, আমিও ছাড়া পাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাব।'

'চলে যাবে? কোথায়?'

'রহমতপুরের কাজীর কাছে। জানো তো, কাজী ফুরমান মোল্লা আমার বাপু। নদীর দু' বাঁক পরেই রহমতপুর।'

'সেখানে কি?'

'সেখানে গিয়ে কাজীর দরবারে কাবিননামা রেজেষ্ট্রী করব। তোমার সঙ্গে আমার সাদি হবে। তুমি হলে আমি ফুলহান।' কথার মাঝে লজ্জা আর আনন্দের মিশেল। সাহস আর ব্যাকুলতার।

গায়ের রক্ত শির-শির করে উঠল জিয়াতের। বললে, 'তোমার বাপ-চাচা রাজি হবে?'

'না হোক। আমি তো আর নাবালগা নই যে অলি লাগবে বিয়েতে। আমি বালিগ হয়েছি গেল পৌষ মাসে। পনেরো বছর পেরিয়ে গেছি আমি। তা আমি সাবিদ করতে পারব। আমাদের বিয়ে রুখতে পারবে না কেউ।'

'বিয়ে হবে আমাদের?' ঘোর-ঘোর চোখে এখনো স্বপ্ন দেখছে জিয়াত?

'হাঁ, তোমার খেয়ালে থাকব চিরকাল। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই ঝগড়া-বিবাদ [illegible] দু' পক্ষের। যে-চর আমার বাবার বলছে আমার, আর তোমার বাবার বলছে তার, সে-চর তারা ভুলে মিলে আমাদের দুজনকে তাড়িয়ে দিয়ে যেবে। নাইয়র যেতে-আসতে হবে আমাকে, বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো দোবার শক্ত কাঠের পোল হয়ে উঠবে। দু'গ্রামে ফিরে আসবে নিত্য-যজমান। তা ছাড়া আমি তো আর পথ দেখি না। নইলে চিরকালই দু' পক্ষ কেবল মারামারি করবে, আমার বাপের মানুষের গায়ে ঝরবে রক্ত আর আমার চোখে ঝরবে দরিয়ার পানি!'

'কি করে যাবে, মমিনা?' জিয়াত উঠে বসল।

'ঘাটে ডোঙা আছে দাদুমিয়ার। তাতে করে পালাব।' কালো চোখে আলো জ্বলল মমিনার।

'আমার হাত যে ভাঙা। নৌকো বাইবে কে?'

'আমি দাঁড় টানব। তুমি শুধু হালটা ধরে বসে থাকবে। পারবে না?'

'পারব।'

'তবে চলো। নদীর নাম আঁধারমাণিক। আঁধার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনেই ক্রান্ত হালকা পায়ে চলে এল নদীর পারে। বাদাম গাছের নিচে নৌকো বাঁধা। হালকা মেছো ডিঙি।

'হাল-দাঁড় কই?' বিশ্বাস করলে জিয়াত।

'ও!' বুঝতে পেরেছে মমিনা। সব আশা-সোটা হয়েছে দাদার উদ্দিশে। বললে, 'তুমি একটু বোসো। উঠোনে চুলি-বাঁশ আছে, তাই দুটো নিয়ে আসি কুড়িয়ে। লগি ঠেলে-ঠেলে চলে যাব দু'জনে। তুমি যদি না পার আমি একা বাইব। ভাটির নদী তরতরিয়ে বয়ে যাবে।' মমিনা ফিরে গেল।

এমনি করেই বুঝি সমাধান হবে, এত সব হাঙ্গাম-হুজ্জুতের, আস্ফোশ-আস্ফালনের! একটা মেয়েকে বিয়ে করে! ঘরের বিবি বানিয়ে। এত হুড়দঙ্গল, কলহ-কোন্দল, ঢোটঝগড়, এত রক্তপাত—সব এমনি করে রফানিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ভুলে যেতে হবে হার-জিত, যারে কাম লাগাতে হবে নোলাম করে। বাদালকে গিয়ে বলবে, মোদার কাছে কেতাব-কলমা পড়ে এসেছি আমরা, এবার ছোলেনামা দাখিল করে দাও আদালতে।

সে না মরদের বাচ্চা?

কিন্তু উপায় কি। এ যে একটা মেয়ে নয় খালি, এ যে মমিনা। নদীর নামে তারও নাম সে যে আঁধারমাণিক।

ছোট মেখে দুটো হালকা বাঁশ নিয়ে এল মমিনা। এসে দেখে, জিয়াত নেই, ডোঙাও নেই। দু' হাতে জল কেটে-কেটে বেরিয়ে গেছে সে অনেক দূরে। ঐ দেখা যায়।

ভাঙা চাঁদ ডুবে গেল পশ্চিমে। মমিনা তাড়াতাড়ি চলে এসে তার ছাঁড়া বিছানায় শুয়ে পড়ল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নদীর খানিক দেখা যায় ঝাপসা-ঝাপসা। অন্ধকারে আঁধারমাণিকের দিকে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল, জিয়াতের দু' হাতে হঠাৎ এত জোর এল কি করে?

সপ্তসুরের নব নৈবেদ্য লইয়া আসিতেছে—

এম, পি, প্রোডাকসন্সের আগামী নিবেদন—

আট নম্বর বাড়ী

ভূমিকা • মলিনা • সন্ধ্যা • সাবিত্রী
ছবি • জহর • মিহির

পরিচালনা সুকুমার দাশগুপ্ত

সঙ্গীত রবীন চট্টোপাধ্যায়